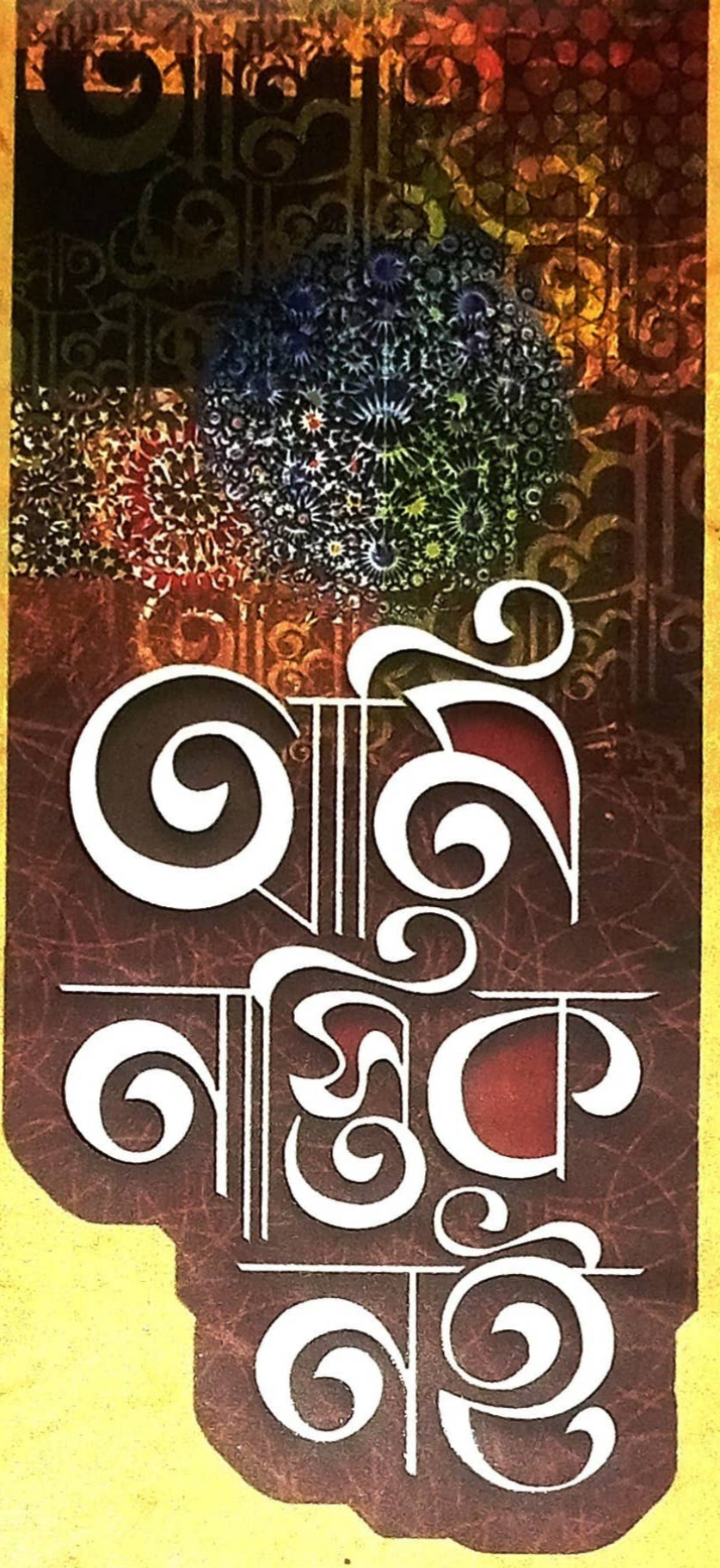



মাওলানা আলী মুর্তাজা সিরাজি

নাস্তিক্যবাদের মুখোশ উন্মোচন এবং ইসলাম ও মুসলমানের
প্রকৃত পরিচয় প্রসঙ্গে রচিত অনন্য গ্রন্থ

# আমি নাস্তিক নই


মাওলানা আলী মুর্তাজা সিরাজি
মুহাদ্দিস, মাদরাসা দারুর রাশাদ, মিরপুর, ঢাকা


সম্পাদনা


মাওলানা মুহাম্মদ লিয়াকত আলী
শিক্ষাসচিব, মাদরাসা দারুর রাশাদ
সিনিয়র মুহাদ্দিস, জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া
সহকারী সম্পাদক, নয়া দিগন্ত



আল-কাউসার প্রকাশনী

ইসলামি টাওয়ার ‖ পাঠক বন্ধু মার্কেট
১১, বাংলাবাজার, ঢাকা ‖ ৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা
০১৭১৬ ৮৫ ৭৭ ২৮, ০১৯২২ ১১ ৪৮ ৮৯
০১৯২২ ১১ ৪৮ ৮০, ০১৯২২ ১১ ৪৮ ৮৮
www.alkawsar.org

প্রকাশক
মুহাম্মদ এন্ড ব্রাদার্স
বাসা-২১৭, রোড-৪, ব্লক-ত,
মিরপুর-১২, পল্লবী, ঢাকা।

প্রথম প্রকাশ
মহররম ১৪৪১ হিজরি
সেপ্টেম্বর ২০১৯ ঈসায়ি

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

মূল্য
চারশত সত্তর টাকা মাত্র

অঙ্গসজ্জা
আল-কাউসার কম্পিউটার্স

মুদ্রণ
আল কাউসার প্রিন্টিং এণ্ড বাইন্ডিং,
বাংলাবাজার, ঢাকা।

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

# উ প হা র

আমার শ্রদ্ধেয়/ স্নেহের.....

..... কে

## ‘আমি নাস্তিক নই’

বইখানা উপহার দিলাম ।

উপহারদাতা

তারিখ :..... .....

ঠিকানা :.....

হযরত মাওলানা মুফতি হিফজুর রহমান দা. বা.
প্রধান মুফতি, জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া
সাত মসজিদ রোড, মুহাম্মদপুর, ঢাকা
-এর

# দু'আ ও বাণী

লেখক, কলামিস্ট ও গবেষক মুফতি আলী মুর্তাজা সিরাজি আমার ছাত্র। তার সংকলিত **'আমি নাস্তিক নই'** একটি সুন্দর, সুখপাঠ্য ও উপকারী গ্রন্থ। পাঠকবৃন্দের জন্য এতে অনেক কিছু বোঝার ও শেখার আছে। সংকলক তার বইটিকে চার অধ্যায়ে বিভক্ত করেছেন :

১. নাস্তিক্যবাদের পরিচয় ও তার অসারতা।

২. ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের পরিচয় ও তার অসারতা।

৩. নাস্তিকদের যুক্তি খণ্ডন।

৪. ইসলাম ও মুসলমানদের পরিচয়।

আমি বইটির বিভিন্ন অংশ পড়ে দেখেছি। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বইটি কবুল করুন। পৃথিবীর সকল মানুষের হাতে পৌছানোর ব্যবস্থা করে দিন। কিয়ামত পর্যন্ত বইটিকে পাঠ্য করুন।

লেখককে আল্লাহ তায়ালা পরিপূর্ণ ইসলাম ও ইসলামের ফয়েজ দান করুন। মৃত্যুর সময় মুসলিম হিসেবে মৃত্যু দান করুন। কিয়ামতের ময়দানে মুসলিম হিসেবে আল্লাহ তায়ালার সামনে উপস্থিত হওয়ার তাওফিক দান করুন। সুন্দর সুন্দর আরো বই লিখে ইসলাম ও মুসলমানদের সেবা করার তাওফিক দান করুন। লেখকের ইলমকে কবুল করুন। তাকে আরো বেশি বেশি ইলমে লাদুনী ও ইলমে নাফে' দান করুন। আমিন!

**(হিফজুর রহমান)**
মোবা : ০১৭১৬৩২৯৮৯৮

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ সালমান দামাত বারাকাতুহুম
খলিফা, হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.
ও মুহতামিম, মাদরাসা দারুর রাশাদ, মিরপুর, ঢাকা।
-এর

# দু'আ ও বাণী

'মাদরাসা দারুর রাশাদ'-এর মুহাদ্দিস মুফতি আলী মুর্তাজা একজন প্রতিভাবান নবীন আলেমে দীন। তিনি দরস-তাদরিসের পাশাপাশি ইসলামি বিষয়ে লেখালেখিও করেন। ইতোমধ্যে তার বিভিন্ন বই-পুস্তকমহলে বেশ সমাদৃত হয়েছে। এবার তিনি **'আমি নাস্তিক নই'** নামে একটি গুরুত্বপূর্ণ বই সংকলন করেছেন। বলা বাহুল্য, আজকাল ইসলামের বিরুদ্ধে শয়তানি ফিতনাগুলোর একটি হল নাস্তিক্যবাদ অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার সত্তাকে অস্বীকার করার ফিতনা। এ ফিতনার মুখোশ উন্মোচন এবং ইসলাম ও মুসলমানের পরিচয় প্রসঙ্গেই তার এ অনবদ্য সংকলন **'আমি নাস্তিক নই'**। আমি বইটি দেখে অত্যন্ত আনন্দিত ও অভিভূত হয়েছি।

আল্লাহ তায়ালা লেখককে সর্বোত্তম বিনিময় দান করুন। দীন ইসলামের কল্যাণে আমৃত্যু লেখালেখি করার তাওফিক দান করুন। আমিন!

**(মুহাম্মদ সালমান)**
মোবা : ০১৫৫২৩৫৬৪২১

সাল্লাল্লাহু
আলাইহি
ওয়াসাল্লাম

# ভূমিকা

اَلْحَمْدُ لِوَلِيِّهٖ وَالصَّلٰوةُ عَلٰى نَبِيِّهٖ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحٰبِهِ الْمُتَأَدِّبِيْنَ بِاٰدَابِهٖ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ . بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ . ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوْهُ، وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيْلٌ ۞ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ ۞

হামদ ও সালাতের পর। আমি আল্লাহ তায়ালার নিকট বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। শুরু করছি পরম করুণাময় ও অতিশয় দয়ালু আল্লাহ তায়ালার নামে।

তিনিই আল্লাহ; তোমাদের পালনকর্তা। তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। তিনিই সবকিছুর স্রষ্টা। তাই তোমরা তাঁরই ইবাদত করো। তিনি প্রত্যেক বস্তুর কার্যনির্বাহী। [সূরা আনয়াম-১০২]

দৃষ্টিসমূহ তাঁকে পেতে পারে না, অবশ্য তিনি দৃষ্টিসমূহকে পেতে পারেন। তিনি অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শী, সুবিজ্ঞ। [সূরা আনয়াম-১০৩]

সকল প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য। যিনি নিজ অনুগ্রহে এ ভূ-মণ্ডল ও নভোমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন, অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে এনেছেন, আবার অনস্তিত্বে নিয়ে যাবেন, পুনরায় অস্তিত্বে এনে বান্দার হিসাব-নিকাশ গ্রহণ করবেন এবং তাদের জান্নাত জাহান্নাম প্রদান করবেন।

হিসাব-নিকাশ ও জান্নাত জাহান্নামের ওই কালকে পরকাল বলা হয়। ওই দিবসকে বিচার দিবস বলা হয়। বিচারের জন্য সমাবেত হওয়ার ওই স্থানকে হাশর ময়দান বলা হয়। এগুলো সব সত্য।

তিনি সর্বদা সর্বত্র বিরাজমান। তাঁর কোনো স্রষ্টা নেই। তিনিই সকলের স্রষ্টা। তিনি অনাদি। তিনি ছাড়া আর কিছু অনাদি নয়। এসব আমরা জেনেছি, প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ ও আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক প্রেরিত কিতাবসমূহ থেকে। নবী-রাসূল, আল্লাহ তায়ালার কিতাব ও তাঁর ফেরশতা—এ সবই সত্য।

অসংখ্য দরূদ ও সালাম সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর ওপর। যিনি আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক মনোনীত ধর্ম ইসলাম আল্লাহ তায়ালার বান্দাদের কাছে হুবহু পৌঁছিয়েছেন, মানবজীবনের পরিপূর্ণ বিধান সমৃদ্ধ কুরআন মাজিদ আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে গ্রহণ করে বান্দাদের কাছে হুবহু পৌঁছে দিয়েছেন। জীবনের তেষট্টিটি বছর আল্লাহ তায়ালার বান্দাদেরকে কুফর-শিরক ও নাস্তিক্যবাদের থেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য প্রাণপণ মেহনত করে গেছেন।

সাহাবায়ে কিরাম, তাবিঈন, তাবে তাবিঈন, মুজতাহিদ ইমাম ও আকাবিরে দীনের প্রতি আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে বর্ষিত হোক শান্তিধারা, যাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমের বদৌলতে আল্লাহ তায়ালার অসীম কৃপায় আজ আমরা মুসলমান।

হযরত আদম আ. থেকে অদ্যাবধি নাস্তিক্যবাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ তায়ালার খাস বান্দাদের অক্লান্ত পরিশ্রম চালু আছে; কিন্তু শয়তানও বসে নেই। সে মানুষ ও জ্বীনদের মধ্য থেকে তার সহচরদের দিয়ে তার প্রোগ্রাম চালিয়েই যাচ্ছে। তার একমাত্র মিশন—কিভাবে সারা বিশ্বের মানুষ ও জীনজাতিকে আল্লাহ তায়ালার নাফরমান বানিয়ে আল্লাহ তায়ালার সাথে কৃত অঙ্গীকারে বিজয়ী হওয়া যায়। সে ওয়াদা ছিল—আল্লাহ তায়ালার বান্দাদেরকে যেভাবেই হোক ধোঁকা দিয়ে ভ্রষ্ট করার ওয়াদা। আর আল্লাহ তায়ালার বান্দাদের মিশন হলো শয়তানের খপ্পর থেকে নিজেকে ও অন্য সকলকে রক্ষা করা।

এ ধারা আদিকাল থেকে চলে আসছে, চলবে কেয়ামত অবধি। আধুনিকতার এ যুগে আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে নাস্তিকতা আজ দুয়ারে দুয়ারে। সরলমনা মুসলমান না জেনে, না বুঝে-ই ধরা খেয়ে যাচ্ছে নাস্তিকদের ধোঁকায়। পূর্ব প্রস্তুতি না থাকার কারণে তারা হাত থেকে নিজের ঈমান বাঁচাতে পারছে না। তাই নাস্তিক্যবাদের পরিচয় ও প্রকৃত ইসলামের পরিচয় দিয়ে একটি পুস্তিকা রচনা করার আবেদন ছিল অনেক শুভাকাঙ্ক্ষীর। মহান রাব্বুল আলামীন অধমের মাধ্যমে তাঁদের অনুরোধ পূর্ণ করতে যাচ্ছেন। আলহামদুলিল্লাহ!

আলোচনা-পর্যালোচনার একপর্যায়ে বইটির নাম ঠিক করা হয়েছে– **'আমি নাস্তিক নই'**। বইয়ের নাম, নামের তাৎপর্য ও প্রাসঙ্গিক বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে বইটিকে চারটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে নাস্তিকতা নিয়ে বিভিন্ন শিরোনামে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ধর্মনিরপেক্ষতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কারণ, ধর্মনিরপেক্ষতা হলো নাস্তিকতার সিঁড়ি। তৃতীয় অধ্যায়ে ভ্রান্তিসমূহের জবাব উপস্থাপন করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে প্রকৃত ইসলাম ও ইসলামের আকিদাসমূহ আলোচনা করা হয়েছে। ইনশাআল্লাহ! বইটি পাঠকের জন্য বিরাট উপকারী হবে।

আমার কয়েকজন ভাই বইটি সংকলনে পরামর্শ দিয়ে এবং পূর্ণ বইটি প্রুফ রিডিং করে সহযোগিতা করেছেন। শ্রদ্ধেয় চাচাজান **মমতাজ উদ্দিন আহমদ** পূর্ণ বইটি পুনরায় খুব খেয়াল করে প্রুফ রিডিং করে সহযোগিতা করেছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সকলকে উত্তম বিনিময় দান করুন। সুস্থতার সাথে দীর্ঘ হায়াত দান করুন। ঈমান, ইলম ও আমলের ময়দানে সমৃদ্ধি দান করুন।

উস্তাদে মুহতারাম হযরত মাওলানা লিয়াকত আলী দা. বা. বইটি সম্পাদনা করে দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা উস্তাদের ছায়া আমার ওপর দীর্ঘ থেকে দীর্ঘ করুন, উস্তাদকে সর্বোত্তম প্রতিদানে ভূষিত করুন।

সর্বদিক বিবেচনায় পুস্তিকাটি নির্ভুল ও নিখুঁত করার চেষ্টা করা হয়েছে; কিন্তু সম্পূর্ণ নির্ভুল হওয়া আল্লাহ তায়ালার কিতাবের বৈশিষ্ট্য। সুতরাং কোনো ধরনের ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হলে জানিয়ে কৃতজ্ঞ করতে অনুরোধ রইল। ইনশাআল্লাহ পরবর্তী সংস্করণে আপনার তথ্যের যথাযথ মূল্যায়ন করা হবে।

আল্লাহ তায়ালা লেখক, সম্পাদক ও প্রুফ রিডারসহ সকল শুভাকাঙ্ক্ষীকে তাঁর খাঁটি বান্দা হিসাবে কবুল করুন। আমিন!

ঢাকা, মিরপুর
নভেম্বর ২০১৭ইং

বিনয়াবনত
মুহাম্মদ আলী মুর্তাজা

সাল্লাল্লাহু
আলাইহি
ওয়াসাল্লাম

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

# সূচিপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

## প্রথম অধ্যায় : আমি নাস্তিক নই


নাস্তিকতা কী? ---- ১৫
সৃষ্টিতত্ত্ব ---- ১৬
ধর্মীয় অবস্থান ---- ১৯
নাস্তিকতার প্রকারভেদ ---- ১৯
প্রকাশ্য নাস্তিক বনাম প্রচ্ছন্ন নাস্তিক ---- ২০
নাস্তিকতার কারণসমূহ ---- ২১
১। প্রবৃত্তির অনুসরণ ---- ২২
২। প্রগতিশীলতা ও অতি আধুনিকতা ---- ২৩
৩। ধর্মীয় বিষয়ে অজ্ঞতা ---- ২৩
৪। কুরআন-হাদিস বুঝতে ভুল করা ---- ২৪
৫। রচনাবলি অধ্যয়ন ---- ২৮
৬। প্রোপাগাণ্ডায় আক্রান্ত হওয়া ---- ২৯
৭। খ্যাতি অর্জনের লোভ ---- ২৯
৮। শিশুকালের মন্দ অভিজ্ঞতা ---- ৩০
৯। অতিমাত্রায় যুক্তিবাদী হওয়া ---- ৩০
১০। হতাশাগ্রস্ত হওয়া ---- ৩১


## নাস্তিক্যবাদের আবির্ভাব


ইতিহাসের তথ্য ---- ৩২
পবিত্র কুরআনের তথ্য ---- ৩৩
আধুনিক যুগে নাস্তিকতার প্রসার ---- ৩৬
বাংলাদেশে নাস্তিক্যবাদের উত্থান ---- ৪২
নাস্তিকতার প্রসারে কমিউনিস্টদের ভূমিকা ---- ৪২
নাস্তিকতা প্রসারে আধুনিক খ্রিষ্টবাদের ভূমিকা ---- ৪৭
ব্লগপূর্ব যুগের নাস্তিকতা ---- ৪৮
ব্লগীয় যুগের নাস্তিকতা ---- ৪৮
ব্লগ ও ব্লগার ---- ৪৯
বাংলা ব্লগের জন্মকথা ---- ৪৯
আরো কয়েকটি ব্লগ ---- ৫০

সব ব্লগার নাস্তিক নয় ----------৫০
কয়েকটি ডানপন্থি ব্লগ----------৫০
আপনিও ব্লগার হতে পারেন ----------৫১
আইনের আওতায় ব্লগার ----------৫১
আদর্শহীনতা----------৫১
প্রকৃতিপূজা ----------৫২
ব্যক্তিপূজা ----------৫৩
প্রবৃত্তি পূজা----------৫৩
নাস্তিক্যবাদের অসারতা ----------৫৪
নাস্তিকের নির্মমতা----------৫৪
নাস্তিক্যবাদের ভ্রান্তিসমূহ ----------৫৮
নাস্তিক্যবাদের দলিল-প্রমাণ----------৫৮
জবাবের অধিকার রাখে না----------৫৯
প্রশ্ন বিভ্রাট ----------৬৪
আত্মঘাতী যুক্তি ----------৬৫

নাস্তিকের বৈশিষ্ট্য

১. দলিল-প্রমাণহীন বিতর্ক----------৬৫
২. অপবাদের রাস্তা অবলম্বন ----------৬৭
৩. গালাগালের পন্থা অবলম্বন করা----------৬৮
৪. জঙ্গিবাদীর পন্থা অবলম্বন করা----------৭০
নাস্তিকের শাস্তি---------- ৭১
নাস্তিকের জানাযা ও কাফন-দাফন ----------৭৪

## দ্বিতীয় অধ্যায় : আমি সেক্যুলার নই

ধর্মনিরপেক্ষতার আভিধানিক সংজ্ঞা ----------৮০
ধর্মনিরপেক্ষতার পারিভাষিক সংজ্ঞা ----------৮০
ধর্মনিরপেক্ষতার গোড়ার কথা ----------৮১
ধর্মনিরপেক্ষতার মূলনীতি ও বৈশিষ্ট্য ----------৮৫
ইসলাম ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের মধ্যে পার্থক্য ----------৮৫
ইসলামি শরিয়তে ধর্মনিরপেক্ষতার কোনো স্থান নেই ----------৯১
ধর্মনিরপেক্ষতাকে ইসলামায়নের অপচেষ্টা----------৯৩
যুক্তির মানদণ্ডে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ----------৯৬

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের পরিণাম ---------- ৯৯
১. আদর্শিক পরিণাম ---------- ৯৯
২. নৈতিক পরিণাম ---------- ১০০
৩. মূল্যমানের পরিণাম ---------- ১০০
৪. শাসনতান্ত্রিক পরিণাম ---------- ১০১
৫. ধর্মীয় পরিণাম ---------- ১০২

## সেক্যুলারিজমের অবদান

তুরস্কের উদাহরণ ---------- ১০২
মিসরের উদাহরণ ---------- ১০৩
বাংলাদেশ পরিস্থিতি ---------- ১০৪
প্রসঙ্গ মুক্তচিন্তা ---------- ১০৪

## তৃতীয় অধ্যায় : নাস্তিক্যবাদের ভ্রান্তি নিরসন

আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্ব ---------- ১০৭
আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্ব ও আমাদের সীমাবদ্ধতা ---------- ১১০
আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্বের প্রমাণসমূহ ---------- ১১১
পরকাল ---------- ১২৭
গবেষণালব্ধ প্রমাণেও পরকাল সত্য ---------- ১৩৫
পরকাল অস্বীকারে নাস্তিকের পন্থা কুরআনের জবাব ---------- ১৩৬
কুরআনের সত্যতা ও প্রমাণ ---------- ১৪১
কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণী ---------- ১৪২
মহাবিস্ফোরণ তত্ত্ব ---------- ১৪৭
ঐতিহাসিকভাবে সত্য প্রমাণিত কুরআনের কয়েকটি ভবিষ্যদ্বাণী ---- ১৫২
ধর্মের প্রয়োজনীয়তা ---------- ১৫৮
ধর্মের অবদান ---------- ১৬০
বিজ্ঞানের নামে ধোঁকাবাজি ---------- ১৬৪
ভ্রান্ত প্রশ্নের সঠিক সমাধান ---------- ১৬৬
প্রশ্নগুলো এড়িয়ে যাওয়াই নিরাপদ ---------- ১৬৬
কুরআন প্রসঙ্গে কাফিরদের কিছু মৌলিক বিভ্রান্তি ---------- ২১১
চা স্টলে একদিন ---------- ২১৭
ইমাম আযম রহ. ও জনৈক নাস্তিক ---------- ২২৮
এক দরবেশের উচিত জবাব ---------- ২৩০
নাস্তিকতা থেকে ইসলামের ছায়ায় ---------- ২৩১

যারে তারে নাস্তিক বলার সংস্কৃতি ---------- ২৫১
কবিরা গুনাহ করলে নাস্তিক হয় না ---------- ২৫২
নাস্তিকতা একটা অপমান ---------- ২৫২
নাস্তিকতা একটি অভিশাপ ---------- ২৫২
ফিরে আসুন! ---------- ২৫৭
নিজে বাঁচুন অন্যকে বাঁচানোর চেষ্টা করুন ---------- ২৫৭
সন্তানের প্রতি খেয়াল রাখুন ---------- ২৫৮
অমুসলিমদের সাথে বন্ধুত্ব নয় ---------- ২৫৯
আল্লাহ তায়ালার সত্তা নিয়ে কল্পনা নয় ---------- ২৬২
বই পড়তে হুঁশিয়ার ---------- ২৬৩
ধোঁকাবাজ ব্লগ থেকে সাবধান ---------- ২৬৪
ইসলামি ব্লগ প্রতিষ্ঠা করুন ---------- ২৬৫
ব্যাপকহারে মক্তব প্রতিষ্ঠা করুন ---------- ২৬৬
প্রয়োজনীয় গ্রন্থ রচনা করতে হবে ---------- ২৬৮
ইসলামিক সেন্টার প্রতিষ্ঠা করতে হবে ---------- ২৬৯
সাধারণ শিক্ষিত ও আলেমদের পরস্পর কাছাকাছি আসা উচিত ------- ২৭০
আরো কিছু করতে হবে ---------- ২৭৩
আল্লাহ তায়ালার কোনো হুকুম অযৌক্তিক নয় ---------- ২৭৩
আল্লাহ তায়ালার বিধানে যুক্তি খোঁজা অযৌক্তিক ---------- ২৭৪

## চতুর্থ অধ্যায় : আমি মুসলিম

মুসলিমের পরিচয় ---------- ২৭৫
ইসলামের পরিচয় ---------- ২৭৫
ঈমানের হাকিকত ---------- ২৭৬
ইসলাম ও কুফরের মানদণ্ড ---------- ৩৪২
মুসলমানের বৈশিষ্ট্যময় গুণাবলি ---------- ৩৫৭
ঈমানের পূর্ণতার জন্য চাই পূর্ণ সমর্পণ ---------- ৩৬০
নিজেই নিজের ঈমান পরখ করুন! ---------- ৩৬৪
প্রকৃত মুসলমানের মৌলিক আকিদাসমূহ ---------- ৩৬৫
ইসলামই শাশ্বত ধর্ম ---------- ৩৭৫
গ্রন্থপঞ্জি ---------- ৩৮৪

সূচী সমাপ্ত



## প্রথম অধ্যায় : আমি নাস্তিক নই

'আমি নাস্তিক নই', দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন একটি স্বীকারোক্তি, বিবেক-বুদ্ধির দাবিও এটাই। আস্তিক মানে যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্বকে বিশ্বাস করে এবং স্বীকার করে। আল্লাহ তায়ালার রহমতের সাগরে ডুবে থেকেও যে লোকটি আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্বকে অস্বীকার করে, তার চেয়ে পোড়াকপাল আর কে হবে? তাই সৌভাগ্যবান ব্যক্তি সর্বদা স্বীকার করবে—আমি নাস্তিক নই। তাৎপর্যপূর্ণ এ স্বীকারোক্তির বিভিন্ন দিক নিম্নে আলোচনা করা হলো।

### নাস্তিকতা কী?

যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা ও পরকালের অস্তিত্ব অস্বীকার করে, পরিভাষায় তাকে Atheist (এথিস্ট), مُلْحِدٌ (মুলহিদ) বা নাস্তিক বলা হয়।

'নাস্তিক' শব্দের আরবি প্রতিশব্দ مُلْحِدٌ (মুলহিদ)। ইংরেজি প্রতিশব্দ Atheist (এথিস্ট)।

বাংলা একাডেমি প্রণীত ব্যবহারিক বাংলা অভিধান গ্রন্থে নাস্তিক শব্দের পরিচয়ে বলা হয়েছে, 'স্রষ্টা ও পরকালের বিশ্বাস নেই এমন ব্যক্তি।

[ব্যবহারিক বাংলা অভিধান-৬৭৯]

এর বিপরীত শব্দটি হল আস্তিক। উক্ত অভিধানে এর অর্থ লেখা হয়েছে, 'আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্বে বিশ্বাসী বা পরকাল মানে এমন ব্যক্তি।'

[ব্যবহারিক বাংলা অভিধান–১৩৩]

আস্তিক শব্দটি আস্তি ধাতুমূল থেকে নির্গত। 'আস্তি'-এর শুরুতে 'দন্ত-ন' অব্যয়যুক্ত করেই (ন+আস্তিক) নাস্তি শব্দের জন্ম হয়েছে।

উইকিপিডিয়াতে নাস্তিক/ নাস্তিক্যবাদের পরিচয় দিতে গিয়ে বলা হয়েছে, 'এটি একটি দর্শনের নাম। যাতে ইশ্বর বা স্রষ্টার অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় না। সম্পূর্ণ ভৌত ও প্রাকৃতিক উপায়ে প্রকৃতির ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। আস্তিক্যবাদ বর্জনকেই নাস্তিক্যবাদ বলা যায়। নাস্তিক্যবাদ বিশ্বাস নয় বরং অবিশ্বাস এবং যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। বিশ্বাস খণ্ডন নয় বরং বিশ্বাস থাকাই এখানে মুখ্য।

নাস্তিকতার ইংরেজি শব্দ Atheism (অ্যাথেইজম)। এ শব্দের উৎপত্তি হয়েছিল গ্রিক 'এথোস' শব্দ হতে। শব্দটি সেসকল মানুষকে নির্দেশ করে,

যারা স্রষ্টার অস্তিত্ব নেই বলে মনে করে এবং প্রচলিত ধর্মগুলোর বিশ্বাসকে যুক্তি দ্বারা ভ্রান্ত বলে প্রমাণ করে। [সূত্র : ইন্টারনেট]

**সৃষ্টিতত্ত্ব**

একদল লোক মনে করে, দুনিয়া নিজে নিজেই সৃষ্টি হয়েছে। তাদের দাবি হলো— লাখ লাখ বছর পৃথিবীর তরল গোলক উত্তপ্ত থাকার পর যখন জীবনের অবস্থানোপযোগী শীতলতা প্রাপ্ত হল, তখন তাতে সর্বপ্রথম এক Cell (সেল) বিশিষ্ট একপ্রকার জীবের উদ্ভব ঘটল। তারপর ক্রমবিকাশ ও ক্রমপরিণতির নিয়মানুসারে পৃথিবী বহু সেলবিশিষ্ট অসংখ্যজীবে অধ্যুষিত হয়ে উঠল। এ ক্রমবিকাশের শেষ পরিণতিই হলো মানুষ। এদেরকে সাধারণ কথায় নাস্তিক বা Athiest বলা হয়। আর এদের মতবাদকে বলা হয় Materialism বা বস্তুবাদ। ডারউইন, হিউম, হেগেল, মার্ক্স ও এঞ্জেলস প্রভৃতি এ মতবাদের জনক ও পরিপোষক।

ইসলাম কঠোর ভাষায় এ ভ্রান্ত মতবাদ ও আকিদার প্রতিবাদ করেছে। ইসলামের মতে মানুষ যেমনি শুধু পুঁজ জাতীয় নাপাক বস্তু আর রক্ত দিয়েই গঠিত নয়, তেমনি মাটি আর গোবরই তার শেষ পরিণতি নয়। মানুষের এ রক্ত-মাংসের জড়পিণ্ড-র অভ্যন্তরে এমন এক অনুপম বস্তু বিদ্যমান রয়েছে; যা চিরঞ্জীব, যার কোনো ধ্বংস নেই, যা চিরকাল বিরাজ করবে। এ বস্তুর নাম হচ্ছে আত্মা বা রূহ। দেহ আর আত্মার সমন্বয়ে সৃষ্ট এই যে মানব, এর একজন স্রষ্টা আছে। মানুষ বানর থেকে বিকাশ লাভ করে নি; সে এক অসীম শক্তিশালী সর্ববিজ্ঞ নিয়ামকের নির্দেশে সৃষ্ট এবং প্রতিপালিত হচ্ছে। তাঁরই অভিপ্রায়, আদেশ ও নির্দেশ অনুসারে চলছে।

আল্লাহ তায়ালার সমস্ত নবী-রাসূল এ বিশ্বাসের প্রতিই যুগে যুগে দেশে দেশে মানবজাতিকে আহবান জানিয়েছেন। কিন্তু দুনিয়ায় একদল বুদ্ধিমান রয়েছেন, যারা মনে করেন ও অপরকে বিশ্বাস করাতে চান যে, একটি অদ্ভুত জাহাজ রয়েছে। নির্দিষ্ট স্থান থেকে নির্ধারিত সময়ে ছাড়ছে। বিভিন্ন বন্দরে নিজে নিজেই ভিড়ছে আর বিভিন্ন পণ্যদ্রব্যের উঠানামা সক্রিয়ভাবেই চলছে। অথচ তার কোনো চালক, কাপ্তান, সারেং, মাল্লা বা নিয়ন্ত্রক কিছুই নেই। আবার জাহাজের কোনো কাজেও কিন্তু এক মিনিটের জন্য কোনো ব্যতিক্রম বা বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় না।

এরূপ জাহাজের খবর যদি কোনো ব্যক্তি প্রদান করে, তা হলে আপনারা তাকে কী করবেন? নিশ্চয় তাকে পাগলা গারদে পাঠানোর ব্যবস্থা করবেন। এখন সামান্য একটা জাহাজ যদি নিজে নিজে চলতে না পারে, তা হলে এ

মহাবিশ্বের বিপুল জগৎ, চন্দ্র, সূর্য ও লক্ষ কোটি সূর্য সদৃশ তারকাপুঞ্জ ও নীহারিকা মণ্ডলের আপন পথে নিঃশব্দে অহর্নিশ পরিভ্রমণ, নিজের কক্ষপথে সুশৃঙ্খল পরিক্রমণ, আলোর বিকিরণ, বারি বর্ষণ এবং শস্য উৎপাদন প্রভৃতি একজন চালক ও নিয়ন্ত্রকের মুখাপেক্ষী না হয়ে কিভাবে চলতে পারে?

James Jeans তাঁর সুবিখ্যাত Mysterious Universe Around Us গ্রন্থে লিখেছেন :

'এমন এক একটা জাহাজ শূন্যে ভ্রাম্যমাণ রয়েছে, যার ভিতর কোটি কোটি সূর্য সদৃশ বস্তু রয়েছে। এসব জাহাজের আকাশপথে বিপুল গতিতে বিরামহীন পরিভ্রমণে কোথাও কোনো স্থানে কস্মিনকালে সংঘর্ষ ঘটে না। এমনকি হাজার হাজার বছরেও একটি জাহাজের সাথে আরেকটি জাহাজের সাক্ষাতও ঘটে না।'

আমরা স্বচক্ষে অহরহ দেখি, মানুষের যথেষ্ট সতর্কতা আর নির্দিষ্ট ব্যবস্থা সত্ত্বেও ট্রেনে ট্রেনে সংঘর্ষ ঘটছে। কিন্তু বিশাল বিরাট মহাশূন্যের সমুদ্রে পরিক্রমণরত জাহাজগুলোর কোনোদিন কোনোটার সাথে কোনোটার ধাক্কা বা সংঘর্ষ লাগছে না। তবু কি আমরা বলব, জগত সংসার স্রষ্টাহীন চালকহীন অবস্থায়ই আপনাআপনি এত সুন্দর সুশৃঙ্খলভাবে চলছে? এ সমস্তের কোনো খালেক-সৃষ্টিকর্তা নেই? যারা এ ধরনের কথা বলে, তাদেরকে আপনারা কী বলবেন? তাদেরকে আপনারা কী করবেন?

কুরআন মজিদে এদেরকেই বলা হয়েছে, কেন তারা আকাশ ও পৃথিবীর বিষয় চিন্তা করে দেখে না? আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ❁

"নিশ্চয় নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল সৃষ্টির মধ্যে, দিবস ও যামিনীর বিবর্তনে চিন্তাশীলদের জন্য রয়েছে অসংখ্য নিদর্শন।" [সূরা আলে ইমরান-১৯০]

অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ❁

"নিশ্চয় আসমান ও জমিনের সৃষ্টিতে, রাত-দিনের বিবর্তনে এবং নদীতে নৌকাসমূহের চলাচলে মানুষের জন্য কল্যাণ রয়েছে। আর আল্লাহ আকাশ থেকে যে পানি নাযিল করেছেন, তদ্বারা মৃত জমিনকে সজীব করে তুলেছেন এবং তাতে ছড়িয়ে দিয়েছেন সবরকম জীবজন্তু। আর জলবায়ু পরিবর্তনে ও

মেঘমালার যা তাঁরই হুকুমের অধীনে আসমান ও জমিনের মাঝে বিচরণ করে, নিশ্চয় এগুলোতে বুদ্ধিমান গোষ্ঠীর জন্য রয়েছে নিদর্শন।" [সূরা বাকারা-১৬৪]

Plato I Newton-এর মতো মনীষীরাও সৃষ্টিকর্তাকে অস্বীকার করেন নি। ইউরোপে শিল্প-বিপ্লব (Industrial revolution) আর কলকব্জার শনৈ শনৈ উন্নতির পর থেকে নিরেশ্বরবাদের প্রচার হতে থাকে আর ক্রমেই নাস্তিকতা ও ইলহাদ তথাকথিত সভ্যজগতে প্রসার লাভ করতে থাকে।

এখন আবার মোড় ঘুরে যাচ্ছে। Theory of Evolution বিবর্তনবাদের ভিতরেও এমন সব ত্রুটি-বিচ্যুতি বেরিয়েছে, স্রষ্টার অস্তিত্বকে স্বীকার করে না নিলে সৃষ্টি-রহস্যের সমাধান আর সম্ভব হচ্ছে না।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ۞

"আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিশ্রিত শুক্র থেকে, তাকে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে। আর তাই আমি তাকে শ্রবণশীল দৃষ্টিমান জীবে পরিণত করেছি।"
[সূরা দাহর-২]

গাছের পাতা, শিকড়, সিনকোণা প্রভৃতি তুচ্ছ তুচ্ছ জিনিসের যদি ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া থাকে, তা হলে শ্রেষ্ঠতম জীব আশরাফুল মাখলুকাত মানুষের আচরণ বা কর্মের Re-action বা প্রতিক্রিয়া থাকবে না, এটা কি হতে পারে? মানুষকে ব-াহীনভাবে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে; মানবজীবনের কোনো দায়-দায়িত্বই নেই—এমন কথা যদি স্বীকার করে নেওয়া হয়, তা হলে জিজ্ঞাসা করি—যারা শোষক, উৎপীড়ক, জালেম ও নিপীড়কারী, তাদের বিরুদ্ধে আর্তনাদ কেন? দুনিয়ার সবকিছুকেই যদি Relative বা আপেক্ষিক বলে মেনে নেওয়া হয়, Rigid Truth বলে যদি কিছু না থাকে, তা হলে জুলমের নিন্দা করা হয় কোন মানদণ্ডে ও বিচারের কোন দৃষ্টিকোণ থেকে?

মানুষের জীবন দায়িত্বহীন নয়। নির্দিষ্ট কর্তব্য, নির্ধারিত দায়িত্ব আছে। তাই মানুষ মানুষ নামের অধিকারী। এখানেই তার মনুষ্যত্ব। এখানেই তার মহত্ত্ব। এখানেই তার শ্রেষ্ঠত্ব। আল্লাহ তায়ালা মানুষকে একজন শ্রবণশীল ও দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন করে তৈরি করেছেন। এ শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তির ভিতরে রয়েছে প্রজ্ঞা ও বিচারশক্তি। ছাগল-গরুতে সেটা নেই। অন্য কোনো প্রাণীতে নেই। যদিও চোখ-কান তাদেরও রীতিমতো বিদ্যমান। কোত্থেকে আসল এ প্রজ্ঞা ও বিচারশক্তি? এসব কি অণু, পরমাণু, হাইড্রোজেন বা ক্যালসিয়ামের ফল?

মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তির মধ্যে এই যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য, এ পার্থক্যটা সৃষ্টি করল কে? মানুষের দৃষ্টি ও বিচারবোধে Intelligence বুদ্ধিবৃত্তির উন্মেষ ও বিকাশ ঘটল কিভাবে? এর মধ্যে রয়েছে চিন্তার খোরাক এবং চিন্তাশীলদের জন্য আছে আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর অসীম ক্ষমতার বহুবিধ নিদর্শন। [নাস্তিকের যুক্তি খণ্ডন : ১০-১৪]

**ধর্মীয় অবস্থান**

নাস্তিকরা ইবলিসের চেয়েও খারাপ। কেননা ইবলিস সৃষ্টিকর্তাকে স্বীকার করে; অথচ নাস্তিকরা সৃষ্টিকর্তাকে অস্বীকার করে। আল্লাহ তায়ালার হুকুম অমান্য করতে গিয়ে ইবলিস বলেছিল–

قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ❖

"আমি তার চেয়ে উত্তম আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন আগুন থেকে আর তাকে সৃষ্টি করেছেন কাদামাটি থেকে। [সূরা ছদ-৭৬]

অর্থাৎ শয়তানও আল্লাহ তায়ালাকে সৃষ্টিকর্তা হিসেবে স্বীকার করে; কিন্তু খোদাদ্রোহী নাস্তিক কাফিররা ইবলিসের চেয়েও নিকৃষ্ট। কেননা তারা আল্লাহ তায়ালাকে সৃষ্টিকর্তা হিসেবে স্বীকার করে না।

ইবলিস শয়তান আরো বলেছিল,

قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ❖

"সে বলল, হে আমার পালনকর্তা! আপনি যেমনি আমাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, আমিও তাদের সবাইকে পৃথিবীতে নানা সৌন্দর্যে আকৃষ্ট করব এবং তাদের সবাইকে পথভ্রষ্ঠ করে দিব।" [সূরা হিজর-৩৯]

অর্থাৎ ইবলিসও আল্লাহ তায়ালাকে পালনকর্তা হিসেবে মেনে নিয়েছে; কিন্তু নাস্তিকরা আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্বকেই অস্বীকার করে!

আল্লাহ তায়ালার দেওয়া নেয়ামতের সাগরে ডুবে থেকেও খোদ আল্লাহ তায়ালাকেই যারা অস্বীকার করে, তাদের চেয়ে নিমক হারাম আর কে হতে পারে? আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে হেফাজত করুন। আমিন!

**নাস্তিকতার প্রকারভেদ**

নাস্তিকতায় নানা শ্রেণি রয়েছে। যথা—

'ট্রেডিশনাল' নাস্তিকতায় কার্লমার্ক্স, জেনপোল ও এনটোনি ফ্লিউ মনে করে, 'স্রষ্টা কোনো সময় ছিলেন না এবং কোনো সময় হবেনও না।

'মাইথলজিক্যাল' নাস্তিকতায় বিশ্বাসীরা মনে করে যে, 'স্রষ্টা সম্পর্কে পৌরণিক উপাখ্যান অতীতের লোকজন বিশ্বাস করতো; কিন্তু আধুনিক মানুষের জ্ঞান ও সংস্কৃতি সে বিশ্বাসকে নিঃশেষ করেছে।

'ডায়ালেকটিক্যাল' নাস্তিকতায় বিশ্বাসীরা মনে করে, যীশু খ্রিষ্টের (যিনি তাদের মতে স্রষ্টার অবতার) মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে স্রষ্টারও মৃত্যু হয়েছে।

'সেমানটিক্যাল' নাস্তিকতায় বিশ্বাসীরা মনে করে, আল্লাহ সম্পর্কে অর্থপূর্ণ ভাষায় কিছু ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। যারা এ মনোভাব পোষণ করে, তাদের কাছে ধর্মের কোনো গুরুত্ব নেই। (নাউযুবিল্লাহ!)

এ ছাড়া নাস্তিক্যবাদের আরো কিছু শ্রেণি আছে। যেমন এক্সিসটেনশিয়াল নাস্তিকতা, মার্কসিসটিক নাস্তিকতা, মনস্তাত্ত্বিক নাস্তিকতা এবং পুঁজিবাদী নাস্তিকতা ইত্যাদি। [নাস্তিক-মুরতাদের শরয়ি বিধান : ১১-১২]

**প্রকাশ্য নাস্তিক বনাম প্রচ্ছন্ন নাস্তিক**

বাংলাদেশের মানুষ স্বভাবতই ধর্মপ্রাণ। নিজে ধর্ম-কর্ম পালন না করলেও ধর্মকে নিয়ে কেউ কটু কথা বললে, আল্লাহ তায়ালা ও রাসূল ﷺ-কে নিয়ে বিদ্রুপ করলে তারা তাকে ছেড়ে দেয় না; যথাসাধ্য এর প্রতিবাদ করে। এটা হৃদয়ের কোণে ধারণ করা ঈমানের আলোকচ্ছটার অবশ্যম্ভাবী একটা প্রভাব। তাই দেখা যায়, যে লোক কোনো দিন নামায পড়বে তো দূরের কথা, পশ্চিম দিকে ফিরে তাকায় নি, সেও নাস্তিকের বিরুদ্ধে মিছিলে যোগ দিয়ে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে শ্লোগান ধরে, 'নিপাত যাক নিপাত যাক, নাস্তিকতা নিপাত যাক'।

এসব বিষয় ভালো করে জানা আছে বিধায় সামাজিকভাবে মানুষের নিন্দা ও অবজ্ঞা থেকে আত্মরক্ষার্থে কিছু নাস্তিক নিজেদের নাস্তিক পরিচয় গোপন করে রাখে চার পাশের মানুষের কাছ থেকে। বাইরের জগতে তারা ধর্ম-কর্ম পালন না করলেও ধর্মের বিরুদ্ধে সরাসরি বিদ্রোহ ঘোষণা করে না। ধর্মের বিরুদ্ধে এদের যত ক্ষোভ সব ঝাড়ে ব্লগের পাতায় বা ফেসবুকের ওয়ালে। ছদ্মনামের আড়ালে তারা তাদের ধর্মবিদ্বেষ ছড়ায়। এরা হল, প্রচ্ছন্ন নাস্তিক। এদের বিপরীতে আছে প্রকাশ্য নাস্তিক, যারা খোলাখুলিভাবে তাদের নাস্তিক পরিচয় প্রকাশ করে গর্ববোধ করে।

প্রচ্ছন্ন কাজ হলো প্রকাশ্য উৎসাহ দিয়ে যাওয়া, সহযোগিতা করে যাওয়া। তারা যখনই নাস্তিকতাপূর্ণ কোনো ব্লগ লিখে, তারা সেখানে কমেন্ট করে ওদের উৎসাহ জানায়। সামনে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা যোগায়। এরা প্রকাশ্য নাস্তিককে নিজেদের অনুসৃত ব্যক্তিত্ব হিসেবে গ্রহণ করে। ফলে প্রকাশ্য নাস্তিকরা ধর্ম নিয়ে যে কোনো ধরনের আপত্তি-অভিযোগ বা দাবি উত্থাপন করার সাথে সাথে এরা মাথা নেড়ে একান্ত অনুগত শিষ্যের মতো সমর্থন জানায়। তাদের দাবির যৌক্তিকতা নিয়ে ভাবার প্রয়োজন বোধ করে না। কিন্তু আবার তাদেরকে নাস্তিক হিসেবে আখ্যায়িত করলে অকপটে বলে দেয় যে, *'আমি নাস্তিক নই'*।

প্রচ্ছন্ন নাস্তিকরা নিজের চিন্তা-বিশ্বাস গোপন রাখার দরুন সামাজিকভাবে অনেক সুযোগ-সুবিধাও ভোগ করতে পারে। প্রকাশ্য ভাগ্যে সেটা জোটে না। ধর্মসংশ্লিষ্ট অনেক উৎসব-অনুষ্ঠানে তাদের আমন্ত্রণ মিস হয় না। সেদিক বিবেচনায় প্রচ্ছন্ন নাস্তিককে সুবিধাবাদী নাস্তিকও বলা যায়।

[নাস্তিকতার স্বরূপ সন্ধান]

**নাস্তিকতার কারণসমূহ**

আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক মানুষকে প্রাকৃতিকভাবে স্রষ্টাকে চেনার গুণ দিয়ে সৃষ্টি করে থাকেন। সেজন্যই দেখা যায়, প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ ধর্মে বিশ্বাসী। কোনো না কোনো স্রষ্টার অস্তিত্বকে মেনে নিয়ে তাঁরা তার বশ্যতা স্বীকার করে আসবে। প্রাগৈতিহাসিক জাতিসমূহের ধর্মবিশ্বাস বিশ্লেষণ করলে এমনটিই বুঝে আসে। রাসূলুল্লাহ ﷺ এক হাদিসে ইরশাদ করেছেন–

كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ

প্রত্যেক শিশুই ইসলামের স্বভাব নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। পরবর্তীসময়ে তার বাবা মা তাকে ইহুদি, খ্রিষ্টান অথবা অগ্নিপূজকে রূপান্তরিত করে।

[বুখারি শরিফ, হাদিস নং ১৩৮৫]

অর্থাৎ জন্মের পর বাবা-মা সন্তানকে আপন আপন ধর্মের দীক্ষা দিয়ে তার ভিতরে সুপ্ত ইসলামের প্রাকৃতিক স্বভাবকে আড়াল করে দেয়।

কুরআন মাজিদে আল্লাহ তায়ালা স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রমাণ করতে গিয়ে জটিল কোনো বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের অবতারণা করেননি। বেশ স্বাভাবিকভাবে তিনি স্রষ্টার অস্তিত্ব তুলে ধরেছেন। যা উচ্চ শিক্ষিত, বিজ্ঞানী, বুদ্ধিজীবী, দার্শনিক থেকে শুরু করে নিরক্ষর চাষা, মজুর বা মাঝি-মাল্লাও বুঝতে সক্ষম।

এ বিষয়ে ভারতরত্ন হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবি রহ. তাঁর তাফ্সিরের মূলনীতিবিষয়ক বিখ্যাত গ্রন্থ 'আল-ফাউযুল কাবিরে' লিখেছেন,

"কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে মানুষের আধ্যাত্মিক অবস্থার সংশোধনের জন্য, সে আরব হোক বা অনারব, গ্রাম্য হোক বা শহুরে। আর সেজন্যই আলোচনা পর্যালোচনা ও তত্ত্ব-তালাশের অতিরিক্ত গভীরতায় না গিয়ে আল্লাহ তায়ালার নিয়ামতের আলোচনায় মানুষকে এমনভাবে সম্বোধন করা হয়েছে, যা তাদের মস্তিষ্ক সহজেই অনুধাবন করতে পারে ও তাদের বোধশক্তি তা স্বাভাবিকভাবে আয়ত্ত করে নিতে পারে। তাই কুরআনে আল্লাহ তায়ালার নাম ও গুণাবলির আলোচনা এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, মানুষ তার সৃষ্টিগত বোধশক্তির মাধ্যমে তা সহজেই বুঝতে সক্ষম। তার জন্য দর্শন বা তর্কশাস্ত্র অধ্যয়নের কোনো প্রয়োজন পড়ে না।" [আল-ফাউযুল কাবির-৪৮]

এতৎসত্ত্বেও মানুষের মধ্যে স্রষ্টাকে অস্বীকার করার প্রবণতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর পিছনে নানাবিধ কারণ লুকিয়ে আছে। বিভিন্ন বই-পত্র, প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও আত্মজীবনীমূলক লেখা ঘাটাঘাটি করে এবং বিভিন্ন সময় তাদের সাথে আলাপ-আলোচনা ও মতবিনিময় করে যে কারণগুলো চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে, এখানে সেগুলো আমরা তুলে ধরলাম। যথা—

১। প্রবৃত্তির অনুসরণ।
২। প্রগতিশীলতা ও অতি আধুনিকতা।
৩। ধর্মীয় বিষয়ে অজ্ঞতা।
৪। কুরআন-হাদিস বুঝতে ভুল করা।
৫। রচনাবলি অধ্যয়ন।
৬। প্রোপাগাণ্ডায় আক্রান্ত হওয়া।
৭। খ্যাতি অর্জনের লোভ।
৮। শিশুকালের মন্দ অভিজ্ঞতা।
৯। অতিমাত্রায় যুক্তিবাদী হওয়া।
১০। হতাশাগ্রস্ত হওয়া।

এ পর্যায়ে আমরা এ কারণগুলোর সামান্য বিশ্লেষণ পেশ করব।

**১। প্রবৃত্তির অনুসরণ**

প্রবৃত্তি যাকে নফস বা মন বলা হয়, সে নফস একাই মানুষকে জাহান্নামে নেওয়ার জন্য যথেষ্ট।

প্রবৃত্তি সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা কুরআন পাকে বলেছেন,

إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ

"নিশ্চয় মানুষের প্রবৃত্তি মন্দ কর্মপ্রবণ।" [সূরা ইউসুফ-৫৩]

এ নফসের ধোঁকায় পড়ে মানুষ প্রথমে চোখের যেনায় লিপ্ত হয়। বেপর্দার গুনাহে আক্রান্ত হয়। তারপর আস্তে আস্তে হাতের যেনা, পায়ের যেনা বরং বাস্তব বাস্তব যেনায়ও লিপ্ত হয়ে পড়ে। দাঁড়ি কাটা, দাঁড়ি ছাটা, মিথ্যা বলা, মদ্যপান করা ইত্যাদি নানাবিধ কবিরা গুনাহে লিপ্ত হয়ে পড়ে।

গুনাহের ক্ষতিসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো গুনাহকারীর অন্তরে অন্ধকার সৃষ্টি হওয়া। অন্তরে অন্ধকার সৃষ্টির একপর্যায়ে তাদের অন্তরে আর গুনাহকে গুনাহ মনে হয় না। প্রবৃত্তি তাকে বুঝাতে থাকে, এটা কোনো গুনাহ নয়। এটা করতে কোনো সমস্যা নেই। দাঁড়িতে ইসলাম ঢোকেনি ইত্যাদি। এমনকি প্রবৃত্তির অনুসারী নাস্তিককে নিজের বোনের সাথে, মেয়ের সাথে, মায়ের সাথেও কুসম্পর্ক রচনার ইচ্ছা ব্যক্ত করতে দেখা গেছে। (নাউযুবিল্লাহ!)

একপর্যায়ে প্রবৃত্তি তাকে আল্লাহ তায়ালা ও ধর্মের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী করে তোলে। কারণ, আল্লাহ পাকের অস্তিত্ব ও ধর্মের অস্তিত্বে তার বিশ্বাস থাকলে একসময় না একসময় এ বিশ্বাসের কারণে সে তওবা করে জান্নাতের রাস্তায় ফিরে আসতে পারে। এক্ষেত্রেও হতভাগা মানুষ তার প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে পিছপা হয় না; দুর্ভাগ্যবশত নাস্তিকতার ধ্বংসাত্মক পথে পা বাড়িয়ে দেয়।

**২। প্রগতিশীলতা ও অতি আধুনিকতা**

কিছু লোক প্রগতিশীল ও অত্যাধুনিক হিসেবে নিজেকে পেশ করার জন্য নাস্তিকতার পথ বেছে নেয়। তারা জানে না, নাস্তিকতা প্রগতিশীলতা নয় বরং পশ্চাৎপদতা। নাস্তিকতা অত্যাধুনিকতা নয় বরং জাহিলিযুগের বর্বরতা।

বাস্তবিকভাবে যদি অত্যাধুনিকতাকে সংজ্ঞায়িত করতে হয়, তবে সকলকে একবাক্যে বলতে হবে যে, ইসলামই অত্যাধুনিকতা, ইসলামই প্রগতিশীলতা, ইসলামই উন্নয়ন ও ইসলামই অগ্রগামিতা। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত নাস্তিকতাকেই তারা প্রগতিশীলতা ও অত্যাধুনিকতা মনে করে এবং নাস্তিকতার ধ্বংসাত্মক পথে পা বাড়াতে থাকে।

**৩। ধর্মীয় বিষয়ে অজ্ঞতা**

ইসলাম বিদ্বেষীরা মুসলমানদের সবচেয়ে বড় যে ক্ষতি করেছে, তা হল– মুসলমানদেরকে তাদের ধর্মীয় শিক্ষা থেকে বিরত রাখা। তারা কখনো ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ক্ষতিসাধন করছে। কখনো ধর্মীয় শিক্ষা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালায়। কখনো মুসলমানদেরকে অন্য শিক্ষা দেয়। গান-বাদ্যে লিপ্ত করে। খেলা-ধুলায় মাতিয়ে রাখে। অন্য কোনোভাবে ধর্মীয় শিক্ষা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে বিমুখ করে রাখে।

কতক মুসলমান আবার ইসলামের চিরশত্রু ইহুদি-খ্রিষ্টান, পৌত্তলিক ও নাস্তিককে বন্ধু মনে করে তাদের ষড়যন্ত্রে আক্রান্ত হয়েছে এবং হচ্ছে। এতে করে ওইসব মুসলমান ও তাদের পরবর্তী প্রজন্ম ইসলামি শিক্ষা থেকে বঞ্চিত থেকে যায়। যার ফলে তারা ধর্মের কাজ আর অধর্মের কাজের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না। বিভিন্ন বাতিলপন্থিদের অধর্মের কাজকে তারা ধর্মের কাজ মনে করে। ওইসব অযৌক্তিক কাজের কারণে ধর্মকে দোষারোপ করে এবং নাস্তিক্যের পথে পা বাড়ায়।

মূল সমস্যা হল, ধর্মের বাস্তব রূপরেখা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার কারণে অধর্মকে ধর্ম বলে জ্ঞান করা। যার ফলে ধর্মের প্রতি অভক্তি জন্ম হয় এবং একটা সময় ধর্মীয় বিশ্বাসের বন্ধন থেকে ছিটকে পড়াটা তার জন্য অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়।

**৪। কুরআন-হাদিস বুঝতে ভুল করা**

পবিত্র কুরআন একটি ধর্মীয় গ্রন্থ ও জীবনবিধান হওয়ায় তাতে উপদেশ-উপমার পাশাপাশি নানা আদেশ-নিষেধমূলক বিধি-বিধান আছে। যার বেশির ভাগই সংক্ষিপ্তাকারে উল্লেখ করা হয়েছে। কুরআনের মোট আয়াত সংখ্যা ছয় হাজারেরও অধিক। তন্মধ্যে বিধানসংশ্লিষ্ট আয়াত মাত্র পাঁচশত।

[নূরুল আনোয়ার-৫]

বিধান সংক্রান্ত এ পাঁচশত আয়াত পুরো কুরআনের খুবই সামান্য অংশ। এর মধ্যে আবার মানসুখসহ আম-খাস ধরনের আয়াত আছে। এসব কারণেই কুরআনের নির্দেশ বুঝার জন্য আমাদের হাদিসের ভাষ্যের আশ্রয় নিতে হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দৈনন্দি জীবন থেকে আয়াতসমূহের মর্ম ও তত্ত্ব উপলব্ধি করতে হয়। শুধু আয়াতের বাহ্যিক নির্দেশনা সর্বক্ষেত্রে আমাদের বোধগম্য হয় না। এ বিষয়টি না বুঝার দরুন কিংবা অনেক সময় বুঝেও গোঁড়ামিবশত অনেকেই কুরআনের নিছক অনুবাদ পড়তে গিয়ে হোঁচট খায়। এর মধ্যে কিছু আয়াত আছে সুপরিচিত, যা নিয়ে প্রায় সব নাস্তিকই ব্লগ গরম করে রাখে। যেমন : পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ. [المائدة: ٥١]

"হে মুমিনগণ! তোমরা ইহুদি-খ্রিষ্টানদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না।"

[সূরা মায়িদা-৫১]

এ আয়াত ও এরূপ অন্যান্য আয়াতগুলো উল্লেখ করে এরা বলে, পবিত্র কুরআন পরধর্মের প্রতি মানুষকে অসহিষ্ণুতা শিখায়। ভিন্ন ধর্মের মানুষের, তারা যতই ভালো ও সৎ হোক, মন্দ বলতে শিখায়। অথচ পরধর্মের মানুষের প্রতি একজন মুসলমানের আচার-আচরণ কেমন হবে, সে বিষয়ে ইসলামের সামগ্রিক যে নির্দেশনা আছে, তা তারা বেমালুম চেপে যায়। অথবা জানার চেষ্টা না করেই অভিযোগের আঙুল তোলে।

এমনিভাবে অন্য আয়াতে আছে,

فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ. [التوبة: ٥]

'মুশরিকদের তোমরা যেখানে পাও হত্যা করো'। [সূরা তওবা-৫]

এ আয়াত তারা খুব বেশি উল্লেখ করে থাকে। তাদের দাবি, এ আয়াতের জন্যই মুসলিমরা 'জঙ্গিকর্ম' করে থাকে। অন্য ধর্মের মানুষদের উপর আঘাত হানে। এতে তাদের মধ্যে কোনো দ্বিধাবোধ কাজ করে না। অথচ অধ্যায়নের পরিধি আরো একটু বিস্তৃত করলেই তারা জানতে পারত, এ আয়াত নাযিল

হয়েছে যুদ্ধক্ষেত্রের হুকুমের জন্য। নাহয় স্বাভাবিক অবস্থায় একজন ভিন্নধর্মী, যে ইসলামি রাষ্ট্র কর্তৃক নিরাপত্তাপ্রাপ্ত, তাকে কোনোক্রমেই হত্যা করা যাবে না, যতক্ষণ না হত্যা করার মতো অপরাধ সে করে। এমনকি তার ধন-সম্পদ ও ইজ্জত-আব্রুও নিরাপদ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

مَنْ أَمَّنَ رَجُلًا عَلَى دَمِهِ، فَقَتَلَهُ، فَأَنَا بَرِيءٌ مِنَ الْقَاتِلِ، وَإِنْ كَانَ الْمَقْتُولُ كَافِرًا.

"যে ব্যক্তি কাউকে জীবনের নিরাপত্তা দিয়ে পরে তাকে হত্যা করল, তবে আমি ঘাতক থেকে সম্পর্কোচ্ছেদ করব; যদিও নিহত ব্যক্তি কাফির হয়।"

[আল-মুজামূল আওসাত-৪/২৯৮; হাদিস-৪২৫২]

উক্ত গ্রন্থে আরেক হাদিসে আছে,

مَنْ آمَنَ رَجُلًا عَلَى دَمِهِ فَقَتَلَهُ، فَهُوَ فِي النَّارِ، وَإِنْ كَانَ الْمَقْتُولُ كَافِرًا.

"যে ব্যক্তি কাউকে জীবনের নিরাপত্তা দিল। এরপর তাকে হত্যা করল। তা হলে সে জাহান্নামে যাবে; যদিও নিহত ব্যক্তি কাফির হয়।"

[আল-মুজামূল আওসাত-৭/১৩৬]

হযরত ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন– নিরাপত্তাপ্রাপ্ত কাফিরকে কোনো মুসলিম যদি অন্যায়ভাবে হত্যা করে, তবে এর বদলায় সে মুসলিমকেও হত্যা করা হবে। [মিরকাতুল মাফাতিহ-৭/১৯]

অনেক সময় আয়াতের বাহ্য বিরোধের কারণেও এরা সংশয়ে পতিত হয়। আর কুরআন আসমানি গ্রন্থ হওয়া নিয়ে নানা আপত্তি শুরু করে। কিন্তু এসব সমস্যার সমাধান জানতে তারা ইসলাম বিশেষজ্ঞদের শরণাপন্ন হয় না। নিজের বুঝকেই চূড়ান্ত বলে পথভ্রষ্টতায় নিপতিত হয়।

এক নাস্তিক কুরআনের পারস্পরিক বিরোধ প্রমাণে কুরআন মাজিদের দুটি আয়াত উল্লেখ করে একটি লেখা পোস্ট করেছিল ব্লগে । আয়াত দুটি হল—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى. [النساء: ٤٣]

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা মাতাল অবস্থায় নামাযের কাছেও যেয়ো না।'

[সূরা নিসা-৪৩]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. [المائدة: ٩٠]

'হে ঈমানদারগণ! নিশ্চয় মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্যনির্ধারক তীরসমূহ শয়তানের অপবিত্র কর্ম। কাজেই এগুলো থেকে বেঁচে থাক।' [সূরা মায়িদা-৯০]

সে দাবি করেছে, প্রথম আয়াত দ্বারা মদ্যপান হালাল হওয়া আর দ্বিতীয় আয়াত দ্বারা হারাম হওয়ার বিধান বুঝে আসে। এখানে ওই নাস্তিকের বিভ্রান্ত হওয়ার কারণ হল, আয়াত নাযিলের ধারাবাহিকতা সে বুঝতে পারে নি। মূলত সে সময়ের আরবরা যেহেতু মদ্যপানে অভ্যস্ত ছিল, তাই পরিবেশ-পরিস্থিতির দাবি ছিল হঠাৎ করে হারাম হওয়ার বিধান না দিয়ে তাদের এ বদ অভ্যাস থেকে ক্রমান্বয়ে ধীরে ধীরে সরিয়ে আনা হবে। কারণ, যদি শুরুতেই মদ হারাম হওয়ার হুকুম শুনিয়ে দেওয়া হত, তবে এটা মান্য করা অনেকের জন্যই কষ্টকর হয়ে যেত। তাই শুরুতেই বিধান ছিল অন্যান্য সময়ে মদ্যপান করা গেলেও নামাযের আগ মুহূর্তগুলোতে সেটা করা যাবে না।

অবশ্য এ বিধান নাযিল হওয়ার পর পরই অনেক সাহাবী রাযি. মধ্যপান পরিত্যাগ করেছিলেন। কারণ, তারা বুঝতে পেরেছিলেন, এটা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর পছন্দ নয়।

তারপর একটা সময় মদ পুরোপুরি হারাম করা হয়। বিষয়টি সে বুঝতে পারে নি বা বুঝার চেষ্টাও করে নি বা বুঝলেও না বুঝার ভান করে জনমনে কুরআনের ব্যাপারে সংশয় ঢেলে দিতে নাটক সাজিয়েছে।

মূলত কুরআনের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা অনেককে পথভ্রষ্ট করেন আবার অনেককে হিদায়েত দান করেন। তবে যারা হিদায়েতের উদ্দেশ্যে কুরআন পড়ে, তারা কখনোই পথভ্রষ্ট হয় না। এখানে একজন নাস্তিকের একটি ব্লগের অংশবিশেষ উল্লেখ করাটা সংগত হবে। 'আমি কেন ইসলাম ছেড়েছি' (Why I Left Islam) শীর্ষক তার এ লেখাটি আরেকজন ব্লগার ১৪ই ডিসেম্বর ২০০৯ সালে মুক্তমনা ব্লগে অনুবাদ করে পোস্ট করে। সেখানে নাস্তিকটি লিখেছে :

"আমার ইসলাম ছাড়ার ঘটনা শুরু হয় যখন আমি পঞ্চম গ্রেডের ছাত্র। আমি কুরআনের সূরা কাহাফের ৮৬ নং আয়াত পড়লাম। তাতে লিখা আছে, যখন যুলকারনাইন সূর্যাস্তের প্রান্তে পৌঁছল, তখন সে দেখল– অনেক লোক সূর্যের প্রচণ্ড তাপে অসহনীয়ভাবে পীড়িত। কেননা সূর্যটা তখন ওই লোকদের খুব কাছাকাছি ছিল। ভাবলাম, এটা কিভাবে সম্ভব? পৃথিবী তো একটা বলের মতো গোলাকার। তা হলে যুলকারনাইন কিভাবে পৃথিবীর প্রান্তে পৌঁছল? আমি আমার শিক্ষককে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলেন। তিনি কোনো উত্তর দিতে পারলেন না। শুধু বললেন, কুরআনে যা লেখা আছে, তাতেই বিশ্বাস করতে হবে। কোনো প্রশ্ন করা চলবে না। এভাবে কুরআনের প্রতি আমার সংশয় শুরু হয়।"

এখানে তার দুর্ভাগ্য হচ্ছে, সে কুরআনের আয়াতটির ভুল অনুবাদ পড়েছে এবং তা ভুল বুঝেছে। মূলত পবিত্র কুরআনের সেই আয়াতটি হল :

وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، قُلْ سَأَتْلُوْ عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا ۞ إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ۞ فَأَتْبَعَ سَبَبًا ۞ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِيْ عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا ۞

"তারা আপনাকে যুলকারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলুন! তোমাদের কাছে আমি তাঁর কিছু অবস্থা বর্ণনা করব। আমি তাকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম ও প্রত্যেক বিষয়ের কার্যোপকরণ দান করেছিলাম। এরপর তিনি এক কার্যোপকরণ অবলম্বন করলেন। অবশেষে তিনি যখন সূর্যের অস্তাচলে পৌঁছলেন; তখন তিনি সূর্যকে এক পঙ্কিল জলাশয়ে অস্ত যেতে দেখলেন এবং তিনি সেখানে এক সম্প্রদায়কে দেখতে পেলেন।

বিজ্ঞ পাঠক! এখানে তো পৃথিবীর প্রান্তে যাওয়ার কথা কোথাও নেই! সে কোত্থেকে পৃথিবীর প্রান্তের কথা পেল? আয়াতে শুধু হয়েছে, সূর্যের অস্তাচলে পৌঁছলেন। এখানে চর্মচোখের অস্তাচলের কথা বুঝানো হয়েছে। আর মানব সমাজে এ ধরনের কথা অহরহ প্রচলিত রয়েছে। যেমন মুসলিম সাম্রাজ্যের পরিধি বর্ণনা করতে গিয়ে ঐতিহাসিকগণ বলে থাকেন—'মুসলিম সাম্রাজ্যে তখন সূর্য উদয় হত এবং অস্ত যেত'। এ কথার উপর যদি কেউ প্রশ্ন উত্থাপন করে, ছোট্ট এ পৃথিবীতে এত বড় সূর্য অস্ত যায় কিভাবে? তবে তাকে মানুষ পাগল ছাড়া কিছু মনে করবে না। মানুষ তার ব্যাপারে চিন্তা করবে, লোকটি তো পরিভাষাও বুঝে না! বাংলাদেশের কুয়াকাটা ভ্রমণকারী একজন সুবোধ বালকের পক্ষেও এ আয়াতটি বুঝা, মানা ও আল্লাহ তায়ালার বাণী হিসেবে গ্রহণ করতে কোনো কষ্ট হবে না। তার দুর্ভাগ্যের বিষয় হল, সে আয়াতটির অনুবাদ ভুল পড়েছে। আবার ভুলটি বুঝতেও ভুল করেছে। কবি বলেন–

آں کس کہ نداند وبداند کہ بداند

در جہل مرکب ابد الدہر بماند

না জেনেও যে ব্যক্তি জানে মনে করে
ডাবল মূর্খ হিসেবে সে লোকালয়ে চলে।

এভাবেই কুরআন ও হাদিসকে অনুধাবন করতে না পেরে অনেকে ধর্ম পরিত্যাগ করে নাস্তিকতার পথে চলতে শুরু করে। আল্লাহ তায়ালা আমাদের হেফাজত করুন। আমিন!

**৫। রচনাবলি অধ্যয়ন**

'অধ্যয়ন' হচ্ছে একজন ব্যক্তির চিন্তাধারা ও মতাদর্শ গঠনের সহজ একটা মাধ্যম। মানুষের ব্যক্তিসত্তা মারা গেলেও তার লিখিত রচনাবলি তার চিন্তা-ভাবনাকে বহন করে চলে যুগের পর যুগ। অতীতে বহু নাস্তিক ও ধর্মবিদ্বেষী তাদের চিন্তাধারা লিপিবদ্ধ করে রেখে গেছে কাগজের পাতায়। বর্তমানে যারা জীবিত, তারাও অনবরত লিখে যাচ্ছে। তাদের এসব রচনা যারা পড়ছে, তাদের মধ্যেও এর একটা বিরূপ প্রভাব পড়ছে। তাদের মগজ ধোলাই হচ্ছে। মনের অজান্তেই সেসব লেখকের চিন্তা-দর্শন স্থান করে নিচ্ছে পাঠকের মন-মগজে। এভাবে বহু মানুষ নাস্তিকতার প্রতি ঝুঁকে পড়ছে।

ভারতের প্রখ্যাত বিপ্লবী নাস্তিক ভবগত সিং তার আত্মজীবনীমূলক এক রচনায় উল্লেখ করেছেন,

'আমি নৈরাজ্যবাদী নেতা বাকুনিনের লেখা পড়েছি। কমিউনিজমের জনক কার্লমার্কসের কিছু বই পড়েছি। লেনিন, ট্রটস্কি প্রমুখ যারা নিজেদের দেশে সফলভাবে বিপ্লব ঘটিয়েছেন, তাদের লেখাও পড়লাম। এরা সকলেই ছিলেন নাস্তিক। বাকুনিনের ইশ্বর ও রাষ্ট্রের ধারণাগুলো বিচ্ছিন্ন হলেও অনুপ্রণিত করে। এরপর পড়লাম নির্লজ্জ স্বামীর লেখা 'সাধারণ জ্ঞান'। তার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল একপ্রকার অতিন্দ্রীয় নাস্তিকতা। আমার এ বিষয়ে আরো আগ্রহ জাগল। ১৯২৬-এর শেষের দিকে আমি নিশ্চিত হলাম, এক সর্বশক্তিমান মহান সত্তা, যিনি মাহবিশ্বকে বানিয়েছেন ও নিয়ন্ত্রণ করেন সেই তত্ত্বের জোরালো কোনো ভিত্তি নেই। আমি এ বিষয়ে বন্ধুদের সাথে আলোচনা শুরু করলাম। এক সময় নিজেকে খোলাখুলিভাবে নাস্তিক বলে ঘোষণা দিলাম।' [Why I am Atheist]

আমাদের দেশে নতুন করে যারা নাস্তিকতার পথে পা বাড়াচ্ছে, তাদের সিংহভাগই রচনাবলি অধ্যয়নের শিকার। এ জাতীয় বই-পুস্তক অধ্যয়নের ফলেই তাদের চিন্তা-চেতনায় মারাত্মক পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। মুক্তমনা ব্লগে 'অবিশ্বাসের হাবিজাবি' নিকনেমের এক ব্লগার তার নাস্তিক হওয়ার কাহিনী তুলে ধরেছিল। সেখানে সে লিখেছে :

"কলেজের প্রথম বর্ষের মাঝামাঝি অথবা শেষের দিকে প্রথম আমি আমার বাসার কম্পিউটারে অভিজিৎ ভাইয়ের 'আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী' বইটা পাই এবং পড়া শুরু করি। এ বইটাই প্রথম আমাকে নাড়া দেয়। বইটা যখন পড়ছি, তখন আরো দুটি বই পেয়ে যাই। একটা হচ্ছে প্রবীর ঘোষের 'যুক্তিবাদীদের চ্যালেঞ্জাররা', আরেকটি আরজ আলী মাতুব্বরের রচনাবলির

প্রথম খণ্ড। এ বইয়ের সাধারণ কিছু প্রশ্ন পড়েই আসল ঘটনা ঘটে। প্রশ্নগুলো এত সাধারণ পুরো মাথা আমার এক ধাক্কায় এলোমেলো করে দেয়। এ ঘটনার পর আমার পড়ালেখার পুরো বরোটা বেজে যায়। মাথায় হাজারও যুক্তি খেলতে থাকে।"

সুতরাং বলা যায়, নতুন করে যারা ধর্মবিদ্বেষী হচ্ছে, তাদের প্রায় সবার মধ্যেই এ কারণটি কমবেশি পাওয়া যায়। তারা অধিক পরিমাণে এসব রচনা পড়েই ভ্রান্তির শিকার হয়েছে। [নাস্তিকতার স্বরূপ সন্ধান, ছুরাউন মাআল মালাহিদাতি হাত্তাল আজম/ শামেলা : ১/৩৪৬-৩৯০]

**৬। প্রোপাগাণ্ডায় আক্রান্ত হওয়া**

কিছু মানুষ আছে, পৈতৃক সূত্রে মুসলিম। কিন্তু পারিবারিকভাবে শৈশব থেকে ইসলামের দীক্ষা না পাওয়ায় তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিতটা অত্যন্ত নড়বড়ে হয়ে থাকে। বিভিন্ন বিষয়ে বড় বড় ডিগ্রি নিলেও ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা ও জ্ঞান সম্পর্কে তারা থাকে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ। এজন্য পরবর্তীকালে লাইব্রেরিতে বা ওয়েবসাইটে নানান রকম ধর্মবিদ্বেষী রচনা পড়ে তারা প্রথমে সংশয়বাদী হয়ে যায়। আর সুকৌশলে ঢুকিয়ে দেওয়া ধর্মবিষয়ক নানারকম প্রশ্ন তাদের মাথায় ঘুরপাক খেতে থাকে। তাদের মধ্যে জন্ম নেওয়া সংশয়-সন্দেহ ও আপত্তি-অভিযোগের উত্তরও তারা সেসব ধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞ লেখনী থেকেই উন্মোচনের চেষ্টা করে। আলেমদের সাথে শেয়ার করারও তাওফিক হয় না। ফলে বিষয়টি আরো জটিল আকার ধারণ করে। একপর্যায়ে তারা নাস্তিকতার অন্ধকার পথে পা বাড়ায়।

**৭। খ্যাতি অর্জনের লোভ**

নাম কামানোর লোভ নাই এমন মানুষের সংখ্যা পৃথিবীতে খুব কম। কেউ কেউ জ্ঞান-গরিমা, আচার-আচরণ ও দয়া-দাক্ষিণ্য তথা উত্তম গুণাবলিতে নিজেকে সুসজ্জিত করে মানুষের মাঝে অনন্য হওয়ার চেষ্টা করেন। আর কিছু লোক আছে ঠিক তার উল্টো। তাদের মধ্যে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণের প্রবল ইচ্ছা কাজ করে। কিন্তু ভালো কিছু করতে পারার ক্ষমতা না থাকায় তারা মন্দ পথ বেছে নেয়। আল্লাহ তায়ালা, রাসূল ﷺ ও তাঁর ধর্ম নিয়ে কুরুচিপূর্ণ ভাষায় এমনভাবে বিষোদগার ও লেখালেখি করে, যেন খুব সহজে তার নাম-ডাক সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। এমন প্রসিদ্ধি থেকে আল্লাহ তায়ালা সকল মুসলিমকে হেফাজত করুন। আমিন!

**৮। শিশুকালের মন্দ অভিজ্ঞতা**

ধর্মপালনে শিশুদের কোমল কথা ও মিষ্টি ভাষায় অনুপ্রাণিত করার বদলে কোথাও কোথাও তাদের ধমক দেওয়া, প্রহার করা ও চাপ প্রয়োগের মতো বিষয়গুলো লক্ষ্য করা যায়। এগুলো শিশুদের কচি মনে গভীর প্রভাব ফেলে। ধর্মটা তার কাছে ভয়ঙ্কর কোনো বস্তু বলে মনে হতে থাকে। কখনো কখনো তার মধ্যে ক্ষোভ ও প্রতিবাদ দানা বাঁধতে থাকে। কিন্তু দুর্বল ও ছোট হওয়ায় সেই ক্ষোভ সে প্রকাশ করতে পারে না। সুযোগের অপেক্ষা করতে থাকে। একটা সময় যখন সে পরিণত বয়সে উপনীত হয় ও মুক্তমত প্রকাশের ক্ষেত্র পায়, তখন সে নিজেকে হালকা করার জন্য তার ভিতরে পুঞ্জীভূত ক্ষোভের প্রকাশ ঘটায় এবং নাস্তিকতার পথে পা বাড়ায়।

**৯। অতিমাত্রায় যুক্তিবাদী হওয়া**

মানুষের জ্ঞানার্জনের মাধ্যম হলো তিনটি। পঞ্চইন্দ্রীয়, বুদ্ধি-বিবেক এবং অহি। প্রত্যেক মাধ্যমের কর্মক্ষেত্রই নির্দিষ্ট একটি গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ। আপন সীমানার বাইরে সে অচল। এ তিনটি মাধ্যমের কর্মকা- ধারাবাহিকতা বজায় রেখে পরিচালিত হয়। ফলে পঞ্চইন্দ্রীয়ের দ্বারা মানুষ যে জ্ঞান অর্জন করতে পারে নিরেট আকল বা বুদ্ধি-বিবেক খাটিয়ে তা অর্জন করা সম্ভব নয়। যেমন, আপনার সামনে একজন পুরুষ আছে। তার গায়ের রঙ শ্যামলা, কপাল প্রশস্ত এবং চুলগুলো কালো। এখন যদি আপনি চোখ বন্ধ করে শুধু বুদ্ধি খাটিয়ে এ বিষয়গুলো জানার চেষ্টা করেন, তবে সেটা হবে পণ্ডশ্রম।

এমনিভাবে যে বিষয়গুলো বুদ্ধি-বিবেক খাটিয়ে জানতে হয়, সেগুলো শুধু পঞ্চইন্দ্রীয় ব্যবহার করে জানা সম্ভব নয়। যেমন– উল্লিখিত ব্যক্তির বিষয়ে আপনার বিবেক-বুদ্ধি আপনাকে বলে দিচ্ছে, নিশ্চয় তার একজন মা আছেন এবং তিনিই তাকে জন্ম দিয়েছেন। যদিও ওই মুহূর্তে তার মা বা তার জন্ম হওয়ার দৃশ্য আপনার সামনে অনুপস্থিত। এখন আপনি যদি বিবেক-বুদ্ধি বাদ দিয়ে শুধু চোখ দিয়ে, কান দিয়ে, নাক দিয়ে, জিহ্বা দিয়ে কিংবা শরীরের স্পর্শশক্তি দিয়ে বিষয়টি বুঝতে চান, তবে আপনি নিশ্চিতভাবে ব্যর্থ হবেন। কারণ, তার জন্ম হওয়ার দৃশ্য বর্তমান অবস্থায় আপনার সামনে অনুপস্থিত।

**মোটকথা :** পঞ্চইন্দ্রীয়ের কর্মক্ষেত্র যতটুকু বিস্তৃত সেখানে নিছক বুদ্ধি-বিবেক অকার্যকর। পঞ্চইন্দ্রীয়ের কর্মক্ষেত্র যেখানে গিয়ে শেষ, সেখান থেকে বুদ্ধি-বিবেকের কার্যক্রম শুরু।

মানুষের বুদ্ধি-বিবেক সীমিত গণ্ডিতে আবদ্ধ। একটা নির্দিষ্ট সীমায় গিয়ে তার কার্যক্ষমতাও শেষ হয়ে যায়। এমন বহু বিষয় রয়েছে, যেখানে মানুষের পঞ্চইন্দ্রীয় বা বুদ্ধি-বিবেক কোনোটাই পথপ্রদর্শন করতে পারে না। যেমন, উল্লিখিত ব্যক্তিকে কেউ সৃষ্টি করেছেন, তা আপনি বুদ্ধি-বিবেকের সহায়তায় বুঝতে পারলেও তাকে সৃষ্টি করার পিছনে লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও তার উপর অর্পিত আল্লাহপ্রদত্ত দায়িত্ব কী? আল্লাহর পছন্দ-অপছন্দের কর্মগুলো কী? এসব প্রশ্নের উত্তর জানতে পারবেন না। এসব উত্তর জানার জন্য আল্লাহ পাক যে পদ্ধতি আমাদরে জানিয়ে দিয়েছেন, তাই হল অহি। [উলূমূল কুরআন-৩৬]

সুতরাং যেসব বিষয় সম্পূর্ণরূপে অহিনির্ভর, সেগুলোকে যদি কেউ বুদ্ধি-বিবেকের মাধ্যম দিয়ে বুঝতে চায়, তা হলে তার ব্যর্থ হওয়াটা অবশ্যম্ভাবী। কারণ বুদ্ধি-বিবেককে সে এমন একটা ক্ষেত্রে খাটানোর চেষ্টা করছে, যেখানে কার্যত তার কিছু করার ক্ষমতা নেই। ধর্মীয় বিধানাবলির বিশাল একটা অংশই হলো এ অহিনির্ভর। সেখানে বুদ্ধি-বিবেক সম্পূর্ণ অচল। তাই কেউ যখন তার সীমাবদ্ধ বুদ্ধি-বিবেক দিয়ে ধর্মের সেসব বিশ্বাস ও বিধি-বিধান যাচাই করতে চায়, যুক্তির আলোকে প্রত্যেকটি বিষয় নিরূপণ করার প্রচেষ্টা চালায়, তখন ব্যর্থ হওয়া ছাড়া উপায় নেই। এ ব্যর্থতাই তার ভিতরে অবিশ্বাসের বীজ বপন করে দেয়। ঈমানহারা হয়ে সে নাস্তিকতার অন্ধকার পথে পা বাড়ায়।

### ১০। হতাশাগ্রস্ত হওয়া

আল্লাহ তায়ালা মানুষকে তাড়াহুড়াপ্রবণ করেই সৃষ্টি করেছেন। যার ফলে সে যে কোনো কাজের ফল নগদে পেতে বেশি আগ্রহী। সে সব সময় বাকির হিসাব এড়িয়ে চলতে চায়। একজন লোক যখন ধর্ম-কর্ম পালন করে, তখন স্বভাবতই তার একটা আকাঙ্ক্ষা থাকে যে, সে অন্য দশজন, যারা ধর্মের ধার ধারে না, তাদের চেয়ে তুলনামূলক ভালো থাকবে। কিন্তু অনেক সময় চিত্রটা উল্টা দেখা যায়। ধর্ম-কর্ম করেও একজনকে সর্বদা ঝামেলা পোহাতে হয়। একের পর এক বিপদ এসে তার ঘাড়ে ভর করে। দারিদ্র্যের কষাঘাত, বিপদাপদের পরিহাস তার জীবনকে করে তোলে অতিষ্ট। অন্যদিকে ধর্ম-কর্মের কাছে-ধারেও যে নাই, দেখা যায় সে দিব্যি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন যাপন করছে। তার অর্থ-বিত্তের অভাব নেই। ঈমানের দুর্বলতার কারণে এসব বাহ্যিক চিত্র তার সরল হৃদয়ে গভীরভাবে রেখাপাত করে। হতাশার কালো মেঘ তার মন-মনন আচ্ছন্ন করে নেয়। সে ভাবে, আল্লাহ তায়ালা তো বলেছেন–

أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ [البقرة: ١٨٦]

'আমার কাছে প্রার্থনা করলে আমি প্রার্থনাকারীর ডাকে সাড়া দিই।'

কিন্তু কই, আমি তো সারাটা জীবন আল্লাহ তায়ালার কাছে প্রার্থনা করেই যাচ্ছি; তিনি তো আমার ডাকে সাড়া দিচ্ছেন না। হতাশা থেকে তার মনে এমন আরো শত প্রশ্নের উদয় হতে থাকে। একপর্যায়ে সে ঈমান হারিয়ে নাস্তিকতার অন্ধকারাচ্ছন্ন পথে পা বাড়াতে থাকে। ঈমানের আলোকিত রাস্তা থেকে ছিটকে পড়ে জাহান্নামের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হয়ে যায়। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে হেফাজত করুন। আমিন!

## নাস্তিক্যবাদের আবির্ভাব

### ইতিহাসের তথ্য

নাস্তিক্যবাদের (স্রষ্টাকে অস্বীকার করার ধারণা) বিগব্যাং থিওরি (Bigbang Theory)-এর মতো আধুনিক যুগের কোনো আবিষ্কার নয়। এটা পৃথিবীর প্রাচীন জনগোষ্ঠীর গুটি কয় মানুষের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। বৃহৎ জনগোষ্ঠী কখনোই তা সাদরে বরণ করে নেয়নি; ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে এসেছে। ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদের দাবি, নাস্তিকতার উদ্ভব ১৬শ শতাব্দির পরে। তবে তা সুসংহত ও শক্তিশালী আকারে প্রকাশ পায় ১৮শ শতাব্দিতে।

ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদের এ দাবির সাথে আমরা একমত হতে পারি না। কারণ, তাদের ইতিহাসের দৌড় বেশি প্রাচীন নয়। যতদূর জানা যায়, কাগজে-কলমে ইতিহাস লিপিবদ্ধ করার সূচনা হয় আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব পাঁচশত সালে। প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক হিরোডেটাস সর্বপ্রথম পদ্ধতিগতভাবে ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করে সেগুলো বিন্যস্ত আকারে লিপিবদ্ধ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তাই আমাদের যেতে হবে এমন এক তথ্যভা-ারের কাছে, যে ভা-ারটি জগৎ সৃষ্টির আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল। সেই তথ্যভা-ার হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার কালাম—কুরআন মাজিদ।

হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিছে দেহলভি রহ. বলেন– পবিত্র গ্রন্থ আল-কুরআন ধর্মীয় গ্রন্থ হলেও ঐতিহাসিক ঘটনা বর্ণনা তার মূল পাঁচটি আলোচ্য বিষয়ের একটি। [আল-ফাউযুল কাবির-২২]

তাই তো আমরা দেখি, পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় ধারাবাহিকভাবে বা বিক্ষিপ্ত আকারে পৃথিবীর বুকে সর্বপ্রথম মানবজাতির আগমন থেকে শুরু করে তৎপরবর্তী বিভিন্ন সময়ের ইতিহাস ও মানুষের সামাজিক জীবনাচার ও তাদের লালিত চিন্তা-দর্শনের ধরন নান্দনিক ভঙ্গিতে সহজ-সরল উপস্থাপনায় নিশ্চিতভাবে চিত্রায়ণ করা হয়েছে। যেমন, পবিত্র কুরআনেই ইরশাদ হয়েছে,

ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ [البقرة: ٢]

'এটা এমন একটি কিতাব, যার মধ্যে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।'

[সূরা বাকারা-২]

সুতরাং আমরা নিঃসঙ্কোচে পবিত্র কুরআনের তথ্যভাণ্ডার থেকে নাস্তিকতার আদিকাল আবিষ্কার করতে পারি। [নাস্তিকতার স্বরূপ সন্ধান]

**পবিত্র কুরআনের তথ্য**

পবিত্র কুরআনের বর্ণনামতে পৃথিবীর সর্বপ্রথম মানব-মানবী হলেন হযরত আদম আলাইহিস সালাম ও বিবি হাওয়া আলাইহাস সালাম। তাঁরা দুজনেই ছিলেন খাঁটি একত্ববাদে বিশ্বাসী। সেই ধারাবাহিকতায় মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তাঁরা স্বীয় সন্তানসন্ততি ও নাতি-পুতিদের এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের দীক্ষা দিয়ে যান। তাদের মৃত্যুর পর জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে মানুষ ধীরে ধীরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়তে শুরু করে। ফলে তাদের মধ্যে পারস্পরিক দূরত্ব বাড়তে থাকে এবং তাওহিদ বা একত্ববাদের বিশ্বাস কারো কারো মধ্যে আস্তে আস্তে দুর্বল হতে থাকে।

আদম আ. পরবর্তী মানুষের আলোচনায় কুরআন সর্বপ্রথম হযরত নূহ আ.-এর কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর সম্প্রদায় ছিল মূর্তিপূজক। তার মানে আদম আ. থেকে নিয়ে নূহ আ.-এর মধ্যবর্তী কোনো একসময় একত্ববাদের সেই শিক্ষা বিলুপ্ত হয়ে শিরিক বা বহুত্ববাদ মানুষের বিশ্বাসের স্থান দখল করে নেয়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন–

وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ۞

"তারা (কওমে নূহের নেতৃবর্গ সর্বসাধারণকে) বলল, তোমরা তোমাদের উপাস্যদের ত্যাগ করো না এবং পরিত্যাগ করো না ওয়াদ, সুয়া, ইয়াগুস, ইয়াউকা ও নসরকে (এসব তাদের উপাস্যদের নাম ছিল)।" [সূরা নূহ-২৩]

এর দ্বারা বুঝা যায়, তাঁরা বহুত্ববাদে জড়িয়ে পড়লেও স্রষ্টাকে অস্বীকার তথা নাস্তিক্যতার ঘৃণ্য পথে পা বাড়ায়নি তখন পর্যন্ত।

এভাবে সূরা মুমিনূনের মধ্যে আল্লাহ তায়ালা নূহ আ.-এর আলোচনা করার পর ইরশাদ করেছেন–

ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ۞ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ

أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۞

"এরপর অন্য একটি সম্প্রদায়কে আমি তার স্থলাভিষিক্ত করেছিলাম এবং তাদেরই একজনকে তাদের মধ্যে রাসূলরূপে প্রেরণ করেছিলাম এই বলে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো। তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো ইলাহ নেই।" [সূরা মুমিন : ৩১-৩২]

এ সম্প্রদায়ের নাম ছিল 'আদ'। প্রকৃতপক্ষে 'আদ' হল নূহ আ.-এর পুত্র সামের অধঃস্তন বংশের এক ব্যক্তির নাম। তিনি হযরত নূহ আ.-এর পঞ্চম অধঃস্তন পুরুষ। এরপর তাঁর বংশধর ও গোটা সম্প্রদায় 'আদ' নামে বিখ্যাত হয়ে যায়। [মায়ারিফুল কুরআন-মাওলানা মুহিউদ্দিন খান-৪৫৪]

এ সম্প্রদায়ের কাছে আল্লাহ তায়ালা হুদ আ.-কে নবীরূপে প্রেরণ করেন। তিনি তাদের এক আল্লাহ তায়ালার ইবাদতের প্রতি আহবান করেন। যেমনটা আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু তাঁর দাওয়াতের জবাবে তাঁর সম্প্রদায়ের নেতাগোছের লোকেরা সাধারণ মানুষদের ঈমান থেকে বিরত থাকতে বলত। যেমন– পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ❁ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ ❁ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ ❁ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ❁ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِيْنَ ❁ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِيْنَ ❁

তাঁর সম্প্রদায়ের প্রধান যারা কাফির ছিল, পরকালের সাক্ষাতকে মিথ্যা বলত এবং যাদেরকে আমি পার্থিব জীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দিয়েছিলাম, তারা বলল, সে তো আমাদের মতোই একজন মানুষ বৈ নয়। তোমরা যা খাও, সেও তাই খায়; তোমরা যা পান কর, সেও তাই পান করে। যদি তোমরা তোমাদের মতোই একজন মানুষের আনুগত্য কর, তবে তোমরা নিশ্চিতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সে কি তোমাদেরকে এ ওয়াদা দেয় যে, তোমরা মারা গেলে এবং মৃত্তিকা ও অস্থিতে পরিণত হলে তোমাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করা হবে? তোমাদেরকে যে ওয়াদা দেওয়া হচ্ছে, তা কোথায় হতে পারে? আমাদের পার্থিব জীবনই একমাত্র জীবন। আমরা মরি ও বাঁচি এখানেই এবং আমরা পুনরুত্থিত হবো না। সে তো এমন ব্যক্তি বৈ নয়, যে আল্লাহ তায়ালা সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করেছে এবং আমরা তাকে বিশ্বাস করি না। [সূরা মুমিনূন : ৩৩-৩৮]

এ আয়াতে কারিমায় আমরা আদ জাতির মধ্যে পরকাল অস্বীকারকারী কিছু লোকের সন্ধান পাচ্ছি। পৃথিবীতে যারা স্রষ্টাতে বিশ্বাসী, সে একত্ববাদী হোক বা বহুত্ববাদী, প্রায় সকলেই পরকালে বিশ্বাসী। সে হিসেবে এ আয়াতে স্রষ্টাকে অস্বীকার করার মতো সরাসরি কিছু পাওয়া না গেলেও ধরে নেওয়া যায়, এরা স্রষ্টায় অবিশ্বাসী নাস্তিক ছিল। উল্লিখিত শেষ আয়াতটি সে দিকেই ইঙ্গিত করছে।

তা ছাড়া আদ জাতির মধ্যে পাশাপাশি পৌত্তলিকতায় বিশ্বাসী আস্তিকশ্রেণিও বিদ্যমান ছিল। এদের সংখ্যাই ছিল তুলনামূলক বেশি। এ তথ্যটিও পবিত্র কুরআন থেকে জানা যায়। হযরত হুদ আ.-এর দাওয়াতের জবাবে তারা বলেছিল—

قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ❖

"তারা বলল, হে হুদ! আমরা তোমার কথায় আমাদের উপাস্যদের বর্জন করব না এবং তোমার প্রতি ঈমানও আনব না।" [সূরা হুদ-৫৩]

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আগমন ঘটেছিল পবিত্র মক্কা নগরীতে। এ নগরী ছিল মরুবালু আর পাথুরে পাহাড় পরিবেষ্টিত। তাদের পূজনীয় মূর্তির মধ্যে লাত, মানাত ও উজ্জা ছিল প্রসিদ্ধ। আল্লাহ তায়ালার প্রতিও তাদের বিশ্বাস ছিল। যেমন, কুরআনে বলা হয়েছে–

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللهُ

قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

"আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল কে সৃষ্টি করেছে? তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ তায়ালা। বলুন, সকল প্রশংসাই আল্লাহ তায়ালার। বরং তাদের অধিকাংশই জ্ঞান রাখে না।" [সূরা লুকমান-২৫]

অর্থাৎ এরা মৌলিক সৃষ্টিকর্তারূপে আল্লাহ তায়ালাকেই বিশ্বাস করত; কিন্তু দুনিয়ার নিয়মানুসারে যেমনি একজন রাজার রাজ্য পরিচালনার জন্য মন্ত্রী-প্রশাসকের দরকার হয়, তেমনি আল্লাহ তায়ালার এ বিশ্বজগৎ পরিচালনার দায়িত্বভার ভিন্ন ভিন্নভাবে এসব দেব-দেবীর উপর অর্পণ করেছেন। এটাই ছিল তৎকালীন আরব জনগোষ্ঠীর সাধারণ ধর্মবিশ্বাস। এর বাইরে স্রষ্টাবিহীন সৃষ্টিতে বিশ্বাসী তথা উপস্থিতিও ছিল। অবশ্য সেটা পৌত্তলিকদের তুলনায় একেবারে নগণ্য ছিল। এ বিষয়টি কুরআন-হাদিস ও জাহিলিযুগের কবিদের রচিত কবিতা থেকে প্রমাণিত হয়। যেমন,

**(ক)** পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন–

وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ

"তারা বলে, এটা কেবল আমাদের পার্থিব জীবন। আমরা মরি ও বাঁচি এবং কেবল যামানাই আমাদের ধ্বংস করে।" [সূরা জাছিয়া-২৪]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বিখ্যাত মুফাসসির ইমাম তাবারি রহ. তাঁর তাফ্সিরগ্রন্থে তাবিয়ি হযরত কাতাদা রহ. থেকে বর্ণনা করেন, এটা আরবের

মুশরিকদের কথা। এরপর তিনি এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, 'আল্লাহ তায়ালা ওইসব আরব মুশরিক সম্পর্কে সংবাদ প্রদান করে বলেন, তারা বলে থাকে, আমাদের ধ্বংস ও নিঃশেষ করে কেবল দিবা-রাত্রির আবর্তন। এটা মূলত তাদের পক্ষ থেকে স্রষ্টা কর্তৃক মৃত্যু প্রদান সম্পর্কে সুস্পষ্ট অস্বীকৃতি।

**(খ)** হাদিস শরিফেও আমরা এ বক্তব্যের সমর্থন দেখতে পাই। যেমন,

আবু হুরাইরা রাযি. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, জাহিলি যুগের মানুষ বলত, দিবা-রাত্রিই আমাদের ধ্বংস করে; মৃত ও জীবিত করে। বিধায় আল্লাহ তাঁর কিতাবে বলেছেন, তারা বলে—'এ তো কেবল আমাদের পার্থিব জীবন। আমরা বাঁচি-মরি ও কালের বিবর্তনই আমাদের নিঃশেষ করে'।

[বুখারি শরিফ, হাদিস নং ১৯৬৩, মুসলিম শরিফ, হাদিস নং ২২৪৬]

উপরিউক্ত আয়াত ও হাদিসে আমরা স্পষ্টভাবে সে সময়ের কিছু মানুষকে নাস্তিকতা বা স্রষ্টায় অবিশ্বাস করার ধারণা পোষণ করতে দেখা যায়।

**(গ)** জাহিলিযুগের কবিদের কবিতায়ও বিষয়টি পাওয়া যায়। যেমন,

তৎকালীন সময়কার একটি কবিতা হচ্ছে–

اَشَابَ الصَّغِيْرَ وَاَفْنَى الْكَبِيْرَ + كَرُّ الْغَدَاةِ وَمَرُّ الْعَشِيِّ

শিশুদেরকে বৃদ্ধ করে বৃদ্ধকে নিঃশেষ
দিবা-রাত্রির চলতি পথে হয় যে পরিশেষ

[আয্যুহদ-ইবনে আবিদ্ দুনিয়া-১/১৯১]

পরিশেষে বলা যায়, হযরত নূহ আ.-এর পরে হযরত হূদ আ.-এর পূর্বে কোনো একসময়ে নাস্তিকতার জন্ম হয়ে আরব জাহিলিযুগ হয়ে চলতে চলতে আজ অবধি চলমান। [নাস্তিকতার স্বরূপ সন্ধান]

## আধুনিক যুগে নাস্তিকতার প্রসার

আজকের উন্নত ইউরোপ একটা বড় সময়জুড়ে ছিল অন্ধকার, অশিক্ষা আর কুসংস্কারে নিমজ্জিত ছিল। সাধারণ লোকদের মূর্খতার সুযোগ নিয়ে খ্রিষ্টান পাদরিরা তদের ওপর নানান রকম জুলুম-শোষণ চালাত। নিজেদের মনমতো আইন তৈরি করে ঈশ্বরের নাম ভাঙিয়ে তা চাপিয়ে দিতো সাধারণ মানুষের ঘাড়ে। ধীরে ধীরে মানুষ যখন কিছুটা শিক্ষার আলো পেতে শুরু করল এবং তাদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পেতে লাগল, তখন পাদরিদের অন্যায়ের একটু-আধটু প্রতিবাদ জানানো আরম্ভ করল। শুরুর দিকে সেজন্য গির্জার হাতে অনেককে প্রাণ দিতে হয়েছে।

পোপদের অত্যাচার ও ধর্মের নামে যথেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম প্রকাশ্য প্রতিবাদ শুরু করেন বিখ্যাত ডাচ মনীষী ইরোসাস। তিনি তার The Praise of the folly গ্রন্থের মাধ্যমে প্রতিবাদ শুরু করেন।

[An Outline History of the world-৩০৭]

তার পরে সরাসরি গির্জার বেদীতে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ শুরু করেন ইংরেজ ধর্মযাজক জন ওয়েক্লিদ (১৩২০-১৩৪৮)। একসময় ধর্মীয় আদালত তাকে প্রাণদ- দ-িত করে। মৃত্যুর দীর্ঘ দিন পরে তার সমাধি থেকেও হাড় তুলে আগুনে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। [An Outline History of the world-৩৩৮]

সারা ইউরোপে তার শিষ্যদের বুনো হায়েনার মতো তাড়া করে খুঁজে খুঁজে হত্যা করা হয়। ওয়েক্লিদের শিষ্যদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন চেকোশ্লোভিয়ার দার্শনিক অধ্যাপক জনহাস (১৩৬৯-১৪১৫)। ১৪১৫ সালে ১৬ জুলাই তাকে জনসম্মুখে আগুনে দগ্ধ করে হত্যা করা হয়। পরের বছরেই জনহাসের শিষ্য জেরুমকেও একইভাবে জীবন্ত আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়।

[সেক্যুলারিজম/আমীর খসরু ১২-১৩]

গির্জার অত্যাচার-নির্যাতন আর স্বেচ্ছাচারিতা যত বৃদ্ধি পাচ্ছিল, ভিতরে ভিতরে মানুষের মধ্যেও ততবেশি ধর্মের প্রতি অশ্রদ্ধা ও গির্জার প্রতি বিরূপ মনোভাব ধূমায়িত হচ্ছিল। মানুষের সাথে শিক্ষার হার ও চিন্তা-গবেষণার প্রশস্ততা যত বাড়ছিল, গির্জার সাথে বিরোধ তত মারাত্মক আকার ধারণ করছিল। এরই পরিপ্রেক্ষিতে পোপদের নেতৃত্বে 'ইনকুইজিশন কোর্ট' স্থাপন করা হয়। এ কোর্ট কালক্ষেপণ না করে সারাদেশে গুপ্তচর বাহিনী ছড়িয়ে দেয় এবং গির্জাবিরোধী ধ্যান-ধারণা পোষণকারী ব্যক্তিদের ধরে ধরে মৃত্যুদণ্ড দিতে থাকে। এক হিসাবমতে জানা যায়—

'এসব কোর্টে দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যা ছিল প্রায় তিন লাখ। এদের মধ্যে ৩২ হাজারকে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়। জীবন্ত দগ্ধদের একজন ছিলেন প্রখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী ব্রুনো। জ্যোতির্বিজ্ঞানী গ্যালিলিওকেও শুধু এ কারণে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় যে, তিনি বিশ্বাস করতেন পৃথিবী সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে।'

অষ্টাদশ শতাব্দিতে পুরো ইউরোপে নবজাগরণের ঢেউ ওঠে। দীর্ঘকালের মূর্খতা, কুসংস্কার আর অন্ধকারাচ্ছন্নতা পায়ে দলে একের পর এক জন্মাতে থাকে নামকরা সব দার্শনিক-চিন্তাবিদ ও গবেষক-সাহিত্যিক। সেসময় বিভিন্ন বাদ মতবাদের ও চিন্তা-দর্শনের উদ্ভব হয়। ধর্মের নামে গির্জার ধারাবাহিক ধান্দাবাজির ফলে বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষিতশ্রেণি ধর্মের প্রতি অবিশ্বাসী হয়ে ওঠে। তাঁরা প্রচার করতে শুরু করে যে, পাদ্রীরা এতকাল তাদের জুলুম-শোষণের হাতিয়ার বানিয়ে স্রষ্টা, পরকাল, পাপ-পুণ্য ইত্যাদি বিশ্বাস তৈরি করে সাধারণ মানুষকে বোকা বানিয়ে এসেছে। মূলত সবই ছিল ফাঁকা বুলি। নাউযুবিল্লাহ!

সেসময় দর্শনের ব্যাপক প্রসার ও মানবজীবনে এর রাজনৈতিক প্রভাব ছিল। সর্বোপরি দীর্ঘদিনের গির্জাপন্থিদের জুলুম-অত্যাচারের করুণ ইতিহাস তাদের এ চিন্তার মধ্যে প্রয়োজনীয় মাল-মসলা যুগিয়েছিল। ফলে এ মতবাদ খুব অল্প সময়েই পশ্চিমা শিক্ষিত সমাজকে আকর্ষণ করতে সক্ষম হয় এবং নাস্তিকতার বিষবাষ্প একে একে গ্রাস করে ফেলে শিক্ষিত সমাজের নামি দামি ব্যক্তিত্বদেরকে।

হযরত মাওলানা আলী মিয়াঁ নদভি রহ.-এর ভাষায় 'এদের সামনে যখন ধর্মের নাম উচ্চারিত হত, তখন আকস্মিকভাবে ধর্মীয় প্রতিনিধি ও গির্জার পুরোহিতদের লোমহর্ষক জুলুম-নির্যাতনের ভয়াবহ ছবি তাদের চোখে জীবন্ত হয়ে ভেসে উঠত। তাদের স্মরণ হয়ে যেত সেসব নিরপরাধ জ্ঞানী-গুণী, বিজ্ঞানী ও দার্শনিকের ছবি, যারা অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে অসহায় অবস্থায় ওইসব জল্লাদের হাতে যন্ত্রণাকর মৃত্যুবরণ করেছিল। ধর্মীয় সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীর নামে ক্রোধব্যঞ্জক চেহারা রুদ্র ও রুক্ষ মূর্তি, অগ্নিঝরা চোখ ও সঙ্কীর্ণহৃদয়, পাদ্রীদের স্থূল মস্তিষ্ক তাদের চোখের সামনে ভেসে উঠত। ফলে শুধু খ্রিষ্টধর্মের বিরুদ্ধেই নয় বরং সকল ধর্মের প্রতি ভীতি ও ঘৃণাকে তাঁরা জীবনের মূলনীতি বানিয়ে নেয়। [মুসলিম উম্মাহর পতনে-৩১৫]

সে সময় দুজন ব্যক্তি খুব জোরেশোরে নাস্তিকতার প্রচার করে। একজন ডেনিস ডিডেরট (১৭১৩-১৭৮৪); অপরজন বেরন ডি হোলবাস। তাদের বক্তব্য ছিল—'বিশ্বজগৎ হল বস্তুর সমষ্টি এবং এ জগৎ অনাদিকাল থেকেই অস্তিত্বশীল। বস্তুর বাইরে এ জগতে আর কিছুর অস্তিত্ব নেই।'

ঊনবিংশ শতাব্দিতে এসে এ মতবাদ আরো প্রকট আকার ধারণ করে। যাদের দ্বারা এর প্রচার প্রসার হয়, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল– কার্লমার্ক্স, দুরখেইম, ফ্রয়েড প্রমুখ যুক্তির অনুসারীগণ। তবে সবচেয়ে বেশি সমর্থন এসেছে চার্লস ডারউইনের কাছ থেকে।

তার জন্ম ১৮০৯ সালে ব্রিটেনে। মৃত্যু হয় ১৮৮৮ সালে। ডারউইন বিগল নামে একটি জাহাজে চাকরিতে যোগদান করে পাঁচ বছর চাকরি করেন এবং জাহাজে করে বিভিন্ন দেশে ঘুরে বেড়ান। এ সময় তিনি বিভিন্ন উদ্ভিদ ও পশু-পাখি সম্পর্কে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করেন এবং সেগুলোর উপর গবেষণা করে জীবজগতের উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ ও অস্তিত্বের ব্যাপারে একধরনের অভিনব সিদ্ধান্তে উপনীত হন। তা হল—

"আদিকালের পৃথিবী যখন বসবাসের উপযুক্ত হয়, তখন আকস্মিক একটি সংঘাতের ফলে এক কোষবিশিষ্ট একটি প্রাণীর দেহে প্রাণ সঞ্চার হয়। এরপর ঘাত-প্রতিঘাত, শক্তিপরীক্ষা, বাঁচার লড়াই, যোগ্যতমের টিকে থাকার প্রাকৃতিক

নির্বাচন ও ক্রমবিকাশের ধারা অতিক্রম করে এক কোষবিশিষ্ট প্রাণী থেকেই প্রায় পাঁচ লাখ প্রজাতির রূপান্তর ঘটেছে। মানুষ তন্মধ্যে একটি প্রজাতিমাত্র। এ সৃষ্টিযজ্ঞের পুরোটাই প্রাকৃতিক নিয়মে দীর্ঘ সময়ের পরিক্রমার মধ্য দিয়ে বর্তমান অবস্থায় পৌঁছেছে। এখানে স্রষ্টার কোনো দরকার নেই।" (নাউযুবিল্লাহ!)

তার এ গবেষণা 'বিবর্তনবাদ' (Theory of Evolution) নামে পরিচিত। তিনি ১৮৫৯ সালে Origin of Species (প্রজাতির উৎপত্তি) নামক গ্রন্থে প্রাথমিকভাবে তার গবেষণার ফল প্রকাশ করেন। তার এক যুগ পর ১৮৭১ সালে Decent of Men (মানুষের আগমন) নামক অপর একটি গ্রন্থের মাধ্যমে তার এ মতবাদকে আরো প্রসারিত করেন।

ঊনবিংশ শতকে মনোবিজ্ঞান শাখায় প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন অস্ট্রেলিয়ান সাইক্রিয়াট্রিস (মানসিক রোগবিশেষজ্ঞ) সিগমান্ড ফ্রয়েড। ১৮৫৬ খ্রিষ্টাব্দে অস্ট্রিয়ার মুরভিয়া জেলার ফ্রেইলবার্গ নামক ক্ষুদ্র জনবসতির এক মধ্যবিত্ত ইহুদি পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। নাস্তিকতা গ্রহণ করার পর তিনি একজন মনোবিজ্ঞানীকে একটি তত্ত্বের প্রস্তাব করেছিলেন। তার তত্ত্বটি আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করে এবং মানবজাতির গোটা আধ্যাত্মিক জগতকে যৌনতা ও ভোগের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করে। তবে তার আক্রমণের মূল লক্ষ্য ছিল ধর্ম। ১৯২৭ সালে প্রকাশিত হয় তার The Future of An Illusion নামক গ্রন্থ। এ গ্রন্থে তিনি দাবি করেন—

"ধর্মীয় বিশ্বাস একধরনের অসুস্থতা। মানবজাতির অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ধর্মীয় বিশ্বাসও একসময় বিলুপ্ত হয়ে যাবে।"

ঊনবিংশ শতাব্দিতে নাস্তিক্যবাদের সবচেয়ে বেশি প্রচার-প্রসার ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে কমিউনিজম বা সাম্যবাদের হাত ধরে। এ মতবাদের প্রধান প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক কার্লমার্ক্স। তিনি ১৮২৮ সালে জার্মানিতে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম জীবনে তিনি খ্যাতনামা জার্মান-দার্শনিক হেগেলের শিষ্য ছিলেন। পরবর্তীকালে হেগেল থেকে স্বতন্ত্র মতবাদ প্রচার করায় জার্মানির তৎকালীন রাষ্ট্রশক্তির সাথে তার বিরোধ হয়। বিধায় তিনি জার্মান থেকে বিতাড়িত হন। সেখান থেকে তিনি ফ্রান্সে গমন করেন। এরপর সেখান থেকেও বিতাড়িত হয়ে ইংল্যান্ড গমন করেন এবং সেখানেই ১৮৮৩ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

এ মতবাদের ভিত্তি শুধু অর্থনীতির উপর স্থাপিত। এতে ধর্মীয় বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণা বাধ্যতামূলক নয়। অর্থাৎ এমন একটি রাষ্ট প্রতিষ্ঠা করা, যে রাষ্ট্র

জনগণকে অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা ও বাসস্থানের নিশ্চয়তা বিধান করবে। রাষ্ট্রীয়ভাবে ধর্মের কোনো বাধ্যবাধকতা থাকবে না বা রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ধর্মীয় কোনো আইনও চলবে না। কার্লমার্ক্সের পর এঙ্গেলস, লেনিন, ট্রটস্কি, স্টালিন কিংবা মাও সেতুংসহ কমিউনিজমের সব দিকপালই নাস্তিকতাকে মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করেন। তারা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু ব্যতীত অন্য কিছু স্বীকার করেন না। সুতরাং আল্লাহ, পরকাল, হিসাব-নিকাশ, জান্নাত-জাহান্নাম এসব তাদের কাছে অলীক চিন্তা মাত্র। এঙ্গেলস বলেন, এ পৃথিবীতে পদার্থ মাত্রই প্রকৃত।

(ইসলামি আকিদা ও ভ্রান্ত মতবাদ-৬৪১]

লেনিনের লিখিত Religion গ্রন্থের শুরুতেই বলা হয়েছে, 'নাস্তিকতা মার্ক্সবাদের স্বাভাবিক ও অপরিহার্য অঙ্গ। নাস্তিকতা ছাড়া মার্ক্সবাদ কিছুতেই বোঝা যেতে পারে না'। কার্লমার্ক্স বলেছেন, 'আমাদের কাছে এ জড়জগৎ ছাড়া কোনো সত্তা নেই। [কমিউনিস্ট শাসনে ইসলাম]

তিনি আরো বলেছেন, 'পৃথিবী বস্তুর নিয়মের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। এজন্য কোনো সার্বজনীন সত্তা বা ইশ্বর প্রয়োজন নেই'।

[ইসলাম ও কমিউনিজম-কবি গোলাম মোস্তফা]

প্রখ্যাত কমিউনিস্ট লুনাকারস্কি বলেছেন, 'কমিউনিস্ট রাশিয়ার শিক্ষককে অবশ্যই নাস্তিক হতে হবে। এ সামাজিক ব্যবস্থায় ধর্মবিশ্বাসী শিক্ষকের কথা চিন্তাই করা যায় না'। [ইসলাম ও কমিউনিজম-কবি গোলাম মোস্তফা]

১৭৮৯ সালে জার-শাসনের বিরুদ্ধে ফরাসি বিপ্লব সংঘটিত হয়। এরপর ইউরোপে রেনেসাঁ যুগ শুরু হয় । বিভিন্ন ধরনের আধুনিক যন্ত্রপাতি আবিষ্কার হয়। ফলে ব্যাপকহারে কল-কারখানা প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। একটা মেশিনই কয়েকশ শ্রমিকের কাজ করে দিতে পারে। এতে খরচও কম হয়। ধনিকশ্রেণি তাই বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রি গড়ে তুলতে শুরু করে। যন্ত্রপাতি ও মেশিনারির সাহায্যে অল্প খরচে বেশি পণ্য উৎপাদন হওয়ায় হস্তশিল্প ও ক্ষুদ্রশিল্প খাতে ধস নামে। তারা কারখানার শ্রমিক হিসেবে নাম লেখাতে বাধ্য হয়।

এভাবে ধীরে ধীরে সমাজে শ্রেণিবিভাজন প্রকট আকার ধারণ করে। সব সম্পদ পুঁজিপতিদের দখলে চলে আসে। ধনিক ও বণিকশ্রেণি আর দরিদ্র-শ্রমিকশ্রেণি সমাজে এমন দুটি ধারা গড়ে ওঠে।

মালিকদের নানাবিধ অন্যায়-জুলুম ও শোষণের যাঁতাকলে যখন দরিদ্রশ্রেণি পিষ্ট হচ্ছিল, তখন কমিউনিজম বা সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক সমতার মোহময় শ্লোগান খুব সহজেই তাদের কাছে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে।

১৯১৭ সালের নভেম্বরে লেনিনের হাত ধরে এ মতবাদ সর্বপ্রথম কোনো দেশের (রাশিয়ার) রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার শীর্ষে চড়তে সক্ষম হয়। লেনিনের মৃত্যুর পাঁচ বছর পরে নাস্তিকতাকে রাশিয়ার রাজধর্ম হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

[ইসলাম, কমিউনিজম ও ভাববাদ-সাইয়িদ কুতুব শহিদ রহ.-১০]

এরপর চেকোশ্লোভিয়া, পোল্যান্ড, রুমানিয়া প্রভৃতি পূর্ব ইউরোপীয় দেশ এবং চীন ও কিউবায় এ মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়। সেইসঙ্গে নাস্তিক্যবাদ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ডাল-পালা ছড়িয়ে শক্ত অবস্থান নিতে শুরু করে। নাস্তিকতার বিস্তার ঘটাতে গিয়ে কমিউনিস্টরা দুই হাতে মানুষ হত্যা করে। শহরের পর শহর জ্বালিয়ে বিরানভূমিতে পরিণত করে। কমিউনিস্টদের এ বর্বরতার কথা The Black Book Of Communism গ্রন্থে উল্লেখ আছে। এগার সদস্যের গবেষক টিমের পরিশ্রমের ফল হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস থেকে প্রকাশিত ওই বইয়ে বলা হয়েছে, 'কমিউনিস্ট সরকার (যুদ্ধ ছাড়াই) একশত মিলিয়ন লোক হত্যা করেছে'।

এ ছাড়া The World on the Brink Of Abyss গ্রন্থ থেকে জানা যায়, কমিউনিজমকে স্বীকার না করার অপরাধে কমিউনিস্টরা মোট ১৮,৬০,০০০ লোককে হত্যা করেছে। তন্মধ্যে ২৮জন বিশপ, ১২০০জন পাদ্রী, ৬০০০জন শিক্ষক, ৮৮০০ ডাক্তার, ১,৯২,০০০জন শ্রমিক, ৮,১৫,০০০জন কৃষক।

[কার্লমার্ক্সের নির্বাচিত রচনাবলি-৫৩৬]

এ ছাড়া সেক্যুলারিজমের ছদ্মাবরণেও বিশ্বব্যাপী নাস্তিক্যবাদের ধ্যান-ধারণা মানুষের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে। আসলে নাস্তিকতার বদলে সেক্যুলারিজম কথাটি ব্যবহার করার রহস্য হল, এ মতবাদকে সরাসরি নাস্তিক্যবাদ বললে কেউ হয়তো সহজে তা গ্রহণ করবে না। নাস্তিকতাকে ভিন্ন নামে বাজারে চালানোর এ কৌশল ও সুচতুর প্রচেষ্টার কারণে অনেক ক্ষেত্রে সেক্যুলারপন্থি ব্যক্তিও আসল ব্যাপার বুঝতে পারে না। ফলে সেক্যুলারিজমের সাথে ধর্মের কোনো বিরোধ নেই এটা প্রমাণ করতে সে আদাজল খেয়ে মাঠে নামে।

সেক্যুলারিজমের প্রতিষ্ঠাতা জর্জ জ্যাকব হোলিওক নিজেই একজন নাস্তিক ছিলেন। ১৮১৮ খ্রিষ্টাব্দে তিনি Secular Society (সেক্যুলার সমাজ) প্রতিষ্ঠা করে সেক্যুলারিজমের পক্ষে আন্দোলন শুরু করার আট বছর আগে তিনি নিশ্চিতভাবে স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাসকে প্রত্যাখ্যান করে নাস্তিকতার অন্ধকার পথে অগ্রসর হন। [Encyclopaedia of Religion and Ethies : ১১/৩৪৮]

তাকে ও তার আন্দোলন গ্রহণকারী সকলের রচনাবলিতে ধর্মকে অস্বীকার ও নাস্তিক্যবাদের গ্রহণের প্রতি আহবান জানানো হয়েছে। [নাস্তিকতার স্বরূপ সন্ধান]

## বাংলাদেশে নাস্তিক্যবাদের উত্থান

বাংলাদেশে নাস্তিক্যবাদের আমদানি ঘটে গত শতকের ত্রিশ-চল্লিশের দশকে রাশিয়ায় সমাজ বিপ্লবের মাধ্যমে সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠার পর থেকে। রুশ বিপ্লবোত্তরকালে সমাজতন্ত্রের ধ্বজাধারীরা তাদের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে বিশ্বের অন্যান্য দেশে রপ্তানির উদ্দেশ্যে এবং বিপ্লব টিকিয়ে রাখতে বিশ্বের অন্যান্য দেশে তাদের উচ্ছিষ্টভোগী বংশধর সৃষ্টির তাগিদ বোধ করতে থাকে। এর অন্যতম কৌশল হিসেবে ধর্মবিদ্বেষকে কাজে লাগায় তারা। মূলত বাংলাদেশের নাস্তিকরা হলো সেই উচ্ছিষ্টভোগী আগাছা ও পরগাছা। আশির দশক পর্যন্ত আমাদের নাস্তিক্যবাদের প্রচারকারীরা রাশিয়ার উচ্ছিষ্ট ভোগ করে যেমন তৃপ্তির ঢেঁকুর তুলেছে, রাশিয়ার সমাজতন্ত্রের পতনের পর সেই তারাই সমাজতন্ত্রের আজন্ম শত্রু এবং সম্পূর্ণ বিপরীত শিবিরভুক্ত দেশ—পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলোর গুণকীর্তন গাওয়া শুরু করলেন উচ্চকিত কণ্ঠে। বিনিময়ে রুজির ব্যবস্থাটা পাকাপোক্ত করার ধান্দা। আহ! কতইনা লজ্জার কথা! সামান্য রুটি-রুজির জন্য নিজের ধর্মবিশ্বাসকে বিক্রি করে দিল! দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী সুবিধার জন্য আখিরাতের অনন্তর জীবনের সুখ-শান্তিকে জলাঞ্জলি দিল! [ধর্মের জয়গান-৩৯০, নাস্তিকতার স্বরূপ সন্ধান]

## নাস্তিকতা প্রসারে কমিউনিস্টদের ভূমিকা

বাংলাদেশের হাজার বছরের ইতিহাস তন্ন তন্ন করে খুঁজলেও কোথাও নাস্তিকতার বিন্দুমাত্র চিহ্ন পাওয়া যায় না। এদেশের সামাজিক-সংস্কার ও ধর্মচিন্তা কেমন ছিল, সে বিষয়ে আমরা সামান্য আলোকপাত করেছি। এখন স্বভাবতই আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে, বাংলাদেশে নাস্তিক্যবাদীদের তৎপরতা শুরু হয়েছে কোত্থেকে? এ বিষয়টি এখন আমরা অনুসন্ধানের চেষ্টা করব।

বিশ্বব্যাপী নাস্তিকতার প্রচার-প্রসারে সমাজতন্ত্রের বিশাল অবদান রয়েছে। কারণ, এ মতবাদের হোতা প্রত্যেকেই ছিল স্রষ্টায় অবিশ্বাসী। তাদের বিভিন্ন রচনা ও লিখনীতে বিষয়টি তারা বারবার তুলে ধরেছে। ঈমানের ফাল্গুধারায় সিক্ত এবং হাজারও অলি-আওলিয়ার পদচারণায় ধন্য আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশের মাটিতে নাস্তিকতার দর্শন সর্বপ্রথম এ সমাজতন্ত্রের পিঠে চড়ে এসেছে। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান স্বাধীন হওয়ার সময় সারা দেশে একটি মাত্র সমাজতান্ত্রিক প্লাটফর্ম ছিল। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সাবেক সদস্য এবং সমর্থক যারা পাকিস্তানে থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, তারা এটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাদের অধিকাংশ ছিল হিন্দু। দেশভাগের ফলে ব্যাপকসংখ্যক হিন্দু পাকিস্তান ত্যাগ করে যায়। তাই স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে পাকিস্তানে

কমিউনিস্ট পার্টির আকার দ্রুত কমে আসে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃবৃন্দ হিসাব করেন, ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর পূর্ব বাংলায় ১০,০০০ এর অধিক কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য বাস করত; কিন্তু ৫০-এর দশকে পূর্ব বাংলায় কমিউনিস্টদের সংখ্যা কয়েকশর অধিক হয় নি।

[বামপন্থি রাজনীতি ও বাংলাদেশের অভ্যুদয়-১৯]

কমিউনিস্টদের মূল আদর্শ 'ধর্মনিরপেক্ষতা' বিধায় এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্মপ্রাণ মুসলমান কোনোকালেই তাদের ভালো চোখে দেখে নি। সেজন্য এদেশে নিজেদের কার্যক্রম সুসংহত করতে শুরু থেকেই তারা অন্যের ঘাড়ে চড়ে চলাফেরা করার নীতি গ্রহণ করে। এ নীতির যথার্থতা তাদের সামনেও বেশি বাস্তব হয়ে ধরা দেয় ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে। এ নির্বাচনে কমিউনিস্ট প্রার্থীরা সরাসরি ১০টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। তাদের ছয়জন মুসলিম আর চারজন হিন্দু ছিল। মুসলমান প্রার্থীদের সকলেই মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় পরাজিত হয়। [বামপন্থি রাজনীতি ও বাংলাদেশের অভ্যুদয়-২৪]

এখনকার মতো তখনও ঘাড়ে চড়ার জন্য আওয়ামী লীগই ছিল তাদের প্রথম পছন্দ। ১৯৪৯ সালে গঠিত আওয়ামী লীগের জন্মকালীন নাম ছিল 'আওয়ামী মুসলিম লীগ'। সে সময় দলটির নেতারা অনুধাবন করেছিলেন যে, নবগঠিত দলটির দ্রুত জনপ্রিয়তা অর্জনে 'মুসলিম' নাম ব্যবহার করা ছাড়া কোনো উপায় নেই। [ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা : ১৭-২৩]

এ নামের সাইনবোর্ড লাগিয়ে খুব সহজেই সাধারণ মুসলমানদের সমর্থন আদায় সম্ভব। রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের লক্ষ্যে সে সময় কমিউনিস্টরা ব্যাপকহারে আওয়ামী মুসলিম লীগে যোগ দেয় এবং আওয়ামী কর্মসূচিতে আরো বেশি করে বামপন্থি আদর্শ ঢুকিয়ে দেওয়ার ফন্দি আঁটতে থাকে। ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের জন্য তারা আওয়ামী মুসলিম লীগকে চাপও দেয়। তখন তাদের অবস্থান বেশ পাকাপোক্ত হয়ে গিয়েছিল। ফলে তাদের দাবির মুখে ১৯৬৩ সালে দলের নাম আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দেওয়া হয়।

এভাবেই ধীরে ধীরে কমিউনিস্টরা তাদের লক্ষ্যপানে খুব সন্তর্পনে এগিয়ে যেতে থাকে। তবে ১৯৫৪ সালে পাকিস্তান সরকার কর্তৃক কমিউনিস্ট দলটি নিষিদ্ধ হওয়ায় তাদের কোমর পুরোপুরি ভেঙে যায়। তখন এর বেশির ভাগ নেতা হয় জেলে গিয়েছিলেন নতুবা ভারতে পালিয়েছিলেন। সে সময় তারা পুরোপুরি আন্ডারগ্রাউন্ড দল হিসেবে নিজেদের অস্তিত্ব কোনোমতে টিকিয়ে রাখে। তবে শত ঝড়-ঝাপটার মোকাবিলা করে গোপনে গোপনে ঠিকই তারা

তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যেতে থাকে; পরবর্তীকালে ভিন্ন নামে আত্মপ্রকাশও করে। তখন পশ্চিম পাকিস্তান সরকারের বাঙালিদের সাথে করা নানান রকম বৈষম্যমূলক আচরণের কারণে বাঙালিরা স্বাভাবিকভাবেই কিছুটা ক্ষুব্ধ ছিল। এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে তারা সতর্কভাবে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বৈষম্য-বিলোপ, ন্যায়ের শাসন, সমতা ইত্যাদি চটকদার দর্শনের ভিতর দিয়ে নিজেদের মতবাদ প্রচার করতে থাকে। কাজেই ১৯৭০ সালের মধ্যে পূর্ববাংলায় বামপন্থি ক্যাডারদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পায়। যেখানে ১৯৪৭-৪৮ সালে ইপিসিপির সদস্য সংখ্যা ছিল মাত্র কয়েক শত, সেখানে ১৯৬৬ সালে সেটা প্রায় তিন হাজারে গিয়ে দাঁড়ায়। তা ছাড়াও প্রথম বছরগুলোতে পাকিস্তানে কমিউনিস্ট দলগুলোর মধ্যে হিন্দু সম্প্রদায়ের চাঞ্চল্যকর সংখ্যাধিক্য থাকলেও ১৯৭০ সালে মুসলিম সদস্যদের সংখ্যা ৯০ শতাংশেরও বেশি হয়ে যায়। [বামপন্থি রাজনীতি ও বাংলাদেশের অভ্যুদয়-৪০]

**মোটকথা :** ব্রিটিশদের ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে যাওয়ার পর ১৯৪৭-৪৮ সালে পূর্ব পাকিস্তানের বামপন্থি আন্দোলন ১৯৬৯-৭০ সাল পর্যন্ত একটা দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে। অন্যান্য অনুন্নত দেশগুলোর মতো এদেশেও বামরা বিভিন্ন কৌশল গ্রহণ করে পূর্ব পাকিস্তান তথা স্বাধীনতাপূর্ব বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষ ও মৌলিক রাজনীতির একটি অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে। তার মধ্যে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন, জনপ্রিয় রাজনৈতিক দলগুলোতে অনুপ্রবেশ, ভাষা ও স্বায়ত্তশাসনের মতো সংবেদনশীল ইস্যুর উদ্দেশ্যমূলক ব্যবহার এবং অর্থনৈতিক বিপর্যয় ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন ইত্যাদি অন্যতম। তারপর এদেশের বামদের মধ্যেও ফাটল দেখা দেয়। তারা দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে–

(১) চীনা সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী, যাদের পিকিংপন্থি বলা হত।

(২) রাশিয়ার সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী, যাদের মস্কোপন্থি বলা হত।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ক্ষমতায় আসার পর পাকিস্তান সরকারের পররাষ্ট্র নীতিতে পরিবর্তন আসে। কৌশলগত কারণে পাকিস্তান সরকার চীন সরকারের সাথে সংস্কৃতিচুক্তিতে আবদ্ধ হয়। যার ফলে মাওবাদী তরুণ প্রজন্মের সামনে মাওবাদী সাহিত্য চর্চার নতুন দ্বার উন্মোচিত হয়। ফলে তখন সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার বই-পত্র ব্যাপকহারে বাংলায় অনুবাদ হয়। মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের সাথে এদেশের মেধাবী ছাত্রসমাজ ও শিক্ষিতশ্রেণি পরিচিত হতে শুরু করে। সাহিত্য-সংস্কৃতিকে পুঁজি করে তারা এদেশের উচ্চ শিক্ষিতদের বিরাট এক শ্রেণিকে ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদে বিশ্বাসী বানাতে সক্ষম হয়। যার কুপ্রভাব স্বাধীনতাপরবর্তী বাংলাদেশে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে পরিস্ফুট হয়। [নাস্তিকতার স্বরূপ সন্ধান]

## নাস্তিকতার প্রসারে ধর্মনিরপেক্ষতার ভূমিকা

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্বেই এদেশে সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী লোকদের হাত ধরে ধর্মনিরপেক্ষতার একটা শক্ত ভিত গড়ে উঠেছিল। রাষ্ট্রের উপর তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি কী পরিমাণে ছিল, তা অনুমান করা যায় ১৯৭২ সালের সংবিধান হতে। স্বাধীনতার এক বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের ধর্মীয় আবেগ-অনুভূতিকে বৃদ্ধাঙুলি প্রদর্শন করে এ সংবিধানের প্রস্তাবনায় বলা হয় : 'জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ এ সংবিধানের মূলনীতি হইবে।'

এ সংবিধান কার্যকর হওয়ার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রাম থেকে اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ [العلق: ١] (ইকরা বিস্‌মি রাব্বিকাল্লাযি খালাক্) মুছে দেওয়া হয়। এভাবে সলিমুল্লাহ মুসলিম হল, ফজলুল হক মুসলিম হল, জাহাঙ্গীরনগর মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দেওয়া হয়। ঢাকা ইসলামিয়া ইন্টারমিডিয়েট কলেজের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় নজরুল ইসলাম কলেজ। কিছুদিন পর সেখান থেকেও 'ইসলাম' শব্দটি মুছে ফেলা হয়। [নাস্তিকতার স্বরূপ সন্ধান]

ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী সবাই যে নাস্তিক ছিলেন, তা কিন্তু নয়। তাদের মধ্যে স্রষ্টা ও ধর্মে বিশ্বাসী মানুষও ছিলেন। বরং দ্বিতীয় শ্রেণির লোকই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। তারা ধর্মকে রাষ্ট্রের বাইরে কেবল ব্যক্তিজীবনে পালনীয় বলেই বিশ্বাস করতেন। কিন্তু যারা নাস্তিক হয়েছে, তারা সকলেই এ মতবাদে বিশ্বাসী ছিল। সহজভাবে বললে, ধর্মনিরপেক্ষতা মানেই নাস্তিকতা নয়; কিন্তু নাস্তিকতা মানেই ধর্মনিরপেক্ষতা। ভালোভাবে অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, যারা নিজেদের নাস্তিক বলে দাবি করছে একসময় তারাও কোনো না কোনো ধর্মে বিশ্বাসী ছিল। শুরুর দিকে তারা স্রষ্টা নেই এমনটা মনে করত না। কিন্তু পরবর্তীতে কমিউনিস্ট চিন্তাধারা গ্রহণ করে বা ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদে বিশ্বাসী হয়ে ধীরে ধীরে তারা 'স্রষ্টাহীন সৃষ্টি' দর্শনের প্রতি ঝুঁকে পড়েছে। একসময় নিজেকে নাস্তিক হিসেবে ঘোষণা করেছে।

এর কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রের অনুবাদে এ মতবাদের লোকেরা বলে থাকে, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র এমন মতবাদ, যে মতবাদ মানবজাতির ইহজগতের কল্যাণচিন্তার উপর গড়ে উঠবে। এমন একটি নৈতিক ব্যবস্থা, যেখানে থাকবে না কোনো ধরনের আল্লাহ ও পরকালভিত্তিক বিশ্বাস। নাউযুবিল্লাহ! [অক্সফোর্ড ডিকশনারি]

মুক্তধারা প্রকাশিত বাংলা বিশ্বকোষ তৃতীয় খণ্ডে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্পর্কে বলা হয়েছে,

"সমাজব্যবস্থা এমন নীতির উপর নির্ভর করবে, যাতে মানুষের নৈতিক আচার-আচরণ ইহকালীন বিষয়ে সামাজিক মঙ্গলের উদ্দেশ্যেই নিয়োজিত ও নির্বাচিত হয় এবং তজ্জন্য ধর্মের নিয়ন্ত্রণ তুলে দেওয়া হবে।"

এখন রাষ্ট্রীয় বিষয়াবলি হয়ে থাকে ব্যক্তির স্বার্থ ও জীবন সংশ্লিষ্ট। বিধায় দেখা যায়, এর মাধ্যমে প্রকারান্তে ব্যক্তিগত জীবন থেকেই ধর্মীয় বন্ধনকে অবমুক্ত করে সম্পূর্ণ ইচ্ছা-স্বাধীন ও অসম্পূর্ণ-ত্রুটিযুক্ত বুদ্ধি-বিবেচনার হাতে নিজেদের সকল সিদ্ধান্তকে সঁপে দেওয়া হয়। আর এটাই হল খোদাদ্রোহিতার সদর দরজা। যেহেতু এ ধাপে উপনীত একজন মানুষ নিজের বিবেকপ্রসূত সিদ্ধান্তকেই চূড়ান্ত বলে মনে করে যে-কোনো খোদায়ী সিদ্ধান্তকে অস্বীকার করে বসে, তাই একপর্যায়ে ধর্মীয় অনুশাসন ও কার্যাবলিকেও সে বস্তুজগতের নিরিখে পরিমাপ করার চেষ্টা চালায়।

স্বভাবত এখানে এসে সে হোঁচট খায়। একসময় দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে 'বিশ্বজগৎ আপনা-আপনি সৃষ্টি হয়েছে' বলে ঘোষণা দিয়ে নিজেকে নাস্তিকদের কাতারে শামিল করে নেয়। সেজন্য বলা যায়, ধর্মনিরপেক্ষতা হল নাস্তিকতার প্রথম ধাপ। এখানে পা রাখার পরই ধীরে ধীরে একজন মানুষ নাস্তিকতার অন্ধকার গলির দিকে এগিয়ে যেতে থাকে।

স্বাধীনতার পূর্বেই সমাজতান্ত্রিক সাহিত্যের প্রভাবে মেধাবী ছাত্রদের বড় একটা অংশ ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে অবস্থান নেয়। ধর্মের ভিত্তিতে বিভাজিত পাকিস্তান রাষ্ট্রের এ দেশীয় মানুষের উপর বৈষম্যমূলক আচরণ, বিশেষভাবে ধর্মের নাম ভাঙিয়ে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে নিরস্ত্র অসহায় বাঙালিদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়া তাদের সেই চিন্তাধারাকে আরো পাকাপোক্ত করে। ধর্মকে তারা আরো বেশি করে ঘৃণা করতে শুরু করে। যদিও ধর্ম কোনো দিনই এমন অন্যায়-অবিচার সমর্থন তো করেই নি বরং বিভিন্নভাবে এর বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছে।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিজয়কে ইসলামের বিপক্ষে বিজয় বলে এরা চালিয়ে দেওয়ার ঘৃণ্য অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়। জোর প্রচেষ্টা চালায় মুক্তিযুদ্ধকে ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে দাঁড় করাতে। স্বাধীনতার পরপর রাশিয়াপন্থি কিছু বুদ্ধিজীবী এবং সমাজতান্ত্রিক চেতনাধারী রাজনীতিক ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা শুরু করেন। বিদেশী টাকায় বিভিন্ন মিডিয়া কোম্পানী তৈরি করে পত্রিকার পাতায় রাষ্ট্র থেকে মসজিদকে আলাদা করতে এবং ৯০% মুসলমানের বাংলাদেশে 'ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার' এ শ্লোগান বেগবান করার লক্ষ্যে আদাজল খেয়ে লেগে যায়।

এটাকে মোক্ষম সুযোগ মনে করে ঘাপটি মেরে থাকা হতভাগা নাস্তিকগুলো গর্ত থেকে বেরিয়ে আসতে শুরু করে। প্রকাশ্যে তাদের ধর্মবিদ্বেষ ও নাস্তিকতার ঘোষণা দেয়।

আমরা এখানে বাংলাদেশে নাস্তিকতার উত্থানপর্বকে দুই ভাগে আলোচনা করব। প্রথম ভাগে ব্লগপূর্ব যুগের নাস্তিকতা আর দ্বিতীয় ভাগে ব্লগপরবর্তী যুগের নাস্তিকতা। [নাস্তিকতার স্বরূপ সন্ধান]

**নাস্তিকতা প্রসারে আধুনিক খ্রিষ্টবাদের ভূমিকা**

'স্টিফেন হকিং, নাস্তিকতা ও ইসলাম' নামক পুস্তিকার ভূমিকায় মুহাম্মদ ছিদ্দিক লিখেছেন :

ইংল্যান্ডের স্টিফেন হকিং-এর কিছু মূল বই আমার কনিষ্ঠতমা কন্যা রুবিনা ছিদ্দিকা পড়ত। তার কাছ থেকেই আমি স্টিফেন হকিং সম্পর্কে প্রথম জানতে পারি। এরপর আমি আরো কিছু ইংরেজি-বাংলা বই সংগ্রহ করি। পঙ্গু হয়েও স্টিফেন হকিং যে বিজ্ঞানের এত বড় পণ্ডিত হয়েছেন, তা বিস্ময়কর। বিজ্ঞানের গবেষণায় তাঁর বিরাট অবদান রয়েছে। তবে যে বিষয়টি আমার চিন্তায় নাড়া দেয়, সেটা তাঁর নাস্তিকতা। তাঁর লিখনী ও মন্তব্য পড়ে কখনো মনে হয় তিনি আংশিক নাস্তিক, কখনো মনে হয় তিনি পুরোপুরি নাস্তিক।

স্টিফেন হকিং-এর নাস্তিকতায় আমি বিস্মিত হইনি। তিনি জন্মগ্রহণ করেন খ্রিষ্টান পরিবারে। খ্রিষ্টান পণ্ডিতগণ খ্রিষ্টবাদকে শেষ পর্যন্ত যে রূপ দান করেছেন, তাতে একজন বিজ্ঞানীর পক্ষে খ্রিষ্টবাদকে মেনে নিয়ে আস্তিক থাকা অসম্ভব। কোনো বৈজ্ঞানিক কি যীশু খোদার বেটা, একথা মেনে নেবেন? এ ছাড়া আরো বহু বিভ্রান্তিকর তত্ত্ব রয়েছে আধুনিক খ্রিষ্টবাদে।

স্টিফেন হকিং-এর মতো পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিকদের বড় দুর্ভাগ্য যে, তাঁরা আসমানের গ্রহ-নক্ষত্রের ব্যাপারে তো বহু খোঁজ-খবর নিতে পারেন; কিন্তু ঘরের কাছের ইসলাম, কুরআন ও হাদিস সম্পর্কে অজ্ঞ। তাঁদের অনেকেই স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নেন যে, ইসলাম খ্রিষ্টবাদের চেয়েও নিকৃষ্ট। খ্রিষ্টবাদেরই যখন এ চেহারা, তা হলে ইসলামের আর কী শ্রেষ্ঠত্ব হবে? তবে কষ্ট করে যারাই কুরআন অধ্যয়নের চেষ্টা করেছেন, অন্তত একটি অনুবাদ পড়েছেন, তাঁদের মনেপ্রাণে শেষ পর্যন্ত ঝড় উঠেছে। তাই তো আমরা দেখি, বৃটেনের পপ তারকা ক্যাট স্টিভেন্স হয়েছেন ইউসুফ ইসলাম, ইংল্যান্ডের মার্মাডিউক পিকথল হয়েছেন মুহাম্মদ মার্মাডিউক পিকথল, ফ্রান্সের ডা. মরিস বুকাইলি কুরআনের প্রশংসায় লিখে ফেলেছেন জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থ 'বাইবেল, কুরআন এন্ড সাইন্স'। এরূপ আরো ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যায়। [স্টিফেন হকিং, নাস্তিকতা ও ইসলাম]

## ব্লগপূর্ব যুগের নাস্তিকতা

আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তি, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং ব্লগ সাইটের ব্যাপক প্রচলনের পূর্বে অল্প কয়েকজন ব্যক্তি এদেশে নাস্তিকতার অন্ধকার ও বিষবাষ্প ছড়িয়েছে, ধর্মকে অবমাননা করে ঘৃণিত হয়েছে। পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে নাস্তিকতার বীজ বপন করতে তারা ছিল বদ্ধপরিকর। কলম ও জবানের সহায়তায় তারা যথাসাধ্য চেষ্টা করে গেছে নিজেদের যোগ্য উত্তরসূরি তৈরি করতে। নিজেদের বুদ্ধিজীবী, অধ্যাপক, সাহিত্যিক ও কবি ইত্যাদি মর্যাদাকর উপাধিগুলোকে ব্যবহার করে তারা নিজেদের পচা-দুর্গন্ধময় এ অবিশ্বাসের দর্শন গিলাতে চেয়েছে পরবর্তী প্রজন্মকে। সে সময় ইন্টারনেট নামক বস্তুটির অসহজলভ্যতার ফলে তারা তাদের এ নষ্ট দর্শন প্রচার করার জন্য বই-পুস্তক, বিভিন্ন সভা-সেমিনার আর নিজেদের ক্লাস-রুমকেই বেছে নিয়েছিল।

এদের ধারাবাহিক প্রচেষ্টায় ওয়েবজগতের ব্যাপক প্রসারের পূর্বে এদেশের সাধারণ শিক্ষিত কিছু তরুণদের মধ্যে নাস্তিকতার প্রতি মমত্ববোধ তৈরি হয়ে যায়। ধর্মীয় শিক্ষায় তেমন যোগ্যতা না থাকার কারণে চিন্তার স্বাধীনতার মোড়ক-পেঁচানো এ দর্শন তাদের খুব সহজেই প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়। তারা এসব নাস্তিককে নিজেদের গুরু হিসেবে গ্রহণ করে নেয়। সেসব গুরুর তিরোধানের পর তাদের রেখে যাওয়া মিশনটি এসব পথভ্রষ্ট তরুণই পরবর্তী সময়ে তোড়জোড়ে এগিয়ে নেওয়ার অপতৎপরতায় মেতে ওঠে। প্রতিষ্ঠা করে বিভিন্ন ব্লগ সাইট।

## ব্লগীয় যুগের নাস্তিকতা

বাংলা ভাষায় ব্লগ চালু হওয়ার আগেই নাস্তিক্যবাদের চেতনাবাহী একটা গোষ্ঠী মোটামুটি তৈরি হয়ে গিয়েছিল সাহিত্যের সংস্পর্শে এসে। এদের প্রায় সবাই হলো বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ধর্মশিক্ষা থেকে বঞ্চিত জাগতিক শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রেণি। মুক্তচিন্তক, মুক্তমনা, প্রথাবিরোধী প্রভৃতি শব্দ তাদের বেশ মোহিত করে। সেইসঙ্গে ভার্সিটি পড়ুয়া কমিউনিস্ট তথা সমাজবাদীদের দৌরাত্ম্য তো রয়েছেই, যা তাদের আরো দ্রুত ধর্মের প্রতি অনাস্থা পোষণে উৎসাহিত করে।

বাংলা ভাষায় ব্লগের ব্যবহার চালু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ধর্মের বিরুদ্ধে এদের প্রোপাগা-া সীমিত পরিসরে আবদ্ধ ছিল। নির্দিষ্ট একটা গ-ির ভিতর চলত তাদের এ অবিশ্বাসের লেনদেন। কারণ, এদেশের মানুষ যুগ যুগ ধরে কোনো না কোনো ধর্মে বিশ্বাসী। নাস্তিকতায় অবিশ্বাস করাটা ছিল তাদের যুগ যুগ ধরে চলে আসা রীতি। এর শেকড় ছিল খুব গভীরে প্রোথিত। তাই নাস্তিকরা

চাইলেই যখন-তখন, যেখানে-সেখানে তাদের চিন্তাধারা আর অসুস্থ দর্শনের কথা তুলে ধরতে পারত না। কিন্তু ব্লগ এসে তাদের এ জটিল সমস্যার সহজ সমাধান তৈরি করে দেয়। ইন্টারনেট, ফেসবুক, ওয়েবসাইট ও ব্লগে আসক্ত যুবক-যুবতীদের মাঝে তাদের দাওয়াত চলতে থাকে হরদম। বিভ্রান্ত হতে শুরু করে অনেক যুবক, এখনো এ ধারা চলমান। [নাস্তিকতার স্বরূপ সন্ধান]

**ব্লগ ও ব্লগার**

অনলাইনে একজন মানুষের ডায়েরি লেখার ব্যাপারটাকেই ব্লগ আকারে আনা হয়েছে। কিছু দেশে ডায়েরি লেখাকেই ব্লগ বলে। ব্লগ (blog) শব্দটি মূলত Web log/ 'ওয়েব লগ-এর' সংক্ষিপ্ত রূপ। ব্লগের প্রথম যাত্রা শুরু হয় ১৯৯৪ সালে। প্রাথমিক পর্যায়ে ব্লগ কেবল ব্যক্তিগত ডায়েরির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ১৯৯৭ সালের ১৭ ডিসেম্বর সর্বপ্রথম 'ওয়েব লগ' শব্দটির ব্যবহার শুরু হয়। এদিন জন বার্জার নামে এক মার্কিন নাগরিক তার নিজ ওয়েব সাইটে এ শব্দটির উদ্ভাবন করেন। পরবর্তীসময়ে ১৯৯৯ সালের মার্চ বা এপ্রিলের দিকে Peter Merholz, যিনি তার নিজস্ব ব্লগ Peter.com-এ একরকম কৌতুক করেই web log (ওয়েবলগ) শব্দটি ভাগ করে blog বলেন। এরপর থেকে ব্লগ শব্দটিকে যথাক্রমে বিশেষ্য ও ক্রিয়াপদ দু'ভাবেই কাজে লাগিয়ে তিনিই প্রথম ব্লগার শব্দ উদ্ভাবন করেন। ১৯৯৯ সালের পর থেকে ব্লগ ব্যবহারকারীর সংখ্যা তীব্র গতিতে বৃদ্ধি পায়। আর সাথে সাথে ব্লগের আসে নানা বৈচিত্র্য। ইদানীং একটা ব্লগে অনেক কিছুই হতে পারে। ব্যক্তিগত ডায়েরি, রাজনৈতিক নিবন্ধ অথবা ব্যবসায় অর্থনীতি, বিজ্ঞান ও দর্শনের উপর প্রবন্ধ, গল্প-কবিতা, ধর্মীয় আলোচনা ইত্যাদি।

এক কথায়, নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা ইন্টারনেট জগতের যে-কোনো স্থানে লিখিতভাবে প্রকাশ করাকে ব্লগিং বলা হয়। আর যিনি ব্লগ লিখেন তাকে বলা হয় ব্লগার। [নাস্তিকতার স্বরূপ সন্ধান, ব্লগ এন্ড ব্লগার ডায়েরি-৮, প্রতি খোলা চিঠি]

**বাংলা ব্লগের জন্মকথা**

একবিংশ শতাব্দির শুরুর দিকেই ব্লগ ও ব্লগিং উন্নত বিশ্বে বেশ পরিচিত হয়ে উঠলেও আমাদের দেশে তখনো এ ধারণা তেমন জোরালো হয় নি। গুটি কয়েক মানুষ যারা ব্লগিং করতেন, তারা ইংরেজিতে করতেন। তখনো বাংলা ভাষায় কোনো ব্লগ চালু হয়নি। এরপর ২০০৬ সালে সর্বপ্রথম সৈয়দ গুলশান ফেরদৌস আরা তার নরওয়েজিয়ান স্বামী অরিলকে নিয়ে প্রথম বাংলা ব্লগ প্রতিষ্ঠা করে। তারা এ ব্লগের নাম দেয় 'সামহ্যোয়ার ইন ব্লগ'

(Somewhereinblog.com), সংক্ষেপে সামু। এ ব্লগের বিরুদ্ধে ধর্মবিদ্বেষকে প্রশ্রয় দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। কারণ, বাকস্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধাশীলতার কথা বলে তারা ধর্মকে আঘাত করে লিখিত লেখাগুলোর বিরুদ্ধে বারবার অভিযোগ করা সত্ত্বেও কোনো ব্যবস্থা নেয় না। অপরদিকে ইসলামপন্থি অনেকের লেখাই তারা ব্যান (ban) করে দেয় নানা ঠুনকো অজুহাতে।

**আরো কয়েকটি ব্লগ**

সচলায়তন– অতি বাম ঘরানার ব্লগ।
আমার ব্লগ– আওয়ামী ঘরানার ব্লগ।
সদালাপ– ধর্মীয় ঘরানার ব্লগ।
মুক্তমনা– নাস্তিক-সেক্যুলারদের ব্লগ।
সোনার বাংলা– জামাতঘেঁষা ব্লগ (বর্তমানে বন্ধ আছে)।
ধর্মকারী– কট্টর ব্লগ।

এ ছাড়া অনেক ব্লগ আছে। যেমন– প্রথম আলো ব্লগ, নির্মাণ, মুক্ত প্রজন্ম ফোরাম, শব্দনীড়, সবুজ বাংলা, স্বপ্নবাজ, ব্লগদেশ বকলম, পিস ইন ইসলাম, নাগরিক ব্লগ, টেকটিউনস, চতুর্মাত্রিক, আমার বর্ণমালা ও অনুকাব্য ইত্যাদি।

[নাস্তিকতার স্বরূপ সন্ধান]

**সব ব্লগার নাস্তিক নয়**

যখন কোনো নাস্তিক ব্লগে নাস্তিক্যবাদের—যেমন : স্রষ্টা না মানা, আল্লাহর প্রেরিত দূত শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ-কে না মানা ইত্যাদি পোস্ট দিয়ে তার নাস্তিকতার পরিচয় দেয়, তখন আমরা তাকে নাস্তিক ব্লগার বলে থাকি। ঠিক তার বিপরীতে আমরা যখন ব্লগে আল্লাহ তায়ালার শ্রেষ্ঠত্ব, গুণাবলি ও বিধান এবং আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর ভালবাসা, ভক্তি-শ্রদ্ধা ইত্যাদি তুলে ধরব, তখন আমরা হবো আস্তিক ব্লগার।

বুঝা গেল, ব্লগে আমরা শ্বাশত ইসলামের খেদমত করতে পারি। আল্লাহ তায়ালার রহমতে সারা বিশ্বে এবং আমাদের দেশে অগণিত আস্তিক ইসলামি ব্লগার রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা তাঁদের সাহায্য করুন। আমিন!

**কয়েকটি ডানপন্থি ব্লগ**

১। www.Islambarta.com
২। www.peaceinislam.com (News)
৩। www.ahlehap-bangla.blogspot.com
৪। www.qawmee.com
৫। www.notunshokal.com

## আপনিও ব্লগার হতে পারেন

আপনি যদি কোনো ব্লগে লিখতে চান, তা হলে প্রথমে আপনি কোন্ ব্লগে লিখতে চান, তা ঠিক করুন। আমি এখানে সংক্ষেপে বলছি, প্রথমে ব্লগ ঠিক করার পর ওই সাইটে লগ ইন করুন। তারপর তাদের শর্তগুলো মেনে নিয়ে সেখানে রেজিস্ট্রার বাটনে ক্লিক করুন। তারপর একটি রেজিস্ট্রার পেজ আসবে, সেখানে শূন্যস্থান পূরণ করে পেজটি তাদেরকে জমা দিন বা আপনি ওয়ার্ডপ্রেস থেকে ব্লগ খুলতে পারেন বা গুগল-এর blogspot.com হতেও আপনার ব্লগ একাউন্ট খুলতে পারেন। এরপর আপনি নিজ প্রোফাইলে গিয়ে ব্লগ লেখা শুরু করতে পারেন। [ব্লগ এন্ড ব্লগার ডায়েরি-১৭]

## আইনের আওতায় ব্লগার

অন্যান্য দেশের মতো আমাদের দেশেও ব্লগারদেরকে আইনের আওতায় আনা হয়েছে। ১৩ মার্চ ২০১৩ ঈসায়ী ফেসবুক ও ব্লগে ইসলাম বিদ্বেষমূলক ও অবমাননাকর মন্তব্যকারীদের শনাক্ত ও তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে নয় সদস্যের একটি কমিটি গঠন করেছে সরকার। তাই ব্লগ বা ফেসবুকে ইসলাম সম্পর্কে কটূক্তিকারী কাউকে শনাক্ত করতে পারলে সাথে সাথে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সহায়তা নেওয়া যেতে পারে। [ব্লগ এন্ড ব্লগার ডায়েরি : ১৭-১৮]

## আদর্শহীনতা

আমাদের দেশে নাস্তিক্যবাদের আমদানি হয়েছিল রাশিয়ার সমাজবিপ্লবের সূত্র ধরে। এখানে নাস্তিক্যবাদের বেসাতি ছড়িয়ে বেড়ানো কেউই পূর্বপুরুষের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে এ তথ্য পান নি। অর্থের বিনিময়ে, বৈষয়িক সুযোগ-সুবিধার লোভে তারা এ তথ্য প্রচার করেছেন। সঙ্গত কারণেই তাদের বাবা-মার কাছ থেকে একটি ধর্মীয় পরিচয়ও জন্মসূত্রে তারা নিয়ে এসেছিলেন এ পৃথিবীতে। এ পরিচয়ের অন্যতম বাহন হলো তার নাম। সব সময়ই তার বাবা-মায়ের সঙ্গে সব রকমের সম্পর্কোচ্ছেদের ঘোষণা দিলেও বাবা-মার কাছে থেকে পাওয়া স্বধর্মের পরিচয় বাহক নাম ত্যাগ করেনি কখনো। তারা নিজেদের সন্তানদের বেছে বেছে সেক্যুলার নাম রাখছেন—অনন্যা, স্নিগ্ধা, শুভেচ্ছা ইত্যাদি; কিন্তু বাবা-মার কাছ থেকে পাওয়া নিজের ধর্মীয় নামটি ত্যাগ করে সেক্যুলার নাম গ্রহণ করে নি কখনো; কিন্তু কেন? অনেকে হয়তো বলতে চাইবেন, এটা দাবি করা আমাদের যৌক্তিক হবে না। কারণ ছোটবেলা থেকেই সে এ নামে পরিচিত হয়েছে। এখন নতুন করে আরেকটা নাম গ্রহণ করাটা ঠিক হবে না। কিন্তু ছেলেবেলায় সে যে ধর্মীয় সম্প্রদায়ের লোক বলে পরিচিত ছিল, যেদিন থেকে তার বোধোদয় হল যে, ধর্ম বলতে আসলে কিছু

নেই, সবই মিথ্যা বানোয়াট, সেদিন থেকেই তো সে ধর্মীয়ভাবে তার নতুন পরিচয় ঠিক করে নিল, স্বধর্মের লোকদের সঙ্গে সব রকম সম্পর্কোচ্ছেদ করে নতুন পরিচয়ে পরিচিত হল। তা হলে এ নতুন পরিচয়ে তার নতুন নাম হবে না কেন?

আমরা সাধারণত দেখি, যদি কোনো হিন্দু জেনে বুঝে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন, তা হলে তাঁর নাম হিন্দু ধর্মের পরিচয় বহন করে থাকলে তিনি নামটা পরিবর্তন করে ইসলাম ধর্মীয় পরিচয় বাহক নাম গ্রহণ করেন। এভাবে যদি কেউ খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে, সেও খ্রিষ্টান ধর্মের পরিচয়বাহী কোনো নাম গ্রহণ করে। তা হলে যে কোনো ধর্ম ত্যাগ করে নাস্তিক হয়ে গেল, সে সেই ধর্মের পরিচয় বহন করে, এমন নাম কেন ত্যাগ করবে না? আসলে এদের কোনো আদর্শ নেই। হালাল পেলেও খায়, হারাম পেলেও খায়। আল্লাহ পাক আমাদের হেফাজত করুন!

নাস্তিক্যবাদের প্রচারকরা একে যেভাবে উপস্থাপন করে তা হল, নাস্তিকতা অর্থ ধর্মের বাঁধন ছিন্ন করে মুক্ত মনের মানুষ হওয়া। কিন্তু বাস্তবতা অনেকটা ভিন্ন। মূলত নাস্তিকতা প্রকৃতিপূজা, ব্যক্তিপূজা ও প্রবৃত্তিপূজার সংমিশ্রণ।

নাস্তিক স্রষ্টার সমস্ত বৈশিষ্ট্য 'অচেতন' ও 'জড়' প্রকৃতির উপর আরোপ করেছে। ফলে সে 'জড়বস্তু'কে সৃষ্টি, প্রতিপালন, ক্ষমতা, নিয়ন্ত্রণের বৈশিষ্ট্য আরোপ করার মাধ্যমে নিজেকে গাছ, পাথর, সূর্য, চন্দ্র, মাছ ও কচ্ছপ পূজারীর পর্যায়ে নামিয়ে এনেছে!

তেমনি নাস্তিকরা কিছু 'বিখ্যাত' ব্যক্তিবর্গের অন্ধ অনুসারী। শুধু তাদের খ্যাতির কারণেই অনেক নাস্তিক তাদের যুক্তির ভুল ধরতে প্রস্তুত নয়।

## প্রকৃতিপূজা

একজন আস্তিক দাবি করে যে, স্রষ্টা চিরকাল বিদ্যমান ছিল, আছেন এবং থাকবেন। পক্ষান্তরে একজন নাস্তিক দাবি করে, অচেতন জড় প্রকৃতি চিরকাল বিদ্যমান ছিল এবং থাকবে।

একজন আস্তিক দাবি করে, প্রজ্ঞাবান স্রষ্টা তাকে সৃষ্টি করেছেন। একজন নাস্তিক দাবি করে, জড় প্রকৃতি তাকে সৃষ্টি করেছে।

একজন আস্তিক সর্বশক্তিমান স্রষ্টার প্রতি ভক্তি নিয়ে শুধুই তাঁর উদ্দেশ্যে মাথানত করে। একজন নাস্তিক প্রকৃতিকে ভক্তি করে প্রকৃতির জন্য মাথা নোয়ায়, বিভিন্ন উপলক্ষ্যে নাচ-গান ও অশালীন আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রকৃতির পূজা করে।

আস্তিক স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আর নাস্তিক জড়প্রকৃতির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে গান, কবিতা, স্মৃতি রচনা করে থাকে; অথচ প্রকৃতি সেটা শুনতেই পায় না। কুরআন মাজিদে ইরশাদ হচ্ছে,

هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ. [الشعراء: ٧٢]

'যখন তোমরা ডাক তখন কি এরা তোমাদের ডাক শুনতে পায়?'

[সূরা শুয়ারা-৭২]

আস্তিক স্রষ্টাকে ভালবাসে আর নাস্তিক স্রষ্টাকে বাদ দিয়ে জড় প্রকৃতিকে ভালবাসে। অন্তরে পৌত্তলিকতার প্রতি ভালবাসার কারণে তারা মূর্তি, ভাস্কর্য ইত্যাদি বানাতে তৎপর।

সুতরাং নাস্তিকতা নতুন কোনো বৈপ্লবিক দর্শন নয় বরং নাস্তিকতা একটি কুসংস্কারাচ্ছন্ন অসভ্য মানুষের মাঝে বিদ্যমান গাছ, সূর্য, চন্দ্র, পাথর, প্রাণী পূজার নবরূপ ও সাম্প্রতিক বহিঃপ্রকাশ। আধুনিক, সভ্য, শিক্ষিত মানুষের জন্য প্রকৃতিপূজার প্রাচীন কুসংস্কারে ফিরে যাওয়া বড় বেমানন ও মূর্খতা।

**ব্যক্তিপূজা**

আমরা মুসলমানরা আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করি। আল্লাহ তায়ালার সকল আদেশ বিনা দ্বিধায় মেনে চলি। আল্লাহ তায়ালার কোনো আদেশ আমাদের যুক্তিতে না আসলেও আমরা সেটাকে যুক্তিসঙ্গত বলেই মনে করি। কারণ, যুক্তি সব সময় এক অবস্থায় থাকে না। যুক্তি কখনো কখনো ভুল সাব্যস্ত হতে পারে; কিন্তু আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর হুকুম সব সময়ই শিরোধার্য, কখনো ভুল হতে পারে না। আল্লাহ ছাড়া এমন গুণে আর কেউই গুণান্বিত হতে পারে না—এটাই চরম চিরসত্য। কিন্তু কী আশ্চর্য! নাস্তিকরা এ আসনে তাদের দার্শনিক ও বিজ্ঞানীদেরকে বসিয়ে দেয়। আপনি যতই তাকে বুঝাবেন যে, বিজ্ঞানের আবিষ্কারের পর থেকে বিজ্ঞানীদের থিওরি পরিবর্তনই হচ্ছে। মানুষের বুদ্ধি ভুল করতেই পারে। বিজ্ঞানের ভুলগুলো যদি চোখে আঙুল দিয়েও আপনি দেখিয়ে দেন, তারপরও নাস্তিকরা তাদের দলের ভ্রান্ত দার্শনিক ও বিজ্ঞানীদের কথায় সন্দেহপ্রবণ হতে রাজি নয়। এসব দার্শনিক ও বিজ্ঞানীদের কথার বাইরে তারা চিন্তা করতেও চায় না। এসব কি তাদের ব্যক্তিপূজা নয়?

**প্রবৃত্তিপূজা**

যাবতীয় অনৈতিক গুণাবলির সর্বাধিক বহিঃপ্রকাশ ঘটে মাঝে। এ কথা বর্তমান সময়ে কাউকে দলিল-প্রমাণ দিয়ে বুঝাতে হবে না। যদি

নাস্তিকতাকে সত্য মানা হয় এবং পৃথিবীর সকল লোক নাস্তিক হয়ে যায়, তবে অল্প কয়েক প্রজন্মের মাথায়ই পৃথিবীর বুক থেকে মানব সভ্যতা বিলুপ্ত হয়ে যাবে! এটা তাদের প্রবৃত্তি পূজার ফলাফল। [খোলা চিঠি]

**নাস্তিক্যবাদের অসারতা**

পৃথিবীতে নাস্তিক্যবাদের সূচনা হয়েছে আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর পূর্বে। কিন্তু তাদের এ তথ্যের অসারতা ও অমূলকতার কারণেই আজও পর্যন্ত নাস্তিক্যবাদের নিঃস্বার্থ অনুসারী কিংবা সমার্থক কোনোটাই পায়নি।

হাতে গোনা ক'জন সুবিধাবাদী মানুষই সময়-সুযোগ বুঝে এ তথ্য প্রচার করে ফায়দা হাসিল করেছে। তাই আজ পর্যন্ত পৃথিবীর কোথাও নাস্তিকতাকে ভিত্তি করে কোনো সমাজ বা কমিউনিটি গড়ে ওঠেনি। আর এ কারণেই জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে এসব সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান পালনের ক্ষেত্রে বরাবরই সংকেট পড়ে নাস্তিকরা। একজন নাস্তিক নিজ পরিবারেই কোণঠাসা হয়ে পড়ে। নিজ পরিবারেই নিজের তথ্য চালু করতে ব্যর্থ হয় সে। আর নিজস্ব পরিবার গড়ে ওঠার আগেই যদি সে নাস্তিকতায় দীক্ষিত হয়, সে ক্ষেত্রে এ সংকট আরো প্রকট হয়ে ওঠে। প্রকৃত নাস্তিক হয়তো তার জীবনসঙ্গী হিসেবে সমমনা অন্য এক নাস্তিক খুঁজে বেড়ায়। কিন্তু অধিকাংশের ভাগ্যেই একাকিত্ব ছাড়া কিছু জোটে না। তাই জীবন সায়াহ্নে এসে তারা হয়ে ওঠে একাকী, নির্জনবাসী। মৃত্যুর পর তাদের স্মরণ করার মতো কেউ অবশিষ্ট থাকে না। এ একাকিত্ব ফাঁকি দেওয়ার জন্যই পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে তারা ঘৃণ্য এক জীবন—সমকামী বসবাসের অনুমতি চাইতে বাধ্য হচ্ছে। আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুন!

[ধর্মের জয়গান-৩৯৫, প্রতি খোলা চিঠি]

**নির্মমতা**

আমাদের প্রথিতযশা আলেমে দীন, শাইখুল ইসলাম মুফতি তাকি উসমানি দা.বা.-এর খলিফা হযরত মাওলানা মুফতি দিলাওয়ার হুসাইন দা.বা. একটি ঘটনা বলেছিলেন। ঘটনাটি হল :

'আমার শাইখ ও মুর্শিদ শাইখুল ইসলাম আল্লামা তাকি উসমানি দা.বা.। যখন সমাজতান্ত্রিক দেশ রাশিয়ার পতন ঘটে, তখন তাঁর সফর হয়েছিল রাশিয়ায়। ফিরে এসে আমাদেরকে সফরের কাহিনী শুনালেন যে, এদের ভাষা আমরা বুঝি না, আমাদের ভাষা এরা বুঝে না। আরবিও বুঝে না, ইংরেজিও বুঝে না। দীর্ঘ চুয়াত্তর বছর যাবৎ পৃথিবী থেকে তাদের ভিন্ন রাখা হয়েছে। অন্য দিকে চোখ তুলে তাকাবে এ সুযোগটি তাদের ছিল না। এক সরকারের ক্ষমতাধীন তাদেরকে চলতে হয়েছে।

তাই তারা আমাদের ভাষা বোঝে না। আমরাও তাদের ভাষা বুঝি না। এর মধ্যে এক স্থানে গিয়ে দেখি, এক ব্যক্তি একদম বিশুদ্ধ উর্দু বলছে। আশ্চর্য! এ লোক এত সুন্দর উর্দূ কোথায় শিখল!

যা হোক! হযরত শাইখ বলেন– এক বৃদ্ধ লোককে পেলাম। তিনি আরবি কথা বলতে পারেন, আমাদের আরবি কথাও বুঝেন। যদিও আরবি শুদ্ধ নয়; কিন্তু অন্তরের আবেগ প্রকাশ করতে পারেন। আর আমাদের কথাও বুঝতে পারেন। আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, জনাব! আপনি আরবি কিভাবে শিখলেন? তখন তিনি কান্না শুরু করে দিলেন, চোখের পানি ছাড়লেন। এরপর হযরত শাইখকে নিয়ে একটু দূরে সরে গেলেন। কারণ, প্রত্যেক তিনজনের মধ্যে একজন সিআইডি থাকার সম্ভাবনা আছে। একটু দূরে নিয়ে বললেন, জনাব! যখন এদেশে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন চলছিল, তখন আমি ছোট। তবে আমি সব বুঝি। আমার এগুলো মনে ছিল। আমার আব্বাজান ছিলেন একজন অনেক বড় আলেম। আমার আব্বাজানকে বাধ্য করেছে সকাল আটটা বাজে মাঠে নামতে, বিকাল চারটা বাজে মাঠ থেকে আসতে। মধ্যখানে যোহরের নামায কুরবান, এটা পড়া সম্ভব ছিল না। তখন যোহর পড়াতো আব্বার জন্য সম্ভব হত না; চারটা বাজে ঘরে ফিরে গোসল সেরে আব্বা ঘরে ঢুকতেন। খাওয়া দাওয়া সারতেন। যোহরের নামায কাযা, আর আসরের নামায আদায় করতেন। নামায পড়া যেহেতু নিষেধ, এটা সময় নষ্ট হয় তাদের দৃষ্টিতে। তাই সিআইডি ঘুরত, কেউ নামায পড়ে কি-না। তাই আব্বা আমাকে ঘরের দুয়ারে দাঁড় করিয়ে রাখতেন, কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে, তোমার আব্বু কী করে? চুলার মধ্যে আম্মা চা বসাতেন, চুলার সামনে আব্বা জায়নামায বিছিয়ে নামাযের নিয়ত বাঁধতেন। যখন কেউ এসে জিজ্ঞাস করত, তোমার আব্বু কী করে? আমি বলতাম চা খায়। আসলে আব্বু চুলার সামনে নামায পড়ছে। আমাকে সিআইডিরা আখরূট দিত, বিভিন্ন ফলফলাদি দিয়ে বলত, বল তো তোমার আব্বু কী করে? বলতাম, আব্বু চা খায়। এরপরও জোরপূর্বক কেউ ঘরে ঢুকে যেত। যখন দেখতাম, জোরপূর্বক ঢকুছে! আমি তো বলেছি চা খায়, এরা গিয়ে দেখবে আব্বু নামায পড়ে! আমার কী দশা ঘটবে, আব্বু-আম্মুর কী দশা ঘটবে? এদেরকে ঢুকতে দেখলে আমি এখান থেকে ছোট্ট মানুষ হিসেবে চিৎকার দিতাম যে, আব্বু লোক আসছে। তখন আব্বু নামায ছেড়ে দিয়ে, জায়নামায এক দিকে ফেলে দিয়ে, চায়ের কাপ হাতে নিয়ে বসে যেতেন। এরা এসে দেখত, আব্বু চা খায়, আমি সত্যবাদী প্রমাণিত হতাম। এভাবে আমার আব্বা-আম্মার দিন কাটত।

রাত বারটার পর পুরা রাশিয়া যখন ঘুমে বিভোর, ঘরের কোণায় আমার আব্বু একটি কূপ খনন করেছেন। বারটার পর আমাকে নিয়ে একটি মোম বাতি নিয়ে এ কূপের তলায় আসতেন, চোঙ্গ বেয়ে। উপরে আমার আম্মা কাঁথা-বালিশ-চাটাই বিছিয়ে রাখতেন, যাতে আলো বাইরে না আসতে পারে, কেউ আবার দেখে ফেলে কি-না? কূপের তলায় এসে রাত বারটার পর ঘুম বন্ধ করে বসে বসে মোম বাতির আলোতে আমার আব্বা আমাকে আরবি শিখিয়েছেন। শরহে বেকায়া পর্যন্ত কিতাব পড়িয়েছেন। শরহে আকাইদও পড়িয়েছেন। এটা আজ থেকে চুয়াত্তর বছর আগের কথা। সেই আব্বার কাছ থেকে কূপের তলায় বসে বসে শিখে নেওয়া আরবি আমি এখনও কিছু কিছু বলতে পারি। আপনাদের আরবিও আমি বুঝতে পারি।

চিন্তা করুন! কী পরিমাণ জুলুম অত্যাচার এসেছিল মুসলমানদের ওপর! ঈমানদারদের ওপর! এরপর তারা তাদের ঈমান হাত থেকে যেতে দেয় নি। এত কুরবানি এত ত্যাগ-তিতিক্ষির পরও তারা ঈমান ধরে রেখেছে।

এবার আসুন দ্বিতীয় ঘটনায়। এটা চীনের। চীনে তাবলিগি জামাত গেল। ইজতিমায়ি (সম্মিলিতভাবে) দাওয়াত দেওয়া নিষেধ। এখনও নিষেধ। কাজেই ইনফিরাদি (ব্যক্তিগতভাবে) মানুষকে দাওয়াত দিত। খুব সাবধানে। এখানেও প্রত্যেক তিনজনের একজন সিআইডি থাকার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু এরা আমাদের কথা বুঝে না। আমরা এদের কথা বুঝি না। তাবলিগের একজন মুরুব্বি আমাকে শুনিয়েছেন। তিনি বলেন, হঠাৎ এক স্থানে গিয়ে দেখি, এক ব্যক্তি একবারে সাবলীল উর্দূ বলছে। আশ্চর্য হলাম, এ ব্যক্তি উর্দূ কিভাবে বলে! তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি উর্দূ কোথা থেকে শিখলেন? তিনিও এভাবে টেনে দূরে নিয়ে গেলেন। অমনি কান্না শুরু করলেন। বললেন, আমি লেখাপড়া করেছি ভরতের ডাবেলে। হযরত শায়খুল ইসলাম আল্লামা শাব্বির আহমাদ উসমানি রহ.-এর কাছে। আমি তাঁর ছাত্র। আমি সেখান থেকে দাওরায়ে হাদিস পাস করে আসার সময় সাত হাজার কিতাব নিয়ে এসেছি চীনে। ভারত থেকে সাত হাজার কিতাব নিয়ে আসা আর কিয়ামত কাঁধে নেওয়া একসমান। এরপর এখানে যখন কমিউনিজম আন্দোলন শুরু হয়, তখন আমার সামনে আমার স্ত্রীর বোরকা, আমার স্ত্রীর হিজাব দোপাট্টা টেনে আগুন দিয়ে জালিয়ে দেয়। আমার স্ত্রীর মাথার চুল কেটে দেওয়া হয়। আমার মেয়ের মাথার চুল কেটে দেওয়া হয়। আমার স্ত্রী, মেয়ে সবসহ আমাদেরকে সকাল আটটা বাজে মাঠে নামতে বাধ্য করা হয়। আর বিকাল চারটা বাজে আমাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

আমার সামনে আমার এ সাত হাজার কিতাব স্তূপ দিয়ে আগুন লাগিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। সারকথা, আমি ওখান থেকে এ উর্দূ শিখে এসেছি। লেখাপড়া করেছি ভারতে।

দেখুন! ইসলামের বিরুদ্ধাচরণ কিভাবে করা হয়েছিল।

**তারা চ্যালেঞ্জ করত!**

প্রথমে দাওয়াত দিত, সবাই মসজিদে আসো। বাধ্যতামূলক নারী-পুরুষ সকলকে মসজিদে আসতে হবে। মসজিদে নারীরা বোরকা গায়ে দিয়ে আসত। মসজিদের দুয়ার দিয়ে ঢুকার সময় জোরপূর্বক নারীদের বোরকা, হিজাব, দোপাট্টা টেনে বাইরে ফেলে দিত। বেপর্দা নারীদেরকে মসজিদে ঢুকতে হত বাধ্যতামূলক। নারী পুরুষ একসঙ্গে মসজিদে আর বাইরে বোরকা হিজাব ও দোপাট্টাগুলোতে আগুন লাগিয়ে জ্বালিয়ে দিত। যাতে ফেরার পথে আর বোরকা গায়ে দিয়ে যেতে না পারে। তখন তারা মসজিদে দাঁড়িয়ে চ্যালেঞ্জ করত, ইসলাম সত্য ধর্ম নয়। ধর্ম বলতে দুনিয়ায় কিছু নেই এগুলো সব মানুষের বানানো। তারা তাদের থিওরিগুলো পেশ করত। পেশ করার পর চ্যালেঞ্জ করত, আছে কারো সাহস, তা হলে আমার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ কর। প্রথম প্রথম আলেম ওলামারা চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতেন। চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার পরেই তার উপর জুলুম-অত্যাচারের স্ট্রীম রোলার চালানো হত। শেষমেষ হিম্মতহারা হয়ে গেছে। কেউ আর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করত না। এরপর বলত যে, দেখ! আমরা যদি সঠিক না হতাম, তা হলে আমাদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার সাহস তোমাদের কেন নেই? এমনকি যাদের কথা মুসলমানরা শুনত, আলেম ওলামা, এদের ওপর অপবাদ দেওয়া হত– অমুক আলেম অমুক খানে যেনা করেছে, অমুক খানে চুরি করেছে, অমুক খানে অপরাধ করেছে; তার বিচার হবে। বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর পূর্বে একটি ইনজেকশন দেওয়া হত। তখন সে এ্যাবনর্মালের মতো হয়ে যেত। সকলের সামনে এ আলেমকে দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞাসা করত যে, তুমি অমুক খানে অমুকের সাথে যেনা করনি? আলেম তো এখন এ্যাবনর্মাল, কিছু বলতে পারে না। নীরব দর্শকের মতো শুধু তাকিয়ে থাকে; মানুষ সন্দিহান হয়ে পড়ত যে, হুজুরকে তো ভালো মনে করতাম, যদি যেনা নাই করত, তা হলে হুজুর এখন জবাব দিচ্ছেন না কেন? বুঝা গেল, আসলে চুপে চুপে এ কাজই করে।

আমাদের দেশেও বিভিন্ন এলাকায় আলেমদের বিরুদ্ধে এমন প্রোপাগাণ্ডা চলে (আল্লাহ তায়ালা হেফাজত করুন!)। আসলে তো ইনজেকশনের কারণে আলেম হয়ে গেছেন কিংকর্তব্যবিমূঢ়। সে এখন এ্যাবনর্মালের মতো। সঠিক উত্তর দিবে কোত্থেকে?

এভাবে মানুষকে ইসলাম থেকে সরানোর চেষ্টা করেছে। তারপরও আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ওয়াদা 'ইন্না নাহনু নাযযালনায যিকরা, ওয়া ইন্না লাহূ লাহাফিযূন' (এ কুরআন, এ দীন আমি দিয়েছি। সংরক্ষণের দায়িত্ব আমার।) এত জুলুম অত্যাচারের ভিতরেও বর্তমান চীনে সরকারের হিসেবে দশ কোটি মুসমান বসবাস করে। আর বেসরকারি হিসেবে ত্রিশ কোটি মুসলমান এখনও চীনে বসবাস করে।

এ ছিল কমিউনিজম, সমাজতান্ত্রিক অত্যাচারের হাল চিত্রের দু-একটি নমুনা। আরো কত মারাত্মক জুলুম যে তারা মুসলমানদের ওপর করেছে। তার তো কোনো ইয়ত্তা নেই। অথচ তারা আমাদের দেশে মুক্তমনা বলে গলা ফাটাতে থাকে। অতএব তাদের ধোঁকা থেকে সাবধান।

## নাস্তিক্যবাদের ভ্রান্তিসমূহ

এখানে মৌলিক ভ্রান্তিগুলো বলছি। (আল্লাহ তায়ালা আমাদের হেফাজত করুন!) এরা মনে করে—

১. আল্লাহর অস্তিত্ব নেই।
২. স্রষ্টা বলতে কেউ নেই।
৩. পরকাল বলতে কিছু নেই।
৪. কুরআন আসমানি কিতাব নয়।
৫. ধর্মের কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই।
৬. ভূ-মণ্ডল ও নভোমণ্ডলে যা কিছু হচ্ছে, সবই প্রাকৃতিক ও অনাদী।

এসব মৌলিক বিশ্বাসগুলো টিকিয়ে রাখতে তারা প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করে অনেক প্রশ্ন করে থাকে। যেগুলো শুনলে সাধারণ বিবেকবান ব্যক্তিও ঘৃণায় পাথর হয়ে যায়। ঈমানদারদের মানসিকতা সম্পূর্ণ গরম হয়ে যায়। জ্ঞানীরা বিরক্ত হয়ে তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। মূর্খ, নাদান, হতভাগা ও দুর্ভাগারা ঈমান হারানোর পথে চলে যায়।

## নাস্তিক্যবাদের দলিল-প্রমাণ

বিপক্ষে বিশ্বাসীদের অসংখ্য দলিল থাকলেও তাদের কাছে দাবির পক্ষে একটাই মাত্র দলিল আছে, সেটা হলো ইন্দ্রীয় গ্রাহ্যতা। যা কোনো কিছুকে অস্বীকার করার দলিল হিসেবে মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্বকে অস্বীকার করা তাদের দলিল-প্রমাণহীন একটি ভ্রান্তি মাত্র। এ ছাড়া তাদের যে কয়টি ভ্রান্তি আছে, সবগুলো তাদের এ ভ্রান্তি আল্লাহ পাকের অস্তিত্ব না থাকার ওপর নির্ভরশীল। তাদের মূলভিত্তি বাতিল ও দলিল-প্রমাণহীন বিধায় তাদের সকল ভ্রান্তিই দলিল-প্রমাণহীন।

এ হিসাব যদি আমরা নাও করি, তবু তাদের অন্য দাবিগুলোও পঞ্চইন্দ্রীয় দ্বারা সাব্যস্ত হতে পারে না। কারণ, পৃথিবীর সকল জ্ঞান-বিজ্ঞান এ কথায় একমত যে, পঞ্চইন্দ্রীয় কখনো কখনো ভুল করে। আর যে শক্তি কখনো কখনো ভুল করে নিছক সে শক্তির সংবাদকে অকাট্য প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করা যায় না। সুতরাং যত দাবি-অস্বীকৃতি, তর্ক-বিতর্ক, বাক-বিতর্ক ও প্রশ্ন-প্রতিপ্রশ্ন যত জায়গায় পাওয়া যায়, সবই বাতিল ও ভ্রান্ত।

**জবাবের অধিকার রাখে না**

ব্লগে, ফেসবুকে, সংবাদ পত্রের মাধ্যমে, বিভিন্ন ম্যাগাজিনের মাধ্যমে এবং বইপত্র লিখে বেশকিছু ভাইকে বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দিতে দেখা যাচ্ছে। আলহামদুলিল্লাহ! খুব খুশি লাগে; তবে একটা বিষয় আমাদের নিশ্চয় খেয়াল রাখা উচিত, সকল প্রশ্ন জবাব পাওয়ার যোগ্য নয়।

এখানে এক নির্বোধ জামাইয়ের গল্প মনে পড়ে গেল। বিয়ে করেছে বেশ কয়েক দিন; কিন্তু শ্বশুরের সাথে সে কথা বলে না। তার চিন্তা হলো, বউটা এমনিতেই তৈরি হয়েছে। কারো কোনো শ্রম কিংবা ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার কোনো প্রয়োজন হয়নি। কতগুলো ধুলি-কণা, আয়রন ও ক্যালসিয়াম একসাথ হয়েছে আর বউ তৈরি হয়ে গেছে!

কিন্তু শ্বশুর বেচারা তার এ আচরণ আদৌ সহ্য করতে পারছেন না। তিনি অপারগ হয়ে ওই নির্বোধের বাবার কাছে দুঃখ প্রকাশ করলেন। বাবা তার নির্বোধ ছেলেকে বললেন– বেটা! তুমি যে স্ত্রীকে নিয়ে ঘুরে বেড়াও, সে এমনিতেই দুনিয়ায় আসে নি। তার একজন বাবা আছে। তার একজন মা আছেন। বউয়ের বাবা তোমার শ্বশুর হয়। বউয়ের মা তোমার শাশুড়ি হয়। তাঁদের সাথে কথাবার্তা বলবে কেমন!

কথাগুলো নির্বোধ ছেলের বিশ্বাস হতে না চাইলেও বাবা বলছে। কী আর করা? বাবার সাথে সে অঙ্গীকার করল, ঠিক আছে! এবার গিয়ে শ্বশুর নামের লোকটির সাথে অবশ্যই কথা বলব।

যেই কথা সেই কাজ। শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে শ্বশুরকে সালাম জানাল। শ্বশুর মহাখুশি হয়ে সালামের জবাব নিল। জিজ্ঞাসা করল, তোমার বাবা কেমন আছেন? তোমার মা কেমন আছেন? সবগুলো প্রশ্নের জবাব দিয়ে সে নিজেও শ্বশুরকে একটি প্রশ্ন করল, আচ্ছা আপনি বিয়ে করেছেন?

শুনে শ্বশুর যেন আকাশ থেকে পড়লেন। এ কী বলছে জামাই! শ্বশুর তার প্রশ্নের জবাব দিল না; তাকে পাল্টা একটি প্রশ্ন করল, বেটা আমি বিয়ে না করলে তোমার বউ আসল কোত্থেকে?

এতক্ষণে নির্বোধ জামাইয়ের মাথায় একটু শুভবুদ্ধির উদয় হল। শ্বশুরকে লক্ষ্য করে বলে দিল, ও! বুঝতে পেরেছি, আপনি বিয়ে করে আমাকে দিয়ে দিয়েছেন। শ্বশুর লোকটি চোখের পানি ফেলে বললেন, তোমার সাথে আমার কথা না বলাই উচিত ছিল।

এমনিভাবে কথার জবাবও না দেওয়াই উত্তম। কারণ, আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্বে যাদের ঈমান নেই, তারা এ নির্বোধ জামাইয়ের চেয়েও বেশি নির্বোধ। তবে কেউ যদি জানার নিয়তে যুক্তিসঙ্গত প্রশ্ন করে, তা হলে তার প্রশ্নের জবাবতো অবশ্যই দিতে হবে।

সুতরাং কোনো নাস্তিক যখন আমাদেরকে প্রশ্ন করে, তখন আমাদেরকে প্রথমেই কয়েকটি বিষয় পরিষ্কার করে নিতে হবে।

১। প্রশ্নটি যৌক্তিক কি-না? অর্থাৎ আপনাকে যে প্রশ্নটি করা হয়েছে, বাস্তবে তার কোনো যৌক্তিকতা আছে কি-না?

২। যে প্রশ্নটি আপনাকে করা হল, সেই প্রশ্নের জবাব আপনার পক্ষে দেওয়া সম্ভব কি-না? যদি কোনো প্রশ্নের জবাব দেওয়া সম্ভব না হয়, তা হলে অসম্ভবের পিছনে পড়ে সময় নষ্ট করবেন কেন? সাফ বলে দিন, এ প্রশ্নের জবাব আছে। তবে আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। আপনি বরং অমুক আলেমের সাথে দেখা করুন। অথবা তাকে বলে দিন, এ প্রশ্নের জবাব দান মানুষের আয়ত্তের বাইরে। খামাখা এসব প্রশ্নের পিছনে পড়ে নিজের জীবনকে বরবাদ করবেন না।

যেমন— আপনি কম্পিউটারের কোনো সফটওয়্যার তৈরি করলেন। এখন ওই সফটওয়্যার থেকে ততটা সমস্যার সমাধানই আপনি আশা করতে পারেন, যতটা লজিক-অ্যানালাইসিস করে আউটপুট দেওয়ার মতো ডাটা আপনি তাতে ইনপুট করেছেন। এর বাইরের কোনো প্রবলেম যদি আপনি সেই প্রোগ্রামে দেন আর তার সমাধান সেখান থেকে দাবি করেন, তবে আপনি কখনো সফল হবেন না। প্রোগ্রামের লিমিটেশনের বাইরের কোনো প্রবলেমের সমাধান সেই প্রোগ্রাম থেকে আশা করাটা কোনো যৌক্তিক দাবি হতে পারে না, বরং সেটা হবে বোকামি।

তেমনি আপনার মস্তিষ্ক নামক কম্পিউটারে শিক্ষা নামক সফটওয়্যারে যে পরিমাণ ডাটা এন্ট্রি করা হয়েছে, এর বাইরের কোনো প্রবলেমের সমাধান ওই মস্তিষ্ক থেকে আশা করাটা হবে বোকামি। কম্পিউটারে হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যারের যেমন ধারণ ক্ষমতার ভিন্নতা আছে, তেমনি মানুষের মস্তিষ্ক

নামক হার্ডওয়্যার ও জ্ঞান-বুদ্ধি নামক সফটওয়্যারেরও ধারণ ক্ষমতার ভিন্নতা রয়েছে। সর্বোচ্চ ধারণ ক্ষমতার হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যারেরও একটি সীমা আছে।

অর্থাৎ এমন কিছু বিষয় আছে, যেগুলো কমমাত্রার ধারণক্ষমতাসম্পন্ন হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার সমাধান করতে পারে না। আরো উচ্চমানের হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যারের শরণাপন্ন হতে হয়। আবার কিছু জটিলতা আছে যেগুলো সর্বোচ্চমানের হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যারও সমাধান করতে অক্ষম। তেমনিভাবে আমাদের সামনে সাধারণ জটিলতাগুলো আসলে আমরা নিজেরাই সমাধান করতে পারি, আর কিছু জটিলতা তো এমন আছে, যার জন্য আমরা আলেমদের শরণাপন্ন হই। আর এমন কিছু জটিলতাও রয়েছে, যেগুলোর ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালা আলেমদেরও অক্ষম করে রেখেছেন।

৩। উপরের দুটি বিষয় খেয়াল করার পর আরেকটি বিষয় থেকে যায়। সেটি হচ্ছে, প্রশ্নকর্তা প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে যে শব্দগুলো ব্যবহার করছে, সেগুলোর যথার্থতা কতটুকু বা সে যা দাবি করছে, তা আদৌ দাবির যোগ্য কি-না?

যেমন, কেউ আপনাকে বলছে—আলোর অক্ষমতা হচ্ছে সে কখনো অন্ধকার হতে পারবে না। দেখুন, সে এক্ষেত্রে আলোর অন্ধকার না হওয়াটাকে দেখাচ্ছে আলোর অক্ষমতা হিসেবে। বস্তুতপক্ষে এটাকে কি অক্ষমতা বলা যায়? যেখানে অন্ধকার মানেই হচ্ছে আলোর অনুপস্থিতি সেখানে অক্ষমতার ব্যাপারটা আসল কোথাথেকে? হাঁ! এটা এসেছে তার নির্বুদ্ধিতা থেকে। এমন নির্বোধ লোকের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পিছনে না পড়ে চুপ থাকাই শ্রেয়।

উল্লিখিত তিনটি বিষয় মাথায় রেখে তবেই আপনাকে প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজতে হবে। যুক্তি দিয়ে সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে হবে। যেমন, নাস্তিকরা প্রশ্ন করে থাকে—

১। আল্লাহ তায়ালা কি এমন কোনো পাথর তৈরি করতে সক্ষম, যা তিনি নিজেই উত্তোলন করতে পারবেন না?

২। আল্লাহ তায়ালা কি এমন কোনো পাথর তৈরি করতে সক্ষম হবেন, যেটা তাঁর চাইতেও অনেক বড়?

৩। তিনি মানুষ হতে পারেন কি?

৪। তিনি নিজের মৃত্যু ঘটাতে পারেন কি?

৫। তিনি তার মতো কোনো স্রষ্টা সৃষ্টি করতে পারেন কি?

৬। তিনি কখনো খারাপকে ভালবাসতে পারেন কি?

৭। তিনি কি আপনাকে তাঁর রহমত ও রাজ্য থেকে বের করে দিতে পারেন?

প্রথম পাঁচটি প্রশ্নই সৃষ্টিকর্তার আকার-আকৃতি ও প্রকৃতি নিয়ে করা হচ্ছে। ভালোভাবে লক্ষ্য করলে দেখবেন পাঁচটি প্রশ্নই তার যৌক্তিকতা হারিয়েছে। তাদের প্রশ্নগুলো পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করে দেখুন!

প্রথমত আল্লাহ তায়ালা কি এমন কোনো পাথর তৈরি করতে সক্ষম, যা তিনি নিজেই উত্তোলন করতে পারবেন না?

ভালোভাবে লক্ষ্য করে দেখুন! স্রষ্টা হচ্ছেন এমন এক সত্তা, যার কোনো শুরু নেই আবার শেষও নেই, সেই অর্থে তিনি একটি অসীম সত্তা। এখন আপনি যদি প্রশ্ন করেন, অসীমের চেয়েও বড় বা অসীমের চেয়েও শক্তিশালী কিংবা অসীমের চেয়েও ভারি কিছু তৈরি করতে পারেন? তা হলে সেই বস্তুকে অসীমের কোনো একদিকের Dimension-কে অতিক্রম করতে হবে। এর মানে অসীমের কোনো একদিকে হয় Dimension-এর end point থাকতে হবে বা start point থাকতে হবে। যে point-কে অতিক্রম করে ওই বস্তুটি অসীমের চাইতে বড় হতে পারবে। কিন্তু অসীমের কোনো start point বা end point বলতে কিছু নেই। তা হলে এমন কোনো বস্তুর উদ্ভব হওয়া সম্ভব নয়, যা অসীমের চাইতে বড় হতে পারবে। আবার দুটা অসীম একসাথেও থাকতে পারবে না। তা হলেও হয় space/ time Dimension-এর কোনো একটাতে তাদের দুজনকেই একটা point এ এসে share করতে হবে, যে point-টা হবে তাদের start point/end point। কিন্তু যার শুরু বা শেষ আছে সে তো অসীম হতে পারবে না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, প্রশ্নটার যৌক্তিকতা নেই।

একই যুক্তিতে স্রষ্টার পক্ষে মানুষ হওয়া সম্ভব নয়। কারণ, মানুষ হচ্ছে Limited; আর স্রষ্টা হচ্ছেন Unlimited। কাজেই মানুষ না হওয়াটা স্রষ্টার অক্ষমতা নয় বরং Limited হওয়াই Unlimited হতে না পারার অক্ষমতা। তারা আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্রষ্টাকে সৃষ্টির সাথে অর্থাৎ Unlimited-কে Limited-এর সঙ্গে তুলনা করে তালগোল পাকিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে। তুলনার সূত্রমতে Unlimited-কে Limited-এর সাথে তুলনা করা আদৌ সঠিক নয়।

এবার শেষের দুটি প্রশ্ন দেখি 'তিনি কখনো খারাপকে ভালবাসতে পারেন কি?' এবং 'তিনি আপনাকে তার রহমত, তার রাজ্য থেকে বের করে দিতে পারেন কি?'। এখানেও আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে, সকল সুন্দর ও

ভালো গুণের অধিকারীই হচ্ছেন আল্লাহ। এখন সকল খারাপ গুণ তা হলে কি? খারাপ গুণের মানেই হচ্ছে সকল ভালো গুণের অনুপস্থিতি। ব্যাপারটা এমন যে, কোনো ঘটনা যখন সত্য হয়ে যায় তখন সেই ঘটনাটি মিথ্যা হতে না পারাটা আসলে তার অক্ষমতা নয়; বরং মিথ্যাটা হচ্ছে ওই ঘটনার ক্ষেত্রে সত্যের অনুপস্থিতি। তাই আল্লাহ তায়ালা যখন বলেছেন তিনি সুবিচারক তাই অবিচারক হওয়াটা এমনিতেই নাকচ হয়ে যায়। কাজেই আল্লাহ তায়ালা সব সময় ভালোকেই কেবল ভালবাসবেন, আর খারাপকে ভালো না বাসা (প্রশ্রয় না দেওয়া) তাঁর কোনো অক্ষমতা প্রকাশ করে না বরং এটা তাঁর সেই অসীম ক্ষমতারই বহিঃপ্রকাশ।

প্রথম ধাপে আমরা তাদের প্রশ্নগুলো যাচাই করলাম। এবার দ্বিতীয় ধাপে পর্যালোচনা করা যাক।

আমাদের পক্ষে সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে সেসব বিষয়ের উত্তরই কেবল দেওয়া সম্ভব, যেগুলো সম্পর্কে তিনি আমাদেরকে অবহিত করেছেন আর সেই সমস্ত বিষয়ের উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়, যা তিনি আমাদেরকে জানান নি।

উপরে সফটওয়্যারের যে উদাহরণটি দেওয়া হয়েছে, সেটি খেয়াল করুন! মানুষকে আমরা কম্পিউটারের সাথে তুলনা করতে পারি। আর তার জ্ঞান-বুদ্ধিকে সফটওয়্যারের সাথে তুলনা করতে পারি। সৃষ্টিকর্তা হলেন উক্ত কম্পিউটার ও সফটওয়্যারের নির্মাতা। তিনি দয়া করে এ কম্পিউটারের জন্য সফটওয়্যার নির্মাণ করার সময়ে যেসকল ডাটা ইনপুট করে দিয়েছেন, সে সকল ডাটা সংক্রান্ত জটিলতাই কেবল এ সফটওয়্যার সমাধান করতে পারে। যে সকল ডাটা তিনি এ সফটওয়্যারের ধারণ ক্ষমতার বাইরে রেখেছেন, সে সকল বিষয়ে জটিলতা এ সফটওয়্যার থেকে কখনো আশা করা যায় না।

সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে যেসব তথ্য তিনি আমাদেরকে জানান নি, তা হচ্ছে—

(১) তিনি দেখতে কেমন বা তাঁর আকার-আকৃতি কোন ধরনের?

(২) তিনি যখন কোনো কাজ করেন, তখন তা কিভাবে করেন?

কারণ, আমরা কেবল classical physics ও modern physics দিয়ে কোনো কিছুর ব্যাখ্যা করতে পারি; তদুপরি সেটা ত্রিমাত্রিক হলে। খুব কম মানুষই আছেন, যারা সর্বোচ্চ চতুর্মাত্রিক (টাইম) ডাইমেনশন নিয়ে চিন্তা করতে পারেন। কিন্তু সৃষ্টিকর্তার কার্যসীমা এ ত্রিমাত্রিক ও চতুর্মাত্রিক অপেক্ষা অনেক উর্ধ্বে। তিনি কত মাত্রিকে কাজ করেন, সেটা মানুষের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। মানুষের মেমোরির ধারণ ক্ষমতা এ সংক্রান্ত ডাটা ধারণ করতে

অক্ষম। তেমনিভাবে তাঁর আকৃতি-প্রকৃতির ডাটাও ধারণ করতে মানুষের মেমোরি অক্ষম। তাই মানুষের মেমোরি থেকে, মানুষ নামী কম্পিউটার থেকে এ সংক্রান্ত জবাব চাওয়া নির্বুদ্ধিতা বৈ কিছু নয়।

উপরোল্লিখিত দুটি ধাপে তাদের প্রশ্নগুলো পর্যালোচনা করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি, প্রশ্নগুলো করার ক্ষেত্রে তাদের শব্দগুলো সম্পূর্ণ বেয়াদবিমূলক এবং প্রশ্নগুলোর মাধ্যমে তাদের কৃত দাবি একেবারেই অযৌক্তিক। সুতরাং তাদের এ প্রশ্নগুলো এবং এ জাতীয় কোনো প্রশ্ন জবাবের কোনো অধিকার সংরক্ষণ করে না।

## প্রশ্ন বিভ্রাট

নাস্তিকরা আরো কিছু প্রশ্ন করে থাকে। যেমন–

১। আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করেন কেন? (ক) ভয়ে? (খ) লোভে?

কিছু কিছু প্রশ্নই থাকে ভুল। তাই আপনি যাই উত্তর দেন না কেন, তা-ও ভুল হবে। যেমন : কেউ আপনাকে বলল, এককথায় উত্তর দিবেন—হাঁ বা না। এরপর তিনি প্রশ্ন করলেন, আপনার বাবা কবে জেল থেকে বের হলেন? (ক) শনিবার? (খ) মঙ্গলবার?

এখানে আপনি কি উত্তর দিবেন? আপনার বাবা তো কখনো জেলেই যায় নি। নাস্তিকরাও ঠিক এভাবে প্রশ্ন করে।

অনেক সময়ই নাস্তিক একজন আস্তিককে বিভ্রান্ত করার জন্য এমন প্রশ্ন করে থাকে, দেশপ্রেম বড় না-কি ধর্ম বড়?

বিশ্বের একশতজন বড় বিজ্ঞানী ও চিন্তাবিদদের মধ্যে অন্যতম অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ডক্টর তারিক রমাদান এ প্রশ্নের খুব চমৎকার জবাব দিয়েছিলেন। তাকে একবার জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আপনি প্রথমে মুসলিম না-কি সুইস? তিনি বলেছিলেন, আমি এসব শিশুসুলভ-বোকাটে প্রশ্নের উত্তর দিই না! যে প্রশ্নই ঠিকমত করতে পারে না তার আর উত্তর দিব কি?

তেমনি নাস্তিকরা প্রশ্ন করার আগে চারিদিকে চিন্তা-ভাবনা করে প্রশ্ন করে না, তাদের চিন্তা থাকে আস্তিকদের শায়েস্তা করা। তাই তারা সৎপথ পায় না। আমাদের জানা উচিত সত্যের জয় চিরদিনই হয়েছে, যদিও সেখানে মিথ্যার চিৎকার চলেছে।

এভাবে তারা অযথাই বলে, আল্লাহ তায়ালার হাত-পা কেমন? তার কি চেহারা আছে? থাকলে নিশ্চয় তা আমাদের মতোই হবে বা এলিয়েনের মতো কোনো চেহারা হবে। তার কি খাওয়া-দাওয়া ও টয়লেট করতে হয়?

এবার দেখুন! তাদের প্রশ্ন বিভ্রাটের নমুনা! আসলেই কি এ প্রশ্ন তাদের মাথায় আসার কথা? তারা তো আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্বকেই অস্বীকার করে! তার মানে দাঁড়ায়, আগে আল্লাহ তায়ালা আছে কি-না, তাই আমাকে প্রমাণ করতে হবে। আর আল্লাহ তায়ালা থাকলেই তো তার সম্পর্কে অন্য সব তথ্য জানার প্রশ্ন আসবে; কিন্তু তারা তো আল্লাহ তায়ালাকেই বিশ্বাস করে না। তা হলে প্রশ্ন আসে কিভাবে? এ হল তাদের প্রশ্ন বিভ্রাটের নমুনা!

যারা হতাশায় ভোগে, তাদের কাছ থেকে কি ভালো কিছু আশা করা যায়? কারণ, নাস্তিকতা হতাশা আর যৌনতার প্রতি দুর্বলতারই বহিঃপ্রকাশ।

সুতরাং কে স্বীকার করতেই হবে : I am an atheist and I proudly say that I can not make a right question because my brain is still on the donkey evolutionism process.

### আত্মঘাতী যুক্তি

যুক্তিবিদ্যার মৌলিক নিয়ম অনুযায়ী কারো বিশ্বাসের বিরুদ্ধে এমন কোনো যুক্তি দেওয়া যাবে না, যে যুক্তি দিয়ে নিজের বিশ্বাসই ভুল প্রমাণ করা যায়। কিন্তু নাস্তিকরা প্রায়শই যুক্তিবিদ্যার এ মৌলিক নিয়মকে লঙ্ঘন করে কিংবা অজ্ঞতাবশত আস্তিকের বিশ্বাসকে ভুল প্রমাণ করার চেষ্টা করতে গিয়ে নিজেই ধরা খেয়ে যান।

যে লোকটি আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্বই বিশ্বাস করে না, সে আবার কিভাবে প্রশ্ন করতে পারে—আল্লাহ তায়ালা কি এমন কিছু বানাতে পারবেন, যা তিনি নিজেই উঠাতে পারবেন না?

সুতরাং দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট হয়ে গেল, এ মতবাদের উপর তাদেরই আস্থা নেই। কাজেই আমরা বলতে পারি, প্রায় প্রশ্নই আত্মঘাতী ও অযৌক্তিক। নাস্তিক্যবাদ একটি অসার মতবাদ। এ মতবাদের উপর জ্ঞানীদের আস্থা থাকা উচিৎ নয়।

## নাস্তিকের বৈশিষ্ট্য

### ১. দলিল-প্রমাণহীন বিতর্ক

বাতিল বিষয় নিয়ে বিতর্ক করা নাস্তিকদের একটি বড় বৈশিষ্ট্য। এর দ্বারা তারা সত্যকে আপন জায়গা থেকে সরিয়ে দিতে চায়। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا ۞

"আর কাফিররা মিথ্যা অবলম্বনে বিতর্ক করে, তা দ্বারা সত্যকে ব্যর্থ করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে এবং তারা আমার নিদর্শনাবলি ও যদ্বারা তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করা হয়, সেগুলোকে ঠাট্টারূপে গ্রহণ করেছে।" [সূরা কাহাফ-৫৬]

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন–

مَا يُجَادِلُ فِيْ آيَاتِ اللهِ إِلَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ ❁ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُوْلِهِمْ لِيَأْخُذُوْهُ وَجَادَلُوْا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوْا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ❁

"তাদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায় মিথ্যারোপ করেছিল আর তাদের পর অন্য অনেক দল ও প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ পয়গম্বরকে আক্রমণ করার ইচ্ছা করেছিল এবং তারা মিথ্যা বিতর্কে প্রবৃত্ত হয়েছিল, যেন সত্য ধর্মকে ব্যর্থ করে দিতে পারে। এরপর আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম। (সুতরাং দেখো) কেমন ছিল আমার শাস্তি। [সূরা গাফির-৫]

তাদের এসব গোঁড়ামির পিছনে একটি কারণ কাজ করে। তা হল, তাদের অন্তর অহংকারের ভাইরাসে আক্রান্ত। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْ آيَاتِ اللهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللهِ وَعِنْدَ الَّذِيْنَ آمَنُوْا كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلٰى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ❁

"যারা নিজেদের কাছে আগত কোনো দলিল ছাড়াই আল্লাহ তায়ালার আয়াত সম্পর্কে বিতর্ক করে, তাদের এ কাজ আল্লাহ ও মুমিনদের কাছে খুব অসন্তোষজনক। এভাবেই আল্লাহ প্রত্যেক অহঙ্কারী-স্বৈরাচারী ব্যক্তির অন্তরে মোহর এঁটে দেন।" [সূরা গাফির-৩৫]

আশ্চর্যের বিষয় হল, এরা নিজে আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর আয়াতসমূহ নিয়ে দলিল-প্রমাণহীন বিতর্কে লিপ্ত হয়ে পড়ে।

তারা দুই ধরনের– (১) নেতৃবৃন্দ, (২) অনুসারীবৃন্দ।

অনুসারীবৃন্দের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيْدٍ ❁
كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيْهِ إِلٰى عَذَابِ السَّعِيْرِ ❁

"কতক মানুষ অজ্ঞানতাবশত আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ক করে এবং প্রত্যেক অবাধ্য শয়তানের অনুসরণ করে। শয়তান সম্পর্কে লিখে দেওয়া হয়েছে, যে কেউ তার সাথী হবে, সে তাকে বিভ্রান্ত করবে এবং দোযখের আযাবের দিকে পরিচালিত করবে।" (সূরা হজ : ৩-৪)

আর নেতৃস্থানীয়দের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ❖ ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ ❖ ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ❖

"কিছু মানুষ জ্ঞান, প্রমাণ ও উজ্জ্বল কিতাব ছাড়াই আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ক করে। সে পার্শ্ব পরিবর্তন করে বিতর্ক করে, যাতে আল্লাহর পথ থেকে বিভ্রান্ত করে দেয়। তার জন্য দুনিয়াতে লাঞ্ছনা আছে এবং কেয়ামতের দিন আমি তাকে দহন-যন্ত্রণা আস্বাদন করাব। এটা তোমার দুই হাতের কর্মের কারণে, আল্লাহ বান্দাদের প্রতি জুলুম করেন না।" [সূরা হজ : ৮-৯]

তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালার সাহায্য চাওয়ার উপদেশ দেওয়া হচ্ছে,

إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ❖

"নিশ্চয় যারা আল্লাহর আয়াত সম্পর্কে বিতর্ক করে, তাদের কাছে আগত কোনো দলিল ব্যতিরেকে, তাদের অন্তরে আছে শুধু আত্মম্ভরিতা, যা অর্জনে তারা সফল হবে না। কাজেই আপনি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় তিনি সবকিছু শুনেন, সবকিছু দেখেন।" [সূরা গাফির : ৫৫-৫৬]

**২. অপবাদের রাস্তা অবলম্বন**

তর্ক-বিতর্কে যখন তারা হেরে যায়, তখন তারা ইসলামের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অপবাদের রাস্তা বেছে নেয়। যেমন– ব্যাপক বিষয়কে বিশেষ করে দেখিয়ে মিথ্যা অপবাদ দেওয়া, বিশেষ বিষয়কে ব্যাপক করে দেখিয়ে মিথ্যা অপবাদ দেওয়া, কোনো সত্য কথা গোপন করে দিয়ে মিথ্যা অপবাদ দেওয়া ইত্যাদি।

আল্লাহ তায়ালা বলেন–

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللهِ أَنَّى يُصْرَفُونَ ❖ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ❖ إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ ❖ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ❖ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ ❖ مِنْ دُونِ اللهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُو مِنْ قَبْلُ شَيْئًا كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللهُ الْكَافِرِينَ ❖

"যারা কিতাবের প্রতি ও যে বিষয় দিয়ে আমি নবীগণকে প্রেরণ করেছি, সে বিষয়ের প্রতি মিথ্যারোপ করে। তাই শীঘ্রই তারা জানতে পারবে। যখন

ডাণ্ডাবেড়ি ও শিকল তাদের গলদেশে পড়বে। তাদেরকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে; ফুটন্ত পানিতে। এরপর তাদেরকে আগুনে জ্বালানো হবে। এরপর তাদেরকে বলা হবে, কোথায় গেল যাদেরকে তোমরা শরিক করতে; আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত? তারা বলবে, তারা আমাদের কাছ থেকে উধাও হয়ে গেছে; বরং আমরা তো ইতোপূর্বে কোনো কিছুর পূজাই করতাম না। এভাবে আল্লাহ কাফিরদেরকে বিভ্রান্ত করেন।" [সূরা গাফির : ৭০-৭৪]

### ৩. গালাগালের পন্থা অবলম্বন করা

তর্ক-বিতর্ক ও অপবাদের পরেও যখন ইসলামের কোনো ক্ষতি করতে পারে না, তখন তারা গালমন্দের পন্থা অবলম্বন করে। কখনো তারা সত্যের পথে আহবানকারীকে বিনষ্টকারী বলে অপবাদ দেয়। আবার সত্যকে কখনো বাতিল, মিথ্যা কিংবা জাদুমন্ত্র ইত্যাদি বলে গালাগাল করতে থাকে। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هٰذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ❖ كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ❖ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ❖

"আমি এ কুরআনে মানুষের জন্য সর্বপ্রকার দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছি। আপনি যদি তাদের কাছে কোনো নিদর্শন উপস্থিত করেন, তবে কাফিররা অবশ্যই বলবে—তোমরা সবাই মিথ্যাপন্থি। এমনিভাবে আল্লাহ জ্ঞানহীনদের হৃদয় মোহরাঙ্কিত করে দেন। সুতরাং আপনি সবর করুন। আল্লাহর ওয়াদা সত্য। যারা বিশ্বাসী নয়, তারা যেন আপনাকে বিচলিত করতে না পারে।"

[সূরা রূম : ৫৮-৬০]

এসব ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাধ্যমে সকল দায়ী ও মুমিনদেরকে ধৈর্যধারণ করার পরামর্শও দিয়েছেন উপরিউক্ত আয়াতে।

কাফিররা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মিথ্যুক, জাদুকর, পদ্যকার ও পাগল ইত্যাদি বলে গালি দিত। কুরআনকে তারা জাদু ও পূর্বেকার লোকদের কিচ্ছা-কাহিনী পদ্যবাক্য ইত্যাদি বলে গালি দিত। এ প্রসঙ্গে বহু আয়াত রয়েছে। যেমন–

(১) আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ ❖

"তারা বিস্ময়বোধ করে যে, তাদেরই কাছে তাদের মধ্যে থেকে একজন সতর্ককারী আগমন করেছেন। আর কাফিররা বলে, এ তো এক মিথ্যাচারী জাদুকর।" [সূরা ছাদ-৪]

(২) আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন–

وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ ۞ وَقَالُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ۞

"তারা যখন কোনো নিদর্শন দেখে তখন বিদ্রুপ করে। এবং বলে, কিছুই নয়, এটা তো স্পষ্ট জাদু।" [সূরা ছাফফাত : ১৪-১৫]

(৩) আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন–

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ۞

"আর কাফিরদের কাছে যখন সত্য আগমন করে, তখন তারা বলে, এটা তো এক সুস্পষ্ট জাদু।" [সূরা সাবা-৪৩]

(৪) আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন–

وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ۞

"আর যদি আপনি তাদের বলেন, নিশ্চয় তোমাদেরকে মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করা হবে, তা হলে অবশ্যই কাফিররা বলবে—এটা তো নিছক এক সুস্পষ্ট জাদু।" [সূরা হূদ-৭]

(৫) আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন–

وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ
لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ

"যদি আমি কাগজে লিখিত কোনো বিষয় তাদের প্রতি অবতীর্ণ করতাম, এরপর তারা তা সহস্তে স্পর্শ করত, তবু অবিশ্বাসীরা একথাই বলত যে, এটা প্রকাশ্য জাদু বৈ কিছু নয়।" [সূরা আনয়াম-৭]

(৬) আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন–

وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ۞ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۞ مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنْظَرِينَ ۞

"তারা বলল– হে ওই ব্যক্তি, যার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে, আপনি তো একজন উন্মাদ। যদি আপনি সত্যবাদী হন, তবে কেন আমাদের নিকট ফিরিশতাদেরকে আনেন না? আমি ফিরিশতাদেরকে নিছক ফায়সালার জন্যই অবতীর্ণ করি। তখন তাদেরকে অবকাশ দেওয়া হবে না। [সূরা হিজর : ৬-৮]

(৭) আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন–

وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ ۞
لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ ۞

"যদি আমি ওদের সামনে আকাশের কোনো দরজাও খুলে দিই আর তাতে ওরা দিনভর আরোহণও করতে থাকে; তথাপি ওরা একথাই বলবে যে, আমাদের দৃষ্টির বিভ্রাট ঘটানো হয় নি বরং আমরা জাদুগ্রস্ত হয়েপড়েছি।"
[সূরা হিজর : ১৪-১৫]

(৮) আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন–

كَذٰلِكَ مَا أَتَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُوْلٍ إِلَّا قَالُوْا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُوْنٌ ❖

"এভাবে তাদের পূর্ববর্তীদের কাছে যখনই কোনো রাসূল আগমন করেছে, তারা বলছে—জাদুকর, নাহয় উন্মাদ।" [সূরা যারিয়াত-৫২]

**৪. জঙ্গিবাদী পন্থা অবলম্বন করা**

সত্যকে প্রতিহত করার জন্য বিস্ময়কর একটি পদ্ধতি হলো দাঙ্গাবাজি ও জঙ্গিবাদী পন্থা অবলম্বন। অর্থাৎ যখন কুরআনের সামনে তাদের প্রমাণগুলো ছাইয়ের মতো উড়ে গেল, মানুষের অন্তরে কুরআনের ভালবাসা তারা আশ্চর্য হয়ে অবলোকন করল, তখন তারা দাঙ্গা-হাঙ্গামার পন্থা অবলম্বন করে নিল। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَسْمَعُوْا لِهٰذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُوْنَ ❖

"আর কাফিররা বলে, তোমরা এ কুরআন শ্রবণ করো না; এর আবৃত্তিতে হট্টগোল সৃষ্টি করো। যাতে তোমরা জয়ী হও।" [সূরা হামীম আস্ সাজদা-২৬]

আর সত্যের শান তো এটা নয় যে, দাঙ্গাকে দাঙ্গা দিয়ে প্রতিহত করবে। এজন্য আল্লাহ তায়ালা তাদের থেকে বিমুখতা প্রকাশ করে ঘোষণা দিচ্ছেন :

فَلَنُذِيْقَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَذَابًا شَدِيْدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِيْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ❖ ذٰلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللهِ النَّارُ. لَهُمْ فِيْهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوْا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُوْنَ ❖

"আমি অবশ্যই কাফিরদেরকে কঠিন আজাব আস্বাদন করাব এবং আমি অবশ্যই তাদেরকে তাদের মন্দ ও হীন কাজের প্রতিফল দিব। এটা আল্লাহর শত্রুদের শাস্তিজাহান্নাম। তাতে তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী আবাস, আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করার প্রতিফলস্বরূপ।" [সূরা হামীম আস্ সাজদা : ২৭-২৮]

আল্লাহ তায়ালা আরো ইরশাদ করেন–

يُرِيْدُوْنَ لِيُطْفِئُوْا نُوْرَ اللهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللهُ مُتِمُّ نُوْرِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ ❖

"তারা মুখের ফুঁৎকারে আল্লাহর আলো নিভিয়ে দিতে চায়। আল্লাহ তাঁর আলোকে পূর্ণরূপে বিকশিত করবেন, যদিও কাফিররা তা অপছন্দ করে।"
[সূরা আছ্ছাফ-৮]

অর্থাৎ তাদের এসব অযথা বিতর্ক, মিথ্যা অপবাদ আরোপ, ইসলাম এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে মিথ্যা গালাগালি করা কিংবা দাঙ্গাবাজির পন্থা অবলম্বন কোনো কাজে আসবে না বরং আল্লাহ তায়ালার নূর তথা দীনকে পরিপূর্ণ করে দিবেন। আল্লাহ তায়ালা আমাদের ঈমান পরিপূর্ণ করে দিন।

[ছুরাউন মাআল মালাহিদাতি হাত্তাল আজম/শামেলা]

**নাস্তিকের শাস্তি**

নাস্তিকরা দুই ধরনের হয়ে থাকে– (১) যারা পূর্ব থেকেই নাস্তিক। (২) যারা কোনো ধর্ম থেকে নাস্তিক হয়েছে। অর্থাৎ তারা কিংবা তাদের পিতামাতা যে কোনো ধর্মের অনুসরণ করত; কিন্তু পরবর্তীসময়ে তারা নাস্তিক হয়ে গেছে।

দ্বিতীয় প্রকারের নাস্তিক আবার দুই প্রকারের হতে পারে– (১) যারা ইসলাম ধর্ম থেকে নাস্তিক হয়েছে। (২) যারা অন্য ধর্ম থেকে নাস্তিক হয়েছে।

যারা ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে নাস্তিক হয়, তাদেরকে ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় মুরতাদ বলা হয়। মুরতাদের শাস্তির বিষয়ে আমার উস্তাদ হযরত শাইখুল হাদিস আল্লামা আজিজুল হক রহ.-এর রচিত একটি প্রবন্ধ মাসিক রহমানি পয়গাম, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। নিম্নে সে প্রবন্ধটি হুবহু উদ্ধৃত করা হচ্ছে :

## মুরতাদ ও তার শাস্তি

—শাইখুল হাদিস আল্লামা আজিজুল হক রহ.

দীন ইসলাম পরিত্যাগকারীকে বলা হয় মুরতাদ। চাই সরাসরি পরিত্যাগ করা হোক বা এমন কোনো আকিদা-বিশ্বাস অবলম্বন করা হোক বা এমন কোনো কাজ কিংবা উক্তি করা হোক, যার দ্বারা দীন ইসলামের স্বীকৃতি ভঙ্গ হয়ে যায়। যেমন : কুরআন-হাদিসের অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত কোনো আকিদাকে প্রত্যাখ্যান করা বা অনুরূপ কোনো আকিদার বিপরীত আকিদা অবলম্বন করা, কুরআন বা হাদিসের অকাট্য প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত শরিয়তের কোনো হুকুমকে অস্বীকার করা বা অবজ্ঞা করা। এভাবে শরিয়তের কোনো হুকুম নিয়ে বিদ্রুপ করা, হালালকে হারাম বা হারামকে হালাল বলে আখ্যায়িত করা, দীন ইসলামের মৌলিক বিষয়সমূহ—যেমন : আল্লাহ তায়ালা, আল্লাহর কুরআন কিংবা আল্লাহর রাসূল সম্পর্কে অপমানজনক ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যজনক, উপেক্ষা ও অবজ্ঞাজনক বা বিদ্রুপাত্মক উক্তি করা, হযরত মুহাম্মদ ﷺ-কে সর্বশেষ নবী গণ্য না করা অথবা এমন কোনো কাজ করা অথবা যা একমাত্র কাফিররাই করে থাকে কিংবা একমাত্র তাদের পক্ষেই সেটা করা সম্ভব হতে পারে। যথা, দেব-দেবীকে সাজ্‌দা করা, পবিত্র কুরআনকে

পায়খানায় নিক্ষেপ করা ইত্যাদি। এসব ক্ষেত্রে অন্তরের আকিদা সহিহ থাকলেও বিনা ওজরে কেউ এরূপ কাজ করলে বা এরূপ উক্তি করলে সে কাফির ও মুরতাদ হয়ে যাবে। এমনকি বিনা ওজরে হাসি-ঠাট্টারূপে এরূপ কাজ করলেও উপরিউক্ত হুকুমই বলবৎ করা হবে বলে ইমামগণ মতপ্রকাশ করেছেন। এ বিষয়ে সতর্ক থাকা আবশ্যক। অবশ্য যদি অন্তরে সহিহ ও সুদৃঢ় ঈমান রেখে কেবল বাহ্যত তা করে ফেলে, তা হলে আল্লাহ তায়ালা তার অন্তরের অবস্থাকে কবুল করে বাহ্যিক অপরাধটুকু ক্ষমা করে দিবেন।

**মুরতাদের সমুদয় নেক আমল বিনষ্ট হয়ে যায়**

এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন–

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ❁

'মুসলমানদের মধ্য হতে যারা ধর্মচ্যুত হবে এবং কুফর অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, তাদের সমুদয় আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে। দুনিয়ার দিক দিয়েও আর পরকালের দিক দিয়েও এবং তারা হবে জাহান্নামি। চিরকাল তারা সেখানেই থাকবে।' [সূরা বাকারা-২১৭]

**ব্যাখ্যা :** দুনিয়ার দিক দিয়ে আমল বিনষ্ট হওয়ার অর্থ হল– সে দীর্ঘদিন মুসলমান নেক আমলকারী থাকা সত্ত্বেও মুরতাদ হওয়ার কারণে, তার জানাযা পড়া হবে না, মুসলমানদের কবরস্থানে তাকে দাফন করা যাবে না, মুরতাদ সাব্যস্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার মুসলমান স্ত্রীর সাথে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাবে, তার সকল ধন-সম্পত্তি ওয়ারিশদের মাঝে বণ্টন করে দেওয়া হবে। তাকে হত্যা করা হলে এর কোনো বিচার হবে না ইত্যাদি।

আর আখিরাতের দিক দিয়ে আমল বিনষ্ট হওয়ার অর্থ হল– সারা জীবন কোটি কোটি নেক আমল করে থাকলেও এর জন্য বিন্দুমাত্র ছওয়াব সে পাবে না এবং সাধারণ কাফিরদের মতো চিরজাহান্নামি হবে।

আল্লাহ তায়ালা আরো ইরশাদ করেছেন–

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ❁

"যারা ঈমান গ্রহণের পর আল্লাহর সঙ্গে কুফরি করবে, ওই লোক ব্যতীত যে অপারগ হয়ে বাহ্যত তা করেছে; কিন্তু তার অন্তর সুদৃঢ় রয়েছে ঈমানের ওপর; অবশ্য যারা খোলা মনে কুফরি অবলম্বন করেছে, তাদের ওপর আল্লাহ তায়ালার গজব এবং তাদের জন্য ভীষণ আজাব নির্ধারিত রয়েছে।"

[সূরা নাহল-১০৬]

কুরআন মাজিদের অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে,

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ۞

"যারা একবার মুসলমান হয়ে পরে পুনরায় কাফির হয়ে গেছে, আবার মুসলমান হয়েছে এবং আবারো কাফির হয়েছে এবং কুফরিতেই উন্নতি লাভ করেছে, আল্লাহ তাদেরকে না কখনো ক্ষমা করবেন; না (তাদের নাজাতের জন্য কোনো) পথ প্রদর্শন করবেন।" [সূরা নিসা-১৩৭]

**মুরতাদকে হত্যা করা হবে**

মুরতাদ সম্পর্কে শরিয়তের বিধান হল—তাকে পুনরায় ইসলাম গ্রহণের লক্ষ্যে তিনদিন অবকাশ দেওয়া হবে এবং আবদ্ধ রেখে ইসলামের জন্য বুঝ-প্রবোধ দেওয়া হবে। যদি ইসলামে প্রত্যাবর্তন না করে, তখন পুরুষ হলে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে; নারী হলে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে না বরং ইসলামে প্রত্যাবর্তন করা পর্যন্ত কারারুদ্ধ অবস্থায় রেখে শাস্তি দিয়ে ইসলাম গ্রহণের জন্য বাধ্য করা হবে। [ফাতাওয়া শামী-৩]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. এবং ইমাম যুহ্‌রি রহ.-এর মতে নারী মুরতাদকেও প্রাণদণ্ড দেওয়া হবে। জোরপূর্বক কোনো কাফিরকে মুসলমান করার রীতি ইসলামে নেই; কিন্তু মুসলমানকে কাফির হয়ে যাওয়ার সুযোগ কিছুতেই দেওয়া হবে না; কঠোরহস্তে তা দমন করতে হবে। এটা সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য স্বাভাবিক আইন। সুতরাং মুরতাদকে প্রাণদণ্ড দেওয়া যুক্তিসঙ্গতই বটে।

হযরত ইকরামা রাযি. বর্ণনা করেছেন, খলিফা হযরত আলী রাযি.-এর নিকট একদল লোককে উপস্থিত করা হল, যারা (হযরত আলী রাযি.-কে খোদা বলে) যিন্দিক ও মুরতাদ হয়েছিল। আলী রাযি. তাদেরকে আগুনে পুড়িয়ে ফেলেন। এ সংবাদ অবগত হয়ে হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, আমি শাসনকর্তা হলে তাদেরকে আগুনে পুড়িয়ে মারতাম না। কারণ, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন–

'তোমরা আল্লাহ তায়ালার আজাব তথা আগুনে পোড়ানোর শাস্তি কারো উপর প্রয়োগ করো না। তবে অবশ্যই আমি তাদের হত্যা করতাম। কারণ, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—'যে ব্যক্তি দীন ইসলাম ত্যাগ করবে, তাকে কতল করে ফেলো'।

হযরত আবু হুরাইরা রাযি. হতে বর্ণিত অপর একটি হাদিসে উল্লেখ আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু মূসা ও মুয়ায ইবনে জাবাল রাযি.-কে ইয়ামানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে পাঠালেন। ইয়ামান দুটি এলাকায় বিভক্ত ছিল। (তাই এক এক এলাকার জন্য এক একজনকে নিযুক্ত করেছিলেন)। তারা উভয়ে নিজ নিজ এলাকার দায়িত্বে চলে গেলেন। তাদের রীতি ছিল, একে অপরের এলাকার নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় অবশ্যই পরস্পর দেখা-সাক্ষাৎ ও সালাম কালাম করে যেতেন।

একবার হযরত মুয়ায রাযি. হযরত আবু মূসা রাযি.-এর নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন। তিনি দেখলেন যে, আবু মূসা আশয়ারি রাযি. বসে আছেন। তার সম্মুখে অনেক লোক সমবেত হয়ে আছে। আর এক ব্যক্তির উভয় হাত ঘাড়ের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে। হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল রাযি. হযরত আবু মূসা আশয়ারি রাযি.-কে ওই ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন, এ লোক ইহুদি ছিল। পরে সে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল। এখন সে ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে পুনরায় ইহুদি (মুরতাদ) হয়ে গেছে। তাকে প্রাণদণ্ড দেওয়ার জন্যই বন্দি করে এখানে আনা হয়েছে। আপনি অবতরণ করুন। হযরত মুয়ায রাযি. বললেন, প্রথমে তার প্রাণদণ্ড কার্যকর করুন! তারপর আমি অবতরণ করব। হযরত আবু মূসা আশয়ারি রাযি. প্রাণদ-ের হুকুম দিলেন এবং তাকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হল।

[রাহমানি পয়গাম, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮ খ্রি.]

## নাস্তিকের জানাযা ও কাফন-দাফন

### মারকাযুদ্ দাওয়ার ফাতাওয়া

বরাবর,
মুফতি সাহেব
মারকাযুদ দাওয়াহ্ আল-ইসলামিয়া, ঢাকা।

**প্রশ্ন :** আমাদের সমাজে মাঝে মাঝে এমন লোকের কথাও শোনা যায়, যারা নিজেকে ধর্মে অবিশ্বাসী বলে ঘোষণা করেন, কিন্তু লোকগুলো মুসলমান পরিবারের বিধায় এদের মৃত্যুর পর মুসলমানদের মতো এদেরও জানাযা-দাফনের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। এখন আমার জানার বিষয় হচ্ছে—

১. ইসলামের দৃষ্টিতে কাফির, মুশরিক তথা বিধর্মীদের জানাযার বিধান কি?

২. ধর্মে অবিশ্বাসী তথা নাস্তিকের জানাযা পড়া হবে কি-না? কিছু লোককে দেখা যায়, তারা জন্ম নিয়েছে মুসলমানের ঘরে কিন্তু তারা তাদের কথায় ও লেখায় আল্লাহ তায়ালা, রাসূল ﷺ ও শরিয়তের বিধি-বিধানকে কটাক্ষ করে। তাদের জানাযার ব্যাপারে শরিয়তের নির্দেশ কী?

৩. মুসলিম-এলাকায় বসবাসকারী বিধর্মীদেরকে কাদের কবরস্থানে সমাহিত করা হবে? এক্ষেত্রে ধর্মত্যাগী তথা মুরতাদ-নাস্তিক সম্পর্কে ভিন্ন কোনো হুকুম আছে কি-না?

৪. কাফির, মুশরিক, নাস্তিক, মুরতাদদের মৃত্যুর পর আমরা তাদের জন্য দুয়া করতে পারব কি-না? বা আলেম ও ইমাম সাহেবদের দুয়া করতে বলতে পারব কি-না? কোনো মুসলমান এ কাজ করলে তার ব্যাপারে শরিয়তের বিধান কী?

উপর্যুক্ত প্রশ্নগুলোর জবাব আপনাদের মুখপত্র মাসিক আল-কাউসার-এর মাধ্যমে জানাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করছি।

**নিবেদক**
মুহাম্মদ দীন ইসলাম

## উত্তর

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ، وَعَلٰى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ، وَعَلٰى مَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ.

মূল জবাবের পূর্বে কয়েকটি বিষয় বলা দরকার।

**এক.** জানাযা, কাফন ও দাফন হল, মানুষের মৃত্যু পরবর্তী কার্যক্রম। এগুলো বাস্তবায়ন করতে হয় জীবিত লোকদের, মৃতব্যক্তির তখন করণীয় কিছুই থাকে না। এজন্যই শরিয়ত এ সংক্রান্ত নির্দেশগুলো প্রদান করেছে মৃতের আত্মীয়-স্বজন ও নিকটবর্তী স্বধর্মীয় লোকদের।

**দুই.** মানুষের মৃত্যু পরবর্তী তার লাশকেন্দ্রিক কার্যক্রমগুলো পরিচালিত হয় ওই ব্যক্তির মৃত্যুপূর্ব ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী। প্রত্যেক ধর্মে এক্ষেত্রে নিজস্ব বিধি-বিধান আছে। কোনো ধর্মই তার অনুসারীর লাশের উপর অন্য ধর্মের বিধি-বিধান প্রয়োগের অনুমতি দেয় না। যেমনি অনুমতি দেয় না তাদের নিজস্ব গোরস্থান ছাড়া অন্য ধর্মের গোরস্থানে দাফন করার।

**তিন.** ইসলামে জানাযা, কাফন, দাফন ইত্যাদি জীবিত মুসলমানদের উপর মৃতদের হক এবং আবশ্যক পালনীয়—ফরয নির্দেশ। অবশ্য এটি ফরযে কিফায়া। অর্থাৎ কিছুসংখ্যক মুসলমান এ দায়িত্ব পালন করলে অন্যরা দায়িত্বমুক্ত হবেন। যদিও এলাকার সকল লোক ও আত্মীয়স্বজনের সুন্নত দায়িত্ব হচ্ছে মৃতের জানাযা ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ এবং তার স্বজনদেরকে সান্ত্বনা দেওয়া।

**এবার প্রশ্নগুলোর জবাব শুনুন!**

**প্রথম প্রশ্নের জবাব**

জানাযা পড়া হবে একমাত্র মুসলমানের। কাফির, মুশরিক তথা বিধর্মীর জানাযা পড়া হারাম।

**দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাব**

শুধু ওই মৃতের জানাযা পড়তে হবে, যিনি মুসলমান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন। মুসলমান পরিবারের কোনো সদস্য যদি নাস্তিক হয়, যদি সে আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসূলকে অস্বীকার করে বা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন, রাসূলুল্লাহ ﷺ, কুরআন মাজিদ বা শরিয়তের অকাট্য অন্য কোনো বিধি-বিধান নিয়ে কটূক্তি-কটাক্ষ করে, তা হলে সে কাফির; বরং মুসলিম-পরিবারে জন্মগ্রহণকারী বা জীবনের একটি অংশে মুসলমান থেকে পরবর্তীসময়ে অবিশ্বাসী হওয়ায় সে নিকৃষ্টতম কাফির। শরিয়তের পরিভাষায় তাকে বলা হয় 'মুরতাদ।' এদের শাস্তি কাফিরদের চেয়েও বেশি। এ সকল অবিশ্বাসী ও মুরতাদের জানাযায় অংশগ্রহণ করা, তাদের জানাযায় ইমামতি করা সুস্পষ্ট হারাম। এমনকি তাদের নিকটতম মুসলমান আত্মীয়দের জন্যও এদের জানাযা পড়া জায়েয নয়। এভাবে যারা প্রকাশ্যে নিজেদেরকে মুসলমান বলে; কিন্তু বাস্তবে সে কাফির ও অবিশ্বাসী, এরা হল মুনাফিক। আর মুনাফিকের অবিশ্বাসের বিষয়টি যদি প্রকাশ পেয়ে যায়, তবে তার জানাযা পড়ারও সুযোগ নেই।

কাফির-মুশরিক, অবিশ্বাসী নাস্তিক-মুরতাদ তথা অমুসলিমের জানাযার নামায হারাম হওয়ার বিষয়টি শরিয়তের সুস্পষ্ট দলিল দ্বারা প্রমাণিত। কুরআন মাজিদে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَلَا تُصَلِّ عَلٰٓى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ أَبَدًا وَّلَا تَقُمْ عَلٰى قَبْرِهٖ ۖ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَمَاتُوْا وَهُمْ فَاسِقُوْنَ.

"কখনো তাদের কেউ মারা গেলে আপনি তার জানাযা পড়বেন না। (দুয়া-ইস্তিগফার বা দাফন-কাফনের জন্য) তার কবরের পাশে দাঁড়াবেনও না। তারা তো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং নাফরমান অবস্থায় মারা গেছে।" [সূরা তওবা-৮৪, তাফ্সিরে উসমানি, ইসলামিক ফাউন্ডেশন]

তাফ্সিরবিদ ইমাম কুরতুবি রহ. আয়াতটির ব্যাখ্যায় বলেন :

هٰذَا نَصٌّ فِي الْامْتِنَاعِ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى الْكُفَّارِ

"এটি সকল কাফিরের জানাযা নিষিদ্ধ হওয়ার সুস্পষ্ট দলিল।"
[আল-জামি' লিআহকামিল কুরআনিল কারিম-৮/১৪০]

এজন্যই এ বিষয়ে উম্মতের সকল ফকিহ একমত। কোনো মাযহাবেই এ বিষয়ে ভিন্নমত নেই। সুতরাং নিম্নোক্ত কিতাবাদি দেখুন!

**হানাফি ফিকহ :** কিতাবুল আছল-১/৪১১;আল্‌মাবসূত-সারাখ্‌সি-২/৫৪।

**মালিকি মাযহাব :** আল্‌মুদাওয়ানাহ-১/১৬৩; মাওয়াহিবুল জলিল-৩/৭০; আল্‌বয়ান ওয়াত তাহ্‌সিল-২/২৭৭।

**শাফিয়ি মাযহাব :** আল-মাজমূ'-৫/১২০ ও ২১৮; আল্‌বায়ান-৩/৭৯।

**হাম্বলি মাযহাব :** আল্‌মুগ্‌নি-ইবনে কুদামা-৩/৪৬৬; আররওযুল মুরবি-১/৩২৯; আল্‌ফুরূ-১/৫৩৯।

**তৃতীয় প্রশ্নের জবাব**

মৃত ব্যক্তির লাশ তার স্বধর্মীয় লোকদের কবরস্থানে দাফন করতে হবে। ইহুদিকে ইহুদিদের গোরস্থানে, খ্রিষ্টানকে খ্রিষ্টানদের গোরস্থানে এবং অন্য ধর্মের লোকদেরকে তাদের নিজ গোরস্থানে সমাহিত করতে হবে। এক ধর্মের লোককে অন্য ধর্মের গোরস্থানে সমাহিত করা যাবে না। আর মুসলমানদের কবরস্থানে একমাত্র মুসলমানদেরকেই দাফন করতে হবে। কোনো অমুসলিমকে সেখানে দাফন করা যাবে না।

আর মুসলিম পরিবারে বড় হওয়া ধর্মত্যাগী নাস্তিক লোকদের বিধান আলাদা। তাদেরকে কোনো ধর্মের কবরস্থানেই জায়গা দেওয়া যাবে না। বরং আলাদা কোনো জায়গায় গর্ত করে মাটিচাপা দিয়ে দিবে।

অমুসলিমের জানাযা নিষিদ্ধের বিধানের মতো এ বিধানেও উম্মতের ঐকমত্য রয়েছে। সুতরাং ফকিহ ইবনে নুজাইম মিসরি বলেন–

وَإِذَا مَاتَ أَوْ قُتِلَ عَلَى رِدَّتِهِ لَمْ يُدْفَنْ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ،
وَلَا أَهْلِ مِلَّتِهِ، وَإِنَّمَا يُلْقَى فِي حُفْرَةٍ كَالْكَلْبِ.

"যদি কোনো ব্যক্তি মুরতাদ অবস্থায় মারা যায় বা নিহত হয়, তবে তাকে মুসলমানদের কবরস্থানে দাফন করা যাবে না এবং ইসলাম ত্যাগ করে যে ধর্ম সে গ্রহণ করেছিল, ওই ধর্মের কবরস্থানেও নয় বরং কোনো গর্তের মধ্যে নিক্ষেপ করে তাকে মাটিচাপা দেওয়া হবে।" [আল-আশবাহ -২/১৯৫]

আদ্দুররুল মুখতার ও তার ভাষ্য ফাতওয়া শামীসহ প্রায় সকল ফিকহের কিতাবে এ মাসআলা রয়েছে।

একই কথা বলেছেন মালিকি মাযহাবের বিখ্যাত ফকিহ ও মুফাসসির কাজি আবু বকর ইবনুল আরাবি। [আহকামুল কুরআন/আবু বকর ইবনুল আরাবি-২/৮০২]

শাফিয়ি ফকিহ ও প্রখ্যাত হাদিস বিশারদ ইমাম নববি রহ. বলেন–

اِتَّفَقَ أَصْحَابُنَا رَحِمَهُمُ اللهُ عَلَى أَنَّهُ لَا يُدْفَنُ مُسْلِمٌ فِي مَقْبَرَةِ كُفَّارٍ وَلَا كَافِرٌ فِي مَقْبَرَةِ مُسْلِمِيْنَ.

"এ ব্যাপারে ফকিহগণ একমত যে, কোনো মুসলমানকে কাফিরদের গোরস্থানে এবং কোনো কাফিরকে মুসলমানদের কবরস্থানে দাফন করা যাবে না।" [শরহুল মুহায্যাব-৫/২৪৮]

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. মুসলমানদের কবরস্থানে অমুসলিম, অবিশ্বাসী ও মুরতাদকে সমাহিত না করার তাৎপর্য বর্ণনা করত: বলেন : لِئَلَّا يَتَأَذَّوْا بِعَذَابِهَا অর্থাৎ মুসলমান মাইয়্যেতগণের আত্মাসমূহ যেন কাফির-মুরতাদদের শাস্তির কারণে কষ্ট অনুভব না করে। [আল্‌মুগ্‌নি-ইবনে কুদামা-৩/৫১৩]

কুয়েত থেকে প্রকাশিত ফিক্‌হি বিশ্বকোষ 'আলমাওসূয়াতুল ফিকহিয়্যা'-২১/১৯-এর মধ্যে কাফির ও মুরতাদের দাফন সংক্রান্ত মাসআলার ক্ষেত্রে সকল ফকিহের ঐকমত্য সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

**চতুর্থ প্রশ্নের জবাব**

যে ব্যক্তি ঈমান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে, একমাত্র তার জন্যই দুয়া করা যাবে। এ ছাড়া অন্য কোনো ধর্মের অনুসারী কিংবা অবিশ্বাসী-মুরতাদদের জন্য কোনোক্রমে দুয়া করা যাবে না, অন্য কাউকে দুয়া করতে অনুরোধও করা যাবে না। এটা সুস্পষ্ট হারাম। মহান আল্লাহ কুরআন মাজিদের বিভিন্ন আয়াতে তার নবীদেরকে কাফির-মুশরিকদের জন্য দুয়া-ইস্তিগফার করতে সুস্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করেছেন। এমনকি ওই মৃত কাফির যদিও নবীর পিতা বা পুত্র হয়। [সূরা তওবা-৮০, ১১৩ ও ১১৪; সূরা হুদ : ৪৫-৪৭]

মুসলিম উম্মাহর কোনো ফকিহ বা আলেমের এ বিষয়ে ভিন্নমত নেই। [আল্‌মাজমূ-৫/১২০]

সুতরাং কোনোক্রমেই কাফির, মুশরিক বা বেদীন মুরতাদের জন্য দুয়া করা বা দুয়ার জন্য অনুরোধ করা যাবে না। এমন দুয়া কবুলের কোনো সম্ভাবনা তো নেই বরং দুয়াকারী ও তাকে অনুরোধকারী হারাম কাজ করার গুনাহে লিপ্ত হবে। কেউ যদি না জেনে বা না বুঝে এমনটি করে ফেলে, তবে অবিলম্বে আল্লাহ তায়ালার দরবারে তওবা-ইস্তিগফার করে নিবে।

**যৌক্তিক দলিল**

শরিয়তের হুকুম-আহকাম নির্ধারিত হয় কুরআন-সুন্নাহ এবং এ দুটির ভাষ্য ফিকহের দ্বারা। তাই এখানে যুক্তির প্রয়োজন হয় না। তবে আলোচ্য বিষয়গুলো যদি সাধারণ যুক্তিতে দেখা হয়, তবুও বিধর্মী ও অবিশ্বাসী নাস্তিক-মুরতাদদেরকে মুসলমানদের কবরস্থানে দাফন করা, তাদের জানাযা পড়া, তাদের জন্য দুয়া করা অন্যায় এবং অযৌক্তিক হওয়াই পরিষ্কার হয়ে উঠে। কেননা জীবদ্দশায় তারা যা ঘৃণা করত, অবিশ্বাস করত বা যা নিয়ে কটাক্ষ করত, সে বিষয়গুলো মরণের পর তাদের উপর আরোপ করা দুনিয়াবি দৃষ্টিতেও অন্যায়ই বটে। সাধারণ যুক্তিতে এটি তো তার 'বিশ্বাসে'র অবমাননা বৈ কিছু নয়।

**মোটকথা :** মুসলমানদের জন্য কোনো বিধর্মী বা অবিশ্বাসী নাস্তিক ও মুরতাদের জানাযা পড়া, তাদেরকে মুসলমানদের কবরস্থানে দাফন করা এবং তাদের জন্য দুয়া করা বা দুয়া করতে বলা সম্পূর্ণ হারাম।

আল্লাহ তায়ালা সকলকে হক কথা বলার ও হক পথে চলার তাওফিক দান করুন। আমিন!

**আবুল হাসান মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ**
মুফতি, ফতওয়া বিভাগ
মারকাযুদ দাওয়াহ আল-ইসলামিয়া, ঢাকা।
৩০/১২ পল্লবী, ঢাকা-১২১৬

তারিখ : ১৪/০৪/১৪৩৪ হি., ২৫/০২/২০১৩ খ্রি.
মাসিক আল-কাউসার, জুমাদাল উলা ১৪৩৪; মার্চ ২০১৩ খ্রি.



# দ্বিতীয় অধ্যায় : আমি সেক্যুলার নই

সেক্যুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতা নাস্তিকতার সিঁড়ি। নাস্তিকতা থেকে বাঁচতে হলে যে কয়েকটি বিষয় থেকে বাঁচতে হয়, তন্মধ্যে অন্যতম একটি হলো সেক্যুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতা। প্রকৃত মুসলিম হতে হলে একজন মানুষকে অবশ্যই ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ থেকে বাঁচতে হবে ও ফিরে আসতে হবে। এ ধর্মনিরপেক্ষতা বা সেক্যুলারিজম সম্পর্কেও আমাদের সম্যক ধারণা থাকা উচিত। নিম্নে সেক্যুলারিজম সম্পর্কে কিঞ্চিত আলোচনা করা হচ্ছে।

## ধর্মনিরপেক্ষতার আভিধানিক সংজ্ঞা

ইংরেজি Secularism শব্দের বাংলারূপ হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষতা। আরবিতে যাকে বলা হয় 'আল-ইলমানিয়্যাহ'।

বাংলা একাডেমি প্রণীত ইংলিশ-বাংলা ডিকশনারী [জিল্লুর রহমান ছিদ্দিকি সাহেবের সম্পাদনায় ২০১২ সনের সংস্করণ)-এ লিখা আছে, Secular অর্থ– পার্থিব, ইহজাগতিক, জড়, জাগতিক।

Secular State 'গির্জার সঙ্গে বৈপরিত্যক্রমে রাষ্ট্র'। সে হিসেবে মুসলিম দেশে এর ব্যাখ্যা হবে, মসজিদের সঙ্গে বৈপরিত্যক্রমে রাষ্ট্র।

Secularism মানে নৈতিকতা ও শিক্ষা ধর্মকেন্দ্রিক হওয়া উচিত নয়—এ মতবাদ। জাগতিকতা, ইহবাদ।

অক্সফোর্ড ইংরেজি-উর্দু অভিধানে লিখা আছে, Secularism অর্থ لَا دِيْنِيَّةَ لَا مَذْهَبِيَّةَ (ধর্মহীনতা)। আর সেক্যুলারিজম যে বাস্তবিকই একটি ধর্মহীনতা (لَا دِيْنِيَّةَ لَا مَذْهَبِيَّةَ), এতে কারো মধ্যে কোনো মতভেদ দেখা যায় না।

উইকিপিডিয়ার তথ্য মতে 'নিরপেক্ষ' শব্দের অর্থ কোনো পক্ষে নয়। 'ধর্ম-নিরপেক্ষ' অর্থ, কোনো ধর্মের পক্ষে নয় তথা সমস্ত ধর্মের সাথে সম্পর্কহীন।

## ধর্মনিরপেক্ষতার পারিভাষিক সংজ্ঞা

পরিভাষায় ধর্মনিরপেক্ষতা এমন একটি মতবাদ, যে মতবাদ মনে করে—ধর্ম শুধু ব্যক্তি জীবনে সীমাবদ্ধ থাকবে। সমাজনীতি, রাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি ও শিক্ষানীতি প্রভৃতি ধর্মীয় শাসন থেকে মুক্ত থাকা উচিত। এককথায় ধর্ম যার যার, রাষ্ট্র সবার। (নাউযুবিল্লাহ!)

অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবন থেকে ধর্মকে বিচ্ছিন্ন করে রাখবে। ধর্ম ব্যক্তির অন্তরের খাঁচায় বন্দি থাকবে। ধর্মের পরিধি ব্যক্তি ও তার উপাস্যের সম্পর্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। ধর্মকে প্রকাশ করার কোনো সুযোগ থাকলে সেটা শুধু উপাসনায়, বিবাহ ও মৃত্যু সংক্রান্ত কার্যাবলিতে।

**ধর্মনিরপেক্ষতার গোড়ার কথা**

এ মতবাদটি সপ্তদশ শতাব্দিতে ইউরোপে আত্মপ্রকাশ করে এবং ঊনবিংশ শতাব্দির শুরুর দিকে এটি প্রাচ্যে প্রসারিত হয়। প্রথমদিকে মিসর, তুরস্ক, ইরান, লেবানন, সিরিয়াতে প্রসার লাভ করে। ধীরে ধীরে তিউনিশিয়াতে এবং ঊনবিংশ শতাব্দির শেষদিকে ইরাকে প্রসারিত হয়। এ ছাড়া বিংশ শতাব্দিতে এসে অন্যান্য আরব দেশগুলোতেও বিস্তার লাভ করে।

খ্রিষ্টান রাজ্যগুলোতে এক্লিরোস, বৈরাগ্যবাদ, ঐশ্বরিক নৈশভোজ (Holy Communion), ক্ষমাপত্র (Indulgence) বিক্রয় ইত্যাদির আড়ালে ধর্মীয় ব্যক্তিত্বগণ তাগুতি শক্তি, পেশাদার রাজনীতিবিদ ও স্বৈরাচারে পরিণত হয়। সেসময় গির্জাগুলোর বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে অবস্থান, মানুষের চিন্তাধারার উপর গির্জার একচ্ছত্র আধিপত্য, গির্জা কর্তৃক Inquisition কোর্ট গঠন করা এবং বিজ্ঞানীদেরকে ধর্মদ্রোহী হিসেবে অভিযুক্তকরণসহ বিজ্ঞানীদের উপর চলছিল নানা জুলুম-নির্যাতন। যেমন—

**কোপার্নিকাস (Copernicus) :** ১৫৪৩ ইং 'আকাশে গ্রহ-নক্ষত্রের আবর্তন' নামে একটি বই প্রকাশ করেন। গির্জা কর্তৃক বইটি নিষিদ্ধ করা হয়।

**গ্যালিলিও (Galileo) :** টেলিস্কোপ আবিষ্কার করার কারণে ৭০ বছর বয়সী এ বিজ্ঞানীর ওপর কঠোর নির্যাতন নেমে আসে। ১৬৪২ সালে তিনি মারা যান।

**স্পিনোজা (Spinoza) :** তিনি ইতিহাস সমালোচনার প্রবক্তা ছিলেন। তার শেষ পরিণতি হয়েছিল তরবারির আঘাতে মৃত্যুদণ্ড।

**জন লক (John Lock) :** তিনি দাবি উত্থাপন করেছিলেন, স্ববিরোধিতা পাওয়া গেলে ঐশীবাণীর বিপক্ষে বিবেকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

**বিবেকবুদ্ধি ও প্রকৃতি নীতির উদ্ভব :** ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তিবর্গ বিবেকের মুক্তির দাবি তোলেন এবং প্রকৃতিকে উপাস্যের বিশেষণে বিশেষিত করার দাবি জানান।

**ফরাসি বিপ্লব :** গির্জা ও নতুন এ আন্দোলনের মাঝে দ্বন্দ্বের ফলে ১৭৮৯ সালে ফ্রান্সে একটি সরকার গঠিত হয়। জনগণের শাসনের নামে এটাই ছিল প্রথম ধর্মনিরপেক্ষ সরকার।

এ বিপ্লবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কতিপয় ব্যক্তিত্ব ও গ্রন্থ :

১। **জন জাক রুশো** (Jean Jacques Rousseau) মৃত্যু-১৭৭৮ খ্রিষ্টাব্দ। Social Contract নামে তার একটি গ্রন্থ রয়েছে। ফরাসি বিপ্লবের ক্ষেত্রে এ গ্রন্থটি ইঞ্জিলের মর্যাদায় ছিল। (বইটি 'সামাজিক চুক্তি' নামে ননীমাধব চৌধুরী অনুবাদ করেছেন।)

২। **স্পিনোজা** (Spinoza)। সে ইহুদি ধর্মাবলম্বী; তাকে ধর্মনিরপেক্ষতার পথিকৃৎ মনে করা হয়। এ পণ্ডিত ধর্মনিরপেক্ষতাকে জীবন ও আচার আচরণের পদ্ধতি হিসেবে উপস্থাপন করেছে। ইশ্বরতত্ত্ব ও রাজনীতি নিয়ে তার রচিত একটি পুস্তিকা রয়েছে।

৩। **ভলটেয়ার** (Voltaire)। ওনি প্রাকৃতিক আইনের প্রবক্তা। তার রচিত বইয়ের নাম 'বিবেকের গি-তে ধর্ম' (১৮০৪ খ্রি.)।

৪। **উইলিয়াম গডউইন** (William Godwin) (১৭৯৩ খ্রি.)। তার রচিত বইয়ের নাম Political Justice (রাজনৈতিক বিচারক)। এ গ্রন্থে তার ধর্মনিরপেক্ষতার দিকে আহবান সুস্পষ্ট।

৫। **মিরাবোঁ** (Mirabeau)। তাকে ফরাসি বিপ্লবের প্রবক্তা, নেতা এবং দার্শনিক হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

**সেক্যুলারিজমের উত্থানে ধর্মবিদ্ধেষী মতবাদের ভূমিকা**

সেক্যুলারিজমের উত্থানে বেশ কিছু ধর্মবিমুখ-ধর্মবিদ্বেষী মতবাদের ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে। নিম্নে কয়েকটি মতবাদের উল্লেখ করা হলো :

**বিবর্তনবাদ :** ১৮৫৯ সালে ডারউইন (Charles Darwin) এর বই The Origin of Species (প্রজাতির উৎপত্তি, অধ্যাপক মুহা. আখতারুজ্জামান অনূদিত হয়ে) প্রকাশিত হয়েছে। এ গ্রন্থে ডারউইন প্রাকৃতিক নির্বাচন (Natural Selection) এবং বংশগতি তত্ত্বের উপর গুরুত্বারোপ করেন। মানুষের আসল পূর্বপুরুষ হিসেবে একটি অণুজীবকে চিহ্নিত করা হয়। যে অণুজীবটি মিলিয়ন মিলিয়ন বছর একটি বন্ধ ডোবাতে ছিল। বিবর্তনের ফলে এটি একপর্যায়ে বানর এবং শেষ পর্যায়ে মানুষে পরিবর্তিত হয়। বিবর্তনবাদ ধর্মীয় বিশ্বাসকে উচ্ছেদ করে নাস্তিকতার বিস্তার ঘটায়। ইহুদিরা সুকৌশলে এ মতবাদ ব্যবহার করে তাদের স্বার্থ উদ্ধার করে।

**নিতশার** (Nietzsche) **দর্শন :** দার্শনিক নিতশা দাবি করেন, ঈশ্বরের মৃত্যু হয়েছে। মানুষ হচ্ছে সুপারম্যান। মানুষকে ঈশ্বরের স্থলাভিষিক্ত হওয়া উচিত।

**দুর্খিম দর্শন :** এ ইহুদি সামষ্টিক বিবেক (Group mind) তত্ত্বের ভিত্তিতে মানুষকে জন্তু ও বস্তু সত্তার সম্মিলিত রূপ বলে অভিমত প্রকাশ করেন।

**ফ্রয়েড [Freud]-এর দর্শন :** তিনি বস্তুজগতের সবকিছুতে যৌনবাসনাকে মূল প্রেরণা মনে করেন। তার দৃষ্টিতে মানুষ নিছক যৌনাকাঙ্ক্ষী প্রাণী।

**কার্ল মার্ক্স (Karl Marx)-এর দর্শন :** এ ইহুদি বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ইতিহাসকে ব্যাখ্যা করেন। মার্ক্স 'অনিবার্য বিবর্তন'তত্ত্বে বিশ্বাস করতেন। তিনি সমাজতন্ত্রের প্রচারক ও প্রথম প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ধর্মকে জাতিসমূহের আফিম বলে আখ্যায়িত করেন।

এ ছাড়া জন-পল সাত্র্য (Jean-Paul Sartre) তার Existentialism গ্রন্থে ও কলিং উইলসন (Colin Wilson) তার The Outsider নামক গ্রন্থে অস্তিত্ববাদ (existentialism) ও নাস্তিক্যবাদের প্রতি আহবান জানান।

**ইসলামি বিশ্বে ধর্মনিরপেক্ষতার অনুপ্রবেশ**

মুসলিম রাষ্ট্রের মধ্যে মুস্তাফা কামাল পাশা আতাতুর্ক (জন্ম- ১৮৮১, মৃত্যু- ১৯৩৮)। ১৯ শতকের শুরুতে ধর্মনিরপেক্ষতাকে একেবারে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছে। মুসলমানদের সর্বশেষ দারুল খিলাফা তুরস্কে বসে ওই লোকটি এ কাজ করেছিল। তার ক্ষমতার মেয়াদকাল ছিল ১৯২৩-১৯৩৮ সাল পর্যন্ত। তখনকার সময়ে সেক্যুলারিজমটা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। ওই ব্যক্তি ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিকে পুঁজি করে কত কি সংঘটিত করেছে, তা ভাবলেও গা শিউরে উঠে।

**তুরস্ক :** ইসলামি খেলাফত বিলুপ্ত হওয়ার পর এবং মুস্তাফা কামাল আতাতুর্ক কর্তৃক সর্বক্ষেত্রে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তারের পর তুরস্ক সেক্যুলারিজমের চাদর গ্রহণ করে। যদিও তারও পূর্ব হতে কিছু কিছু লক্ষণ ও কর্মকাণ্ড দেখা দিয়েছিল।

**মিসর :** নেপোলিয়ান বোনাপার্টের আক্রমণের সঙ্গে মিসরে ধর্মনিরপেক্ষতার অনুপ্রবেশ ঘটে। আল-জিবরিতি তার ইতিহাস গ্রন্থে (মিসরের উপর ফরাসি হামলা ও সংশ্লিষ্ট ঘটনাপ্রবাহ শীর্ষক অংশে) এমনই ইঙ্গিত দিয়েছেন। তিনি তার লেখায় এমন কিছু শব্দ চয়ন করেছেন, যা সেক্যুলারিজম/ ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের অর্থ বহন করে। তিনি অবশ্য এ শব্দটি সরাসরি ব্যবহার করেন নি; সর্বপ্রথম 'ইলমানিয়্যাহ্' তথা আরব বিশ্বের সেক্যুলারিজম পরিভাষাটি ব্যবহার করেছেন কাতারের বাসিন্দা খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী ইলিয়াস; ১৮২৭ সালে প্রকাশিত আরবি-ফরাসি অভিধানে। খিদিভ ইসমাঈল ১৮৮৩ সালে ফ্রান্সের আইন মিসরে প্রবেশ করান। এ খিদিভ পাশ্চাত্য-সংস্কৃতির অন্ধভক্ত ছিলেন। তার স্বপ্ন ছিল মিসরকে ইউরোপের অঙ্গরাজ্যে পরিণত করা।

**ভারত :** ১৭৯১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতবর্ষে ইসলামি আইন (শরিয়া) মোতাবেক শাসনকার্য পরিচালিত হয়েছে। এরপর ইংরেজদের প্ররোচনায় ক্রমান্বয়ে ইসলামি আইন বিলুপ্ত করা শুরু হয়। ঊনবিংশ শতাব্দির মাঝামাঝি সময়ে সম্পূর্ণভাবে ইসলামি আইন বিলুপ্ত করা হয়।

**আলজেরিয়া :** ১৮৩০ সালে ফ্রান্স কর্তৃক উপনিবেশ শাসনের শিকার হওয়ার পর ইসলামি আইন বিলুপ্ত করা হয়।

**তিউনিশিয়া :** ১৯০৬ সালে তিউনিশিয়াতে ফ্রান্সের আইন স্থান করে নেয়।

**মরক্কো :** ১৯১৩ সালে মরক্কোতে ফ্রান্সের আইন অনুপ্রবেশ করে।

**ইরাক ও সিরিয়া :** উসমানি খিলাফত আমলে ইরাক ও সিরিয়া থেকে ইসলামি আইন বিলুপ্ত করে সেখানে ইংরেজ ও ফরাসিদেরকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

**বাংলাদেশ :** আমাদের দেশে ধর্মনিরপেক্ষতা আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হয়েছিল ১৯৭২ সালে। সে বছর ১৯ শে মার্চ ভারত-বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর মাঝে একটি মৈত্রীচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এতে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে বাংলাদেশের উপর ধর্মনিরপেক্ষতাকে চাপিয়ে দেওয়া হয়। সদ্য স্বাধীন হওয়া রাষ্ট্রের নতুন সংবিধানের মূলনীতিতে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। বস্তুত তখনই দেশের জনসাধারণ ও স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুক্তিযোদ্ধারা জানতে পেরেছে, ধর্মনিরপেক্ষতার জন্য এ দেশ স্বাধীন হয়েছে।

মুক্তিযোদ্ধাদের ধর্মীয় পরিচয় যাই হোক, অল্প ধার্মিক বা বেশি ধার্মিক, যুদ্ধের সময় তারা জানতে পারে নি, তারা সেক্যুলারিজম/ ধর্মনিরপেক্ষতার জন্য যুদ্ধ করছে। এটা জেনেছে তারা ১৯৭২ সালের শেষে স্বাধীনতা যুদ্ধের এক বছর পর। সংবিধানে লিখে দেওয়া হয়—'যেসব কারণে আমাদের দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সবাই মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন, তার অন্যতম উদ্দেশ্য ধর্মনিরপেক্ষতা'। এটা সংবিধানে লেখা আছে।

এর আগ পর্যন্ত কেউ বলতে পারবে না যে, আমাদের দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রাম ধর্মনিরপেক্ষতার জন্য হয়েছে। কোনো ঐতিহাসিক দলিলে সেটা নেই। রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও পৌরনীতির বইগুলো পড়লে এর যথার্থতা খুঁজে পাওয়া যাবে। এ ছাড়া স্বাধীনতার পূর্বে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানি জনগণ অনেক আন্দোলন করেছে। শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে অনেক আন্দোলন হয়েছে। ঐতিহাসিক ৬ দফা পেশ হয়েছে। ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান হয়েছে। ৭০-এর ঐতিহাসিক নির্বাচন হয়েছে। এগুলোর কোথাও ধর্মনিরপেক্ষতার নাম-গন্ধও ছিল না। এমনকি

আপনি বর্তমান সময়ের (যখন দীর্ঘদিন থেকে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায়) মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট দেখুন। সেখানেও মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে ধর্মনিরপেক্ষতার কথা পাবেন না।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪ সালের নির্বাচন, ১৯৬৬ সালের ৬ দফা, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান এবং ১৯৭০ সালের নির্বাচনকালের কোনো দফায় ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলা হয়নি। ধর্মনিরপেক্ষতাকে উল্লেখ করা হয়নি ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল গৃহিত মুজিবনগরের ঘোষণাপত্রেও।

[মাসিক আল-কাউসার, ফেব্রুয়ারি-২০১৪]

**ধর্মনিরপেক্ষতার মূলনীতি ও বৈশিষ্ট্য**

ধর্মনিরপেক্ষতা একটি খণ্ডিত মতবাদ। মানুষের জীবন যাপনে সামগ্রিক দিকনির্দেশ না করে এ মতবাদটি একটি মাত্র দিক নিয়ে পর্যালোচনা করে। ফলে এ মতবাদের মাধ্যমে জীবনের সকল দিক ও বিভাগের সমস্যাগুলোর সমাধান করা সম্ভব হয় না। এখানে মতবাদের কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করুন!

১. **বস্তুগত উপায় :** উপাদানের মাধ্যমে উন্নতির প্রচেষ্টা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এ মতবাদ অনুযায়ী একমাত্র বস্তুগত উপায়-উপাদানের মাধ্যমে মানুষ তার চাহিদা পূর্ণভাবে অর্জন করতে পারে।

২. ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের প্রবক্তাদের মতে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান যেমন– পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান ইত্যাদির মতোই মানুষের আচরণ ও সমাজের কল্যাণে যে নীতিমালা ও আইন-কানুনের প্রয়োজন, তা একমাত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অভিজ্ঞতার দ্বারা রচনা করা সম্ভব। এজন্য কোনো ধর্মবিশ্বাস, নবী-রাসূল ও প্রত্যাদেশ ইত্যাদির প্রয়োজন হয় না।

এ ছাড়াও সেক্যুলারিজমের আরো কতগুলো মূলনীতি রয়েছে। যেমন—

(ক) রাষ্ট্র বা রাজনীতির সাথে ধর্ম যুক্ত থাকবে না।

(খ) ধর্ম থাকবে ব্যক্তির একান্ত ব্যক্তিগত জীবনে।

(গ) রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণ ও পরিচালনায় কোনোভাবেই ধর্মকে বিবেচনা করা হবে না।

(ঘ) মুসলিম বিশ্বে ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ইসলামমুক্ত শাসন।

(ঙ) ইসলাম থেকে রাষ্ট্র ও রাজনীতি সম্পূর্ণ পৃথক করা ইত্যাদি।

**ইসলাম ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের মধ্যে পার্থক্য**

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। ধর্মহীনতা ইসলাম কখনো সমর্থন করে না। ধর্মনিরপেক্ষতা বা ধর্মহীনতা ইসলামের বিপরীত ও পরিপন্থি একটি মতবাদ। ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী হলে সে আর মুসলমান থাকে না।

আরেকটু স্পষ্ট করে বলতে হয়, ইসলাম তো বটেই, অন্য কোনো ধর্মও এ মতবাদকে প্রশ্রয় দেয় না। তাই এ মতবাদ শুধু ইসলামের বিপরীত মতবাদই নয় বরং মানব সৃষ্টির পর থেকে অদ্যাবধি আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে প্রদত্ত সকল ধর্মের সাথে সাংঘর্ষিক একটি মতবাদ। স্বধর্ম ত্যাগ করে নাস্তিক্যবাদ গ্রহণের একটি নিশ্চিত সিঁড়ি এ ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ।

আবারো বলি— ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের সাথে ইসলামের সাথে বৈপরিত্যের সম্পর্ক। ধর্মনিরপেক্ষতা ও ইসলামের মাঝে আগুন পানির সম্পর্ক। আগুন ও পানির সহাবস্থান যেমনি অবাস্তব, তেমনি ধর্মনিরপেক্ষতা ও ইসলামের সহাবস্থান একদম অসম্ভব। একজন মুসলিম একই সাথে সেক্যুলার, আবার মুসলিম- হতেই পারে না। এ কথাগুলোর প্রমাণ কুরআন, হাদিস ও বিবেকের দুয়ারে ভুরি ভুরি এবং এত স্পষ্ট যে, তা বর্ণনা করার অপেক্ষা রাখে না।

আজ বিশ্ব মানবতার জন্য এক বড় অভিশাপ হলো ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ। এটি মানবতা বিধ্বংসী এক বিষাক্ত অজগর, যার বিষাক্ত ছোবলে সারা পৃথিবী আজ বিষদগ্ধ। কাজেই এ বিষাক্ত অজগর ও অভিশাপকে প্রতিহত করার জন্য শান্তিকামী সকল মানুষকে একযোগে কাজ করতে হবে।

### ১. ইসলাম পূর্ণাঙ্গ দীন

ইসলাম আল্লাহ তায়ালার মনোনীত পূর্ণাঙ্গ দীন। আকিদা-বিশ্বাস, ইবাদত, সমাজনীতি, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি ও শিক্ষাসহ মানবজীবনের সবকিছু এ ধর্মের ব্যাপকতার আওতাভুক্ত। ইসলাম ব্যক্তি জীবনে সীমাবদ্ধ নয়। যেমন– পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا.

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম এবং তোমাদের উপর আমার নেয়ামত পরিপূর্ণ করলাম। আর তোমাদের জন্য দীন হিসাবে ইসলামকে (চিরতরে) পছন্দ করলাম।" [সূরা মায়িদা-৩]

অন্যত্র আরো ইরশাদ হয়েছে,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا
خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ.

"হে মুমিনগণ! ইসলামে সম্পূর্ণরূপে প্রবেশ করো এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চিত জেনে রাখো! সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।"
[সূরা বাকারা-২০৮]

সুতরাং কুরআন-সুন্নাহে মানবজীবনের সকল বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা ও বিধি-বিধান রয়েছে। ফিকাহ শাস্ত্রে খুটিনাটি সবকিছুর বিস্তারিত আলোচনা আছে। এর কিছু মান্য করা, কিছুকে অস্বীকার করা কুফরি। কুরআন মাজিদে ইরশাদ হয়েছে,

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ❖

তবে কি তোমরা কিতাবের কিয়দাংশে ঈমান রাখ আর কিয়দংশ অস্বীকার কর? তা হলে বলো, যারা এরূপ করে তাদের শাস্তি এ ছাড়া আর কী হতে পারে যে, পার্থিব জীবনে তাদের জন্য থাকবে লাঞ্ছনা। আর কিয়ামতের দিন তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হবে কঠিনতর আজাবের দিকে? তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ তায়ালা সে সম্পর্কে উদাসীন নন।" [সূরা বাকারা-৮৫]

ইসলাম-পূর্ব আসমানি ধর্মগুলো সারা পৃথিবীর জন্য এবং সব যুগের জন্য ছিল না। তাই বর্তমান প্রেক্ষাপটে তাতে জীবনের সব বিষয়ের সমাধান নেই। সেগুলো পূর্ণাঙ্গও নয়। কিন্তু ইসলাম এর ব্যতিক্রম।

## ২. ইসলাম আল্লাহ তায়ালার মনোনীত একমাত্র দীন

ইসলাম আল্লাহ তায়ালার মনোনীত সর্বশেষ দীন। মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন মুক্তি একমাত্র এ ধর্মের মাঝে নিহিত। ইরশাদ হয়েছে,

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ ❖

"নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালার নিকট গ্রহণযোগ্য দীন কেবল ইসলাম।"
[সূরা আলে ইমরান-১৯]

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে :

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ❖

"যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দীন অবলম্বন করতে চাইবে, তার থেকে সে দীন কবুল করা হবে না এবং পরকালে যারা মহা ক্ষতিগ্রস্ত, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে।" [সূরা আলে ইমরান-৮৫]

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন–

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، .... "وَلَوْ كَانَ مُوسَى حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِي"

"... যদি মূসা আ. জীবিত থাকতেন, তা হলে তাঁকেও আমার অনুসরণ করতে হত।" [মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং ১৪৭৩৬]

## ৩. ইসলাম বিশ্বজনীন ধর্ম, সকল মানুষের ধর্ম

আল্লাহ তায়ালা বলেন :

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ ❖

"রমাযান মাস, যে মাসে কুরআন নাযিল করা হয়েছে, বিশ্বমানবের জন্য যা আদ্যোপান্ত হিদায়াত ও এমন সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলি সম্বলিত; যা সঠিক পথ দেখায় এবং সত্য ও মিথ্যার মধ্যে চূড়ান্ত ফয়সালা করে দেয়।" [সূরা বাকার-১৮৫]

আরো ইরশাদ হয়েছে :

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّيْ رَسُوْلُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيْعًا الَّذِيْ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ❖

"আপনি বলুন, হে মানুষ! আমি তোমাদের সকলের প্রতি আল্লহর প্রেরিত রাসূল, যাঁর আয়ত্তে আসমানসমূহ ও পৃথিবীর রাজত্ব।" [সূরা আ'রাফ-১৫৮]

আরো ইরশাদ হয়েছে,

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ ❖

"হে নবী! আমি আপনাকে বিশ্বজগতের জন্য শুধু রহমত করেই পাঠিয়েছি।" [সূরা আম্বিয়া-১০৭]

আরো ইরশাদ হয়েছে,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُوْرِ

وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِيْنَ.

"হে মানুষসকল! তোমাদের কাছে এমন জিনিস এসেছে, যা তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এক উপদেশ, অন্তরের রোগ-ব্যাধির উপশম এবং মুমিনের পক্ষে হিদায়াত ও রহমত।" [সূরা ইউনুস-৫৭]

ইসলাম মানবধর্ম। জাতি-ধর্ম বংশ-বর্ণ নির্বিশেষে সবার প্রতি ন্যায়বিচার, সহমর্মিতা, সৌজন্য আচরণ ও জীবের প্রতি দয়া এ ধর্মের অন্যতম শিক্ষা। কুরআন মাজিদে ইরশাদ হয়েছে :

إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ

إِنَّ اللهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ، إِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ❖

"হে মুসলিমগণ! নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ করেছেন, তোমরা আমানতসমূহ তার উপযুক্ত প্রাপককে পৌঁছে দিবে এবং যখন মানুষের মধ্যে বিচার করবে, তখন ইনসাফের সাথে বিচার করবে। নিশ্চিত জেনে রাখো! আল্লাহ তোমাদেরকে যে বিষয়ে উপদেশ দেন, তা অতি উৎকৃষ্ট হয়ে থাকে। নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছু শুনেন, সবকিছু দেখেন।" [সূরা নিসা-৫৮]

আরো ইরশাদ হয়েছে :

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ
بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا

"নিশ্চয় আমি তোমার প্রতি সত্য সম্বলিত কিতাব নাযিল করেছি। যাতে আল্লাহ তোমাকে যে উপলব্ধি দিয়েছেন, সে অনুযায়ী মানুষের মধ্যে মীমাংসা করতে পার। আর তুমি অসাধুদের পক্ষাবলম্বন করো না।" [সূরা নিসা-১০৫]

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا. فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ❖

"হে মুমিনগণ! তোমরা ইনসাফ প্রতিষ্ঠাকারী হয়ে যাও। আল্লাহ তায়ালার সাক্ষীরূপে; যদিও তা তোমাদের নিজেদের বিরুদ্ধে কিংবা পিতা-মাতা ও আত্মীয়স্বজনের বিরুদ্ধে হয়। সে ব্যক্তি (যার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়ার আদেশ করা হচ্ছে) যদি ধনী বা গরিব হয়, তবে আল্লাহ উভয় প্রকার লোকের বিষয়ে তোমার চেয়ে বেশি কল্যাণকামী। সুতরাং এমন খেয়ালখুশির অনুসরণ করবে না, যা তোমাদের ইনসাফ প্রতিষ্ঠায় বাধা হয়। তোমরা যদি পেঁচাও অর্থাৎ (মিথ্যা সাক্ষ্য দাও) অথবা (সঠিক সাক্ষ্য দেওয়া থেকে) পাশ কাটিয়ে যাও, তবে শোনো! আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কাজ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত।" [সূরা নিসা-১৩৫]

আরো ইরশাদ হয়েছে :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا. هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ❖

"হে মুমিনগণ! তোমরা এমন হয়ে যাও যে, সর্বদা আল্লাহর (আদেশসমূহ পালনের) জন্য প্রস্তুত থাকবে, ইনসাফের সাথে সাক্ষ্যদানকারী হবে ও কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি শত্রুতা যেন তোমাদেরকে ইনসাফ পরিত্যাগে প্ররোচিত না করে। ইনসাফ অবলম্বন করো। এ পন্থাই তাকওয়ার অধিক নিকটবর্তী। আর আল্লাহকে ভয় করে চলো। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কাজ সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবগত।" [সূরা মায়িদা-৮]

ইসলাম আল্লাহ তায়ালার মনোনীত একমাত্র সত্য ধর্ম। এ ধর্ম সকলকে দরদের সাথে সত্যের পথে আহবান করে। ইহকালীন ও পরকালীন নাজাতের পথে ডাকে। কিন্তু কাউকে বাধ্য করে না। সকলের ধর্মীয় স্বাধীনতা স্বীকার করে।

হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে :

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ :

«مَنْ لاَ يَرْحَمِ النَّاسَ لاَ يَرْحَمْهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ».

"হযরত জারির ইবনে আব্দুল্লাহ রাযি. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যারা মানুষের প্রতি দয়া করে না, আল্লাহ তাদের প্রতি দয়া করেন না।"

[মুসলিম শরিফ, কিতাবুল ফাযাইল, হাদিস নং ৬১৭২]

আরো ইরশাদ হয়েছে :

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ ،

ارْحَمُوا مَنْ فِي الأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ.

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, (জীবের প্রতি) দয়াকারীর উপর দয়াময় আল্লাহ তায়ালা দয়া করেন। জমিনে বসবাসকারী জীবের প্রতি দয়া করো, আকাশের অধিপতি তোমাদের প্রতি দয়া করবেন।" [তিরমিযি শরিফ, হাদিস নং ১৯২৪]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : الْخَلْقُ عِيَالُ اللهِ، فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَى عِيَالِهِ.

"রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, সমগ্র সৃষ্টি আল্লাহ তায়ালার পরিবার। আল্লাহ তায়ালার কাছে প্রিয় সেই ব্যক্তি, যে তাঁর পরিবারের প্রতি দয়া করে।" [মুসনাদুশ শাশি, হাদিস নং ৪৩৫, বায়হাকি হাদিস নং ৭০৪৮]

হাদিস শরিফে ইরশাদ হচ্ছে–

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ».

"হযরত আবু সাঈদ খুদ্‌রি রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি কোনো গুনাহের কাজ দেখবে, শক্তি থাকলে হাত দ্বারা (বলপ্রয়োগ করে) তা বন্ধ করে দিবে। এ পরিমাণ শক্তি না থাকলে মুখ দ্বারা নিষেধ করবে। এ পরিমাণ শক্তিও না থাকলে অন্তর দ্বারা ঘৃণা করবে।"

[মুসলিম শরিফ হাদিস নং ৭৮]

আরো ইরশাদ হয়েছে :

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مُرُوا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ». (رَوَاهُ أبو داود فِي سُنَنِهِ، كِتَابُ الصَّلٰوةِ، بَابُ مَتٰى يُؤْمَرُ الْغُلَامُ بِالصَّلٰوةِ)

হযরত আমর ইবনে শুয়াইব তাঁর পিতাসূত্রে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, শিশুর বয়স যখন সাত বছর হয় তাদেরকে নামাযের আদেশ করো, দশ বছর হলে (প্রয়োজনে) প্রহার (হালকা শাসন) করো এবং তাদের শয্যা পৃথক করে দাও। [আবু দাউদ শরিফ, হাদিস নং ৪৯৬]

মুরতাদ সম্পর্কে ইসলামি আদালতকে রাসূল ﷺ নির্দেশ দিয়ে বলেছেন :

عَنْ عِكْرِمَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ.

"হযরত ইকরিমা রহ. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে আববাস রাযি. বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন– যে মুসলমান ধর্ম ত্যাগ করল তাকে মৃত্যুদণ্ড দাও।" [নাসায়ি শরিফ, হাদিস নং ৪০৫৯]

ইসলাম কোনো অমুসলিমকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করে না। তবে একমাত্র বিজয়ী ধর্ম হিসাবে প্রতিষ্ঠিত থাকতে চায়। [মাসিক আল-কাউসার এপ্রিল ২০১৩]

## ইসলামি শরিয়তে ধর্মনিরপেক্ষতার কোনো স্থান নেই

ইসলামে ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে কিছু নেই। ইসলামের মূল ভিত্তি হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালার কালাম কুরআন মাজিদ। এতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন–

وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيْدُ اللهُ أَنْ يُصِيْبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوْبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيْرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُوْنَ ❖ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُوْنَ ❖

'আর আমি আদেশ করছি, আপনি তাদের পারস্পরিক বিষয়ে আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তদনুযায়ী ফয়সালা করুন! তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না। তাদের থেকে সতর্ক থাকুন! যেন তারা আপনাকে এমন কোনো নির্দেশ থেকে বিচ্যুত না করে, যা আল্লাহ আপনার প্রতি নাযিল করেছেন। অনন্তর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে জেনে নিন, আল্লাহ পাক তাদেরকে তাদের গুনাহের কিছু শাস্তি দিতেই চেয়েছেন। মানুষের মধ্যে অধিকাংশই নাফরমান। তারা কি জাহিলি যুগের ফয়সালা কামনা করে? আল্লাহ অপেক্ষা বিশ্বাসীদের জন্য উত্তম ফয়সালাকারী কে?" [সূরা মায়িদা-৪৯]

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে–

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ ❖ ... وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ ❖ ... وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ ❖

"যারা আল্লাহ তায়ালার বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করে না তারা জালিম ... তারা কাফির ... তারা ফাসিক।" [সূরা মায়িদা-৪৪, ৪৫ ও ৪৭]

এ তিনটি আয়াতে সুস্পষ্টত আল্লাহ তায়ালার বিধান ভিন্ন ফয়সালাকারীকে জালিম, কাফির ও ফাসিক বলা হয়েছে। আপনি এ আয়াতগুলো পড়ুন এবং অপব্যাখ্যাকারী সেক্যুলার গবেষকদের বক্তব্য শুনুন। জবাবটা আপনি নিজেই দিতে পারবেন।

সেক্যুলারিজমের বক্তব্য হচ্ছে, আইন-আদালত, বিচারকার্য এসব চলবে রাষ্ট্রীয় নীতি ও জনগণের চাহিদা অনুযায়ী। রাষ্ট্র যেভাবে আইন করে সেভাবে চলবে। ধর্মের সেখানে প্রবেশাধিকার নেই। কোনো কোনো সেক্যুলারপন্থির বক্তব্য হল— খলিফারা যে আইনে আদালত ও রাষ্ট্র চালিয়েছেন, তা তাদের নিজস্ব বিষয়। এটি ইসলামের কিছু নয়।

এখন আপনি উপরিউক্ত আয়াত এবং এ সংক্রান্ত অন্যান্য আয়াতগুলো দেখুন। এগুলোতে কি বলা হয়েছে, ওই সকল হুকুম-আহকাম খলিফাদের পর্যন্ত সীমিত? পরবর্তীদের জন্য তা পালনীয় নয়? দেখুন! সেক্যুলারিজম এমন কোনো বিষয় নয় যে, তার অসারতা সম্পর্কে জবাব দিতে হলে মাটি খুঁড়ে বের করে দলিল দিতে হবে। শরিয়তের বিষয়গুলো لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا অর্থাৎ সম্পূর্ণ স্বচ্ছ, স্পষ্ট ও প্রকাশ্য।

এখানে অস্পষ্টতা বা অন্ধকারের স্থান নেই। ইবাদত-বন্দেগি থেকে শুরু করে আইন-আদালত, রাষ্ট্রনীতি সবকিছুই কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা সুপ্রমাণিত। কিন্তু এখন ভাবখানা এমন যে, নামায-রোযা ইত্যাদি মানুষকে তাদের ধর্ম মতো করতে দাও। আর রাষ্ট্র-আদালত পরিচালিত হবে মানবরচিত আইনে।

সুতরাং কুরআনের বিধানের সাথে সামঞ্জস্য থাকুক বা না থাকুক, তিনি মীরাছের হিস্যা তার মতো করে বণ্টন করে দিতে পারবেন। এর জন্য মুসলিম স্কলারের ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। বিচারক নিজেই লিবারেল ও স্বাধীন। ফতওয়া সম্পর্কে ধারণা থাকুক বা না থাকুক, এমনকি ফতওয়ার সঠিক সংজ্ঞাও যদি জানা না থাকে, তিনি ফতওয়া অবৈধ বলে দিতে পারবেন এবং বলতে পারবেন যে, ফতওয়া দিতে পারবে শুধু উচ্চ আদালতের বিচারক। ফতওয়া দেওয়ার আইনগত কর্তৃপক্ষ হল কোর্ট।

ধর্মনিরপেক্ষতা এমনই। অন্য ধর্মের ব্যাপারে এর তেমন মাথাব্যথা নেই। তাদের বিরোধিতারও দরকার নেই। আর অন্য ধর্মাবলম্বীরা এ নিয়ে কোনো চিৎকার-চেঁচামেচি করে না। ভারতের উগ্রপন্থি বিজেপি কি কখনো দাবি পেশ করেছে—গীতা/ মহাভারত অনুযায়ী রাষ্ট্র চালাতে হবে? খ্রিষ্টানরাও সেটা বলে নি। তাদের কাছে তো ইসলামের মতো রাষ্ট্র পরিচালনার মৌলিক নীতিগুলোই

নেই। এ অনুপম ও সুমহান নীতি শুধু ইসলামেরই রয়েছে। সেক্যুলারিজম/ধর্মনিরপেক্ষতা এসেছেই ইসলামকে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে; স্রষ্টার আইনের বদলে নিজেদের মনমতো করে মানুষকে শাসন করার লক্ষ্যে।

[মাসিক আল-কাউসার; ফেব্রুয়ারি-২০১৪]

**ধর্মনিরপেক্ষতাকে ইসলামায়নের অপচেষ্টা**

আমাদের দেশে কেউ বই লিখেছেন কি-না জানি না, তবে আরব বিশ্বের কোনো কোনো ডক্টর-প্রফেসর ধর্মনিরপেক্ষতার সপক্ষে বইপত্রও লিখেছেন। তারা নিজেদেরকে আলেমও মনে করেন। আবার নিজেদের বক্তব্যের সপক্ষে কুরআন-হাদিসের দলিল দেওয়ারও চেষ্টা করেছেন। তারা বলেন– ইসলাম নামায, রোযা, ইবাদত-বন্দেগি কিভাবে আদায় করবে তা শিক্ষা দেয়; কিন্তু রাষ্ট্র কিভাবে পরিচালিত হবে তা ইসলাম বলেনি। সুতরাং ইসলামে রাজনীতি নেই। (এ কথাটাই আমাদের দেশের ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলো এভাবে বলে যে, ধর্ম পবিত্র জিনিস। রাজনীতি থেকে এটাকে আলাদা রাখতে হবে।) যা হোক! ওই আরব সেক্যুলার আলেমদের বক্তব্য হচ্ছে, ইসলাম ইবাদত বন্দেগির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। রাষ্ট্র পরিচালনা, বিচার বিভাগ, শিক্ষা-ব্যবস্থা ইত্যাদি ক্ষেত্রে ধর্মকে টেনে আনার কথা ইসলামে নেই। [প্রাগুক্ত]

**হাদিস দ্বারা দলিল**

এরা আমাদের দেশের কারো কারো মতো 'লাকুম দীনুকুম ওয়ালিয়া দীন' দ্বারা দলিল পেশ না করলেও ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে দু'-একটি হাদিসও পেশ করে থাকেন। তাদের পেশকৃত একটি হাদিস হল, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ—'তোমাদের পার্থিব বিষয়ে তোমরাই ভালো জান'।

এ হাদিসের প্রেক্ষাপট হল, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট 'তাবিরুন নাখ্‌ল' বা পরাগায়ণ [খেজুর চাষ সংক্রান্ত একটি বিশেষ পদ্ধতি] বিষয়ে একবার পরামর্শ চাওয়া হয়। তিনি এটা অপছন্দনীয় বললেন। পরবর্তী বছরে ফলন কম হয়। তখন তিনি বললেন– إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ أَمْرِ دِينِكُمْ فَاتَّبِعُوهُ অর্থাৎ দীনি বিষয়ে বললে সেটা শুনবে, মানবে। আর দুনিয়াবি বিষয়ে কিছু বললে পরামর্শ মনে করবে; তোমাদের এসব বিষয়ে তোমরাই ভালো জান।

এটা তাদের বড় দলিল। কেননা রাসূলুল্লাহ নিজেই বলেছেন, দুনিয়াবি বিষয়ে আমার কথা তোমরা শুনলেও শুনতে পার আবার নাও শুনতে পার। যদি সকল বিষয়ে তার নির্দেশনা মানা আবশ্যিক বিষয় হত, তা হলে এখানেও আবশ্যিক হত।

শরিয়তের মেযাজ, সম্বোধন সম্পর্কে যারা অবগত তাদেরকে এসব কথার জবাব দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। তারা নিজেরাই তা সহজে বুঝতে পারে।

উপরিউক্ত হাদিসটির তাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় না গিয়ে শুধু তরজমা দেখেও যে কেউ বুঝে নিবেন যে, এখানে কোনো কৃষিনীতি পেশ করা হয়নি বরং খেজুর বাগানে ফলন বৃদ্ধির একটি বিশেষ প্রক্রিয়া সম্পর্কে বলা হয়েছে, যা নিতান্তই একজন কৃষকের নিজস্ব ব্যাপার। ঠিক যেমনি একজন কৃষক তার ক্ষেতে ধান চাষ করবে না গম, সাধারণ জাতের চাষ করবে না-কি হাইব্রিড ইত্যাদি সবই তার একান্ত নিজস্ব বিষয়। যে পর্যন্ত জনস্বার্থের ক্ষতি না হবে, ইসলাম তার কাজে হস্তক্ষেপ করবে না। কৃষকের এ স্বাধীনতাকে ধর্মনিরপেক্ষতার দলিল হিসেবে পেশ করার যৌক্তিকতা কোথায়?

রাসূলুল্লাহ ﷺ তো সে প্রেক্ষিতেই বলেছেন– أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأُمُوْرِ دُنْيَاكُمْ অর্থাৎ 'তোমাদের দুনিয়াবি বিষয়গুলো তোমরাই ভালো জান।' [মুসলিম]

তাদের এ সকল বক্তব্যের খণ্ডন তো তখনই হয়ে গেছে। বিজ্ঞ আলেমরা যুক্তিপূর্ণ জবাবও দিয়েছেন। ইসলামের এটা বৈশিষ্ট্য। হাদিস শরিফে আছে,

لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِيْ مَنْصُوْرِيْنَ عَلَى الْحَقِّ

"আমার উম্মতের একটা দল সর্বদা হকের উপর বিজয়ী থাকবে। তারা সব যুগেই ছিল, থাকবে।" [ইবনে মাজাহ]

অন্য এক হাদিসে আছে, يَحْمِلُ هٰذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلْفٍ عُدُوْلُهُ এরা যুগে যুগেই ছিল। ওরা বই লিখেছে। কিন্তু প্রতিকূল পরিবেশে থেকেও আলেমরা এর কঠোর প্রতিবাদ করেছেন। [মাসিক আল-কাউসার, ফেব্রুয়ারি ২০১৪]

**কারাফির কিতাব থেকে দলিল**

তারা ইমাম কারাফির কিতাব 'আল-ইহকাম' থেকেও দলিল দিয়ে থাকে। সেক্যুলারিজমের কিছু কিছু লোক দাবি করেছেন, ইসলামের বড় বড় পি-ত, উসূল ও ফিকহবিদগণও ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলেছেন। তার নজির হিসেবে তারা ইমাম কারাফি রহ.-কেও পেশ করেছে।

ইমাম কারাফি রহ. তাঁর কিতাবে ২৫ নং প্রশ্নোত্তর অধ্যায়ে খুব সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কার্যবালি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি কোনো কাজ করেছেন নবী হিসেবে, কোনোটি দাঈ ও মুবাল্লিগ হিসেবে, কোনোটি শাসক ও রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে, কোনোটি বিচারক হিসেবে, কোনোটি মানুষ হিসেবেও করেছেন। এ কথাগুলো খুবই সুস্পষ্ট। কারাফি রহ. বিভিন্ন হাদিসের উপমা দিয়ে বিষয়গুলো বুঝিয়েছেন। সে

অধ্যায়টি ভালোভাবে পড়ে নিলে হাদিসের কিতাবগুলো বোঝাও সহজ হয়ে যাবে। কিন্তু কতক জ্ঞানপাপী গবেষক ইমাম কারাফি রহ.-এর বক্তব্যের ভুল ও অপব্যাখ্যা করেছেন। তারা বলেন– রাসূলুল্লাহ ﷺ যেসব কাজ নবী হিসেবে করেছেন, কেবল সেগুলোই মুসলমানদের পালনীয় বিষয়। তিনি রাষ্ট্রনায়ক ও বিচারক হিসেবে যা করেছেন, তা ইসলামের অন্তর্ভুক্ত বিষয় নয়। অর্থাৎ তাদের দাবি হল, রাসূলুল্লাহ ﷺ কাজি (বিচারক) হিসাবে/ হাকিম (শাসক) হিসাবে যা যা করেছেন, সেগুলোর কোনোটিই অনুসরণীয় নয়।

ভ্রষ্টতার গোড়া কিন্তু এখানেই। অর্থাৎ এ মতবাদ মানলে শরিয়তের বড় একটা অংশকে অস্বীকার করতে হয়। এটাকে গভীর থেকে দেখতে হবে, তা হলে এর ভয়াবহতা স্পষ্ট হয়ে যাবে।

আমাদের দেশের রাজনীতি বা বিশ্ব রাজনীতি এবং রাজনীতিকদের অনেক কথাই আছে স্থূল, যা শুধু বলার জন্যই বলে। মানুষ এগুলোকে হালকাভাবে দেখেই অভ্যস্ত। ধর্মনিরপেক্ষতাকে এ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার সুযোগ নেই। এর ক্ষতিটা যে কত গভীর ও ব্যাপক হতে পারে বিবেকবান মানুষের সেটা উপলব্ধি করা উচিত। কারাফি রহ.-এর গ্রন্থসূত্র দলিল প্রদানকারী লোকদের কথার আরো কিছু জবাব একটু পরে বলছি।

আলোচনার শুরুতে আমি এনসাইক্লোপিডিয়ার উদ্ধৃতিতে প্রথমেই বলে এসেছি, তারা সেক্যুলারিজম অর্থ করেছে Anti Islam। আসলে খুব সহজে চিন্তা করলেই বিষয়টা স্পষ্ট হয়ে আসে। কেননা ধর্মনিরপেক্ষতা যখন থেকে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছে, তখন কিন্তু অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা রাষ্ট্রের সাথে লড়াই করেছে এমন নয়। রাষ্ট্রের আইন নিয়ে তো তাদের কোনো মাথাব্যথাই ছিল না। খ্রিষ্টানরা তো তাদের ধর্মকে চার্চকেন্দ্রিক করে ফেলেছিল আগেই। আরবদের ভাষায়—دَعْ مَا لِقَيْصَرَ لِقَيْصَرَ وَمَا لِلّٰهِ لِلّٰهِ অর্থাৎ ধর্ম মসজিদ পর্যন্ত আর রাষ্ট্র পরিচালিত হবে রাষ্ট্রনায়কদের দ্বারা। একটার সাথে আরেকটার কোনো সম্পর্ক থাকবে না। এত কিছুর পর আবার ধর্মনিরপেক্ষতা বা ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে দূরে রাখার কেন দরকার হল?

খুব স্পষ্ট কথা। রাষ্ট্র থেকে ইসলামকে দূরে সরিয়ে রাখাই মূখ্য উদ্দেশ্য। কেননা একমাত্র ইসলামের নীতিমালাই তাদের পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারে।

মুসলিম শাসকদের ইসলামি নীতিমালায় রাষ্ট্র পরিচালনার দীর্ঘ ঐতিহ্য রয়েছে। গোটা পৃথিবীর অনেক অংশই যখন সভ্যতা বিবর্জিত ছিল, ইসলামই তখন সভ্যতার রাস্তা দেখিয়েছে। সত্যিকারের রাষ্ট্রব্যবস্থা যে অন্য যে কোনো নীতি থেকে হাজারো গুণ ভালো, তা ইসলাম দেখিয়ে দিয়েছে। মূলত এটাই

ছিল তাদের বাধা। এ কারণেই হয়তো সেক্যুলারিজমকে Anti Islam বলা হয়েছে। Anti Religion নয়—ধর্মবিরোধী নয়, আসলে ইসলাম বিরোধী। এ সত্যটাকে অনুধাবন করতে হবে। কারণ, ধর্মের কথা তারাও বলে। তবে ওটা বাইবেল ছুঁয়ে শপথ করা এবং ডলারের গায়ে ওহ God we trust লিখে দেওয়া পর্যন্তই। অবশ্য এটুকুতেই ওরা খুশি। এর বেশি দরকারও মনে করে না। তাই সেক্যুলারিজম দরকারই হয়েছে ইসলামকে ঠেকানোর জন্য। বিধায় Anti Islam ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সুতরাং ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়—এ কথা শুনে বিভ্রান্ত হওয়ার সুযোগ নেই বরং ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পূর্ণই ধর্মহীনতা বলতে হবে। [মাসিক আল-কাউসার; ফেব্রুয়ারি-২০১৪]

**যুক্তির মানদণ্ডে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ**

প্রাচীন ও আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা তাদের মতবাদকে কোনো দিক দিয়েই মজবুত যুক্তি দ্বারা দুর্ভেদ্য করে তুলতে পারে নি। দলিল-প্রমাণের পরিবর্তে তারা সর্বদা অন্ধ শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। শাসন ও অর্থশক্তি প্রয়োগ করে তারা গায়ের জোরে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ কায়েম রাখতে ব্যর্থ চেষ্টা করে। যুক্তির কষ্টিপাথরে যাচাই করলে ধর্মরিপেক্ষতাবাদের মতো অবৈজ্ঞানিক মতবাদ আর কিছুই নেই বলে মনে হয়। অথচ আশ্চর্য ব্যাপার হল, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরাই সবচেয়ে বেশি বুদ্ধি ও জ্ঞানের দোহাই পাড়েন। তাই যুক্তি ও বিবেকের দৃষ্টিতে ধর্মনিরপেক্ষতার বিশ্লেষণ হওয়া প্রয়োজন।

(১) এ বিশ্বের যদি কোনো স্রষ্টা থাকেন এবং সমগ্র বস্তুজগতে যদি তার দেওয়া প্রাকৃতিক বিধানসমূহ কার্যকর বলে স্বীকৃত হয়, তা হলে সেই মহাশক্তিশালী স্রষ্টাকে মানুষের জীবনে একটি কার্যকর শক্তি হিসেবে গ্রহণ করতে আপত্তি করার কি কারণ থাকতে পারে? প্রাকৃতিক জগতে কোনো ক্ষুদ্রতম বিধানকে বদলিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা মানুষের নেই। এমনকি মানুষ তার আপন শারীরিক বিধিও ইচ্ছামতো পরিবর্তন করে সুস্থ থাকতে পারে না। এমতাবস্থায় মানব জীবনে সামঞ্জস্য ও শৃঙ্খলা বিধানের জন্য কোনো বিধি ব্যবস্থা বিশ্বস্রষ্টার নিকট থেকে গ্রহণ না করার সিদ্ধান্তকে কিরূপে যুক্তিভিত্তিক বলে মেনে নেওয়া যায়? যিনি জীব জগৎ, উদ্ভিত জগৎ ও সৌরম-লে শান্তি ও স্থিতিশীলতার বিধান দিয়েছেন তাঁকে মানবজাতির জন্য বিধানদাতা হিসাবে স্বীকার করায় আপত্তি কেন?

প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা এখানে মুনাফিকির আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে। 'আল্লাহ নেই' বলে ঘোষণা করবার দুঃসাহস করা বুদ্ধিমানের কাজ নয় মনে করেই তারা ধূর্ততার বক্রপথ গ্রহণ করে থাকে। বাস্তব ক্ষেত্রে

নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্তার (Constitutional head) ন্যায় প্রভাবহীন এক দুর্বল সত্তা হিসাবে আল্লাহ তায়ালাকে স্বীকার করে তারা স্রষ্টায় বিশ্বাসীদেরকে ধোঁকা দেওয়ার অপকৌশল গ্রহণ করেছে। এ পন্থায় বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠান সর্বস্ব ধর্মে তুষ্ট এক শ্রেণির ভীরু লোক ধর্মনিরপেক্ষতাবাদকে স্বীকার করেও আল্লাহ তায়ালাকে খুশি করা যায় বলে বিশ্বাস করে। আর শাসন শক্তির ধারক ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা এ ভীরু ধার্মিকদের সমর্থনেই টিকে থাকার চেষ্টা করে। এ সমর্থনটুকুর জন্যই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী শাসকরা আল্লাহ পাককে অবিশ্বাস করলেও মুখে স্বীকার করে থাকে।

(২) ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা মহান আল্লাহকে ব্যক্তিগত জীবনে আনুগত্যের অধিকারী বলে স্বীকার করে এবং সমাজ জীবনে আল্লাহ তায়ালা ও ধর্মকে মানার প্রয়োজন নেই বলে ঘোষণা করে। এখানে প্রশ্ন হল, কোন্ দলিলের ভিত্তিতে তারা আল্লাহর মতকে ব্যক্তিগত গ-িতে সীমাবদ্ধ করে? আল্লাহ পাক কি কোথাও এ বিষয়ে কোনোরূপ ইঙ্গিত দিয়েছেন? ব্যক্তিগত জীবনে আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্যে কিছু পূজা-পার্বন ও নামায-রোযার অনুষ্ঠান পালন করলেই তিনি সন্তুষ্ট হবেন? জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে নিজের বুদ্ধি অনুযায়ী যার যেমন খুশি জীবন যাপন করলেও আল্লাহ তায়ালার কোনো আপত্তি নেই বলে কোনো নবীর নিকট ওহী কি নাযিল হয়েছে? আল্লাহ তায়ালা যদি তাঁর আনুগত্যের দাবিকে মানুষের ব্যক্তি জীবনে নিজেই সীমাবদ্ধ করে না থাকেন, তা হলে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের নির্দেশেই কি আল্লাহকে সমাজ জীবনে অমান্য করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে?

(৩) যিনি এ বিশাল বিশ্বের ক্ষুদ্র, বৃহৎ দৃশ্য, অদৃশ্য যাবতীয় সৃষ্টি পরিচালনা করেছেন, জ্ঞানের দিক দিয়ে কোনো বিষয়ে তাঁর ত্রুটি থাকা কিছুতেই সম্ভব নয়। মহাজ্ঞানী 'হাকিম' ও 'আলীম' না হলে তাঁর পক্ষে অগণিত গ্রহ-উপগ্রহ খচিত শূন্যম-লে শৃঙ্খলা রক্ষা করা অসম্ভব হত। মানুষের জটিল শরীর বিজ্ঞানের যাবতীয় নিয়ম-কানুন যিনি তৈরি করেছেন, একমাত্র তিনিই মানব জীবনে শান্তি স্থাপনের পথনির্দেশ করতে সক্ষম। শারীরিক সুস্থতার জন্য যেমনি আল্লাহ তায়ালার প্রাকৃতিক বিধান খোঁজ করতে হয়, তেমনি ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের সঠিক ব্যবস্থার জন্যও তাঁরই শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া উপায় নেই। আল্লাহ তায়ালা আছেন অথচ সর্বজ্ঞ নন কিংবা সর্বাবস্থায় নেই—একথার চেয়ে অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত আর কী হতে পারে?

(৪) ব্যক্তি জীবনে ধর্মীয় বিধান মেনে চলা এবং সমাজ জীবনকে ধর্মের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখার মতবাদ অত্যন্ত দুরভিসন্ধিমূলক। যারা এ মতবাদের

প্রচারক তারা ব্যক্তি জীবনেও ধর্মের বন্ধন স্বীকার করতে রাজি হয় না। 'ধর্ম যদি ব্যক্তিগত ব্যাপার বলেই স্বীকার কর, তা হলে তোমরা ব্যক্তি জীবনেও ধর্মকে মেনে চলো না কেন?' ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীকে এ প্রশ্ন করা হলে উদার নীতির দোহাই দিয়ে বলে যে, এ প্রশ্ন করাটাও অসামাজিক ব্যাপার। আমি ব্যক্তিজীবনে ধর্মকে কতটা মেনে চলি তা জিজ্ঞাসা করার অধিকার আপনার নেই। এভাবে অত্যন্ত কৌশলের সাথে ধর্মকে অস্বীকার করার ফন্দি হিসাবেই ধর্মনিরপেক্ষতার এ আজব মতবাদ প্রচার করা হয়। তাই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও ধর্ম বিরোধিতায় মূলত কোনো পার্থক্য নেই।

(৫) ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের মধ্যে যে ব্যবধানের উল্লেখ করে, তা সমাজ বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে চরম অবৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত। নিতান্তই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে তারা ইচ্ছাকৃতভাবে এ বিজ্ঞান বিরোধী মতবাদ পোষণ করে থাকেন। মানুষের ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের মাঝে ব্যবধানের সীমারেখাটি কোথায়? সামাজিক জীব হিসাবে মানুষের ব্যক্তি জীবন সমাজ থেকে কিভাবে পৃথক হতে পারে? ধর্মীয় কারণে যে ব্যক্তি সত্যবাদী সে তার সত্যবাদিতা সমাজ জীবনেই প্রয়োগ করবে। কিন্তু অপর ব্যক্তির সাথে সামাজিক জীবন যাপনের বেলায় মিথ্যুক বলে সাব্যস্ত হলে ব্যক্তিগতভাবে সত্যবাদী হওয়ার উপায় কি? ব্যক্তি জীবনে চরিত্রবান ও চরিত্রহীন হওয়ার কোনো উপায় নেই। কেউ ব্যক্তি জীবনে গুন্ডা হয়েও রাজনৈতিক জীবনে সৎ হতে পারবে কি? সমাজ জীবনে ঘুষখোর ও দুর্নীতিবাজ ব্যক্তি জীবনে ধার্মিক বলে স্বীকৃত হতে পারে কি? প্রত্যেকটি মানুষই জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যাবতীয় বিষয়ে এক বা একাধিক ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত। তার জীবনে এমন কোনো ব্যাপারই থাকতে পারে না যা অন্য কোনো মানুষের সাথে কোনো সম্পর্ক রাখে না। নির্জনে বসে এক ব্যক্তি যা চিন্তা করে সেখানেও সমাজ থেকে সে বিচ্ছিন্ন হয় না। সে যে কোনো কাজই করুক তার কোনো না কোনো সামাজিক পরিণাম নিশ্চয় দেখা যায়।

মানুষে মানুষে পারস্পরিক সম্পর্কের নামই সমাজ। ব্যক্তিগতভাবে ধর্মের অনুশাসন মেনে চলতে যারা রাজি তারা পারস্পরিক সম্পর্কের বেলায় ধর্মকে কিরূপে অস্বীকার করবে? আর যদি অস্বীকারই করে তা হলে ধর্মকে স্বীকার করা হল কোথায়? ব্যক্তিগণ পৃথক পৃথকভাবে ধর্মকে মেনে চলবে, কিন্তু তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের বেলায় আর ধর্মের প্রভাব স্বীকার করবে না– একথা কী প্রকারে যুক্তিসঙ্গত বলে গ্রহণ করা যায়?

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ সকল দিক দিয়েই যুক্তির সম্পূর্ণ পরিপন্থি। আল্লাহ তায়ালাকে জীবনের কোনো ক্ষেত্রে দখল দেওয়া বা কোনো কোনো বিভাগে

বেদখল করার এখতিয়ার কারো নেই। ধর্মস্থানের বাইরে মানব জীবনের বিশাল ময়দানে আল্লাহ তায়ালার উপর ১৪৪ ধারা জারি করার এ অপচেষ্টা জীবন সম্পর্কে ভোগবাদী দৃষ্টিভঙ্গিরই সৃষ্টি।

ধর্ম মানুষকে যেসব নৈতিকতার বন্ধন মেনে চলার নির্দেশ দেয়, তা পালন করা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী বিলাসীদের পক্ষে সম্ভব নয় বলেই তারা এ চোরাপথ সন্ধান করে নিয়েছে। জীবনকে নৈতিকতার ঝামেলা থেকে মুক্ত করে আযাদ জীবন যাপনের সস্তা সুবিধাটুকু উপভোগ করতে হলে ধর্মকে ব্যক্তিগত বিষয়ে পরিণত করা ছাড়া তাদের আর কোনো উপায়ই নেই। সুতরাং এ মতবাদ যে মানুষের সদিচ্ছার সৃষ্টি নয়, তা বলাই বাহুল্য।

**ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের পরিণতি**

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের ইতিহাস আলোচনা করলে স্পষ্টই বোঝা যায়, ওটা কোনো ইতিবাচক (positive) মতাদর্শ নয়, তা নিতান্তই একটি নেতিবাচক (negative) দৃষ্টিভঙ্গি মাত্র। ধর্মকে মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে সীমাবদ্ধ করার নামে মানব জীবনকে ধর্ম ও আল্লাহ তায়ালার প্রভাব থেকে মুক্ত রাখার এ মতবাদকে প্রকৃতরূপে আদর্শহীনতাই বলা উচিত। মানুষকে ধর্মের বন্ধন ও স্রষ্টার দাসত্ব থেকে আযাদ করার পর নির্দিষ্ট আদর্শের পথে পরিচালনার ইঙ্গিত এ মতবাদে পাওয়া যায় না। জীবনের সর্বক্ষেত্রে ধর্মের প্রভাব মেনে চলার আদর্শ থেকে বিচ্যুত এ মতবাদ মানুষকে আদর্শহীন অবস্থায় নিক্ষেপ করে। তাই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ কোনো আদর্শ নয়; এটা চরম আদর্শহীনতা (Absence of Ideology) ছাড়া আর কিছুই নয়।

**১. আদর্শিক পরিণাম**

মানুষ এমন এক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জীব যে, তাকে সর্ববিষয়েই নিজের ভালো-মন্দ বাছাই করার ঝামেলা পোহাতে হয়। অন্যসব জীবের মতো তার পরিপূর্ণ বিকাশ আপনা আপনিই হতে পারে না। সুতরাং আদর্শের সন্ধান করা ছাড়া মানুষের কোনো উপায় নেই। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ যখন মানুষকে আদর্শহীন করে অনিশ্চিত পথে ছেড়ে দেয়, তখন তার জীবনে এক বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি হয়। কিন্তু তার পক্ষে আদর্শ শূন্য অবস্থায় জীবন যাপন করা বাস্তব ক্ষেত্রে অসম্ভব। ফলে এ শূন্যতাকে পূরণ করার জন্য তার সামনে অনেক বিচিত্র ও বিপরীতমুখী আদর্শের আবির্ভাব ঘটে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, নৈতিক ও অন্যান্য দিকে মানুষ তখন আদর্শের সন্ধান করতে বাধ্য হয়।

প্রয়োজনের তাগিদে যখন মানুষ আদর্শ খোঁজ করতে থাকে, তখন বিভিন্ন চিন্তাশীল মানুষ পৃথক পৃথকভাবে বিচিত্র রকমের আদর্শ আবিষ্কার করে।

একই মানুষের পক্ষে মানব জীবনের সর্বদিক এবং বিভাগের উপযোগী সামঞ্জস্যশীল পূর্ণাঙ্গ আদর্শ সৃষ্টি করা সম্ভব হয় না বলে বাধ্য হয়েই জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের জন্য বিভিন্ন মানুষের রচিত আদর্শ গ্রহণ করতে হয়। এমতাবস্থায় সামঞ্জস্যময় জীবন কিছুতেই সম্ভব হতে পারে না। এ আদর্শিক অসামঞ্জস্য ধর্মনিরপেক্ষতার সর্বপ্রধান পরিণাম।

**২. নৈতিক পরিণাম**

মানুষ নৈতিক জীব। নৈতিক মূল্যবোধই মানুষকে অন্যান্য জীব থেকে উন্নত মর্যাদার অধিকারী করেছে। আইন ও শাসন মানুষের মধ্যে প্রকাশ্য নৈতিকতা কিছুটা সৃষ্টি করলেও অন্তরে নৈতিকতাবোধ সৃষ্টি না হলে মানুষের ব্যক্তি জীবনে নৈতিকতা মজবুত হতে পারে না। এ নৈতিকতা সৃষ্টির জন্য এমন এক স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস থাকা প্রয়োজন, যিনি সর্বাবস্থায় মানুষের চিন্তা ও কর্ম সম্বন্ধে জ্ঞাত; যিনি আদালতে পরকালে ন্যায়বিচার করে মানুষকে পুরস্কার ও শাস্তি প্রদান করবেন। আইন মানুষের কর্মজীবনকে আংশিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করে মাত্র। কেবল ধর্মই মানুষের ইচ্ছা ও প্রবৃত্তির উপর শক্তিপ্রয়োগ করতে পারে। তাই ধর্মই কর্মজীবনকে পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম। নৈতিক চরিত্র বর্জিত মানুষকে মানবদেহী পশুই বলা যায়। বরং বুদ্ধিশক্তির অধিকারী মানুষ চরিত্রহীন হলে পশুর চেয়েও অধিক অনিষ্টকারী হতে পারে। সুতরাং ধর্মনিরপেক্ষতা মানুষকে পশুত্বের নিম্নতম স্তরে নিক্ষেপ করতে পারে। এ মতবাদ মানবদেহের সুপ্ত পশুত্বকে লাগামহীন করে নৈতিকতার বন্ধনকে ছিন্ন করারই পাশব আদর্শ মাত্র।

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ যে সভ্যতার জন্ম দিয়েছে নৈতিকতার দৃষ্টিতে তা মনুষ্যত্বের উপযোগী হতে পারে না। মনুষ্যত্ববোধ জাগ্রত করার একমাত্র অবলম্বনই ধর্মবোধ। মানুষ তার পশু প্রবৃত্তির তাড়নায় ধর্মকেও কুপ্রবৃত্তির সহায়ক হিসাবে ব্যবহার করার চেষ্টা করে বটে, কিন্তু ভালো ও মন্দ সম্বন্ধে মানুষের যে সহজাত ধারণা রয়েছে, তা একমাত্র ধর্মেরই অবদান। নৈতিক বিধান একমাত্র ধর্মেরই অনুশাসন। মানুষের জীবনে নৈতিক অনুশাসন কার্যকর করতে হলে সমাজ জীবনকে ধর্মের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখা নিশ্চয় বুদ্ধিমানের সিদ্ধান্ত নয়।

**৩. মূল্যবোধের পরিণাম**

মূল্যবোধই মানুষের জীবনকে সত্য ও কৃষ্টিসম্মত করে তোলে। সভ্য ও অসভ্য, ভালো ও মন্দ, সঠিক, সুন্দর ও কুৎসিত ইত্যাদি সম্পর্কে নির্ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছার দায়িত্ব যদি প্রত্যেক মানুষের যুক্তির উপর ন্যস্ত থাকে, তা

হলে বিশ্বের মানুষ কোনো চিরন্তন ও শাশ্বত মূল্যমানের সন্ধান পাবে না। একমাত্র মানব জাতির স্রষ্টার পক্ষেই চিরন্তন মূল্যমান (Eternal Values) নির্ধারিত করা সম্ভব। একই সঙ্গে দুটো বিপরীত জিনিস সত্য হতে পারে না। অথচ মানুষ নিজের বুদ্ধিসর্বস্ব জ্ঞানের ভিত্তিতে পরস্পর বিপরীত মূল্যমান নির্ধারণ করে। মদ্যপান হয় ভালো না হয় মন্দ। অথচ কতক লোক ভালো মনে করে, আবার অনেক লোক এটাকে মন্দ মনে করে। প্রত্যেক বস্তু ও কার্যের আদি ও অন্ত সম্বন্ধে যার জ্ঞান আছে, তার সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর না করলে মানুষ নিজের বুদ্ধি দ্বারা সঠিক মূল্যমান নিরুপণ করতে পারবে না। ফলে একসময় যা ঠিক বলে সিদ্ধান্ত করবে অন্য সময় আবার বেঠিক বলে তা বর্জন করবে। অথচ তা একবার ঠিক ও পরে বেঠিক হতে পারে না।

**৪. শাসনতান্ত্রিক পরিণাম**

শাসন শক্তি এমন এক হাতিয়ার, যা দ্বারা জনসাধারণ শান্তিপূর্ণ জীবন যাপনের সুযোগও পেতে পারে আবার চরমভাবে নির্যাতিতও হতে পারে। যে কোনো রাষ্ট্রব্যবস্থায় শাসকগণই রাষ্ট্রের সকল ধন-সম্পদের উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। আইন রচনা দ্বারা তারা নাগরিকদের সমগ্র জীবনের উপরই প্রচ- প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম। তাদের পরিচালিত বিচার পদ্ধতির উপরই সর্বসাধারণের মান-ইযযত সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। শিক্ষা-ব্যবস্থার মাধ্যমে জাতির ভবিষ্যৎ মনমগজ গঠন করার চাবিকাঠিও তাদের হাতে ন্যস্ত। বিশেষভাবে আধুনিক যুগে নাগরিকদের গোটা জীবনের সুখ-দুঃখ মান-অপমান উন্নতি অবনতি রাষ্ট্র পরিচালক ও শাসকবৃন্দের ইচ্ছা মনোবৃত্তি ও দৃষ্টিভঙ্গির উপর অনেকখানি নির্ভর করে।

এমতাবস্থায় শাসক সম্প্রদায় আল্লাহ তায়ালার দাসত্ব ও ধর্মের বন্ধন হতে যদি মুক্ত হয়, বিশ্ব স্রষ্টার নিকট যদি জবাবদিহিতার অনুভূতি শূন্য হয় এবং পরকালে পুরস্কার ও শাস্তির প্রতি যদি অবিশ্বাসী হয়, তবে নিঃসন্দেহে তারা সুবিধাবাদী নীতি অনুসরণ করে চলবে। তাদের চরিত্র কিছুতেই নির্ভরযোগ্য হবে না। তারা নিজেদের পার্থিব লাভ-লোকসানের ভিত্তিতে সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। গদি রক্ষার জন্য তারা যে কোনো পদক্ষেপ নিতে প্রস্তুত হবে। আত্ম-প্রতিষ্ঠার জন্য এবং নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্য তারা শাসনযন্ত্রকে যথেচ্ছা ব্যবহার করবে। তাদের গোটা চরিত্র মানুষের খিদমতের জন্য নিয়োজিত না হয়ে নিজেদের খিদমতেই নিযুক্ত হবে। কেবল গণবিপ্লব এড়ানোর জন্য এবং জনসমর্থন থেকে বঞ্চিত হওয়ার ভয়েই তারা জনসেবা করবে। এখানেও চরম উদ্দেশ্য আপন স্বার্থ।

আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস যাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে তাদের শাসন ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীর শাসনে যে বিরাট পার্থক্য আছে, তা যেমনিভাবে যুক্তিসঙ্গত; তেমনি তা ঐতিহাসিক সত্য। যারা ধর্মকে বাস্তব জীবনে গ্রহণ করেছে তাদের শাসন ধর্মহীনদের শাসন থেকে স্বাভাবিকভাবেই আলাদা ধরনের হবে। এমনকি মুসলিম শাসনের দীর্ঘ ইতিহাসেও ধার্মিক ও অধার্মিক শাসকদের যুগে জনগণের জীবনে ব্যাপক পার্থক্য দেখা গেছে। শাসন ব্যক্তি ও সমাজের সর্বাপেক্ষা ব্যাপক ও সবলশক্তি। এ বিপুল শক্তিকে একমাত্র আল্লাহ তায়ালা ও আখিরাতের ভয়, আল্লাহ তায়ালা ও রাসূলের আইন এবং ধর্মীয় অনুশাসন দ্বারাই নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। তদুপরি জনমতও আংশিকভাবে শাসন শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষ শাসকদের আচরণ একমাত্র জনমত দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। ফলে তারা প্রচারযন্ত্রের সাহায্যে, ক্ষমতার জাদুমন্ত্রে জনমতকে কলুষিত করে অনেক সময়ই অন্যায়কে ন্যায় বলে চালিয়ে দিতে পারে। তাই ধর্মনিরপেক্ষ শাসন জনগণকে ধোঁকা দিয়ে ক্ষমতায় থাকার সাধনাই করে।

### ৫. ধর্মীয় পরিণাম

ধর্মনিরপেক্ষতার ধর্মীয় পরিণাম হলো সরাসরি নাস্তিকতা। মানব সমাজের সকল বিভাগ থেকে বেদখল করে যখন খোদাকে ধর্মীয় উপসনালয়ে বন্দি করা হয়, তখন এ মতবাদের আক্রান্ত ব্যক্তির অন্তরে খোদার অস্তিত্বটুকু বজায় থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ে। কারণ, তখন সে আল্লাহ তায়ালাকে দুর্বল সত্তা ভাবতে থাকে। যদিও আল্লাহ তায়ালা সকল দুর্বলতার উর্ধ্বে। আল্লাহ তায়ালাকে দুর্বল সত্তা ভাবাই তো একপ্রকারের পথভ্রষ্টতা ও ধোঁকা। তখন সে আল্লাহ তায়ালার বিধানগুলোতে যুক্তি খুঁজতে থাকে। আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্বে যুক্তি খুঁজতে থাকে। যদিও এ যুক্তি সামাল দেওয়ার মতো মেমোরি তাকে দেওয়া হয় নি। তাই সে নাস্তিকতার মতো পথভ্রষ্টতায় অতি দ্রুত অগ্রগামী হয়ে যায়।

## সেক্যুলারিজমের অবদান

### তুরস্কের উদাহরণ

ধর্মনিরপেক্ষতার বাতিক একটি জাতিকে কত উঁচু থেকে কত নিচে ছুঁড়ে ফেলতে পারে তার নজির আপনি দেখতে পারেন এককালের উসমানিয়া রাজত্বের রাজধানী তুরস্কে। এ তুরস্ক শাসন করেছিল হারামাইন শরিফাইনসহ পৃথিবীর একটি বিশাল অংশ। শত শত বছরের ওই উসমানিয়া খেলাফতের কেন্দ্রবিন্দুই শেষের দিকের সুলতানদের অপরিণামদর্শিতা, অযোগ্যতা আর অদক্ষতার কারণে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে। কামাল আতাতুর্ক হলেন ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের আদর্শ ব্যক্তি। যিনি ওই

তুরস্কেই সেক্যুলারিজমকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছিলেন। আতাতুর্ক সাহেব তুরস্কে কী কী ঘটিয়েছিলেন, হয়তো অনেকেরই জানা থাকবে। বিশেষ করে যাদের ইতিহাস নিয়ে নাড়া-চাড়ার অভ্যাস রয়েছে।

খুব সহজ একটা উদাহরণ হল আজান। আযানের ভাষাও ওখানে বদল করে দেওয়া হয়েছিল। মাইকে দেওয়া তো নিষিদ্ধই ছিল। তুর্কি ভাষায় আযান দেওয়া হত। দারুল খিলাফা হওয়ার কারণে সেখানে অসংখ্য মাদরাসা ছিল। সেগুলো সব বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। মানুষ গর্তের ভিতরে লুকিয়ে চুপিচুপি কুরআন শিক্ষা চালু রেখেছিল। ওদের বর্ণমালা ঠিক আরবির মতোই ছিল। এখনো তুর্কী ভাষায় লেখা বই-পত্র পাওয়া যায়। কিন্তু আতাতুর্ক সে বর্ণমালাকে নিষিদ্ধ করে রোমান অক্ষর চালু করেছেন। এখন সেখানে রোমান লিপি চলে। অর্থাৎ ইংরেজি অক্ষরে তুর্কী ভাষা লেখা হয়। এ ভদ্রলোক নিছক ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান তৈরি করে ও ইসলামি শিক্ষা বন্ধ করেই ক্ষ্যান্ত হন নি বরং সে দেশের প্রতিরক্ষা তথা আর্মি ও আদালতকে কড়া সেক্যুলার বানিয়ে গেছেন। কঠোর হস্তে সেখানে সেক্যুলারিজমের ধর্ম ও ধর্মওয়ালাদের বিরুদ্ধে একপক্ষীয় যুদ্ধ করা হয়েছে। কেননা ধর্মের পক্ষের মানুষ অস্ত্রশস্ত্রহীন ছিল। হাজার হাজার লোককে প্রহসনের বিচার করে কিংবা বিনা বিচারে মেরে ফেলা হয়েছে। এভাবে সেখানে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেয়েছে সেক্যুলারিজম।

আর আর্মি ও আদালতকে এত কড়া সেক্যুলার বানানো হয়েছিল যে, তারা কোনো ধার্মিক তো দূরে থাক কোনো ধর্মীয় দলকে ক্ষমতা দেওয়া তো দূরের কথা, কোনো দাড়িওয়ালা বা কোনো হিজাব পরুয়া নারীর স্বামীকেও রাষ্ট্রপতি হিসেবে গ্রহণ করেনি; যদিও তাদের পরিচালিত নির্বাচনেই ওই ব্যক্তিরা জনগণের বিপুল ভোটে নির্বাচিত হয়ে এসেছে। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত দলকে নিষিদ্ধ করে দিতে ওই শক্তিগুলো কোনো দ্বিধাই করেনি। এসব থেকে আমাদেরকে শিক্ষা নিতে হবে, সতর্ক থাকতে হবে। অন্যদেরকে সতর্ক করতে হবে। [মাসিক আল-কাউসার, ফেব্রুয়ারি-২০১৪]

## মিসরের উদাহরণ

ঐতিহ্যবাহী দেশ মিসরের সর্বপ্রথম নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট মুরসি। রাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ তাকে ভোট দিয়েছে। এর আগে মিসরের ইতিহাসে কোনো নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ছিল না। আগের সরকারগুলো রাষ্ট্রীয় ফরমান, সামরিক ফরমান জারি করে ক্ষমতায় ছিল। ডক্টর মুহাম্মদ মুরসি পশ্চিমাদের বড় আস্থাভাজন, নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত বড় বড় ব্যক্তিদের মোকাবিলা করে নির্বাচিত হয়েছেন। এভাবে নির্বাচিত হওয়ার পরও অনেক চড়াই উৎরাই এবং প্রাণহানির পর ক্ষমতায় বসেছেন। কিন্তু একটি দিনের জন্যও তাকে শান্তিতে রাষ্ট্র চালাতে দেওয়া হয়নি। আদালত ও সামরিক বাহিনীর নগ্ন

হস্তক্ষেপ এবং সেক্যুলার ও বেদ্বীন তথাকথিত সুশীলদের বহুমুখী ষড়যন্ত্র চলেছে সমান্তরালে এবং অবশেষে বন্দুকের জোরে ক্ষমতাচ্যুত করে অন্ধকার কারাবাসে পাঠানো হয়েছে। এসব কী? এসবই হল সেক্যুলারিজমের কুফল। এভাবেই সেক্যুলার শক্তিগুলো যুগে যুগে দেশে দেশে ষড়যন্ত্র ও দমন-পীড়নের মাধ্যমে মুসলমান ও ইসলামপন্থিদের দমিয়ে দিচ্ছে। তাদের গণতন্ত্র-মানবাধিকার এক্ষেত্রে অন্য কোনো অর্থেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

[মাসিক আল-কাউসার, ফেব্রুয়ারি-২০১৪ খ্রি.]

**বাংলাদেশ পরিস্থিতি**

এদেশের কিছু লোক আগেও ধর্মনিরপেক্ষ ছিল, এখনো আছে। কিন্তু তারা কখনো সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল না। বিশাল ধর্মপ্রাণ মানুষের তুলনায় তাদের সংখ্যা একেবারেই নগণ্য। অথচ এ সংখ্যালঘুদের মতবাদই এখন চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে পুরো দেশের ৯৯ শতাংশ মানুষের ওপর। বাংলাদেশের শিক্ষানীতি রাষ্ট্রনীতি ও শাসননীতির লক্ষ্য করলে এ কথা দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট। [মাসিক আল-কাউসার : ফেব্রুয়ারি ২০১৪]

**প্রসঙ্গ মুক্তচিন্তা**

বর্তমানে বিশ্বে একশ্রেণির মানুষ মুক্তচিন্তা ও মুক্তবুদ্ধি চর্চার ব্যাপারে খুবই উৎসাহী। তারা মনে করে, মানুষ যেমনি স্বাধীন তেমনি তার চিন্তা ও বুদ্ধি চর্চাও স্বাধীন, মুক্ত ও বাঁধনহীন। যে কোনো বিষয় নিয়ে ভাবতে পারবে ও তার বুদ্ধি প্রয়োগ করতে পারবে। কথাগুলো এভাবে বললেও মূলত তারা কেবল ধর্মীয় দিকনির্দেশনা বিরোধী চিন্তা ও বুদ্ধির প্রয়োগ ঘটাতে চায়। অন্য বহু ক্ষেত্র রয়েছে যেখানে মুক্তবুদ্ধি প্রয়োগের প্রয়োজন। কিন্তু তারা ঘুণাক্ষরেও সেদিকে যেতে চায় না। এভাবে তারা ধর্মীয় বিষয়ে ধ্বংসাত্মক ও নৈরাজ্যবাদী চিন্তা ও কর্মের পথে ধাবিত হয়। আর এ জাতীয় ধ্বংসাত্মক কোনো বিষয়ে চিন্তা ও বুদ্ধির প্রয়োগ ঘটানো, নিজের স্বার্থ ও সিদ্ধান্তের ক্ষতি হয় এমন কোনো বিষয়ে বুদ্ধি ও চিন্তার প্রয়োগ ঘটানোকে কেউই ভালো মনে করে না। এটাই স্বাভাবিক ব্যাপার।

আল্লাহ তায়ালা মানুষের কল্যাণের জন্য ধর্ম দিয়েছেন। সবশেষে ইসলাম ধর্মকে মানুষের জন্য চূড়ান্ত করে দিয়েছেন। কেয়ামত অবধি আর কোনো ধর্ম সঠিক পথপ্রদর্শন করতে পারবে না। আর তা আল্লাহ তায়ালার কাছে গৃহিতও হবে না। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন :

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ❁

"আর যে কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম তালাশ করে কস্মিনকালেও তা গ্রহণ করা হবে না। পরকালে সে হবে ক্ষতিগ্রস্ত।" [আলে ইমরান-৮৫]

অন্যত্র আরো ইরশাদ হয়েছে,

إِنَّ اللهَ اصْطَفٰى لَكُمُ الدِّيْنَ فَلَا تَمُوْتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ ❁

"নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের জন্য এ ধর্ম (ইসলাম)-কে নির্বাচিত করেছেন। কাজেই তোমরা মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।" [সূরা বাকারা-১৩২]

এজন্য ইসলাম ধর্ম নিয়ে চিন্তা ও গবেষণা এবং এর শিক্ষা ও নির্দেশনাকে ব্যাপকভাবে কার্যকর করার জন্য নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে বুদ্ধি-বিবেকের প্রয়োগ নিঃসন্দেহে ঈমানের দাবি এবং অপরিহার্যও বটে। অথচ এদিকটাই আজ উপেক্ষিত। যেখানেই আজ মুক্তচিন্তা ও মুক্তবুদ্ধি চর্চার কথা বলা হয়, সেখানেই মূলত ইসলামি চিন্তা-চেতনা বিসর্জন দিয়ে ভ্রান্ত চিন্তা-চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটানোর মানসিকতা প্রকাশ করা হয়। এটি কোনো যুক্তিতে কাম্য হতে পারে? এ ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআনের একটি আয়াতের প্রেক্ষাপট বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا ادْخُلُوْا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ.

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না।" [সূরা বাকারা-২০৮]

আয়াতের প্রেক্ষাপট হলো—হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম রাযি. প্রমুখ প্রথমে ইহুদি আলেম ছিলেন। সে ধর্মমত অনুযায়ী শনিবার ছিল সপ্তাহের পবিত্র দিন আর উটের গোশ্ত ছিল হারাম। ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর ধারণা হয় যে, হযরত মূসা আ.-এর ধর্মে শনিবারকে পবিত্র দিন হিসেবে সম্মান করা ওয়াজিব। কিন্তু ইসলাম ধর্মে শনিবারকে অসম্মান করা তো ওয়াজিব নয়। তেমনিভাবে মূসা আ.-এর শরিয়তে উটের গোশ্ত খাওয়া হারাম; কিন্তু ইসলাম ধর্মে তা খাওয়া ফরজ নয়। কাজেই যদি যথারীতি শনিবারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয় আর উটের গোশ্ত হালাল জেনেও তা বর্জন করা হয়, তা হলে তো দু'কুলই রক্ষা হয়।

হযরত মূসা আ.-এর শরিয়তের প্রতিও আস্থা থাকে; আবার ইসলামের বিরোধিতাও হয় না। আল্লাহ তায়ালা আলোচ্য আয়াতে যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে এ ধারণার সংশোধনী উচ্চারণ করেছেন, যার সারমর্ম হল—

"ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ দীন। চিন্তা-চেতনা ও বিদ্যা-বুদ্ধি দিয়ে ইসলামের চূড়ান্ত আনুগত্য করতে হবে। ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিত মনে সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নিতে হবে। ইসলামের প্রতিটি নির্দেশনা প্রাণপণে বাস্তবায়ন করতে হবে। এখানে দ্বিমুখী চিন্তা-ভাবনার কোনো অবকাশ নেই বরং একনিষ্ঠ হয়ে ইসলামকে নিয়ে ভাবতে হবে অথবা ইসলামের গন্ডিতে থেকে ইসলামের আলোকে আলোকিত হতে হবে।

আবার এমন বিষয় নিয়েও ভাবা যাবে না, যাতে খোদ সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব নিয়ে মনের মধ্যে সংশয়ের জন্ম হয়। সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণার মাত্রা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং হাদিসে ইরশাদ হয়েছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَا يَزَالُ النَّاسُ يَتَسَاءَلُونَ حَتَّى يُقَالَ: هٰذَا خَلَقَ اللهُ الْخَلْقَ، فَمَنْ خَلَقَ اللهَ؟ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا، فَلْيَقُلْ: آمَنْتُ بِاللهِ

রাসূল ﷺ বলেন, মানুষ পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদ করে। এমনকি বলা হয়, এসবকে তো আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টি করেছেন, তা হলে আল্লাহ তায়ালাকে কে সৃষ্টি করেছেন? যার এমন প্রশ্ন জাগবে, সে যেন বলে آمَنْتُ بِاللهِ 'আমি আল্লাহ তায়ালার প্রতি ঈমান এনেছি।' [বুখারি ও মুসলিম]

কাজেই বুঝা গেল, আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্ব বিষয়ে কোনো জিজ্ঞাসাবাদ বা চিন্তা-ভাবনার অবকাশ নেই। এটি শয়তানি প্ররোচনা এবং ঈমান বিধ্বংসী অপপ্রয়াস। এমন ধারণা হলেই ঈমানের দিকে ফিরে আসতে হবে। আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি ও সৃষ্টিজগৎ নিয়ে চিন্তা ও গবেষণা করতে হবে। তা হলে আল্লাহ তায়ালার অপার মহিমা উন্মুক্ত হবে। আল্লাহ তায়ালার প্রতি ঈমানের মাত্রা আরো বেড়ে যাবে। এতে ঈমান আরো মজবুত ও সুদৃঢ় হবে। এমন চিন্তা-গবেষণা ও বুদ্ধিকে কাজে লাগানো নিঃসন্দেহে উৎসাহব্যঞ্জক ও কাম্য বিষয়। আল্লাহ তায়ালা নিজেই এরশাদ করেন–

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ❖

"নিশ্চয় আসমান ও জমিনের সৃষ্টিতে, রাত-দিনের বিবর্তনে এবং নদীতে নৌকাসমূহে; আর আল্লাহ তায়ালা আকাশ থেকে যে পানি অবতীর্ণ করেছেন, যা দ্বারা মৃত জমিনকে সজীব করে তুলেছেন এবং তাতে ছড়িয়ে দিয়েছেন সব রকম জীবজন্তু। আর বায়ুর দিক পরিবর্তনে এবং আসমান ও জমিনের মাঝে নিয়ন্ত্রিত মেঘমালাতে নিদর্শন রয়েছে বুদ্ধিমান সম্প্রদায়ের জন্য।" [সূরা বাকারা-১৬৪]

পক্ষান্তরে মুক্তচিন্তা ও মুক্তবুদ্ধি চর্চার নামে আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্ব নিয়ে সংকটে পড়া অথবা ইসলামের নির্দেশনা বহির্ভূত মুক্তচিন্তা ও মুক্তবুদ্ধি চর্চার প্রচলন ঘটানো কোনোভাবেই কাম্য হতে পারে না। ইসলামে এসবের কোনো অবকাশই নেই। আল্লাহ তায়ালা আমাদের রক্ষা করুন। আমিন!

[মাসিক আল-কাউসার,
জুমাদাল উলা-১৪৩৪হি.; মার্চ-২০১৩ খ্রি.]



# তৃতীয় অধ্যায় : নাস্তিক্যবাদের ভ্রান্তি নিরসন

প্রথমে আমরা তাদের ভ্রান্তিগুলো দেখে নেই। তাদের ভ্রান্তিগুলো হল–

১। আল্লাহর অস্তিত্ব নেই।

২। স্রষ্টা বলতে কেউ নেই।

৩। পরকাল বলতে কিছু নেই।

৪। কুরআন আসমানি কিতাব নয়।

৫। ধর্মের কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই।

৬। ভূ-মণ্ডল ও নভোমণ্ডলে যা কিছু হচ্ছে, সবই প্রাকৃতিক ও অনাদী।

প্রথম দু'কথার মূলকথা আল্লাহ তায়ালা তথা স্রষ্টার অস্তিত্ব বিষয়ে। বিধায় এ দুটি ভ্রান্তির জবাব একসাথে দেওয়া হল।

## ১-২. আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্ব

আল্লাহ তায়ালা এমন এক সত্তা, যাঁর অস্তিত্ব চিরসত্য। এ পৃথিবীর বাগ-বাগিচা, গাছ-পালা, পশু-পাখিসহ যা কিছু আছে সবকিছু তাঁরই সৃষ্টি। এসব সৃষ্টির যে কোনো একটির দিকে দেখলেই আল্লাহ তায়ালাকে দেখা যায়।

'নাস্তিকতা ও ইসলাম' নামক পুস্তকে আছে–

"স্রষ্টা মানুষ ও মহাবিশ্ব নিয়ে কোনো কিছু ভাবেন না। মানুষের ব্যাপারে তাঁর কোনো মাথাব্যথা নাই। (নাউযুবিল্লাহ!)"

এ শুধু হকিং-এর কথা নয়। বেশকিছু নাস্তিক পণ্ডিত এমনি ধারণা পোষণ করেন। এ ধারণা একটি ভুল ধারণা। পৃথিবীতে অন্যায়, যুদ্ধ-বিগ্রহ, দারিদ্র্য, খাদ্যাভাব, হতাশা, রোগ-ব্যাধি, খরা, অপরাধ-জুলুম, বন্যা, ভূমিকম্প, হত্যা ইত্যাদি রয়েছে বলে কি স্রষ্টা বিশ্ব সম্পর্কে নির্লিপ্ত? আসলে তা নয়। ভালো-মন্দ সবকিছু মিলিয়েই স্রষ্টার বিশ্ব।

বিশ্বের ভালো-মন্দ সম্পর্কে স্রষ্টার ভাষায়ই জ্ঞান নিতে হবে। স্রষ্টা মানুষ সম্পর্কে একেবারে নির্লিপ্ত নন। মানুষকে ভালবাসেন তিনি। তাই তিনি বিশিষ্ট ব্যক্তি ও নবীগণের মাধ্যমে তাঁর কালাম ও কথা পেশ করেছেন। এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। হযরত মূসা আ., হযরত দাউদ আ., হযরত ঈসা আ. ও

হযরত মুহাম্মদ ﷺ-সহ সকল নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে স্রষ্টা মানুষের ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় সম্পর্কে নানা মন্তব্য করেছেন, নানা তথ্য প্রদান করেছেন। এসব হেসে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না।

হযরত আদম আ. থেকে হযরত মুহাম্মদ ﷺ পর্যন্ত এ দীর্ঘ সময়ে অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি স্রষ্টার কথা বর্ণনা করেছেন। বর্তমানে প্রাপ্ত নতুন ও পুরাতন বাইবেল, ইহুদিদের তৌরাত (তোরা) ও ইসলামের কুরআনে এখানে-সেখানে কিছু পার্থক্য থাকলেও মূল সুর একই। স্রষ্টা এ মহাবিশ্ব, জীবজন্তু ও মানুষ সবই সৃষ্টি করেছেন,। তিনি মানুষের মঙ্গলের জন্য মাঝে মাঝে কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তিকে কিছু দায়িত্ব দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন মানুষকে সঠিক পথে চলার নির্দেশনা দিয়ে। স্রষ্টা তাঁর একটি নীতির কারণেই প্রতিটি মানুষের সম্মুখে সশরীরে হাজির হবেন না। তিনি বিশ্বের মানুষকে তাঁর দূতের মাধ্যমে তাঁর বাণী জানান। ভক্তিপ্রবণ মানুষ এসব বিশিষ্ট ব্যক্তিকেই অতিভক্তি দেখিয়ে আসল স্রষ্টাকে বাদ দিয়ে এদের কাউকে কাউকে স্রষ্টা, ভগবান, গড, খোদার পুত্র ইত্যাদি নামে প্রচার করেছে। এটি একটি মারাত্মক ভুল। এসব ব্যক্তির সবাই স্রষ্টার দূত-প্রতিনিধি। তাঁরা কেউই স্বয়ং স্রষ্টা নন।

যা হোক! এসব ব্যক্তিত্বের অন্যতম সর্বশেষ নবী স্রষ্টার যে বাণী কুরআন মাজিদের দ্বারা বহন করে এনেছেন, তাতে মানুষের বহু প্রশ্নের জবাব রয়েছে। আর এসব জবাব উদ্ভট নয়। কুরআন মাজিদের কোনো অংশই মিথ্যা প্রমাণ করা যায় নি বিধায় এসব জবাব ও তথ্য নির্ভরযোগ্য। কুরআন মাজিদের ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ ও বৈজ্ঞানিক তথ্যসমূহ সম্পূর্ণ নির্ভুল পাওয়া গেছে। কুরআন মাজিদ তাই এখন পর্যন্ত পৃথিবীর মানুষকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে যাচ্ছে, এমন একটি রচনা পেশ করতে। কিন্তু আজো পর্যন্ত কেউ এ চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করে সফল হতে পারেনি।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ নিরক্ষর হলেও তাঁর মুখনিঃসৃত কুরআন মাজিদ নিজেই একটি অলৌকিক বস্তু। এটি হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর রচনা নয়। এটি তাঁর নিজের বাণী নয়। তিনি পুরো গ্রন্থটি প্রকাশের শুধু একটি মাধ্যম মাত্র। রেডিও, টেলিভিশন সেট যার আছে, সেই কোনো দূরবর্তী রেডিও, টেলিভিশন কেন্দ্রের কথা ধরতে পারে; অন্যরা তাতে অক্ষম। হযরত মুহাম্মদ ﷺ হযরত মূসা আ., হযরত ঈসা আ. প্রমুখ নবীগণের স্রষ্টার বাণী গ্রহণের ক্ষমতা ছিল বলেই তাঁরা আসমানি গ্রন্থ মানুষকে উপহার দিয়েছেন। হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর মাধ্যমে স্রষ্টার প্রেরিত গ্রন্থটি সর্বশেষ গ্রন্থ। তাই এতে রয়েছে সর্বশেষ ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য ও বাণী। যে গ্রন্থটিকে আমরা পবিত্র কুরআন নামে জানি। পবিত্র কুরআনের স্রষ্টা তাঁর দায়িত্ব সচেতনতা সম্পর্কে ইরশাদ করেন–

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللهِ وَمَا اللهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ❖

"তার চেয়ে বড় জালেম কে, যে আল্লাহর পক্ষ থেকে তার কাছে প্রমাণিত সাক্ষ্যকে গোপন করে? আল্লাহ তোমাদের কর্ম সম্পর্কে বেখবর নন।"

[সূরা বাকারা-১৪০]

স্রষ্টার পরিচয় ও অবদান সম্পর্কে ইরশাদ হচ্ছে–

الرَّحْمَنُ ❖ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ❖ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ❖ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ❖ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ❖ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ❖ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ❖ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ❖ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ❖ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ❖ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ ❖ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ❖ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ❖

"করুণাময় আল্লাহ তায়ালা। শিক্ষা দিয়েছেন কুরআন। সৃষ্টি করেছেন মানুষ। তাকে শিখিয়েছেন বর্ণনা। সূর্য ও চন্দ্র হিসাব মতো চলে। আর নক্ষত্র ও বৃক্ষলতা সাজদারত আছে। তিনি আকাশকে করেছেন সমুন্নত এবং স্থাপন করেছেন তুলাদণ্ড। যেন তোমরা সীমালঙ্ঘন না কর তুলাদণ্ডে। তোমরা ন্যায্য ওজন কায়েম কর এবং ওজনে কম দিও না। তিনি পৃথিবীকে স্থাপন করেছেন সৃষ্টিজীবের জন্যে। এতে আছে ফলমূল ও বহিরাবরণবিশিষ্ট খেজুর গাছ। আর আছে খোসাবিশিষ্ট শস্য ও সুগন্ধি ফুল। তাই তোমরা উভয়ে (মানব ও জিন) তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?"

[সূরা আর-রহমান : ১-১৪]

এমন হাজার হাজার যুক্তি-প্রমাণ আমাদের সম্মুখে আছে, যেগুলো আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্বকে অকাট্যভাবে প্রমাণ করে। কিন্তু মানুষের মধ্যে কেউ কেউ তাঁকে অস্বীকার করে। পবিত্র কুরআন বলে–

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ❖ ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ ❖

"মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহ সম্বন্ধে বিতর্ক করে; তাদের না আছে জ্ঞান, না আছে নির্দেশক, না আছে কোনো দীপ্তিমান কিতাব। সে বিতর্ক করে ঘাড় বাঁকিয়ে লোকদেরকে আল্লাহ তায়ালার পথ হতে ভ্রষ্ট করার জন্য। তার জন্য লাঞ্ছনা আছে ইহলোকে এবং কিয়ামত দিবসে আমি তাকে আস্বাদন করাব দহন-যন্ত্রণা।" [সূরা হজ : ৮-৯]

পবিত্র কুরআনে আরো ইরশাদ হয়েছে,

وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ❖

"তুমি যতই চাও না কেন, বেশিরভাগ লোকই বিশ্বাসী নয়।"

[সূরা ইউসুফ-১০৩]

এজন্যই অনেকের কাছে স্রষ্টার অস্তিত্ব কুহেলিকাময়। কেউ তাঁর অস্তিত্বে বিশ্বাস করে, কেউ অবজ্ঞা করে। মানবকেই তার নিজস্ব জ্ঞান, প্রতিভা, অনুভূতি দিয়ে এর মুখোমুখী হতে হবে। ভুল সিদ্ধান্তে সবই ভণ্ডুল হয়ে যাবে। কারণ, মানুষ এতে সত্য বিচ্যুত হয়ে পড়বে।

[স্টিফেন হকিং, নাস্তিকতা ও ইসলাম : ১৫-২০]

**আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্ব ও আমাদের সীমাবদ্ধতা**

আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্বের অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ হাজার হাজার রয়েছে। সব যুক্তি হয়তো আমাদের বুঝে আসবে না। কেননা আমরা ও আমাদের বিবেক-বুদ্ধি, যুক্তি-প্রমাণ—সবই সসীম। সসীমের পক্ষে অসীমকে বুঝতে যাওয়ার মতো মূর্খতা আর হয় না।

শুধু মানুষ কেন, সৃষ্টি বলতেই স্থান ও কালের অধীন। আর স্রষ্টা সময় বা কাল এবং স্থান বা Space এর উর্ধ্বে। আমরা যেখানে eternity ও infinity তথা অনাদি ও অনন্ত শব্দ দুটির যথার্থতাই বুঝি না, সেখানে কী করে আমরা eternal ও infinite আল্লাহ তায়ালাকে বুঝতে পারব?

এজন্য সতর্ক করে আমাদেরকে বলা হয়েছে, তোমরা আল্লাহ তায়ালাতে চিন্তা করো না বরং তাঁর সৃষ্টিতে চিন্তা করো।

[উসূলুস সুন্নাহ-ইবনে আবী যিমনীন (মৃত-৩৯৯) হাদিস নং ২৬]

উল্লেখ্য, এ সসীম জীবনে আমরা আল্লাহর অনন্ত অনাদি সত্তাকে বুঝতে পারব না। পরজীবনে গিয়ে অনাদি ও অনন্ত অসীম সত্তার উপলব্ধি হবে।

[মাসিক রাহমানী পয়গাম ডিসেম্বর ১৯৯৭ইং পৃ. ১৯]

জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট তার 'Critique of Pure Reason' নামক বইয়ে উল্লেখ করেছেন অসীম বাস্তবতা একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট। যা মানব মস্তিষ্ক সাধারণত উপলব্ধি করতে পারে না। আল্লাহর মতো একটি মহাবৈশ্বয়িক এবং স্বয়ংভূ সত্তার অস্তিত্ব উপলব্ধি করতেও স্বভাবতই এটি অক্ষম।

অন্যদিকে বিখ্যাত মুসলিম দার্শনিক হযরত ইবনে আরাবি রহ. 'আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছেন?' এরূপ প্রশ্ন করাকে 'একটি বিশৃঙ্খল চিন্তার বহিঃপ্রকাশ' বলে আখ্যায়িত করেছেন। তার মতে আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্ব সন্দেহের উর্ধ্বে আর অন্য কোনো কিছুকে বা মহাবিশ্বকে আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্বের প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করা ভ্রমাত্মক।

আল্লাহ খোদ এমন একটি প্রমাণ, যা প্রমাণের জন্য অন্য কোনো প্রমাণের প্রয়োজন নেই। তিনি নিজেই প্রত্যক্ষ সত্য। তিনিই সেই প্রমাণ, যা অন্য সব কিছুর সত্যায়ন করে। তিনি স্পষ্টতা দানকারী সবকিছুর বিন্যাসে, সূক্ষ্মতায়, সৌন্দর্যে ও ধারাবাহিকতায়; গাছের পাতা, পাখির পালক, প্রজাপতির ডানা, ফুলের সুগন্ধ, কোকিলের গান, গ্রহ-নক্ষত্রের সামঞ্জস্য; যাকে আমরা মহাবিশ্ব বলি—এসব কিছুর যথার্থতা প্রদানকারী একমাত্র তিনিই।

## আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্বের প্রমাণসমূহ

এ পৃথিবীতে আল্লাহ তায়ালা তাঁর অস্তিত্বের অসংখ্যা অগণিত প্রমাণ রেখে দিয়েছেন। গাছের পাতায় পাতায়, পানির কণায় কণায়, শব্দের তরঙ্গমালায়, পাহাড়ের ঝরণাধারায়, সাগরের বয়ে চলায়আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্বের প্রমাণ বিরাজমান। উদাহরণস্বরূপ অল্প কয়েকটি প্রমাণই নিম্নে উল্লেখ করা হল। কপালে হিদায়েত থাকলে তাই যথেষ্ট হবে ইনশাআল্লাহ।

### প্রমাণ-১

বিজ্ঞানমনস্ক আলেম আল্লামা মুফতি দিলাওয়ার হুসাইন দা.বা. বলেন–

পৃথিবীর কেউ অসুস্থ হতে চায় না; কিন্তু অসুস্থ হয়। বুঝা গেল, সুস্থতা ও অসুস্থতা আমার হাতে নয়।

পৃথিবীর কেউ গরিব হতে চায় না; তারপরও গরিব হয়। বুঝা গেল, গরিব আর ধনী হওয়া আমার হাতে নয়।

পৃথিবীর কেউ বৃদ্ধ হতে চায় না; কিন্তু বৃদ্ধ হয়। বুঝা গেল, যৌবন আমার নিজের হাতে নয়।

পৃথিবীর কেউ মৃত্যুবরণ করতে চায় না; কিন্তু সকলকে মরতেই হয়। বুঝা গেল, বাঁচা-মরা আমার হাতে না। এসব কিছু যাঁর হাতে, তিনিই আল্লাহ।

### প্রমাণ-২

বিশিষ্ট জীববিজ্ঞানী ফ্রাংক এলিন লিখেছেন :

"আমরা যখন মেনে নিলাম যে, এ জগতটি বিদ্যমান আছে, তখন আমরা এর অস্তিত্বকে কিভাবে মূল্যায়ন করব?"

এ প্রশ্নের জবাবের চারটি সম্ভাবনা আছে–

১। হয়তো এ জগতটি শুধু ধারণা ও কল্পনানির্ভর; বাস্তবতা বলতে কিছু নেই। এ জবাবটি জগত আছে বলে আমাদের মেনে নেওয়ার পরিপন্থি। সুতরাং তা গ্রহণযোগ্য নয়।

২। অথবা হতে পারে এ জগতটি নিজে নিজেই অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব লাভ করেছে। এটা তো স্পষ্টত অগ্রাহ্য হয়ে যায়।

৩। অথবা এ জগতটি অনাদি। তার কোনো শুরু নেই। এ সম্ভাবনাটি ওই কথার সাথে মিলে যায়, যা মুমিনগণ আল্লাহ তায়ালার ব্যাপারে বলে থাকেন। অথচ এ জগতের ব্যবস্থাপনা ইঙ্গিত করে যে, এর মূল ও ভিত্তি কোনো এককালের সাথে বন্ধনযুক্ত, নির্দিষ্ট কোনো একটি মুহূর্তে তা শুরু হয়েছে। সুতরাং সে ক্ষেত্রে এটিও বিভিন্ন ঘটনাবলির মধ্য থেকে একটি ঘটনা। আর এর অস্তিত্বকে কোনো আকস্মিকতার দিকে ফিরিয়ে দেওয়াও বুদ্ধিগতভাবে অসম্ভব। এজন্য এ সম্ভাবনাও বাতিল।

৪। অথবা এ জগতের জন্য একজন স্বয়ম্ভু সৃষ্টিকর্তা আছেন, যিনি এ জগতকে সৃষ্টি করেছেন। এ সম্ভাবনাটিকে নির্দ্বিধায় বিবেক গ্রহণ করে। এ সম্ভাবনা সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে এমন কোনো প্রশ্ন আসে না, যদ্দরুন বুদ্ধিগতভাবে এ সম্ভাবনা বাতিল করে দেওয়া যায়। সুতরাং এ সম্ভাবনার উপর নির্ভর করাই আবশ্যক হয়ে গেল। অর্থাৎ এ জবাবই সাব্যস্ত হয়ে গেল, জগতের একজন স্বয়ম্ভু সৃষ্টিকর্তা আছেন। তিনি হলেন আল্লাহ তায়ালা। [ছুরাউন মায়াল মালাহিদাতি হাত্তাল আজম/শামেলা-১/৯৯]

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন,

أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ ۞

"শোনো! তারা তাদের পালনকর্তার সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারে সন্দেহে পতিত রয়েছে। শোনো! তিনি সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছেন।"

[সূরা হামীম আস্ সাজদা-৫৪]

**প্রমাণ-৩**

কতিপয় নাস্তিক একদা হযরত ইমাম আযম আবু হানিফা রহ.-কে আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্বের প্রমাণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিল। তিনি জবাবে বললেন, তোমরা আমাকে একটা বিষয় একটু ভাবতে দাও। কতিপয় লোক আমাকে এ মর্মে একটা সংবাদ দিল যে, একটা সমুদ্রে ব্যবসার মালামাল বোঝাই একটা নৌকা কোনো মাঝি ছাড়াই আপনা আপনি চলছে, সমুদ্রের ঢেউ চিরে সম্মুখে অগ্রসর হচ্ছে। কারো কোনোরূপ পরিচালনা ছাড়াই ইচ্ছামতো সেটি নিজের গন্তব্যে পৌঁছে যাচ্ছে।

একথা শুনে তারা ইমাম সাহেবকে বলল, কোনো বদ্ধ পাগল ছাড়া এমন কথা কেউ বলতে পারে না। তখন ইমাম আযম হযরত আবু হানিফা রহ. বললেন, তা হলে এ মহা উর্ধ্বজগৎ, অধঃজগৎ এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী এ বিশাল সৃষ্টিরাজির কোনো সৃষ্টিকর্তা থাকবে না, তা কী করে হয়? লোকগুলো নির্বাক হয়ে চলে গেল। [ফাতহুল মুলহিম-১]

**প্রমাণ-৪**

হযরত ইমাম শাফিঈ রহ.-কে আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্বের প্রমাণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন– 'এই দেখো তুত গাছের পাতা। প্রত্যেক পাতার স্বাদ ও গুণ অভিন্ন। কিন্তু এ তুত গাছের পাতা রেশম পোকায় আহার করলে সে পাতা রেশম হয়ে বের হয়, মধু পোকায় আহার করলে তা মধু হয়ে বের হয়ে আসে, গরু-ছাগলে আহার করলে গোবর হয়ে বের হয়ে আসে আর হরিণে আহার করলে মৃগনাভী কস্তুরি হয়ে বের হয়। অথচ বস্তু এক।' ইমাম শাফিয়ি রহ. বুঝাতে চাইলেন যে, এ সূক্ষ্ম কারিগরি কার? এর পিছনে নিশ্চয় একজন সুনিপুণ কারিগর রয়েছেন। সেই কারিগর হলেন আল্লাহ তায়ালা।

[ফাতহুল মুলহিম-১]

**প্রমাণ-৫**

হযরত ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ.-কে স্রষ্টার অস্তিত্বের দলিল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, 'আমি একটি ক্ষুদ্র আকারের মসৃণ দুর্গ দেখতে পাই। যাতে আসা-যাওয়ার কোনো পথ, এমনকি কোনো ছিদ্র ছিল না। তার উপরটা দেখতে রূপার মতো শুভ্র; আর ভিতরটা স্বর্ণের মতো। তারপর একসময় সে দুর্গটি বিদীর্ণ হয়। তার দেয়াল ফেটে ফুটফুটে একটি বাচ্চা বের হয়ে আসে। অর্থাৎ ডিমের ভিতর থেকে বাচ্চা বের হয়ে আসে।'

ইমাম আহমাদ রহ. বুঝাতে চাইলেন, এমন একটি দুর্গ সদৃশ ডিম থেকে বের হয়ে সে তার শত্রু-মিত্র চিনতে সক্ষম হয়। তাই সে চিল-কাকের উপদ্রব দেখলে মায়ের ডানায় আশ্রয় নেয়। যে বাচ্চা ডিমের ভিতর কোনো দানাপানি দেখেনি, সে বের হয়ে এসেই নিজের খাদ্য চিনতে পারে। ডিমের ছিদ্রহীন বদ্ধ ঘরে এ বাচ্চাটিকে এতসব কে শিখাল? যিনি শিখিয়েছেন, তিনিই আল্লাহ তায়ালা, তিনিই সৃষ্টিকর্তা। (ফাতহুল মুলহিম-১)

**প্রমাণ-৬**

এক চরকাওয়ালী বুড়িকে জিজ্ঞাসা করা হয়, জীবন তো শেষ হলো চরকা কেটে কেটে, স্রষ্টার পরিচয় কি পেয়েছ? সে উত্তর করল, হাঁ! এ চরকাই তো তার জ্বলন্ত প্রমাণ। যতক্ষণ ঘুরাই, কেবল ততক্ষণই ঘুরে। নয়তো স্থির হয়ে যায়। তাই বুঝতে বাকি নেই যে, এ ক্ষুদ্র চরকার জন্য যদি চালকের প্রয়োজন হয়, তবে এ বিরাট বিশ্ব-ভূবনের জন্য নিশ্চয়ই মহা-চালক দরকার।

[হক ও বাতিলের চিরন্তন দ্বন্দ্ব—আহমদ শফি']

**প্রমাণ-৭**

ইমাম জাফর ছাদিক রহ.-এর নিকট একবার এক নাস্তিক এসে জিজ্ঞাসা করল, স্রষ্টার পরিচয় কী? সে সময় এক শিশু একটি ডিম হাতে এসে হাজির

হয়। ইমাম ডিমটি হাতে নিয়ে বললেন, এটা একটি আশ্চর্যজনক কিল্লা। এর চারপাশে শক্ত আবরণী, ভিতরে আবার পাতলা আবরণী। ভিতরে তরল রূপা (ডিমের সাদা অংশ) এবং তরল সোনা (ডিমের হলুদ অংশ)। যত নড়াচড়া করা হোক, এ তরল অংশ দুটি মিশ্রিত হয় না। পৃথকই থাকে। এ ডিমের ভিতর থেকে একসময় রঙ বেরঙের পাখির ছানা বেরিয়ে আসবে। এর সুন্দর সুন্দর ডানা। কে এ ডানাকে রঙ-বেরঙ করল? তা ছাড়া কোত্থেকে আসল এর পা, ঠোঁট, পাখা, চোখ, কান ও পেট ইত্যাদি? কেউ তো ডিমের ভিতরে প্রবেশ করে এসব করেনি? যে শক্তি এসব করেছে, তিনিই স্রষ্টা আল্লাহ।

**প্রমাণ-৮**

এক নাস্তিক একবার ইমাম জাফর ছাদিক রহ.-কে জিজ্ঞাসা করল, তিনি কিভাবে স্রষ্টার প্রমাণ দিবেন? ইমাম জানতেন, সেই ব্যক্তি সাগরে কয়েকবার সফর করেছে। ইমাম বললেন, সে কি সমুদ্রে ঝড়ে পড়েনি? হঠাৎ ঝড় এসে গেল, জাহাজের পাল ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল, জাহাজ ডোবার মতো হয়ে উঠল। জাহাজ ডুবতে লাগল। ঢেউয়ের হাতে দিশেহারা হলো যাত্রীগণ। এ সময় মনের অভ্যন্তরে একটু আশা জাগে, একটি শক্তি, একটি অদেখা, অদৃশ্য শক্তি হয়ত তাদের বাঁচিয়ে নিবে। আর সে দুর্যোগের মুহূর্তে যে শক্তির কথা মনে জাগে, সেই শক্তিই হলেন মহান স্রষ্টা আল্লাহ তায়ালা।

**প্রমাণ-৯**

ইমাম জাফর ছাদিক রহ. এক নাস্তিককে বললেন, যদি মৃত্যুর পরে গিয়ে আস্তিক ও নাস্তিক উভয়ে দেখে যে কোনো খোদা নেই, কোনো পরকাল নেই, তা হলে কি আস্তিকের কোনো বিপদ হবে? বরং আস্তিক নাস্তিক উভয়ের একই অবস্থা হবে। তবে যদি দেখা যায় যে, খোদা আছেন, পরকাল আছে, তা হলে তো নাস্তিকরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কাজেই ভবিষ্যতে লাঞ্ছনা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহতে বিশ্বাস রাখাই তো প্রকৃত জ্ঞানের দাবি।

**প্রমাণ-১০**

হযরত আলী রাযি.-কে স্রষ্টার প্রমাণ দিতে বললে তিনি বললেন, উট বা গাধার মল দেখে বোঝা যায় যে এ প্রাণীগুলো কোন্ দিক থেকে এসে কোন্ দিক দিয়ে গেছে। মানুষের পায়ের চিহ্ন দেখেও মানুষের আনাগোনা বোঝা যায়। তিনি আরো বলেন, এ বিপুল মহাবিশ্বের এত কিছুর বিশালতা ইত্যাদি কি স্রষ্টার অস্তিত্বের দিকে ইঙ্গিত করে না? [নাস্তিকের যুক্তি খণ্ডন]

**প্রমাণ-১১**

গণিত ও রসায়নবিদ ড. জন ক্লীভল্যান্ড কথর‍্যান বলেন, 'বিশ্বের অন্যতম প্রধান পদার্থ বিজ্ঞানবিদ লর্ড কেলভীন নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ উক্তি করেছেন,

"আপনি যদি খুব গভীরভাবে চিন্তা করেন, তা হলে বিজ্ঞান আপনাকে আল্লাহ তায়ালাতে বিশ্বাস স্থাপন করতে বাধ্য করবে।"

এ উক্তি উদ্ধৃত করার পর ড. জন ক্লীভল্যান্ড কথর‍্যান বলেন– আমাকে অবশ্য স্বীকার করতে হচ্ছে, আমিও তার এ উক্তির সাথে সম্পূর্ণ একমত।

**প্রমাণ-১২**

ড. জন ক্লীভল্যান্ড কথর‍্যান আরো বলেন, 'রসায়ন শাস্ত্র এ তথ্য প্রকাশ করে যে, জড় পদার্থ ক্রমশ বিলুপ্ত হচ্ছে। কতক খুব ধীরে ধীরে আবার কিছু অত্যন্ত তাড়াতাড়ি ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। কাজেই বলা যায়, জড় পদার্থের অস্তিত্ব শাশ্বত নয়। নিশ্চয় জড় পদার্থের একটা আরম্ভও আছে।'

**প্রমাণ-১৩**

ড. জন ক্লীভল্যান্ড কথর‍্যান আরো বলেছেন, এ জড়জগৎ যখন নিজেকে নিজে সৃষ্টি করতে পারে নি, তাকে পরিচালনাকারী আইনাবলি সৃষ্টি করতে পারেনি, তখন সৃষ্টির এ কাজ নিশ্চয় অজড় কোনো সত্তা দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে আর সে সত্তা নিশ্চয় সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষার অধিকারী।

**প্রমাণ-১৪**

গণিতবিদ ও পদার্থ বিজ্ঞানী ডোনাল্ড হেনরী পিটার বলেন, 'আমার বক্তব্য হল, যদি এ ধারাবাহিক সৃষ্টি সম্পর্কিত থিওরি সমর্থন করতে হয়, তা হলে আমি অবশ্যই সৃষ্টিকর্তা হিসেবে আল্লাহ তায়ালাকে স্বীকার করব।'

**প্রমাণ-১৫**

ডোনাল্ড হেনরী পিটার আরো বলেন, 'প্রকৃতির উৎপত্তি সম্পর্কে যে কোনো কিছুই বিবেচনা করা হোক না কেন, একজন বৈজ্ঞানিক হিসেবে সকল বিষয়ে প্রধান ভূমিকায় আল্লাহ তায়ালাকে বসিয়ে আমি পরম সন্তুষ্টি লাভ করি। প্রতিটি ছবিতে আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন মূল চরিত্র। আর যেসব প্রশ্নের আজও জবাব দেওয়া হয়নি, একমাত্র তিনিই তার জবাব।'

**প্রমাণ-১৬**

প্রাণ-পদার্থ বিজ্ঞানী পলক্ল্যারেন্স ইবারসোল্ড বলেন, 'ইংরেজ দার্শনিক ও রাজনীতিক ফ্যান্সিস বেকন তিন শতাব্দিরও আগে বলেছিলেন, দর্শন জ্ঞানে স্বল্পতা মানুষকে নাস্তিকতার দিকে নিয়ে যায়, আর গভীর দর্শন জ্ঞান তাকে ধর্মের পথে টেনে আনে।' এ যেমন ইংরেজি প্রবাদ A Little Learning is a Dangerous Thing (অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী)-এর মতো।

**প্রমাণ-১৭**

পলক্ল্যারেন্স আরো বলেন, 'মানবজাতির অভ্যুদয়ের পর থেকে অদ্যাবধি লাখকে লাখ দিয়ে গুণ করলে যে সংখ্যা দাঁড়ায়, তার চাইতেও বেশিসংখ্যক চিন্তাশীল অনুসন্ধিৎসু প্রতিটি ব্যক্তিই স্বতন্ত্র এসব রহস্যময় প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছেন—কোন্ সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষা ও কোন্ অনন্ত শক্তিশালী মনীষা এ অন্তহীন মহাবিশ্বকে পরিচালনা করেন? জীবন ও মানুষের অভিজ্ঞতার উৎসমূলে অথবা বাইরে কী আছে?

**প্রমাণ-১৮**

পলক্ল্যারেন্স আরো বলেন, আল্লাহ তায়ালা কোনো অর্থেই শরীর নন। তাই শারীরিক উপলব্ধি দিয়ে তাঁকে বোঝানো মানুষের ক্ষমতার বাইরে। সেইসঙ্গে তাঁর অস্তিত্ব সম্পর্কে পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক প্রমাণ বিদ্যমান এবং তিনি যে বুদ্ধি, জ্ঞান ও শক্তিতে বর্ণনাতীত, তাঁর সৃষ্টি সে কথারই সাক্ষ্য দিচ্ছে।

**প্রমাণ-১৯**

পলক্ল্যারেন্স আরো বলেন– 'আমরা একটি বিষয় অবশ্যই উপলব্ধি করি, মানুষ ও এ মহাবিশ্ব সম্পূর্ণ শূন্যতা থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৃষ্টি হয় নি। নিশ্চয় এসবের আরম্ভ আছে এবং তজ্জন্য একজন আরম্ভকর্তাও রয়েছেন।'

**প্রমাণ-২০**

চিকিৎসাবিদ মরলিন বুকস ক্রীডার বলেন, 'সাধারণ মানুষ এবং বিজ্ঞানের অধ্যয়ন ও গবেষণায় জীবন উৎসর্গকারী ব্যক্তি হিসেবে আল্লাহ পাকের অস্তিত্ব সম্পর্কে আমার মনে আদৌ সন্দেহের কোনো লেশ নেই। তাঁর অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্য যদিও আমরা সাধারণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারি না, তথাপি মানুষ ও প্রকৃতিতে তাঁর অস্তিত্বের যে অগণিত প্রমাণ ছড়িয়ে আছে, তা নিয়ে আমরা গবেষণা করতে পারি। আমার মনে হয়, সেসব প্রমাণ যেমন সুস্পষ্ট, তেমনি বিশ্বাসজনক।'

**প্রমাণ-২১**

পদার্থবিদ জর্জ আর্ল ডেভিস বলেন, 'একজন পদার্থ বিজ্ঞানী হিসেবে এ মহাবিশ্বের অবিশ্বাস্য জটিল কাঠামোর যৎকিঞ্চিৎ দেখার সুযোগ হয়েছে আমার, যার ক্ষুদ্রতম পরমাণুর অভ্যন্তরীণ প্রাণস্পন্দন বৃহত্তম নক্ষত্রের বিশাল কর্মতৎপরতার তুলনায় কোনো অংশেই কম আশ্চর্যের ব্যাপার নয়। সেখানে প্রতিটি আলোকরশ্মি, প্রত্যেকটি প্রাকৃতিক ও রসায়নিক বিক্রিয়া এবং প্রতিটি প্রাণীর প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্য একই অপরিবর্তনীয় আইনের নির্দেশে আত্মপ্রকাশ ও নিজস্ব পথে পরিচালিত হয়ে থাকে।'

**প্রমাণ-২২**

জর্জ আর্ল ডেভিস আরো বলেন, (প্রতিপক্ষের ধারণা মতে) 'যদি একটি মহাবিশ্ব নিজে নিজে সৃষ্টি হতে পারে, তবে বাধ্য হয়েই এ সিদ্ধান্তে উপনীত হবো যে, এ বিশ্বই খোদা। তা হলে দেখা যাচ্ছে, আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্ব স্বীকার করে নেওয়া হচ্ছে। তবে এখানে এক অদ্ভুতরূপে আল্লাহকে কল্পনা করা হচ্ছে। আমি কিন্তু এমন এক আল্লাহ তায়ালার কথা চিন্তা করতে পছন্দ করি, যিনি নিজের সঙ্গে কোনো সাদৃশ্য রেখে একটি জড়জগত সৃজন করেন নি। কিন্তু তাঁরই সৃষ্টি সেই বিশ্বের উপর প্রভূত্ব বিস্তার করে আছে।'

**প্রমাণ-২৩**

পদার্থ ও রসায়নবিদ ড. অস্কার লিও ব্রউয়ার বলেন, 'নাস্তিকতার অর্থ হচ্ছে দ্বন্দ্ব আর যুদ্ধ। বৈজ্ঞানিক হিসেবে আমি এর কোনোটিই চাই না। থিওরি হিসেবে আমি নাস্তিকতাকে অযৌক্তিক ও ভ্রান্ত বলে মনে করি। বাস্তব দিক থেকে আমার মনে হয় এটা মারাত্মক ক্ষতিকর।'

**প্রমাণ-২৪**

প্রকৃতি বিজ্ঞানী ড. ইরভিং উইলিয়ম নবলচ বলেন, আমি মহান আল্লাহতে বিশ্বাসী। যে-জন্য বিশ্বাস করি, তার কারণ হল– আমি মনে করি না সর্বপ্রথম ইলেকট্রোন বা সর্বপ্রথম প্রোটোন বা সর্বপ্রথম পরমাণু বা সর্বপ্রথম এনিমো-এসিড অথবা সর্বপ্রথম প্রোটোপ্লাজম অথবা সর্বপ্রথম বীজ অথবা সর্বপ্রথম মস্তিষ্কটির জন্মের জন্য কেবল দৈব দায়ী। আমার কাছে এসব কিছুর মূলে আল্লাহ তায়ালার পবিত্র অস্তিত্বই একমাত্র যুক্তিসিদ্ধ ব্যাখ্যা হতে পারে।'

তিনি আরো বলেন, 'বিখ্যাত মার্কিন চিকিৎসা বিজ্ঞানী অলিবার ওয়েনডেল একসময় বলেছিলেন, 'জ্ঞান যতই বাড়তে থাকে, বিজ্ঞান ততই ধর্মকে ভ্রুকুটি করা থেকে বিরত হয়। বিজ্ঞানকে উপযুক্ততার সাথে বুঝতে পারলে দেখা যাবে, সর্বশক্তিমানে বিশ্বাস স্থাপনের ব্যাপার বিজ্ঞানই অধিক থেকে অধিকতর সম্ভাবনাময় করে তোলে।'

**প্রমাণ-২৫**

গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যা বিশেষজ্ঞ বৈজ্ঞানিক ড. মার্লিন গ্র্যান্ড স্মীথ বলেন, 'আমার কথা হচ্ছে আল্লাহ তায়ালা কোনো এক অনির্বচনীয়, চঞ্চলমতি স্বর্গীয় বা ইথারীয় সত্তা নয়। অনেক যুগে আর অনেক স্থানে অতি উৎসাহী সব মন থেকে উদ্ভূত কাল্পনিক সাজানো গল্পের চেয়ে অনেক সুসামঞ্জস্য সত্তা। আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন বাইবেলে বর্ণিত সৃষ্টিকর্তা। যাঁকে সকল পয়গম্বর ও তাঁদের বাণীর প্রচারকগণ বিশ্বাস ও বর্ণনা করেছেন।'

**প্রমাণ-২৬**

ড. মার্লিন গ্র্যান্ড স্মীথ আরো বলেন, 'মানুষের আবির্ভাবের পর থেকে সকল যুগে লাখ লাখ মানুষ অশিক্ষিত সরল বা জ্ঞানী আর বিজ্ঞানীগণ সাক্ষ্য দিয়ে এসেছেন, তারা যথার্থই তাদের অন্তরাত্মায় আল্লাহ তায়ালার উপস্থিতি উপলব্ধি করেছেন। আমরা তাদের সে সাক্ষ্য-প্রমাণ নিয়ে কী করব? বর্জন করব? অবজ্ঞা করব? অগণিত মানুষ যে, 'অবর্ণনীয় আনন্দ ও গৌরব' লাভ করেছেন, আমরা কি তাকে দৃষ্টির আড়াল করে চাপা দিয়ে রাখব? শহিদ আর ধর্মপ্রাণ ও ধর্মের বাণী প্রচারের জন্য যাঁরা জীবন উৎসর্গ করেছে, তাঁদের যে ঈমান নিঃসঙ্গতার মধ্যে শক্তি-সাহস যুগিয়েছে, অহরহ কষ্ট স্বীকার করিয়েছে, সকল নির্যাতন সহ্য করিয়েছে, মৃত্যুকে হাসিমুখে বরণ করতে শিক্ষা দিয়েছে, আমরা কি সে সম্পর্কে নির্লজ্জের মতো উদাসীন থাকতে পারি? আপন মনে কি বলতে পারি, সে সবই ভুল? আমার কথা হচ্ছে, আমি বিশ্বাস করি আল্লাহ তায়ালা আছেন এবং যারা তাঁকে অধ্যবসায় সহকারে পাওয়ার চেষ্টা করেন, তিনি তাদের জন্য মহাপুরস্কার দাতা।' [হিব্রু-১১/৬]

**প্রমাণ-২৭**

কনসাল্টিং কেমিস্ট জন অ্যাডলফ বুয়েহলার বলেন, 'আজকের বিজ্ঞানের বিশ্বাস—যে প্রাকৃতিক আইন আমাদের গ্রহকে পরিচালনা করে, মহাশূন্যের অন্যান্য গ্রহগুলোও সেই একই আইন অনুসারে পরিচালিত। যেদিকে আমরা তাকাই, সর্বত্র আমাদের নজরে পড়ে সুপরিকল্পনা, ক্রম এবং সমন্বয়। তাই আমার মনে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই যে, সর্বশ্রেষ্ঠ এক মনীষা এসব কিছুর পরিকল্পনা করেছেন, সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই এ মহাবিশ্বকে এর নির্দিষ্ট গন্তব্য পথে পরিচালনা করছেন।'

**প্রমাণ-২৮**

জীববিজ্ঞানী ড. আলবার্ট ম্যাককমরস উইনচেষ্টার বলেন, 'অনেকের কাছেই বিজ্ঞান ও ধর্ম হচ্ছে দুটি বিরুদ্ধ শক্তি। কেউ যদি একটিকে আঁকড়ে ধরে, এদের মতে তা হলে অন্যটিকে বর্জন করতে হয়। আজ আমি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে বলছি, বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দীর্ঘকাল ধরে অধ্যয়ন এবং গবেষণার পর আল্লাহ তায়ালাতে আমার বিশ্বাস শিথিল হয় নি বরং আরো জোরদার এবং পূর্বাপেক্ষা আরো মজবূত বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিটি বৈজ্ঞানিক নয়া আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান সর্বশক্তিমান আল্লাহর মর্যাদা ও শক্তিমত্তা সম্পর্কে যে অন্তর্দৃষ্টি দান করে, তা আরো জোরদার হয়।'

**প্রমাণ-২৯**

ভূ-রসায়নবিদ ডোনাল্ড রবার্টকার বলেন, 'আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্ব সম্পর্কে আমার পক্ষে খোলা মন নিয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ অসম্ভব। এটা অপর পক্ষে অবৈজ্ঞানিক শোনাবে। আমাকে ব্যাখ্যা করতে দিন। তারপর আমি খাঁটি বিজ্ঞানসম্মত কিছু মন্তব্য পেশ করব। তিনি বলেন, ভূ-রসায়ন সম্পর্কিত গবেষণা ব্যাপক আকারে সমুদয় বস্তুর প্রতি নজর দিতে শিক্ষা দিয়ে থাকে। পৃথিবীর ইতিহাসের কোটি কোটি বছরের প্রতি একবার চিন্তা নিবদ্ধ করতে, যে মহাশূন্য মহাবিশ্বকে আচ্ছন্ন করে রয়েছে, আরেক বার তার দিকে এবং সর্বশেষ বিশ্বব্যাপী আবর্তনের যে প্রক্রিয়া বিদ্যমান, তাকেও প্রত্যক্ষ করতে শিক্ষা দেয়। সবকিছুর বিশালত্বই মানুষকে মহান আল্লাহর মহত্বকে নতুনভাবে উপলব্ধি ও হৃদয়ঙ্গম করতে সাহায্য করে।'

**প্রমাণ-৩০**

কনসাল্টিং ইঞ্জিনিয়ার (নিউইয়র্ক) ড. ক্লাড এম হ্যাথাওয়ে বলেন– 'আমি আল্লাহতে বিশ্বাস সম্পর্কিত আমার যুক্তিসঙ্গত কারণসমূহ সম্পর্কে মন্তব্য করার আগে বলতে চাই যে, আল্লাহতে আমার যে বিশ্বাস, তার অধিকাংশই জীবনের এ বয়সে যাকে অভিজ্ঞতা বলা চলে, তার উপর প্রতিষ্ঠিত।'

**প্রমাণ-৩১**

ড. ক্লাড এম হ্যাথাওয়ে বলেন, 'পরিকল্পনার জন্য একজন পরিকল্পকের প্রয়োজন। আল্লাহ তায়ালাতে আমার বিশ্বাসের এ মৌলিক যুক্তিযুক্ত কারণটি আমার ইঞ্জিনিয়ারিং অভিজ্ঞতা দ্বারা অনেকখানি সমর্থিত হয়েছে। ... কাজেই এমনি অভিজ্ঞতা নিয়ে আমাদের চারিদিকে দুনিয়ায় যে কল্পনাতীত পরিকল্পনা ছড়িয়ে আছে, তা দেখে একজন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এবং অসীম মনীষার অধিকারী পরিকল্পকের কাজ ছাড়া অন্য কিছুর চিন্তাই আসতে পারে না। নিঃসন্দেহে এ একটি পুরনো যুক্তি। কিন্তু তা সত্ত্বেও এটা এমন এক যুক্তি, যাকে আধুনিক বিজ্ঞান পূর্বাপেক্ষা আরো অধিকতর অখ-নীয় করে তুলেছে।'

**প্রমাণ-৩২**

জীববিজ্ঞানী সিসিল বয়েস হ্যাম্যান বলেন, 'বিজ্ঞান জগতের যেদিকেই আমি তাকাই না কেন, সর্বত্র পরিকল্পনা, আইন ও শৃঙ্খলার সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ তায়ালার সাক্ষ্য দেখতে পাই। সূর্যালোকোজ্জ্বল রাস্তা দিয়ে হেঁটে এগিয়ে যান। সেইসঙ্গে ফুলের অত্যন্ত খুঁটিনাটি বৈশিষ্ট্যগুলো একবার লক্ষ্য করুন। মন দিয়ে রবিন পাখির মিষ্টি গান শুনুন আর ভাবুন! পতঙ্গকে আকর্ষণকারী ফুলের যে মধু, তা কি আকস্মিকভাবে ফুলের মধ্যে পৌঁছেছে? পতঙ্গ যে আগামী বছর আরো ফুল জন্মানোর ব্যবস্থা করে দিয়ে গেল, তা কি

আকস্মিকভাবে হলো? অতি ক্ষুদ্র পুষ্পরেণু ফুলের গর্ভকোষের মধ্যে ক্রমশ অঙ্কুরিত হয়ে যে বীজ উৎপাদনের ব্যবস্থা করে, এটাকে কি মামুলি দৈবাৎ ব্যাপার বলে উল্লেখ করা চলে?

**প্রমাণ-৩৩**

সিসিল বয়েস হ্যাম্যান আরো বলেন, 'একবার নক্ষত্র খচিত আকাশের দিকে চোখ তুলে তাকালে সেখানকার সুশৃঙ্খল দৃশ্য দেখে আমাদের বিস্ময়ে হতবাক হতে হয়। রাতের পর রাত, ঋতুর পর ঋতু, বছরের পর বছর, শতাব্দির পর শতাব্দি ধরে বহিঃশূন্যের সকল জগৎ আকাশ পথে নিজ নিজ কক্ষে এগিয়ে চলেছে। তারা নিজ কক্ষ পথে নির্দিষ্ট স্থানে এমন নির্ভুলভাবে ফিরে আসে যে, বহু শতাব্দি আগেও সূর্য বা চন্দ্রগ্রহণ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা যেতে পারত। এরপরেও কি এমন কোনো ব্যক্তি থাকতে পারেন, যিনি এগুলোকে দৈবক্রমে একত্রীভূত জ্যোতিষ্ক জাতীয় পদার্থ বলে উল্লেখ করেন এবং বলেন, উদ্দেশ্যহীনভাবেই এগুলো আকাশ মার্গে বিচরণ করছে? যদি তাদেরকে পরিচালনের কোনো আইন না থেকে থাকে, তা হলে মানুষ কি তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করে নিজেদের নির্দেশ মোতাবেক সেগুলোকে আকাশের অচিহ্নিত পথে পরিচালিত করতে পারবে? [ইসলামি আকিদা ও ভ্রান্ত মতবাদ]

**প্রমাণ-৩৪**

বায়ু ও বিদ্যুৎ কি দেখেছেন? (এক নাস্তিক ও আস্তিকের আলাপ)

**নাস্তিক :** আল্লাহ তায়ালাকে দেখি না বিধায় আল্লাহ তায়ালাকে মানি না। যা দেখি না, তা বিশ্বাস করি না।

**আস্তিক :** বায়ু দেখেননি। পিতামহকে দেখেননি। সম্রাট অশোককে দেখেননি। লন্ডনও তো দেখেননি। তা সত্ত্বেও সবই তো মানছেন। অথচ আল্লাহ তায়ালাকে দেখেননি বলে মানছেন না! কী অদ্ভুত!

**নাস্তিক :** আমরা বায়ু চোখে না দেখতে পেলেও বায়ুর স্পর্শ অনুভব করতে পারি। বিদ্যুৎ তারে দৃশ্যমান না হলেও আলোয়, পাখায়, ফ্রিজে, টেপ রেকর্ডারে বা যন্ত্রপাতিতে তার অস্তিত্বের প্রমাণ রয়েছে। সম্রাট অশোকের কথা প্রামাণ্য ঐতিহাসিক দলিলে পাই বলেই মানি। আমার অস্তিত্বই আমার প্রপিতামহের অস্তিত্বের প্রমাণ। অর্থ ব্যয় করতে পারলে লন্ডন ঘুরে আসা সম্ভব।'

**আমরা বলি :** স্রষ্টাও অনুভব করা যায়। নাস্তিক হয়ত পারেনি; হযরত মুহাম্মদ ﷺ, হযরত ইবরাহিম আ. ও অনেক নবী তা করেছেন। স্রষ্টা বহু নবীকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা পূর্ণ করে তাঁর অস্তিত্ব ঘোষণা

করেছেন। স্রষ্টা হযরত মুহাম্মদ ﷺ-কে আশ্বাস দিয়েছিলেন, মানুষ তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করলেও তাঁকে তিনি জয়যুক্ত করবেন। শেষ পর্যন্ত তাই হয়েছে। স্রষ্টার কথার প্রামাণ্য দলিল কুরআনে বিদ্যমান। আরবের মূর্তিপূজার ধর্ম নিশ্চিহ্ন হয়ে হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর ইসলাম প্রতিষ্ঠা স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রমাণ। আর লন্ডন দর্শনের মতো কোনো কোনো নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ-সহ লন্ডন অপেক্ষা আশ্চর্যজনক দৃশ্য দর্শন করেছেন, যা স্রষ্টার অস্তিত্বকে চাক্ষুস প্রমাণিত করে। নাস্তিক হয়তো বলবে বায়ু, বিদ্যুৎ, অশোক, প্রপিতামহ ও লন্ডনের মতো তো স্রষ্টাকে কেউ কখনো দেখে নি। হাঁ! তা সত্য। কারণ, স্রষ্টা এসবের মতো নয়। তাই তাঁর দর্শনের অনুভূতি নিশ্চয় ভিন্নতর হতে বাধ্য। হযরত মুহাম্মদ ﷺ দেখেছেন। এ ছাড়া আরো অনেকেই তো দেখেছেন। আর পরকালে সকলেই দেখতে পাবে। [নাস্তিকের যুক্তি খণ্ডন]

**প্রমাণ-৩৫**

যদি আমরা বলি—পৃথিবীর সবকিছুই একা একা বা ঘটনাক্রমেই অস্তিত্ব লাভ করেছে, তা হলে এ ধারণা থেকে এ কথাও বলা যেতে পারে যে, টাইপ রাইটারের অক্ষরগুলোকে ইচ্ছামতো টেপাটিপি করলেই নজরুলের অগ্নিবীণার মতো বা শেখ সা'দীর গুলিস্তার মতো সাহিত্যকর্ম একা একাই সৃষ্টি হয়ে যাবে। এ কথা কি নাস্তিকরা বিশ্বাস করবেন। বিশ্বাস করে থাকলে আপনি এমন কী-বোর্ড টেপাটিপি করে একটা অগ্নিবীণা বানিয়ে দেখিয়ে দিন! আর নিজের স্থান করে নিন নজরুলের পাশের আসনটিতে। নাস্তিকরা তা পারেনি আর কখনো পারবেও না।

**প্রমাণ-৩৬**

'আপনি পৃথিবীর কোনো এক অঞ্চলে গেলেন। সেখানে গিয়ে আপনি পাহাড়, পর্বত, বালু ও পাথর দেখলেন। পাথর দেখে আপনি হয়তো বলবেন, বহুকাল থেকে, সেই আদিকাল থেকে পাথরগুলো এভাবেই আছে।

হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ আপনি দেখতে পেলেন, একটা নাইকন ক্যামেরা। আপনি সেটা হাতে নিবেন আর নিশ্চয় বলবেন, এর একজন নির্মাতা আছেন। ক্যামেরাটা হাতে নিয়ে আপনি ভাবতে পারবেন না, শূন্য থেকে এটা আপনা-আপনি এসে হাজির হয়েছে। কারণ, এটা একটা জটিল যন্ত্র।

এবার আরেকটু এগিয়ে গেলেন। কোত্থেকে একটা খরগোশ বেরিয়ে এসে আপনার দিকে তাকাল। নাইকন ক্যামেরা কী করে? ছবি তোলে। খরগোশ কী

করে? অনেক কাজই করে। খরগোশের একটা কাজ হলো দেখা। এ খরগোশের চোখ নাইকন ক্যামেরার চেয়ে হাজার গুণ বেশি জটিল। নাইকন ক্যামেরাটা দেখে আপনার যদি মনে হয়, এর একটা নির্মাতা থাকা দরকার। তা হলে খরগোশের বেলায় এটা আপনার মনে হবে না কেন? আমার প্রথম যুক্তি যদি গ্রহণ করেন, আমার দ্বিতীয় যুক্তিটাও আপনাকে গ্রহণ করতে হবে।'

কথাগুলো বলেছিলেন কথাশিল্পী হুমায়ুন আহমেদ। বলা হয়, এ ধারণাটি উইলিয়াম প্যালে ১৮০২ সালে প্রকাশ করেছেন। সেটা যাই হোক! আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্বের পক্ষে এটি অত্যন্ত সুন্দর যুক্তি নয় কি?

**প্রমাণ-৩৭**

আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্বের যৌক্তিক প্রমাণ দিয়ে বলা হয়, আমরা জানি, (আল্লাহ তায়ালার সত্তা ও গুণাবলি ব্যতীত) জগতের সবকিছু অনিত্য (حَادِثٌ) বা সৃষ্ট। আর সমস্ত অনিত্য বা সৃষ্টবস্তুর জন্য সৃষ্টিকর্তা (مُوْجِد) আবশ্যক। সুতরাং জগতের জন্যেও একজন সৃষ্টিকর্তা আবশ্যক। তিনি হলেন আল্লাহ।

**বিশ্বজগতের সবকিছু অনিত্য (حَادِثٌ) হওয়ার প্রমাণ**

**(ক)** আমরা দেখি, জগতের সবকিছু পরিবর্তনশীল। আর সকল পরিবর্তনশীল বস্তু অনিত্য বা حَادِثٌ হয়। বিধায় বিশ্বজগতের সবকিছুই অনিত্য (حَادِثٌ)।

**(খ)** দ্বিতীয়ত জগতের যে কোনো বস্তু হয় উপাদান (جَوْهَرٌ) হবে। অন্যথায় আপতন (عَرَضٌ) হবে। এতদুভয়ের বাইরে কিছু নেই। যদি আপতন হয়, তবে তো সেটা অনিত্যই। তন্মধ্যে কোনো কোনোটি অনিত্য হওয়া ইন্দ্রীয়গ্রাহ্য বিষয়। যেমন– অন্ধকার চলে যাওয়ার পর আলো আসা, গরমের পর ঠা-া আসা ইত্যাদি। আর কোনো কোনোটির অনিত্য হওয়া এভাবে প্রমাণিত যে, আপতন অস্তিত্বহীনতা (عَدَمٌ)-কে গ্রহণ করে অর্থাৎ তা বিলীন (فَانٍ) হয়ে যায়। অথচ নিত্য (قَدِيْمٌ) জিনিস কখনো বিলীন হয় না। সুতরাং প্রমাণিত হল, আপতন নিত্য (قَدِيْمٌ) নয় বরং অনিত্য (حَادِثٌ)।

আর যদি উপাদান হয়, তবে উপাদানসমূহও অনিত্য। কেননা উপাদান হয়তো শরীর (جِسْمٌ) হবে; নতুবা পরমাণু (جَوْهَرٌ فَرْدٌ বা جُزْءٌ لَا يَتَجَزّٰى)। যাই হোক, তা حَرَكَتْ وَسُكُوْن তথা গতি-স্থিতিকে গ্রহণ করে থাকে বিধায় তা অনিত্য (حَادِثٌ)। কারণ, গতি-স্থিতি হলো আপতন। আর যার মধ্যে আপতন তথা অনিত্যতা (حُدُوْث) পাওয়া যায়, তা অনিত্যই হয়। অন্যথায় অনিত্যকে নিত্য বলা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়াবে।

এখন রইল প্রত্যেকটা শরীর (جِسْمٌ) বা পরমাণু (جَوْهَرٌ فَرْدٌ বা جُزْءٌ لَا يَتَجَزَّىٰ)-এর জন্য গতি-স্থিতি (حَرَكَتٌ وَسُكُوْن) অপরিহার্য কেন? তার কারণ হল, শরীর বা পরমাণুর জন্য একটি স্থান (حَيِّزٌ) থাকা আবশ্যক। এখন এ মুহূর্তের পূর্ব থেকেই যদি সেই স্থানে তার অবস্থান চলে আসতে থাকে, তা হলে বলতে হবে সেটা স্থিতিশীল (سَاكِنٌ) অর্থাৎ তার মধ্যে স্থিতি (سُكُوْن) বিদ্যমান। নতুবা সেটা গতিসম্পন্ন (مُتَحَرِّكٌ)। অর্থাৎ তার মধ্যে গতি (حَرَكَتٌ) বিদ্যমান।

**প্রমাণ-৩৮**

**সাতটি যুক্তি : বৈজ্ঞানিক কেন স্রষ্টায় বিশ্বাস করে?**

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত 'রিডার্স ডাইজেস্ট'-এর জানুয়ারি ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দ সংখ্যা ও নভেম্বর ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দ সংখ্যায় অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের প্রফেসর C.A. Coulson, FRS এর সুপারিশে Seven reasons Why a scientist believes in God নামে একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। নিবন্ধটির বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হল–

**প্রথম যুক্তি :** গণিতশাস্ত্র দ্বারা প্রমাণ করা যায় যে, মহাবিশ্ব একজন বড় ধরনের ইঞ্জিনিয়ারিং জ্ঞানবান শক্তির দ্বারা পরিকল্পিত ও পরিচালিত। মনে করা যাক দশটি মুদ্রায় এক থেকে দশ চিহ্ন দেওয়া হল। এগুলোকে যদি ঝাঁকুনি দিয়ে আমরা এর সিরিয়ালি হিসাবে পেতে চাই তা হলে সে সুযোগ মিলিয়ন মিলিয়ন বার ঝাঁকুনি দিয়েও পাওয়া কঠিন। একইভাবে পৃথিবীতে জীবনের জন্য যেসব সঠিক পরিস্থিতি প্রয়োজন, তা শুধু 'চান্স' (সুযোগ বা দুর্ঘটনা)-এর মাধ্যমে লাভ করা অসম্ভব। পৃথিবী তার নিজস্ব অক্ষে ঘণ্টায় একহাজার মাইল বেগে ঘোরে। যদি পৃথিবী একশত মাইল বেগে ঘুরত, তা হলে আমাদের দিন ও রাত দশগুণ বেড়ে যেত বর্তমানের চেয়ে। উত্তপ্ত সূর্য বৃহত্তর দিনে আমাদের ফসল-উদ্ভিদ পুড়িয়ে ফেলত। আর দীর্ঘ রাতে উদ্ভিদের কচি চেহারা নষ্ট করে ফেলত।

সূর্যের উপরিভাগের তাপমাত্রা হল ১২ হাজার ফারেনহাইট। আমাদের পৃথিবী যে দূরত্বে রয়েছে, তাতে স্বাভাবিক সুষম তাপমাত্রা গ্রহণ করছে। সূর্য যদি এর বিকিরণ অর্ধেক কমাত, তা হলে আমরা বরফে জমে যেতাম আর যদি বিকিরণ অর্ধেক বাড়াত, তবে আমরা কাবাব হয়ে যেতাম।

পৃথিবী ২৩ ডিগ্রি কাত হয়ে থাকায় আমরা পৃথিবীতে নানা ঋতু পাই। যদি এভাবে পৃথিবী বাঁকা হয়ে না থাকত, মহাসমুদ্রের বাষ্পকণা উত্তর ও দক্ষিণে

উড়ে চলে যেত। আমাদের বাসভূমির এ অঞ্চল হয়ে যেত বরফের মহাদেশ। যদি চাঁদও বর্তমান অবস্থানে না থেকে মাত্র পঞ্চাশ হাজার মাইল দূরে থাকত, তা হলে দিনে দু'বার সমুদ্রে এমন জোয়ার আসত যে, মহাদেশসমূহ পানিতে ডুবে যেত। এমনকি পাহাড়সমূহ ভেসে যেত। যদি পৃথিবীর মৃন্ময় উপরিভাগ (Crust) মাত্র দশ ফিট নিচু হত, তবে কোনো অক্সিজেন গ্যাস থাকত না। ফলে কোনো জীবও বাঁচত না। মহাসমুদ্র যদি আর কয়েক ফুট বেশি গভীর হত, তবে কার্বনডাই অক্সাইড ও অক্সিজেন গ্যাস শোষিত হয়ে যেত। কোনো উদ্ভিদ বাঁচত না। পৃথিবীর বায়ুম-ল যদি আরো কম ঘন হত, তা হলে যে লাখ লাখ উল্কা বর্তমানে শূন্যে পুড়ে নিঃশেষ হচ্ছে, তা পৃথিবীর সর্বত্র এসে আঘাত হানত ও অগ্নিকাণ্ড ঘটাত।

এসব কারণ ও অন্যান্য উদাহরণের জন্য বলতে হয়, লক্ষ্যের ভিতর একটি চান্স বা সুযোগ নেই যে, বলা যাবে—এ পৃথিবীতে জীবন শুধু এক দুর্ঘটনা বরং অবশ্যই বলতে হবে—এটা মহান স্রষ্টার কারিশমা।

**দ্বিতীয় যুক্তি :** উদ্দেশ্য সাধনের জন্য জীবনের মধ্যে যে সম্ভাবনা রয়েছে, তা-ই প্রমাণ করে যে, এর পিছনে একজন প্রজ্ঞাময় সত্তা রয়েছেন।

জীবন কী তা মানুষ কমই বুঝতে সক্ষম। এর ওজন নেই। আকার নেই। অন্যদিকে বর্ধিত বৃক্ষ শিকড় পাথরকে কেটে ফেলে। জীবন এমন এক শিল্পী, যে শিল্পী গাছের প্রতিটি পাতাকে আর্ট করে, রঙিন করে। জীবন পাখির কণ্ঠে কী সুন্দর গান সৃষ্টি করে। জীবন ফলে মিষ্টতা, ফুলে সুগন্ধি, গাছে কার্বনিক এসিড প্রবেশ করায় ও গাছ থেকে অক্সিজেন নির্গত করে জীব-জন্তুর জন্য। প্রায় অদৃশ্য প্রটোপ্লাজমের ফোঁটা, যা স্বচ্ছ এবং জেলির মতো ও চলৎশক্তিসম্পন্ন, সূর্য থেকে শক্তি টেনে নেয়। এ স্বচ্ছ ও কুয়াশার মতো একক সেল সম্পন্ন ফোঁটা ধরে রাখে জীবন। কে এসব সম্পন্ন করেছেন?

**তৃতীয় যুক্তি :** জীব-জন্তুর অবস্থা দেখলে বুঝা যায়, এসব অসহায় সৃষ্টির ভিতরে স্বতঃপ্রবৃত্ত স্বভাব দয়ালু স্রষ্টা সৃষ্টি করে দিয়েছেন।

অল্প বয়সী স্যামন মাছ বছরের পর বছর সমুদ্রে বাস করে। এরপর সে নদীর সেই অংশে আসে, যাতে অন্য একটি উপনদী পতিত হয়েছে এবং এ স্থানে সে জন্মেছিল। কে তাকে এ পথে সেই জন্মস্থানে নিয়ে আসল? তুমি যদি তাকে অন্য কোনো উপনদীর মোহনায় রেখে আস, সেই স্যামন মাছটি বুঝতে সক্ষম হবে—সে তার জন্মস্থানে নেই, ভুল জায়গায় এসে পড়েছে। সে-ই আবার মূলনদী দিয়ে তার প্রকৃত জন্মস্থানের উপনদীতে এসে হাজির হবে।

বান (ঈল) মাছের ব্যাপার আরো বিস্ময়কর। এ বান মাছগুলো বয়স হলে নদী-নালা থেকে হিজরত করে। ইউরোপের বান মাছ হাজার হাজার মাইল দূরে বারমুডার সমুদ্র অঞ্চলে চলে যায়। সেখানে তার বংশ বিস্তার করে ও মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বানের ছোট ছোট বাচ্চাগুলো পানি ছাড়া কিছুই দেখেনি। তারা যাত্রা শুরু করে সেই ঠিক জায়গায় যেখানে তাদের পিতা-মাতা একসময় বসবাস করত। এমনকি শুধু সেই এলাকা নয়, সেই নদী বা সেই হ্রদে পৌঁছে যায়, যেখানে তাদের বাবা-মায়েরা থাকত। ফলে সর্বত্র বান মাছে ভর্তি হয়ে যায়। আমেরিকার বান ইউরোপে যায় না। আর ইউরোপের বান আমেরিকায় যায় না। বারমুডার সমুদ্র অঞ্চল থেকে ইউরোপের দূরত্ব আমেরিকার চাইতে বেশি বলে ইউরোপের বান মাছের বয়ঃপ্রাপ্ত হতে একবছর বা তার চেয়ে বেশি সময় প্রয়োজন হয়। কোথা থেকে এ নির্দেশকারী তাড়না আসল?

এবার ভিমরুলের কাণ্ড-কারখানা দেখা যাক। একটা ভিমরুল একটা ফড়িং পাকড়াও করে। তারপর সে মাটিতে একটি গর্ত করে। এরপর ফড়িং-এর এমন জায়গায় শুঁড় ফুটে দেয়। যাতে সে শুধু অজ্ঞান হয়ে যায়; কিন্তু মরে না। উদ্দেশ্য ফড়িংকে রক্ষিত মাংস হিসেবে বাঁচিয়ে রাখা; কিন্তু ফড়িং যেন পালাতে না পারে। এরপর ভিমরুল অজ্ঞান ফড়িং-এর পাশে ডিম পাড়ে। ডিম ফুটে বাচ্চাগুলো অজ্ঞান ফড়িং-এর শরীর থেকে ঠোকর মেরে মেরে খাদ্য গ্রহণ করে। তাদের জন্য মৃত, পচা মাংস বিষবৎ হবে। তাই তাজা মাংস সরবরাহের এ ব্যবস্থা। এরপর মা ভিমরুল উড়ে চলে যায় ও মারা যায়। সে কোনো সময় তার বাচ্চাদের দেখে না। ভিমরুলরা সব সময় এ কাজ করে যাচ্ছে। প্রথমবার এবং প্রত্যেকবার। নইলে পৃথিবীতে ভিমরুল বলে কিছু পাওয়া যেত না।

ভিমরুলের এ বিস্ময়কর আচরণ বর্ণনা বা খাপ খাওয়ানো পদ্ধতি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যাবে না। বরং এ কথা মানতেই হবে যে, এর পিছনে একজন পরিকল্পনাকারী অবশ্যই আছেন।

**চতুর্থ যুক্তি :** মানুষের জন্য জীব-জন্তুর স্বতঃপ্রবৃত্ত স্বভাবের তুলনা একটু বেশি রয়েছে, তা হলো তাদের চিন্তাশক্তি।

অন্য কোনো জন্তুর দশ পর্যন্ত গণনার যোগ্যতা নেই। এমনকি তারা দশের অর্থ বুঝতে সক্ষম নয়। স্বতঃপ্রবৃত্ত স্বভাব যদি বাঁশির একটি সুর হয়, তা হলে মানুষের মগজের রয়েছে বহু সুর সৃষ্টির ক্ষমতা। মানুষের চিন্তাশক্তি বিস্ময়কর। মানুষের মধ্যে এ সম্মোহনী শক্তি কে দিয়েছেন?

**পঞ্চম যুক্তি :** জিন্‌স (genes- জন্ম বা উৎপত্তি উপাদান)-এর বিস্ময়কর কার্যকলাপ আমরা এখন জানতে পেরেছি। এ জ্ঞান ডারউইনের সময় ছিল না। এ জিনস অতি ক্ষুদ্র; সমগ্র পৃথিবীর সব মানুষের এ সংক্রান্ত উপাদান একটি অঙ্গুস্তানার [সেলাইয়ের জন্য আঙুলের টোপর] উপর নিলেও জায়গা খালি থাকবে। জিনস এত ক্ষুদ্র! তবু এ অতি ক্ষুদ্র উপাদান ও তার সাথী 'ক্রমোজম' প্রতিটি জীবন্ত সেলে বাস করে। মানুষ, জীবজন্তু ও উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্যের চাবিকাঠি 'জিন্স' কিভাবে সমগ্র বংশধরের বৈশিষ্ট্য ও প্রত্যেক জীবনের পৃথক বৈশিষ্ট্য এত ক্ষুদ্র পরিসরে রক্ষণ করে? কয়েক মিলিয়ন পরমাণু ক্ষুদ্রতম জিন্সে বন্দি হয়ে সমগ্র পৃথিবীতে যে জাদুকরী কার্য করে, তা শুধু একটি সৃষ্টিশীল, প্রজ্ঞাময় সত্তার কাছ থেকেই হতে পারে।

**ষষ্ঠ যুক্তি :** প্রকৃতিতে যে মিতব্যয়িতা, পরিমিতি ও পরিচালনা প্রক্রিয়া রয়েছে, তা দেখে আমরা বলতে বাধ্য যে, একমাত্র একটি অসীম প্রজ্ঞাময় সত্তাই এমন ব্যবস্থার স্রষ্টা হতে পারেন।

বহু বছর পূর্বে একধরনের মনসা জাতীয় গাছ [ক্যাকটাস] অস্ট্রেলিয়ায় লাগানো হয় বেড়া হিসাবে। তা দারুণভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে। ইংল্যান্ডের সমান এক এলাকায় ছড়িয়ে যায় এবং শহর, গ্রাম, কৃষিফার্ম মনসা গাছে উজাড় হতে থাকে। অবশেষে প্রাণীবিদগণ একধরনের কীট অস্ট্রেলিয়ায় নিয়ে এলেন। এটা শুধু মনসা গাছ খেয়ে বাঁচে। দেখতে দেখতে মনসা গাছের বিপদ কেটে গেল। মনসা গাছ এখন আয়ত্তে চলে আসল।

প্রকৃতিতে এ ক্ষমতা ও ভারসাম্য রাখা হয়েছে। এ দ্রুত বিস্তারপ্রাপ্ত কীট-পতঙ্গ পৃথিবীকে সম্পূর্ণ গিলে খাচ্ছে না কেন? কীটপতঙ্গের ফুসফুস নেই। এরা টিউবের মাধ্যমে নিঃশ্বাস নেয়। যখন এসব কীট-পতঙ্গ বড় হয়, তাদের টিউব তেমন বাড়ে না। তাই কীট-পতঙ্গসমূহ বিরাট আকার ধারণ করে না। তাদের আকার তাই থাকে ক্ষুদ্র। শরীরের এ বাড়ন্ত যদি নিয়ন্ত্রণে না থাকত, তা হলে প্রকৃতিতে একটা ভিমরুল সিংহের মতো বড় হত। আর তাতে কী যে বিপদ চারদিকে দেখা যেত। এসবের নিয়ন্ত্রণ কি এমনিতেই হয়েছে?

**সপ্তম যুক্তি :** মানুষ যে স্রষ্টার ধারণা করে, তা-ও স্রষ্টার অস্তিত্বের একটি প্রমাণ। মানুষ সর্বত্র স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রমাণ প্রত্যক্ষ করে ও সর্বত্র স্রষ্টার ডিজাইন (নকশা) ও উদ্দেশ্য এবং স্রষ্টার কর্মের ছাপ প্রত্যক্ষ করে। তাই মানুষের অন্তরে স্রষ্টার অস্তিত্বের অনুভব হয়। কারণ, সমগ্র সৃষ্টিতে রয়েছে স্রষ্টার প্রশংসা; সর্বত্রই রয়েছে তাঁর কুদরতি হাতের ছোঁয়া।

উক্ত সাতটি যুক্তি এটাই প্রমাণ করে, কোনো স্রষ্টা, কোনো ডিজাইনার, কোনো কারিগর ছাড়া এতসব কিছু হওয়া সম্ভব নয়। তাই স্রষ্টা একজন থাকতেই হবে। [নাস্তিকের যুক্তি খণ্ডন]

**৩. পরকাল**

পরকালের অবিশ্বাসটা মূলত আল্লাহ তায়ালাকে অবিশ্বাস এবং পৃথিবীকে অনাদি মনে করার কুফল। যুক্তি প্রমাণ দিয়ে যখন এ কথা সাব্যস্ত করা হল যে, আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্বে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই এবং এ পৃথিবী অনাদি হতে পারে না, সুতরাং তাদের পরকালে অবিশ্বাসের ভ্রান্তিও এতে অসার প্রমাণিত হয়ে গেল। তা ছাড়া পরকালের বিষয়টি যেহেতু সত্য সংবাদের বিষয়, তাই এ বিষয়ে যুক্তি-তর্ক নয় বরং কুরআন ও হাদিসের বাণী দিয়ে কথা বলতে হবে।

শাইখ আব্দুর রহমান হাসান হাবান্নাকাহ রহ. উল্লেখ করেছেন–

إِنَّ الْإِيْمَانَ بِالْحَيَاةِ بَعْدَ الْمَوْتِ لِلْحِسَابِ وَالْجَزَاءِ فِيْ دَارٍ غَيْرِ هٰذِهِ الدَّارِ قَضِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ . أَيْ : ذَاتُ مُسْتَنَدٍ خَبَرِيٍّ . وَلَيْسَتْ قَضِيَّةً عَقْلِيَّةً بِحَتَّةٍ حَتّٰى نَبْحَثَ فِيْ نِطَاقِ الْعَقْلِ عَنْ دَلِيْلٍ يَدُلُّ عَلَيْهَا دُوْنَ الْاِسْتِنَادِ إِلَى الْإِيْمَانِ بِاللهِ.

"নিশ্চয় মৃত্যুর পরের জীবন সম্পর্কে বিশ্বাস, যা হবে হিসাব ও প্রতিদানের জন্য, যা হবে আমাদের এ জগৎ ছাড়া অন্য এক জগতে, এটি একটি সংবাদমূলক বাক্য। এটি একদম কারো কোনো বিবেকপ্রসূত বাক্য নয়; যাতে আমরা আল্লাহ তায়ালার উপর বিশ্বাসের দিকে সম্পৃক্ত না করে বুদ্ধিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গিতে কোনো দলিল-প্রমাণ দিয়ে তা আলোচনা করতে পারি। অর্থাৎ এ বিষয়ে কুরআন-হাদিসের সংবাদবাচক দলিল দিয়েই কথা বলতে হবে।

[ছুরাউন মাআল মালাহিদাতি হাত্তাল আজম/শামেলা-১/১৪১]

আল্লাহ তায়ালা মানব জাতিকে লক্ষ্য করে বলছেন–

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوْا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفّٰى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيْجٍ ❁ ذٰلِكَ بِأَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ❁ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيْهَا وَأَنَّ اللهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُوْرِ ❁

"হে লোকসকল! যদি তোমরা পুনরুত্থানের ব্যাপারে সন্দিগ্ধ হও, তা হলে (ভেবে দেখো) আমি তোমাদেরকে মৃত্তিকা থেকে সৃষ্টি করেছি। এরপর বীর্য থেকে, এরপর জমাট রক্ত থেকে, এরপর পূর্ণাকৃতিবিশিষ্ট ও অপূর্ণাকৃতিবিশিষ্ট মাংসপি- থেকে, তোমাদের কাছে ব্যক্ত করার জন্যে। আর আমি এক নির্দিষ্ট কালের জন্য মাতৃগর্ভে যা ইচ্ছা রেখে দিই, এরপর আমি তোমাদেরকে শিশু অবস্থায় বের করি। তারপর যাতে তোমরা যৌবনে পদার্পণ কর। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং তোমাদের মধ্যে কাউকে নিষ্কর্মা বয়স পর্যন্ত পৌঁছানো হয়। যাতে সে জানার পর জ্ঞাত বিষয় সম্পর্কে সজ্ঞান থাকে না। তুমি ভূমিকে পতিত দেখতে পাও। এরপর আমি যখন তাতে বৃষ্টি বর্ষণ করি, তখন তা সতেজ ও স্ফীত হয়ে যায় এবং সর্বপ্রকার সুদৃশ্য উদ্ভিদ উৎপন্ন করে। এগুলো এজন্য যে, আল্লাহ সত্য ও তিনি মৃতকে জীবিত করেন এবং তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান আর এজন্য যে, কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী; এতে সন্দেহ নেই এবং এ কারণে যে, কবরে যারা আছে, আল্লাহ তাদেরকে পুনরুত্থিত করবেন।" [সূরা হজ : ৫-৮]

পরকাল সম্পর্কে কাফিরদের হঠকারিতা প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا لَا تَأْتِيْنَا السَّاعَةُ قُلْ بَلٰى وَرَبِّيْ لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذٰلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِيْ كِتَابٍ مُبِيْنٍ ❖ لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيْمٌ ❖ وَالَّذِيْنَ سَعَوْا فِيْ آيَاتِنَا مُعَاجِزِيْنَ أُولٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزٍ أَلِيْمٌ ❖

"কাফিররা বলে আমাদের উপর কিয়ামত আসবে না। বলুন! কেন আসবে না? আমার পালনকর্তার শপথ! নিশ্চয় আসবে। তিনি অদৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞাত। নভোমণ্ডলে ও ভূ-মণ্ডলে তাঁর আগোচরে নয় অণু পরিমাণ কিছু, না তদপেক্ষা ক্ষুদ্র আর না বড়—সবই আছে সুস্পষ্ট কিতাবে। প্রতিদান দেওয়ার জন্য তাদেরকে, যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক রিযিক। আর যারা আমার আয়াতসমূহকে ব্যর্থ করার জন্য উঠে পড়ে লাগে, তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।" [সূরা সাবা : ৩-৫]

**ব্যাখ্যা :** কাফিররা বলে, আমাদের কাছে কিয়ামত আসবে না। অতএব কিয়ামতের পরে যা কিছু ঘটার তাও ঘটবে না, পুনরুত্থান হবে না, হিসাব-নিকাশ হবে না, জান্নাত-জাহান্নাম কিছুই আসবে না। (নাউযুবিল্লাহ!)

আপনি বলুন! অবশ্যই আসবে। আমার মালিক এবং পালনকর্তার কসম! যিনি সকল গায়েব সম্পর্কে অবগত। অবশ্যই কিয়ামত তোমাদের নিকট আসবে। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর কণা পরিমাণ কিছু তাঁর অবগতির বাইরে নয় এবং তার চেয়েও ছোট বা বড় কিছু নেই, যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই।

কাফিররা মৃত্যুর পরের জীবনকে অস্বীকার করে এবং অসম্ভব মনে করে। আল্লাহ তায়ালা তাঁর রাসূল ﷺ-কে আদেশ করেছেন, আপনি বলুন! অবশ্যই কিয়ামত আসবে। কিভাবে বলবেন? আপনার রবের কসম করে বলুন।

আল্লামা ইবনে কাছির রহ. বলেন, প্রথমোক্ত আয়াতে উল্লিখিত কসম ওই তিন কসমের একটি, যে তিনটি স্থানে আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীকে পরকালের পুনরুত্থান সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালার কসম করে ঘোষণা দিতে বলেছেন।

উক্ত তিন কসমের প্রথমটি সূরা ইউনুসে বর্ণিত হয়েছে। যেমন,

وَيَسْتَنْبِئُوْنَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِيْ وَرَبِّيْ إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ۞

"তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে, এ (কিয়ামত) কি সত্য? আপনি বলুন! হাঁ! অবশ্যই, কসম আমার রবের! অবশ্যই তা সত্য। আর তোমরা তা ব্যর্থ করতে পারবে না।" [সূরা ইউনুস-৫৩]

উক্ত তিন কসমের দ্বিতীয়টি সূরা সাবায় বর্ণিত হয়েছে। যেমন,

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَأْتِيْنَا السَّاعَةُ قُلْ بَلٰى وَرَبِّيْ لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ، لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذٰلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِيْ كِتَابٍ مُبِيْنٍ ۞

"কাফিররা বলে আমাদের উপর কিয়ামত আসবে না। বলুন! কেন আসবে না? আমার পালনকর্তার শপথ! নিশ্চয় আসবে। তিনি অদৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞাত। নভোমণ্ডলে ও ভূ-মণ্ডলে তাঁর অগোচরে নয় অণু পরিমাণ কিছু, না তদপেক্ষা ক্ষুদ্র এবং না বৃহৎ সমস্তই আছে সুস্পষ্ট কিতাবে।" [সূরা সাবা-৩]

উক্ত তিন কসমের তৃতীয়টি সূরা তাগাবুনে বর্ণিত হয়েছে। যেমন,

زَعَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوْا قُلْ بَلٰى وَرَبِّيْ لَتُبْعَثُنَّ

ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ۞

"কাফিররা মনে করেছে, ওরা কখনো পুনরুত্থিত হবে না। আপনি বলুন, অবশ্যই। কসম আমার রবের! অবশ্যই তোমরা পুনরুত্থিত হবে। এরপর তোমাদেরকে তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করা হবে। আর এটা আল্লাহ তায়ালার পক্ষে সহজ।" [সূরা তাগাবুন-৭]

দেখুন! পরকালে বিশ্বাসই সকল অন্যায়-অনাচারের পথে সবচেয়ে বড় বাধা। এ বিশ্বাস জাগ্রত থাকলে নির্দ্বিধায় পাপাচারে লিপ্ত হওয়া সম্ভব নয়। তাই পাপাসক্ত মানুষ পরকালকে ভুলে থাকতে চায়। আর কাফিররা সরাসরি অস্বীকার করে নিজ সত্তার ব্যাকুলতা দমন করতে চায়। কিন্তু বাস্তবতা হল, মানবের যিনি স্রষ্টা তাঁর কাছে মানবকে ফিরে যেতেই হবে। বিশ্বাস করলেও যেতে হবে, বিশ্বাস না করলেও যেতে হবে। অস্বীকার করলেই কি বাস্তবতা টলে যায়? মাটির ঢিবিতে মুখ গুঁজলেই কি প্রলয় থেমে যায়?

এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে, শপথ করে বলার আদেশ। আল্লাহ তায়ালা তাঁর এ বাস্তবতা মানবজাতিকে জানাতে বলেছেন। আর তা জানাতে বলেছেন তাঁর পবিত্র নামের কসম সহকারে। অর্থাৎ এ এমনই অমোঘ বাস্তবতা, যা কোনোভাবেই টলার নয়।

এরপর আল্লাহ তায়ালা পরকালের অস্তিত্বের পক্ষে যুক্তি পেশ করে বলেন (অবশ্য আল্লাহ তায়ালার সকল কথা, সংবাদ, হুকুম, আদেশ-নিষেধ ও বিধি-বিধান যুক্তি-তর্কের উর্ধ্বে) :

لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۞

وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزٍ أَلِيمٌ ۞

"প্রতিদান দেওয়ার জন্য তাদেরকে, যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক রিযিক। আর যারা আমার আয়াতসমূহকে ব্যর্থ করার জন্য উঠে পড়ে লেগে যায়, তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।" [সূরা সাবা : ৩-৫]

অন্য আয়াতেও আল্লাহ তায়ালা এমনই যুক্তি প্রদর্শন করে বলেছেন :

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۞

"যারা দুষ্কর্ম উপার্জন করেছে তারা কি মনে করে যে, আমি তাদেরকে সে লোকদের মত করে দেব, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং তাদের জীবন ও মৃত্যু কি সমান হবে? তাদের দাবি কত মন্দ!" [সূরা জাছিয়া : ২১-২২]

অন্য আয়াতেও আল্লাহ তায়ালা এমনই যুক্তি প্রদর্শন করে বলছেন :

أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ

أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ

"আমি কি বিশ্বাসী ও সৎকর্মীদেরকে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী কাফিরদের সমতুল্য করে দিব? না খোদাভীরুদেরকে পাপাচারীদের সমান করে দিব।"
[সূরা ছাদ-২৮]

অন্য আয়াতেও আল্লাহ তায়ালা এমনই যুক্তি প্রদর্শন করে বলছেন :

أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ❖ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ❖

"আমি কি আজ্ঞাবাহীদেরকে অপরাধীদের মতো গণ্য করব? তোমাদের কী হল, তোমরা কেমন সিদ্ধান্ত দিচ্ছ?" [সূরা ক্বলাম : ৩৫-৩৬]

অর্থাৎ যদি কিয়ামত না আসে, হিসাব-নিকাশের পর্ব না থাকে, তা হলে এর অর্থ হয়—বিশ্বাস-অবিশ্বাস সমান, ন্যায়-অন্যায় সমান, ভালো ও মন্দ সমান। যে ভালো কাজ করছে আর যে মন্দ কাজ করছে, যে আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করছে আর যে আনুগত্য ত্যাগ করছে, তাদের সবার পরিণাম এক। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সবারই বিলুপ্তি ঘটবে। এটা কিভাবে সম্ভব? আল্লাহ তায়ালা বলেন– তোমাদের কি হল, তোমরা কেমন সিদ্ধান্ত দিচ্ছ?

তোমাদের জ্ঞান-বুদ্ধির এ বিপর্যয় কেন? তোমরা আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে মনে করছ যে, তিনি তাঁর অনুগত বান্দা আর বিদ্রোহী বান্দাদের সমান করে দিবেন! তাদের পরিণাম এক করে দিবেন! কখনো নয়।

অর্থাৎ কিয়ামত অবশ্যই হবে। পরকাল অবশ্যই আসবে। আমি আমার বিশ্বাসী পুণ্যবান বান্দাদের উত্তম প্রতিদান দিব। আর আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে সচেষ্ট, অবাধ্য অবিশ্বাসীদের যন্ত্রণাকর ও লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তির সম্মুখীন করব। এটা কিয়ামত সম্পর্কে আল্লাহর দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা।

## কুরআনুল কারীমের আরো কিছু আয়াত

পরকাল অস্বীকারকারীদের ব্যাপারে অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে,

وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ❖ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ ❖ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ ❖ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ❖ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ❖ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ❖ [المؤمنون : ٣٣ - ٣٨]

"তাঁর সম্প্রদায়ের প্রধানরা যারা কাফির ছিল, পরকালের সাক্ষাৎকে মিথ্যা বলত এবং যাদেরকে আমি পার্থিব জীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দিয়েছিলাম, তারা বলল, এ তো আমাদের মতোই একজন মানুষ বৈ নয়। তোমরা যা খাও, সেও

তাই খায় এবং তোমরা যা পান কর, সেও তাই পান করে। যদি তোমরা তোমাদের মতোই একজন মানুষের আনুগত্য কর, তবে তোমরা নিশ্চিতরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সে কি তোমাদেরকে এ ওয়াদা দেয় যে, তোমরা মারা গেলে এবং মৃত্তিকা ও অস্থিতে পরিণত হলে তোমাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করা হবে? তোমাদেরকে যে ওয়াদা দেওয়া হচ্ছে, তা কোথায় হতে পারে? আমাদের পার্থিব জীবনই একমাত্র জীবন। আমরা মরি ও বাঁচি এখানেই এবং আমরা পুনরুত্থিত হবো না। সে তো এমন ব্যক্তি বৈ নয়, যে আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করেছে ও আমরা তাকে বিশ্বাস করি না। [সূরা মুমিনূন : ৩৩-৩৮]

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে,

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ❖ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ❖ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ❖ قُلِ اللهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ❖ وَلِلهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ ❖ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا، الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ❖ هٰذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ، إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ❖ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ ❖ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ ❖ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ ❖ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ❖ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ❖ ذٰلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ❖

"আপনি কি তার প্রতি লক্ষ্য করেছেন, যে তার খেয়াল-খুশিকে নিজের উপাস্য স্থির করেছে? আল্লাহ তায়ালা জেনে-শুনে তাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, তার কান ও অন্তরে মহর এঁটে দিয়েছেন এবং তার চোখের উপর রেখেছেন পর্দা। কাজেই আল্লাহর পর কে তাকে পথ প্রদর্শন করবে? তোমরা কি চিন্তা-ভাবনা কর না? তারা বলে, আমাদের পার্থিব জীবনই তো শেষ; আমরা মরি ও বাঁচি

মহাকালই আমাদেরকে ধ্বংস করে। তাদের কাছে এ ব্যাপারে কোনো জ্ঞান নেই। তারা কেবল অনুমান করে কথা বলে। তাদের কাছে যখন আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন একথা বলা ছাড়া তাদের কোনো যুক্তিই থাকে না যে, তোমরা সত্যবাদী হলে আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে নিয়ে এসো। আপনি বলুন, আল্লাহই তোমাদেরকে জীবন দান করেন, এরপর মৃত্যু দেন, এরপর তোমাদেরকে কেয়ামতের দিন একত্র করবেন। যাতে কোনো সন্দেহ নেই; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ বোঝে না। নভোমণ্ডল এবং ভূ-মণ্ডলের রাজত্ব মহান আল্লাহরই। যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন মিথ্যাপন্থিরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আপনি প্রত্যেক উম্মতকে দেখবেন নতজানু অবস্থায়।

প্রত্যেক উম্মতকে তাদের আমলনামা দেখতে বলা হবে। তোমরা যা কিছু করতে অদ্য তোমারদেরকে তার প্রতিফল দেওয়া হবে। আমার কাছে রক্ষিত এ আমলনামা তোমাদের সম্পর্কে সত্য কথা বলবে। তোমরা যা করতে আমি তা লিপিবদ্ধ করতাম। যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও সৎকর্ম করেছে, তাদেরকে তাদের পালনকর্তা আপন রহমতে প্রবেশ করাবেন। এটাই প্রকাশ্য সাফল্য। আর যারা কুফরি করেছে, তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমাদের কাছে কি আয়াতসমূহ পঠিত হত না? কিন্তু তোমরা অহংকার করছিলে এবং তোমরা ছিলে এক অপরাধী সম্প্রদায়। যখন বলা হত, আল্লাহ তায়ালার ওয়াদা সত্য এবং কেয়ামতে কোনো সন্দেহ নেই, তখন তোমরা বলতে—আমরা জানি না কেয়ামত কী? আমরা শুধু ধারণাই করি এবং এ বিষয়ে আমরা নিশ্চিত নই। তাদের মন্দ কর্মগুলো তাদের সামনে প্রকাশ হয়ে পড়বে এবং যে আযাব নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত, তা তাদেরকে গ্রাস করবে। বলা হবে, আজ আমি তোমাদেরকে ভুলে যাব, যেমন তোমরা এ দিনের সাক্ষাৎকে ভুলে গিয়েছিলে। তোমাদের আবাসস্থল জাহান্নাম এবং তোমাদের সাহায্যকারী নেই। এটা এজন্য যে, তোমরা আল্লাহ তায়ালার আয়াতসমূহকে ঠাট্টারূপে গ্রহণ করেছিলে এবং পার্থিব জীবন তোমাদেরকে প্রতারিত করেছিল। সুতরাং আজ তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে না এবং তাদের কাছে তওবা চাওয়া হবে না।" [সূরা জাছিয়া : ২৩-৩৫]

পরকাল অস্বীকারকারীদের প্রসঙ্গে অন্যত্র বলা হয়েছে,

أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَٰلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ ۞

"(কাফিররা বলে) আমরা মরে গেলে এবং মৃত্তিকায় পরিণত হয়ে গেলেও কি পুনরুত্থিত হব? এ প্রত্যাবর্তন তো সুদূরপরাহত।" [সূরা কাফ-৩]

তাদের জবাবে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ۞

"তোমরা কি ধারণা কর যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার কাছে ফিরে আসবে না?" [সূরা মুমিনূন-১১৫]

আল্লাহ তায়ালা আরো ইরশাদ করছেন–

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ❖ بَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ❖ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ❖ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ❖ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَىٰ مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ ❖

"আর আপনি যদি দেখেন, যখন তাদেরকে দোযখের উপর দাঁড় করানো হবে! তারা বলবে, কতই না ভালো হত, যদি আমরা পুনঃপ্রেরিত হতাম; তা হলে আমরা আপন পালনকর্তার নিদর্শনসমূহে মিথ্যারোপ করতাম না এবং আমরা বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম। এবং তারা ইতোপূর্বে যা গোপন করত, তা তাদের সামনে প্রকাশ হয়ে পড়েছে। যদি তারা পুনরায় প্রেরিত হয়, তথাপি তাই করবে, যা তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল। নিশ্চয় তারা মিথ্যাবাদী। তারা বলে, আমাদের এ পার্থিব জীবনই জীবন। আমাদেরকে পুনরায় জীবিত হতে হবে না। আর যদি আপনি দেখেন; যখন তাদেরকে প্রতিপালকের সামনে দাঁড় করানো হবে। তিনি বলবেন– এটা কি বাস্তব সত্য নয়? তারা বলবে, হাঁ! আমাদের পালনকর্তার কসম। তিনি বলবেন, কাজেই নিজ কুফরের কারণে শাস্তি আস্বাদন করো! নিশ্চয় তারা ক্ষতিগ্রস্ত, যারা আল্লাহর সাক্ষাৎকে মিথ্যা মনে করেছে। এমনকি যখন কিয়ামত তাদের কাছে অকস্মাৎ এসে যাবে, তারা বলবে– হায়, আক্ষেপ! এর ব্যাপারে আমরা কতই না ত্রুটি করেছি। তারা নিজের বোঝা নিজ পিঠে বহন করবে। শোনো! তারা যে বোঝা বহন করবে, তা নিকৃষ্টতর বোঝা।" [সূরা আনয়াম : ২৭-৩১]

পরকাল অস্বীকারকারী ও পরকাল সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ❖ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ❖ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ❖ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ ❖ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ❖ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ❖ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ❖

"মানুষ কি দেখে না যে, আমি তাকে সৃষ্টি করেছি বীর্য থেকে? এরপর তখনই সে হয়ে গেল প্রকাশ্য বাকবিতর্ককারী। সে আমার সম্পর্কে এক অদ্ভুত কথা বর্ণনা করে, অথচ সে নিজের সৃষ্টি ভুলে যায়। সে বলে, কে জীবিত করবে অস্থিসমূহকে যখন সেগুলো পচে গলে যাবে? বলুন, যিনি প্রথমবার সেগুলো সৃষ্টি করেছেন, তিনিই জীবিত করবেন। তিনি সর্বপ্রকার সৃষ্টি সম্পর্কে সম্যক অবগত। যিনি তোমাদের জন্য সবুজ বৃক্ষ থেকে আগুন উৎপন্ন করেন। তখন তোমরা তা থেকে আগুন জ্বালাও। যিনি নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল সৃষ্টি করেছেন, তিনিই কি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে সক্ষম নন? হাঁ! তিনি মহাস্রষ্টা, সর্বজ্ঞ। তিনি যখন কোনো কিছু করতে ইচ্ছা করেন, তখন তাকে শুধু বলে দেন 'হও', তখনই তা হয়ে যায়। সুতরাং পবিত্র তিনি, যাঁর হাতে সবকিছুর রাজত্ব এবং তাঁরই দিকে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।" [সূরা ইয়াসীন :৭৭-৮৩]

**গবেষণালব্ধ প্রমাণেও পরকাল সত্য**

আব্দুর রহমান হাসান হাবান্নাকাহ আলমায়দানি রহ. বলেন–

نَقْضُ تَوَهُّمَاتِ مُنْكِرِيْ الْحَيَاةِ الْأُخْرٰى : لَدَى الْبَحْثِ عَنِ الْمُسْتَنَدَاتِ الْفِكْرِيَّةِ الَّتِيْ يَسْتَنِدُ إِلَيْهَا مُنْكِرُوْ الْحَيَاةِ الْاٰخِرَةِ يَتَبَيَّنُ لَنَا أَنَّهُمْ لَا يَمْلِكُوْنَ أَيَّةَ مُسْتَنَدَاتٍ فِكْرِيَّةٍ صَحِيْحَةٍ، إِنَّمَا هُمْ بَيْنَ الْعِنَادِ وَالتَّوَهُّمِ .أَمَّا الْعِنَادُ فَهُوَ مَذْهَبُ الْمُكَابِرِيْنَ الَّذِيْنَ لَا يَنْفَعُ مَعَهُمُ الْجَدَلُ الْمَنْطِقِيُّ، وَالْمُنَاظَرَةُ الْعِلْمِيَّةُ وَأَمَّا التَّوَهُّمُ فَهُوَ طَرِيْقَةُ كَثِيْرٍ مِّنَ الْمُنْكِرِيْنَ الَّذِيْنَ يَنْدَفِعُوْنَ وَرَاءَ تَوَهُّمَاتٍ يَتَصَوَّرُوْنَهَا أَدِلَّةً ، وَلَيْسَتْ هِيَ بِأَدِلَّةٍ. وَإِنَّ الْحَيَاةَ الْأُخْرٰى لَيْسَتْ مِنَ الْمُسْتَحِيْلَاتِ الْعَقْلِيَّةِ حَتّٰى يَجْحَدُوْهَا الْجَاحِدُوْنَ بِحُجَّةِ الْاِسْتِحَالَةِ ، وَلٰكِنَّهَا مِنَ الْمُمْكِنَاتِ الْعَقْلِيَّةِ ، وَظُهُوْرُ الْحَيَاةِ الْأُوْلَى أَعْظَمُ شَاهِدٍ تَجْرِيْبِيٍّ عَلٰى إِمْكَانِ الْحَيَاةِ الْأُخْرٰى ، وَبَعْدَ إِثْبَاتِ الْإِمْكَانِ الْفِعْلِيِّ تَبْقٰى لَدَيْنَا مُرَجَّحَاتُ إِثْبَاتِ الْوُقُوْعِ ، وَقَدْ رَأَيْنَا بِالْأَدِلَّةِ النَّظَرِيَّةِ أَنَّ مُرَجَّحَاتِ إِثْبَاتِ الْوُقُوْعِ مُرَجَّحَاتٌ قَوِيَّةٌ ، فَإِذَا انْضَمَّتْ هٰذِهِ الْأَدِلَّةُ النَّظَرِيَّةُ إِلَى التَّبْلِيْغَاتِ الرَّبَّانِيَّةِ الَّتِيْ أَخْبَرَنَا بِهَا رُسُلُ اللهِ الصَّادِقُوْنَ وَجَدْنَا أَنَّ الْحَيَاةَ الْأُخْرٰى قَضِيَّةٌ حَتْمِيَّةٌ لَا مَنَاصَ لِلْعُقَلَاءِ مِنَ الْإِيْمَانِ بِهَا ، وَالتَّسْلِيْمِ بِمَا جَاءَ عَنْهَا مِنْ أَخْبَارٍ صَادِقَاتٍ .

"পরকাল অস্বীকারকারীদের সংশয়াবলির নিরসন : বিবেকপ্রসূত বিষয়ে আলোচনা করতে গেলেও আমাদের সামনে দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, পরকাল অস্বীকারের দাবির পক্ষে বিবেকপ্রসূত সঠিক কোনো প্রমাণ নেই; তারা শুধু একগুঁয়েমি ও সংশয়ের মাঝে ঘুরপাক খাচ্ছে। একগুঁয়েমি! সে তো অহংকারীদের একটি পন্থা, যাদের সাথে যুক্তিপূর্ণ বিতর্ক এবং

জ্ঞানগর্ভ তর্ক-বিতর্কে কোনো লাভ নেই। আর সংশয় হল, অধিকাংশ অস্বীকারকারীদের পন্থা, যারা ধারণার পিছনে ধাবিত হয়, যারা এটাকে প্রমাণ মনে করে; অথচ ধারণা কখনো প্রমাণ নয়।

আর নিশ্চয় পরকালীন জীবন জ্ঞানগত অসম্ভব নয় যে, অস্বীকারকারীরা 'হুজ্জাতে ইস্তিহালা' তথা অসম্ভব হওয়ার বাহানা দিয়ে পরকালকে অস্বীকার করতে পারে; বরং পরকালীন জীবন বুদ্ধিগ্রাহ্য সম্ভাব্য একটি বিষয়। ইহকালীন জীবনের প্রকাশ ও পরকালীন জীবনের একটি বড় অভিজ্ঞতাসূলভ প্রমাণ বটে। কার্যত পরকালীন জীবন সম্ভব হওয়া প্রমাণিত হওয়ার পর আমাদের সম্মুখে বাকি থাকে বাস্তবায়িত হওয়ার প্রমাণের প্রাধান্য। আমরা গবেষণালব্ধ দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে লক্ষ্য করেছি, পরকালীন জীবন বাস্তবায়িত হওয়ার প্রমাণের প্রাধান্য শক্তিশালী। তারপর যখন এ গবেষণালব্ধ প্রমাণাদির সাথে তাবলিগে রাব্বানি তথা খোদাপ্রদত্ত সংবাদের সম্মেলন হল, যা আমাদের জানিয়েছেন আল্লাহ তায়ালার রাসূলগণ, যাঁরা অকাট্যভাবে সত্যবাদী, তখন আমরা নিশ্চিত হলাম যে, পরকালীন জীবনটা নিশ্চিত বাস্তব। জ্ঞানীদের জন্য এর প্রতি বিশ্বাস করা বাধ্যতামূলক এবং এ ব্যাপারে যেসব সত্য সংবাদ এসেছে, তা মেনে নেওয়া অপরিহার্য।"

[ছুরাউন মাআল মালাহিদাতি হাত্তাল আজম/ শামেলা-১/১৭১,১৭২]

**পরকাল অস্বীকারে নাস্তিকের পন্থা কুরআনের জবাব**

আব্দুর রহমান হাসান হাবান্নাকাহ আলমায়দানি রহ. বলেন :

جِدَالُهُمْ فِيْ قَضِيَّةِ الْآخِرَةِ : وَجَادَلَ الْكَافِرُوْنَ فِيْ قَضِيَّةِ الْآخِرَةِ وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَكَانَ أَهَمُّ مَا اعْتَمَدُوْا عَلَيْهِ مِنْ حُجَّةِ إِظْهَارِ التَّعَجُّبِ، وَالْإِنْكَارِ عَلَى أَسَاسِ الْاِسْتِغْرَابِ وَالْاِسْتِبْعَادِ، وَظَاهِرٌ أَنَّ مِثْلَ هٰذَا لَا يُمَثِّلُ حُجَّةً مَقْبُوْلَةً عِنْدَ الْعُقَلَاءِ. لَقَدْ عَرَضَ الْقُرْآنُ جَدَلِيَّاتِهِمْ فِيْ هٰذَا الْمَوْضُوْعِ. فَمِنْهَا قَوْلُ اللهِ تَعَالٰى.

"পরকাল প্রসঙ্গে বিতর্ক : কাফিররা পরকাল ও মৃত্যুর পর জীবিত হওয়ার বিষয়ে বিতর্ক করে। তাদের বিতর্কর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পন্থা হলো হুজ্জাতুল ইসতি'জাব তথা বিস্মিত হওয়া এবং এটাকে অদ্ভুত ও সুদূর পরাহত মনে করে অস্বীকার করা। আর সুস্পষ্টত জ্ঞানীদের কাছে এসব গ্রহণযোগ্য প্রমাণ হতে পারে না।"

পবিত্র কুরআন এমন বিতর্কগুলো প্রসঙ্গে ইরশাদ হয়েছে,

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَئِنَّا لَمُخْرَجُوْنَ ❁ لَقَدْ وُعِدْنَا هٰذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هٰذَا إِلَّا أَسَاطِيْرُ الْأَوَّلِيْنَ ❁ قُلْ سِيْرُوْا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ

الْمُجْرِمِينَ ۞ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ ۞ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۞ قُلْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ۞

"কাফিররা বলে, যখন আমরা ও আমাদের বাপ-দাদারা মৃত্তিকা হয়ে যাব, তখনও কি আমাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে? এ ওয়াদাপ্রাপ্ত হয়েছি আমরা এবং পূর্ব থেকেই আমাদের বাপ-দাদারা। এটা তো পূর্ববর্তীদের উপকথা বৈ কিছু নয়। বলুন! পৃথিবী পরিভ্রমণ করো এবং দেখো অপরাধীদের পরিণতি কি হয়েছে? তাদের কারণে আপনি দুঃখিত হবেন না এবং তারা যে চক্রান্ত করেছে, এতে মনঃক্ষুণ্ন হবেন না। তারা বলে, তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে বলো—এ ওয়াদা কখন পূর্ণ হবে? বলুন! অসম্ভব কি, তোমরা যত দ্রুত কামনা করছ তার কিয়দংশ তোমাদের পিঠের উপর চলে এসেছে। আপনার পালনকর্তা মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল, কিন্তু তাদের অধিকাংশই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।" [সূরা নামল : ৬৭-৭৩]

পরকাল ও মৃত্যুর পর প্রতিদানের জন্য পুনরায় জীবিত হওয়াকে অস্বীকার করতে ঝগড়াটে কথা দু'ভাগে বিভক্ত। যেমন,

১. অদ্ভুত ও সুদূর পরাহত মনে করার উপর ভিত্তি করে অস্বীকার করা।

২. বিচার দিবস অনেক দূর হওয়া এবং উল্লিখিত দিন না এসে তাদের বাপ-দাদার থেকে নিয়ে যুগের পর যুগ গত হয়ে যাওয়ার উপর ভিত্তি করে অস্বীকার করা। এটাই তাদেরকে ধারণা করতে উদ্বুদ্ধ করেছে যে, পরকাল বাস্তবায়িত হবে না।

স্পষ্টত এমন কল্পনা মূল হতেই অবাঞ্ছিত। কেননা এ জগতের ব্যবস্থাপনা কেবল দশ হাজার বছরেই যথেষ্ট নয় যে, তা বাকি থাকার মেয়াদ লম্বা হয়ে গেলে এটা অনাদিকাল চলতে থাকার ওপর এবং এ ব্যবস্থাপনার পর আর কোনো ব্যবস্থাপনা কিংবা জীবন নেই—এর উপর প্রমাণ হতে পারে।

নিশ্চয় এটা একটা মহাব্যবস্থাপনা, যার ওপর দুনিয়ার জীবন স্থাপিত, যার জন্য সৃষ্টি জগতকে সাজানো হয়েছে এবং মানব জাতির জন্য এর মধ্যে যে পরীক্ষার স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে, এসবের জন্য হাজার হাজার যুগও যথেষ্ট নয়। সুতরাং সময়ের এ দীর্ঘতাকে বেশি মনে করা হবে না, যদিও তা দীর্ঘ হয়ে যায়। সুতরাং পরকাল চিরস্থায়ী জীবন প্রমাণিত হল। আর দুনিয়ার জীবন লম্বা হলেও পরকালের তুলনায় অতি স্বল্প। কিন্তু নাস্তিকরা সঙ্কীর্ণমনা। সকল জিনিসকে তারা নিজের ব্যক্তিসত্তা ও নিজের পরিমণ্ডলের উপর অনুমান করে। তারা চিরস্থায়িত্বকে শুদ্ধরূপে কল্পনা করতে পারে না যে, দুনিয়ার জীবন দীর্ঘ হওয়ার পরও তা তার কাছে ক্ষীণ মনে হবে।

সুতরাং কাফিররা যা পেশ করেছে পরকালকে অস্বীকার করার জন্য যা কিছু উপস্থাপন করেছে, তা জ্ঞানীদের কাছে প্রমাণস্বরূপ গ্রহণযোগ্য হওয়ার মতো সঠিক নয়; বরং এটা পরকাল সম্পর্কে প্রমাণবিহীন মিথ্যা রটনা মাত্র। তাদেরকে তাদের নাস্তিকতায় উৎসাহদাতা হল—দুনিয়ায় চিরস্থায়ী হওয়ার আশা, দুনিয়ার বিলাসিতা, মোহাচ্ছন্নতা ও এ দুনিয়ার স্থান-কালকে দীর্ঘ মনে করা, এটা একটা তর্কের অজুহাত, যার কোনো যুক্তিপূর্ণ ভিত্তি নেই।

তাদের এসব কথার প্রত্যুত্তরে কুরআনের বর্ণনা পদ্ধতি হল– পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে যারা বিচার দিবসকে অস্বীকার করেছে, তাদের ব্যাপারে আল্লাহর বিচার প্রকাশ করা। বিচার দিবসের পূর্বেই এ দুনিয়ায় আল্লাহ তায়ালার শাস্তি জলদি কামনা করা অবস্থায় তাদেরকে তিনি কিভাবে হোঁচট খাইয়েছেন, তা প্রকাশ করা। যাতে নগদ প্রতিফল কার্যকর হওয়ার দ্বারা বাকিটা সত্য হওয়া প্রমাণিত হয়ে যায়। সাথে সাথে তাদেরকে প্রেরণ করা হয়েছে সরেজমিনে চাক্ষুস প্রমাণের দিকে, যেখানে কাফির এবং পরকাল অস্বীকারকারীদের উপর ধ্বংসাত্মক শাস্তির ঘটনা ঘটেছে।

আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা দিয়েছেন,

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ❖

"বলুন! পৃথিবী পরিভ্রমণ করো! দেখো, অপরাধীদের পরিণতি কি হয়েছে।" [সূরা নামল-৬৯]

এরপর তাঁর রাসূলকে বলেছেন–

وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ ❖

"তাদের কারণে আপনি দুঃখিত হবেন না এবং তারা যে চক্রান্ত করেছে এতে মনঃক্ষুণ্ন হবেন না।" [সূরা নামল-৭০]

আর এর কারণ হচ্ছে, তারা এটুকু যোগ্যতাও রাখে না যে, তাদের কারণে রাসূল ﷺ চিন্তিত হবেন। কেননা তারা নিজেদের জন্য অস্বীকার ও সত্যকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করার পথ বেছে নিয়েছে। তারা নিজেদের জন্য মিথ্যাপ্রতিপন্নতার পরিণতিকে পছন্দ করে নিয়েছে। আর আপনি নিজের ও নিজের দাওয়াত সম্পর্কে তাদের চক্রান্তে মনোবল হারাবেন না। নিশ্চয় আল্লাহ আপনাকে সাহায্য করবেন।

নাস্তিকরা তাদের তর্কে এ অঙ্গীকার বাস্তবায়নের সময় সম্পর্কে প্রশ্ন করে। সুতরাং তারা রাসূলগণকে বলে–

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ❖

"তারা বলে, তোমরা যদি সত্যবাদী হও বলো, এ ওয়াদা কখন পূর্ণ হবে?" [সূরা নামল-৭১]

বাস্তবে আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের থেকে কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সময়টি গোপন রেখেছেন। যেমনটি তিনি বিভিন্ন জায়গায় বর্ণনাও করেছেন। সুতরাং এ বিষয়ে জানতে চাইলে তাদের জন্য চমৎকার জবাব হল, তাদেরকে ধমকি দিবে—সেই প্রতিশ্রুত আজাবের কিয়দংশ এই তো তাদের উপর এসে পড়ল বলে। সুতরাং তারা তাদের কুফরি ও একগুঁয়েমিতে বাড়াবাড়ি করলে তারা যেন নগদ শাস্তি পাওয়ার জন্য এ দুনিয়ায় অপেক্ষা করে। যেমন, মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁর রাসূলকে বলেছেন–

قُلْ عَسٰى أَنْ يَكُوْنَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِىْ تَسْتَعْجِلُوْنَ ۞

"বলুন! অসম্ভব কি তোমরা যত দ্রুত কামনা করছ, তার কিয়দংশ তোমাদের পিঠের উপর এসে গেছে।" [সূরা নামল-৭২]

এরপর আল্লাহ তায়ালা বলেন : তাঁর শাস্তির বিলম্ব তাঁর বান্দাদের উপর তাঁর পক্ষ থেকে অনুগ্রহস্বরূপ। যাতে তারা তওবা করার সুযোগ পায়। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এ সুযোগের মূল্যায়ন করে না। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُوْنَ ۞

"আপনার পালনকর্তা মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল, কিন্তু তাদের অধিকাংশই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।" [সূরা নামল-৭৩]

বিতর্ক প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র এভাবে বর্ণনা করেছেন–

قٓ ۞ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيْدِ ۞ بَلْ عَجِبُوْا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُوْنَ هٰذَا شَىْءٌ عَجِيْبٌ ۞ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذٰلِكَ رَجْعٌ بَعِيْدٌ ۞

"ক্বাফ! সম্মানিত কুরআনের শপথ! বরং তারা তাদের মধ্য হতেই একজন ভয় প্রদর্শনকারী আগমন করেছে দেখে বিস্ময় বোধ করে। এরপর কাফিররা বলে– এটা আশ্চর্যের ব্যাপার। আমরা মরে গেলে এবং মৃত্তিকায় পরিণত হয়ে গেলেও কি পুনরুত্থিত হব? এ প্রত্যাবর্তন সুদূর পরাহত।" [সূরা ক্বাফ : ১-৩]

এখানেও তারা বিস্মিত হওয়ার ভিত্তিতে পরকাল অস্বীকার করেছে। অথচ বিস্মিত হওয়া কোনো সত্য বিষয়কে অস্বীকার করার জন্য প্রমাণ হতে পারে না। তারপর তারা রাসূলের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা শুরু করেছে, লোকটি আল্লাহর প্রতি মিথ্যা কথা বলছে, না-কি তার মধ্যে পাগলামি আছে? তাদের এ জিজ্ঞাসাবাদ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেছেন–

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِىْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ۞ أَفْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا أَمْ بِهٖ جِنَّةٌ بَلِ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ فِى الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيْدِ ۞ أَفَلَمْ يَرَوْا إِلٰى مَا بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنْ نَشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيْبٍ ۞

"কাফিররা বলে, আমরা কি তোমাদেরকে এমন ব্যক্তির সন্ধান দিব, যে তোমাদেরকে খবর দেয় যে; তোমরা সম্পূর্ণ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেও তোমরা নতুন সৃজিত হবে। সে আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে মিথ্যা বলে, না হয় সে উন্মাদ এবং যারা পরকালে অবিশ্বাসী, তারা আজাবে ও ঘোর পথভ্রষ্টতায় পতিত আছে। তারা কি তাদের সামনের ও পশ্চাতের আকাশ ও পৃথিবীর প্রতি লক্ষ্য করে না? আমি ইচ্ছা করলে তাদেরসহ ভূমি ধসিয়ে দিব বা আকাশের কোন খণ্ড তাদের উপর পতিত করব। আল্লাহ অভিমুখী প্রত্যেক বান্দার জন্য এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে।" [সূরা সাবা : ৭-৯]

এখানে এ বিষয়ে শক্ত ইঙ্গিত রয়েছে, আল্লাহ তায়ালা তো নতুনভাবেও তৈরি করতে সক্ষম। তা হলে যিনি আকাশ-জমিন নতুনভাবে সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাদের শরীর নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার পরও পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম। সুতরাং এ বিষয়টি তাদের পক্ষে অদ্ভুত ও সুদূর পরাহত মনে করার কোনো সুযোগ নেই। তাদের বাক-বিতর্কের বিভিন্ন স্তর পার হওয়ার পরও, তাদের ভ্রান্তিগুলোর জবাব প্রদান করার পরও তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য কোনো প্রমাণ না থাকা সত্ত্বেও তাদের কেউ কেউ পরকাল অস্বীকার করার ওপর বাড়াবাড়িই করে থাকে। আল্লাহ তায়ালা তাদের এ বিষয়টি কুরআন পাকের সূরা সাবার শুরুতে বর্ণনা করেছেন–

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَأْتِيْنَا السَّاعَةُ قُلْ بَلٰى وَرَبِّيْ لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ، لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذٰلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِيْ كِتَابٍ مُبِيْنٍ ❖ لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيْمٌ ❖ وَالَّذِيْنَ سَعَوْا فِيْ آيَاتِنَا مُعَاجِزِيْنَ أُولٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزٍ أَلِيْمٌ ❖

"কাফিররা বলে আমাদের উপর কিয়ামত আসবে না। বলুন! কেন আসবে না? আমার পালনকর্তার শপথ! নিশ্চয় আসবে। তিনি অদৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞাত। নভোমণ্ডলে ও ভূ-মণ্ডলে তাঁর আগোচরে নয় অণু পরিমাণ কিছু ; না তদপেক্ষা ক্ষুদ্র ও না বৃহৎ—সমস্তই আছে সুস্পষ্ট কিতাবে। প্রতিদান দেওয়ার জন্য তাদেরকে, যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক রিযিক। আর যারা আমার আয়াতসমূহকে ব্যর্থ করার জন্য উঠেপড়ে লেগে যায়, তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।" [সূরা সাবা : ৩-৫]

এখানে কাফিরদের কুফুরিতে বাড়াবাড়ির বিপরীতে রাসূলের পীড়াপীড়ি ছিল, তারা যেন ঈমান আনয়ন করে। সুতরাং আমরাও এখানে রাসূলের পন্থা

অবলম্বন করে শত বাড়াবাড়ি সত্ত্বেও তাদের প্রতি আহ্বান করছি, আপনারা আল্লাহ তায়ালার প্রতি ঈমান আনয়ন করুন! তাঁর কিতাবের প্রতি ঈমান আনয়ন করুন। পরকালের প্রতি ঈমান আনয়ন করুন! আল্লাহ তায়ালা সকলকে জান্নাতের পথপ্রদর্শন করুন। আমিন!

[ছুরাউন মায়াল মালাহিদাতি হাত্তাল আজম/শামেলা : ১/৪০৬-৪১২]

**৪. কুরআনের সত্যতা ও প্রমাণ**

আল্লাহ তায়ালা মানব জাতিকে সৃষ্টি করে তাদের জন্য জীবনবিধানও সৃষ্টি করেছেন। জান্নাত থেকে একটা নির্ধারিত সময়ের জন্য দুনিয়াতে প্রেরণ করে পুনরায় জান্নাতের যাওয়ার পথনির্দেশনাও তিনি বান্দার জন্য দিয়েছেন। সে পথনির্দেশনা ও জীবন বিধানসমূহ হলো যুগে যুগে প্রেরিত আসমানি কিতাব ও ছহিফাগুলো। আসমানি সে কিতাব ও ছহিফাগুলোর মধ্য থেকে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি কিতাব পবিত্র কুরআন।

পবিত্র কুরআনের শুরুতেই আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা দিয়েছেন, এ কিতাবে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। পবিত্র কুরআনের সত্যতা প্রমাণে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অসংখ্য প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে। যেগুলো আমাদেরকে জানান দিতে থাকে যে, কুরআন পাক কোনো মানুষ কিংবা জিনের কথা নয়; এটা একমাত্র মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের বাণী।

ডক্টর মুহাম্মদ ছিদ্দিক বলেন—পৃথিবীর লেখকগণ গ্রন্থ রচনায় কতবার লেখালেখি, কাটাকাটি, নবসংস্করণ ও পরিবর্তন-পরিবর্ধন করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুখনিঃসৃত কুরআন—তিনি যা মুখে ডিক্টেট করেছেন তাঁর 'কাতিব' বা লিপিকারদের, তাই রয়েছে সেই প্রথম দিন থেকে। রাসূল ﷺ তো কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশুনা করেন নি; তাঁর তো কোনো অক্ষরজ্ঞান ছিল না। একজন নিরক্ষর ব্যক্তির মুখ থেকে প্রায় ছয়শত পৃষ্ঠার একটি গ্রন্থ বের হয়ে আসল, যার বিষয়বস্তু ধর্ম, সংস্কৃতি, শাসন, বিজ্ঞান, সমাজ, ইতিহাস, আইন, পরিবারনীতি, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, যুদ্ধনীতি, শান্তি, এবাদত-বন্দেগি ও আরো কত কী! এসব বিষয়ভিত্তিক লেখার বা ভাষার ভুলত্রুটি সংশোধনের কোনোই প্রয়োজন পড়েনি, না তাঁর জীবদ্দশায়, না পরবর্তীকালে। এমনকি বৈজ্ঞানিক বিষয়সমূহেরও কোনো তাত্ত্বিক পরিবর্তনের প্রয়োজন পড়ছে না, যা কুরআনে চৌদ্দশত বছর পূর্বে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তো বৈজ্ঞানিক ছিলেন না। অতীতের বা বর্তমান যুগের বৈজ্ঞানিকগণও সত্যে পৌঁছতে তাদের বৈজ্ঞানিক মতামত বারবার পরিবর্তন করেছেন। পদার্থবিদ হকিং তার ছোট্ট 'ব্রিফ হিস্ট্রি অব টাইম' বইটি কতবার

কারেকশন করে সংশোধন করেছেন, তার সীমা নেই। তিনি তাঁর বৈজ্ঞানিক অভিমতও পরিবর্তন করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রিধারী বিজ্ঞানীর জ্ঞানের এ অবস্থা কেন?

নিরক্ষর হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর মুখনিঃসৃত বাণীর বা তত্ত্বের পরিবর্তন প্রয়োজন পড়ে না কেন? এটি কি একটি 'সারকামস্ট্যানসিয়াল এভিডেন্স' নয়? কুরআন যে মানুষ মুহাম্মদ ﷺ-এর বানানো নয়; খোদ স্রষ্টার বাণী, এটি কি এতে প্রমাণিত হয় না? কুরআনের পিছনে স্রষ্টা আছেন। তাই এতে ভুল নেই। 'ব্রিফ হিস্ট্রি অব টাইম'-এর পিছনে স্রষ্টা নেই। রয়েছে জাগতিক শিক্ষায় শিক্ষিত বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং। তাই এতে ভুল সংশোধনের প্রয়োজন পড়ছে এবং প্রয়োজন হবে কিয়ামত পর্যন্ত। তা-ও নির্ভুল দাবি করা অসম্ভব।

পবিত্র কুরআন যে আল্লাহ তায়ালার বাণী; হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর বাণী নয়—এটা উপলব্ধি হবে পবিত্র কুরআন ও [মুহাম্মদ ﷺ-এর বাণী] হাদিসের ভাষা ও বাচনভঙ্গির পার্থক্যে। হাদিসের ভাষা ও বাচনভঙ্গি থেকে কুরআনের ভাষা-বাচনভঙ্গি পৃথক। হাদিস যদি জমিন হয়, কুরআন আসমান। কুরআনের গুরুগাম্ভীর্য, মাহাত্ম্য, ভাষাগত উৎকর্ষতা, বিষয়বস্তুর তাৎপর্য, যৌক্তিকতা ইত্যাদি হাদিস অপেক্ষা বহুগুণে উচ্চতর। দুটির পাঠকালেই তা স্পষ্ট বোঝা যায়। যদি দুটির প্রণেতা একই ব্যক্তি হতেন, তা হলে এ পার্থক্য থাকার কথা নয়। যেহেতু দুটির প্রণেতা দুজন তাই এ পার্থক্য।

কবি রবীন্দ্রনাথ, কবি কাজি নজরুল ইসলাম, কবি জসিম উদ্দিন প্রমুখের লেখা পাঠ করলে বুঝা যায়, প্রত্যেকের লেখার একটি ভিন্ন বৈশিষ্ট্য রয়েছে। কবি জসিম উদ্দিনের লেখা আর কবি নজরুল ইসলামের লেখার ভাষাগত ও বাচনভঙ্গি সম্পূর্ণ আলাদা।

হাদিস ও কুরআনের অবস্থাও এমনই। যদি কুরআন হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর লেখা বা প্রণীত হত, তা হলে তা হাদিস থেকে পৃথক পদ্ধতির হত না। সুতরাং কুরআন মুহাম্মদ ﷺ বা জগতের কারো বাণী হতে পারে না। কুরআন একমাত্র আল্লাহর বাণী ও কুরআন আল্লাহর অস্তিত্বের একটি বড় প্রমাণও। [স্টিফেন হকিং, নাস্তিকতা ও ইসলাম ৯৮-৯৯]

**কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণী**

কুরআন আলেমুল গায়ব আল্লাহ তায়ালার বাণী। এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। কুরআনে প্রদত্ত কোনো ভবিষ্যদ্বাণী আজ পর্যন্ত মিথ্যা প্রমাণিত হয়নি বরং সত্যই প্রমাণিত হয়ে চলছে একের পর এক। কুরআন আলেমুল গায়বের বাণী না হলে এমনটি হওয়ার কথা নয়। খোদ কুরআন পাক বলছে–

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِيْ لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِيْ فَلَكٍ يَسْبَحُوْنَ ❖

'সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চন্দ্রের নাগাল পাওয়া এবং রজনীর পক্ষে সম্ভব নয় দিবসকে অতিক্রম করা এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষ পথে সন্তরণ করে।'

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يُوْلِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِيْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَأَنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ❖

"তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ তায়ালা রাত্রিকে দিবসে প্রবিষ্ট করান এবং দিবসকে রাত্রিতে প্রবিষ্ট করান? তিনি চন্দ্র ও সূর্যকে নিয়মাধীন করেছেন। প্রত্যেকেই নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত পরিভ্রমণ করে। তুমি কি আরো দেখ না, তোমরা যা কর, আল্লাহ তায়ালা তার খবর রাখেন?" [সূরা লুকমান-২৯]

وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِيْ لِأَجَلٍ مُسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوْقِنُوْنَ ❖

"এবং আল্লাহ তায়ালা সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়মাধীন করলেন; প্রত্যেকে নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত আবর্তন করে।" [সূরা রায়াদ-২]

يُوْلِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِيْ لِأَجَلٍ مُسَمًّى ذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ مَا يَمْلِكُوْنَ مِنْ قِطْمِيْرٍ ❖

"তিনি রাত্রিকে দিবসে প্রবিষ্ট করান এবং দিবসকে রাত্রিতে প্রবিষ্ট করান। তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়ন্ত্রিত করেছেন। প্রত্যেকটি আবর্তন করে এক নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত। তিনি আল্লাহ; তোমাদের পালনকর্তা, সাম্রাজ্য তাঁরই। তাঁর পরিবর্তে তোমরা যাদের ডাক, তারা তুচ্ছ খেজুর আঁটিরও অধিকারী নয়।" [সূরা ফাতির-১৩]

خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِيْ لِأَجَلٍ مُسَمًّى أَلَا هُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفَّارُ ❖

"তিনি আকাশ ও জমিন সৃষ্টি করেছেন যথার্থভাবে। তিনি রাত্রিকে দিবস দ্বারা আচ্ছাদিত করেন এবং দিবসকে রাত্রি দ্বারা আচ্ছাদিত করেন এবং তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে আজ্ঞাবহ করেছেন। প্রত্যেকেই বিচরণ করে নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত। শোনো! তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল।" [সূরা যুমার-৫]

উপরের আয়াতগুলোতে যে বৈজ্ঞানিক তথ্য চৌদ্দশত বছর পূর্বে এসেছে, তা হযরত মুহাম্মদ ﷺ কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে জেনে প্রকাশ করেননি। সেসময় তো চন্দ্র-সূর্যের, উভয়ের পরিভ্রমণ সম্পর্কে দুনিয়ার কোথাও কোনো

ঐকমত্য ছিল না। তার অনেক পরে মধ্যযুগে গ্যালিলিও, ব্রুনো প্রমুখ খ্রিষ্টান বৈজ্ঞানিক এ বিশুদ্ধ তথ্যটি প্রকাশ করে তো নির্যাতিত হয়েছেন।

প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক প্লেটো বলেন, পৃথিবীর চারদিকে অন্যান্য জ্যোতিষ্ক ঘোরে। তারপর বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ টলেমীও জোর দিয়ে একই কথা বলেন। তদানীন্তন জ্যোতির্বিজ্ঞানের গৃহীত তত্ত্বের বিরুদ্ধে সপ্তম শতাব্দি থেকে আজ অবধি কুরআন বলছে অন্য কথা।

কুরআন তখনকার বিজ্ঞানীদের মতো বলেনি, পৃথিবীর চারদিকে গ্রহরাজি ঘুরছে। কুরআন বলছে, চন্দ্র-সূর্যসহ সব গ্রহই সাঁতার কাটছে অর্থাৎ ঘুরছে আপন কক্ষপথে।

ইউরোপের ব্রুনো (১৫৪৮-১৬০০ খ্রিষ্টাব্দ) বলেছিলেন, পৃথিবী ঘোরে, সূর্য নয়। ফলে তাকে ভেনিসের খ্রিষ্টধর্মীয় আদালতে সাত বছরের বিচার শেষে জীবন্ত অগ্নিদগ্ধ করে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়।

নিকোলাস কোপারনিকাস ও গ্যালিলিও (১৫৬৪-১৬৪২ খ্রিষ্টাব্দ) পৃথিবীর ঘূর্ণনের তত্ত্ব প্রচার করলেন। কোপারনিকাস ও গ্যালিলিও কৌশল করে ধর্মীয় গুরুদের শাস্তি এড়াতে সক্ষম হয়েছেন। কুরআন বা ইসলাম পৃথিবীকে মহা বিশ্বের কেন্দ্র বলে কোনো কলহের সৃষ্টি করেনি। এটা করেছে অতীত গ্রিস ও মধ্যযুগের খ্রিষ্টান ধর্মগুরুগণ। এ সম্পর্কে কুরআনের তত্ত্ব সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক। হযরত মুহাম্মদ ﷺ একজন নিরক্ষর ব্যক্তি হিসেবে এমন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব পেশ করা বাস্তবতার নিরিখে তাঁর পক্ষে অসম্ভব। কাজেই কুরআন যে মুহাম্মদ ﷺ-এর বাণী নয়; আল্লাহ তায়ালার কিতাব—এটি প্রমাণিত সত্য।

একসময় আধুনিক বিজ্ঞানীরা বলতেন, সূর্য স্থির। কিন্তু কুরআন স্পষ্ট বলে যে, সূর্যও তার কক্ষপথে ঘূর্ণায়মান। কুরআনের কোনো বৈজ্ঞানিক মতবাদ সংশোধনের প্রয়োজন পড়েনি এ চৌদ্দশত বছরেও। প্রয়োজন হবে না কোনো কালেও। এতেও কি প্রমাণিত হয় না, এ কুরআন এমন এক সত্তার বাণী যাঁর নিজেরও কোনো পরিবর্তন নেই, যাঁর কথারও কোনো পরিবর্তন নেই, যাঁর কথায় কোনো ভুল থাকতে পারে না, যাঁর কথার কোনো সংশোধনীর প্রয়োজন হয় না? তিনি হলেন আমাদের স্রষ্টা মহান আল্লাহ। তাই কুরআন বলছে—

وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ۞ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ

وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ۞

নিশ্চয় এটা [কুরআন] এক মহিমাময় গ্রন্থ। কোনো মিথ্যা এতে অনুপ্রবেশ করবে না—অগ্র হতেও নয়, পশ্চাত হতেও নয়। এটা প্রজ্ঞাময় ও প্রশংসিত আল্লাহ তায়ালার নিকট হতে অবতীর্ণ।' [সূরা হামীম আস্‌সাজদা : ৪১-৪২]

এতে বোঝা যায়, কুরআনে কোনো মিথ্যা প্রবেশ করবে না। চৌদ্দশত বছর কুরআনের 'টেক্স' অবিকৃত থাকা, কুরআনের মর্ম অবিকৃত থাকাও এটাই প্রমাণ করে যে, কুরআনের সকল ভবিষ্যদ্বাণী সত্য নিজের ব্যাপারেও; অন্যের ব্যাপারেও। সুতরাং কুরআন এমন এক সত্তার বাণী, যিনি অতীত-বর্তমান সর্বকালের মালিক। তিনি হলেন আমার আল্লাহ তায়ালা!

পবিত্র কুরআন বলে—

الٓمٓرٰ. تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَالَّذِىْ أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ
وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۞

"আলিফ লাম মীম রা। এগুলো কিতাবের নিদর্শন; আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হতে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা সত্য; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এতে বিশ্বাস করে না।" [সূরা রায়াদ-১]

পবিত্র কুরআন বলে—

وَمَا كُنْتَ تَتْلُوْ مِنْ قَبْلِهٖ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهٗ بِيَمِيْنِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُوْنَ ۞ بَلْ هُوَ آيَاتٌ
بَيِّنَاتٌ فِىْ صُدُوْرِ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُوْنَ ۞

"(হে মুহাম্মদ) আপনি তো এর পূর্বে কোনো কিতাব পাঠ করেননি এবং স্বহস্তে কোনো কিতাব লিখেননি যে, মিথ্যুকরা সন্দেহ পোষণ করবে। বস্তুত যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে, তাদের অন্তরে এ সুস্পষ্ট নিদর্শন। কেবল জালিমরাই আমার (আল্লাহ তায়ালার) আয়াতসমূহ অস্বীকার করে।"
[সূরা আনকাবূত : ৪৮-৪৯]

পবিত্র কুরআন বলে—

أَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا ۞

"তবে কি তারা কুরআন সম্বন্ধে অনুধাবন করে না, তা যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো হতো তবে তারা তাতে অনেক অসঙ্গতি পেত।" [সূরা নিসা-৮২]

কুরআন যদি মিথ্যা হত, তা হলে বহু ভুলভ্রান্তি তাতে থাকত। কঠিন কঠিন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, যা বর্তমানে প্রমাণিত হচ্ছে, তা কিভাবে কুরআনে আসল? নিশ্চয় কুরআন স্রষ্টার সৃষ্ট বলেই সৃষ্টির অনেক বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক রহস্য এতে নির্ভুলভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ফরাসি পণ্ডিত ড. মরিস বুকাইলি খ্রিষ্টান হওয়া সত্ত্বেও দীর্ঘ গবেষণা করে কুরআনে কোনো বৈজ্ঞানিক অসঙ্গতি বের করতে পারেননি।

পবিত্র কুরআন বলে—

قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ❁

"বলুন! যদি এ কুরআনের অনুরূপ কুরআন আনয়নের জন্য মানুষ ও জীন সমবেত হয় এবং তারা পরস্পরকে সাহায্য করে, তথাপি তারা এর অনুরূপ আনয়ন করতে পারবে না।" [সূরা বনী ইসরাইল-৮৮]

আল্লাহ তায়ালার এ চ্যালেঞ্জ চৌদ্দশত বছর পরেও রয়েছে। কুরআনের ভাব-ভাষার অনুরূপ গ্রন্থ তৈরির চ্যালেঞ্জ এখনো অক্ষুণ্ন আছে। কুরআন শুধু একটি গ্রন্থই নয়। এটি একটি জীবন বিধান। একটি দর্শন। একটি বিজ্ঞান। একটি আধ্যাত্মিক সমাধান। একটি সাহিত্য। বরং আরো বহু কিছু।

পবিত্র কুরআন বলে—

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ❁ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ❁

"আমি আমার বান্দা (হযরত মুহাম্মদ ﷺ)-এর প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি (অর্থাৎ কুরআন গ্রন্থ), তাতে তোমাদের কোনো সন্দেহ থাকলে তোমরা তার অনুরূপ কোনো সূরা আনয়ন করো এবং তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তা হলে আল্লাহ ছাড়া তোমাদের সকল সাহায্যকারীকে আহবান করো। সুতরাং যদি তোমরা আনয়ন করতে না পার আর কখনো করতে পারবে না, তবে সেই আগুনকে ভয় করো, যার ইন্ধন হবে মানুষ এবং পাথর, যা প্রস্তুত রয়েছে অবিশ্বাসীদের জন্য।" [সূরা বাকারা : ২৩-২৪]

পবিত্র কুরআন বলে—

أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ ❁ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ❁ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ❁ أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ ❁

"ওরা কি বলে, এ কুরআন তাঁর নিজের রচনা? বরং ওরা অবিশ্বাসী। ওরা যদি সত্যবাদী হয়, এর সদৃশ কোনো রচনা উপস্থিত করুক না! ওরা কি স্রষ্টা ব্যতীত সৃষ্টি হয়েছে, না ওরা নিজেরাই স্রষ্টা? নাকি ওরা আকাশম-লী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছে? বরং ওরা তো অবিশ্বাসী।" [সূরা তূর : ৩৩-৩৬]

কুরআন নিজেই চ্যালেঞ্জ করেছে মানুষকে অনুরূপ গ্রন্থ সৃষ্টি করতে। ভাব, ভাষা, বিষয়বস্তু, কাব্য, বিজ্ঞান, দর্শন, আধ্যাত্মিক ভাবনা সব নিয়ে এমন গ্রন্থ পৃথিবীতে কি আর দ্বিতীয়টি রয়েছে? (নিঃসন্দেহে নেই।)

[স্টিফেন হকিং নাস্তিকতা ও ইসলাম : ১০০-১০৩]

**মহাবিস্ফোরণ তত্ত্ব** (The Big Bang Theory)

বর্তমান বিশ্বে মহাকাশ বিজ্ঞানের সবচেয়ে আধুনিক, আলোচিত, স্বীকৃত বিষয় হলো 'The Big Bang Theory' বা মহাবিস্ফোরণ তত্ত্ব। আজ থেকে প্রায় ১৩.৭ বিলিয়ন বছর আগে এ মহাবিশ্ব একটি অতি ঘন ও উত্তপ্ত অবস্থা থেকে সৃষ্টি হয়েছিল। এ ধারণাটিকেই ভৌত বিশ্বতত্ত্ব, মহাবিস্ফোরণ বা বৃহৎ বিস্ফোরণ বলা হয়। এ তত্ত্বটি ১৯২৯ সালে বিজ্ঞানী এডুইন হাবল সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন। পরবর্তীকালে স্টিফেন হকিংসহ প্রায় সকল বিখ্যাত তত্ত্ববিদ পদার্থবিজ্ঞানী এর বাস্তবতা মেনে নিয়েছে। কিন্তু যারা কুরআনকে অবৈজ্ঞানিক বলে হৈ চৈ করে, তারা কি কখনো ভেবে দেখেছে, বৈজ্ঞানিক এ সূত্রটি খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতকেই কুরআনে বর্ণনা করে দেওয়া হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে,

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا
وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ۞

"কাফিররা কি ভেবে দেখে না যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী একত্র ছিল। এরপর আমি উভয়কে পৃথক করে দিলাম এবং প্রাণবন্ত সবকিছু আমি পানি থেকে সৃষ্টি করলাম। এরপরও কি তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না?" [সূরা আম্বিয়া-৩০]

মহাবিস্ফোরণ তত্ত্ব আবিষ্কার করতে গিয়ে বিজ্ঞানী এডুইন হাবল প্রথম বলেন– দূরবর্তী ছায়াপথসমূহের বেগ একসাথে করে পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এরা পরস্পর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে অর্থাৎ মহাবিশ্ব ক্রমশ সম্প্রসারিত হচ্ছে। আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্বের ফ্রিডমান-ল্যামেএ-রবার্টসন-ওয়াকার নকশা অনুসারে এটি ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কিন্তু অবাক করার বিষয় হল—এ তথ্যটিও কুরআন মাজিদে সূরা যারিয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন,

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ۞

"আমি নিজ হাতে মহাকাশ নির্মাণ করেছি ও নিশ্চয় আমি সম্প্রসারণকারী।" [সূরা যারিয়াত-৪৭]

বিশিষ্ট আরবি লেখক আব্দুর রহমান আল হাবান্নাকাহ বলেন–

فَكَلِمَةُ (مُوسِعُونَ) فِي الْآيَةِ تُشِيرُ إِلَى أَعْمَالِ التَّوَسُّعَةِ الْمُتَجَدِّدَةِ فِي السَّمَاءِ. وَذٰلِكَ لِأَنَّ هٰذِهِ الْكَلِمَةُ مِنْ صِيَغِ اِسْمِ الْفَاعِلِ. وَصِيغَةُ اِسْمِ الْفَاعِلِ بِقُوَّةِ الْمُضَارِعِ مِنْ جِهَةِ الدَّلَالَةِ. هِيَ لِلتَّعْبِيرِ عَنِ الْحَالِ أَوَّلًا ثُمَّ عَنِ الْاِسْتِقْبَالِ.

আয়াতে مُوسِعُونَ শব্দটি মহাবিশ্বের প্রশস্তকরণ চালু থাকার প্রতি ইঙ্গিত করে। কারণ, এটি ইসমে ফায়েলের শব্দ, যা বর্তমান ও ভবিষ্যৎকালের অর্থ প্রদানের জন্য ব্যবহৃত হয়। সুতরাং এর অর্থ হবে, 'নিশ্চয় আমি মহাকাশকে সম্প্রসারণ করে চলছি এবং করতে থাকব।' [ছুরাউন মাআল মালাহিদাতি -১/৮৬]

অথচ ১৯২৯ সালের আগেও বিজ্ঞান জানত না, মহাবিশ্ব একটি ক্ষুদ্রকণা থেকে এক মহাবিস্ফোরণের ফলে সৃষ্টি হয়েছে। যে মহাবিস্ফোরণটি হয়েছিল আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের كُنْ এর মাধ্যমে। যেমন,

পবিত্র কুরআন বলে—

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ❖

"তিনি যখন কোনো কিছু করতে ইচ্ছা করেন, তখন তাকে কেবল বলে দেন 'হও', তখনই তা হয়ে যায়।" [সূরা ইয়াসীন-৮২]

এমনকি বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে এতেও ঘোর মতভেদ ছিল যে, এ মহাবিশ্ব অসীম না-কি সসীম? স্থির না-কি অস্থির?

বিজ্ঞানী নিউটন মনে করতেন মহাকাশ অসীম; তবে স্থির। তিনি তাঁর বিখ্যাত মহাকর্ষীয় তত্ত্ব আবিষ্কার করে তৎকালীন যুগে বিজ্ঞানীমহলে ব্যাপক হৈচৈ ফেলে দিয়েছিলেন। কিন্তু এরূপ জনপ্রিয় একটি তত্ত্বের মধ্যে অতি সূক্ষ্ম একটি ঘাপলা রয়ে গিয়েছিল। কারণ নিউটনের সূত্রমতে মহাকর্ষের বস্তুগুলো একে অপরকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে। কিন্তু ঘাপলা হচ্ছে, এমনটি হলে তো মহাশূন্যের বস্তুগুলো নির্দিষ্ট একটি পয়েন্টে এসে মিলিত হয়ে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কথা। অথচ তেমনটি হয় না। কেন?

পরে বিজ্ঞানী আইনস্টাইন তার বিখ্যাত Theory of Relativity দিয়ে এর সমাধান করেছেন। আইনস্টাইন নিউটনের অমীমাংসিত প্রশ্নের সমাধানে বলেছেন—এরকম হত যদি Time আর Space শাশ্বত বা পরম হত। কিন্তু Time আর Space কখনোই পরম নয়। এ বিখ্যাত তত্ত্ব দিয়ে আইনস্টাইন বিজ্ঞানকে এক নতুন জগতের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তার নাম 'আপেক্ষিকতার জগৎ'।

বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের উক্ত আপেক্ষিকতার সূত্র ধরে রাশিয়ান পদার্থবিদ আলেকজান্ডার ফ্রিডম্যান দাবি করেন যে, এ মহাবিশ্ব স্থির নয়। এটি একটি ক্রমবর্ধমান মহাবিশ্ব। স্যার আলেকজান্ডার ফ্রিডম্যান তখন সাধারণ ধারণা করেছিলেন বটে; কিন্তু যথেষ্ট ব্যাখ্যার অভাবে তার কথা বিজ্ঞানীমহল তখন আমলে নেয় নি।

এরপর বেলজিয়ামের বিজ্ঞানী Georges Lemaitre তো বিজ্ঞানীমহলকে সর্বপ্রথম একটি শক্ত শক খাওয়ালেন। তিনি বললেন, এ মহাবিশ্ব একটি ক্ষুদ্র পরমাণু কণা—যাকে Super Atom বলা হয়—এর বিস্ফোরণের ফলে সৃষ্টি হয়েছে। তিনিও রাশিয়ান বিজ্ঞানী স্যার আলেকজান্ডার ফ্রিডম্যানের সাথে সুর মিলিয়ে বললেন– মহাবিশ্ব স্থির নয়, এটি ক্রমাগত সম্প্রসারিত হয়ে চলেছে।

বলা বাহুল্য, Georges Lemaitre-এর এসব দাবিরও ভিত্তি ছিল বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার সেই সূত্রটি। এ ধারণাটিই হলো আজকের বিগব্যাং থিওরি। কিন্তু মজার ব্যাপার হল, আইনস্টাইন নিজেই Georges Lemaitre-এর ওই দাবিকে নাকচ করে দেন। 'মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হচ্ছে' তত্ত্বটা আনিস্টাইন মেনে নিতে পারেননি। তিনি বললেন, Lemaitre তার ব্যাখ্যায় ম্যাথমেটিক্যালি প্রচুর ভুল করেছেন। আইনস্টাইন আরো বললেন, মহাবিশ্ব অসীম হলেও এটি সম্প্রসারিত হচ্ছে—এটি ভুল ব্যাখ্যা। এ হলো বিজ্ঞানীদের মতবিরোধের অবস্থা।

তাদের এ মতবিরোধে না জড়িয়ে আমেরিকান জ্যোতির্বিজ্ঞানী এডউইন হাবল বিজ্ঞানীমহলকে তাক লাগিয়ে দিলেন। ১৯২০ সালে বিজ্ঞানী এডউইন হাবল একটি টেলিস্কোপ আবিষ্কার করে ফেলেন। এটিই রাতারাতি তখনকার জ্যোতির্বিজ্ঞান জগতকে পাল্টে দিল। মাউন্ট উইলসন অবজার্ভেট্রিতে বিজ্ঞানী হাবল তাঁর আবিষ্কৃত টেলিস্কোপ দিয়ে প্রমাণ করে দেখালেন যে, আমাদের মহাবিশ্বের ছায়াপথগুলো ক্রমাগত একটি অন্যটি থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

তিনি এটি প্রমাণ করেন Doppler Effect থিওরি দিয়ে। আর Doppler Effect হল, মহাবিশ্বের বস্তুগুলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য যদি আলোক তরঙ্গের উপর ফেলা হয় আর তরঙ্গ যদি লাল আলোর দিকে সরে আসে, তা হলে বুঝতে হবে ছায়াপথগুলো একটি অন্যটি থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। যদি তা না করে সেটা নীল আলোর দিকে সরে যায়, তা হলে বুঝতে হবে, ছায়াপথগুলো একটি অন্যটি থেকে দূরে না সরে বরং কাছাকাছি চলে আসছে। বারবার এ পরীক্ষাটি করে প্রমাণ করা হয়, ছায়াপথগুলো একটি অন্যটির কাছাকাছি নয় বরং একটি অন্যটি থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। ১৯৫০ সালে মাউন্ট পালমারে সে সময়ের সবচেয়ে বড় টেলিস্কোপ বসিয়ে এ ব্যাপারটি আরো নিখুঁতভাবে অবজার্ভ করে বিজ্ঞানীরা।

হাবলের এ দাবির সাথে বিজ্ঞানী Georges Lemaitre-এর দাবি সম্পূর্ণ মিলে যায় এবং সেই পরীক্ষা থেকে বোঝা যায়, মোটামুটি ১০-১৫ বিলিয়ন বছর আগে একটি ক্ষুদ্র কণা হতেই আজকের মহাবিশ্বের সৃষ্টি। মজার ব্যাপার

হল– আইনস্টাইন বিশ্বাস করতেন মহাবিশ্ব অসীম হলেও স্থির; সম্প্রসারিত হচ্ছে না। বিজ্ঞানী Georges Lemaitre-এর থিওরিকে ভুল বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। এ আইনস্টাইনই পরে নিজের ভুল স্বীকার করে নিয়ে বলেন–

'বিজ্ঞানী হাবল ও Georges Lemaitre-এর দাবিই সত্য—এ মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হচ্ছে'। তিনি বিজ্ঞানী Georges Lemaitre -এর কাছে অনুতপ্ত হন এবং নিজের ভুলকে ক্যারিয়ারের সবচেয়ে বড় ভুল দাবি করেন।

একটু চিন্তা করে দেখুন! আজ হতে চৌদ্দশ' বছরের অধিক পূর্বে, খ্রিষ্টীয় ৬ শতকে অর্থাৎ বিগব্যাং থিওরি আবিষ্কারেরও ১৩০০ বছর আগে মরুভূমিতে উট-বকরি চরানো জাগতিক অক্ষরজ্ঞানহীন এক বালক কিভাবে এমন একটি কথা বললেন, যা আধুনিক বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে মাত্র ১৯২৯ সালে? এ কথা বাইবেল-ইঞ্জিলে ছিল না; কোনো গ্রিক পুরাণ কিংবা মিথোলজিতে ছিল না।

কাজেই অবশ্যই আমাদের বলতে হবে, তিনি এ সূত্রগুলো পেয়েছেন এমন এক অসীম জ্ঞানের অধিকারী থেকে, যিনি অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতে যা কিছু হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে, সবকিছু জানেন ও সবকিছুর কর্তা। তিনিই আল্লাহ।

সুতরাং প্রমাণিত হল, কুরআন মুহাম্মদ ﷺ-এর বানানো কিংবা তৎকালীন কোনো জিন বা মানুষের রচিত গ্রন্থ নয়; বরং এটি মানুষ ও জীনের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তায়ালার কালাম। [নাস্তিকের যুক্তি খণ্ডন]

মানব দেহের জটিল তথ্য

পৃথিবীতে সবচেয়ে জটিল ও অদ্ভুত যন্ত্রটি সম্ভবত মানব দেহ। সূক্ষ্ম, জটিল ও আশ্চর্যজনক যন্ত্রাংশের সমন্বয়ে তৈরি এ যন্ত্রটি। এগুলোর কাজকর্ম এতটাই সূক্ষ্ম-জটিল যে, সেগুলোর কোনো একটি সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করতে গিয়ে কয়েক প্রজন্ম পর্যন্ত সময় লেগে যায়।

যেমন, আমাদের শারীরিক অনুভূতি। যখনই গ্রীষ্মের রোদ আমাদের গায়ে এসে পড়ে আমরা বলি 'ওহ! কি গরম!' আবার মাঘের প্রত্যুশে হাত-মুখ ধোয়ার সময় বরফ-শীতল পানির সংস্পর্শ পেয়ে মনের অজান্তেই বলে উঠি, 'ইস! কী ঠা-া!' আবার মা যখন মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে যান, মনে মনে ভাবি 'আহ! কী শান্তি।'

কীভাবে আমরা এ অনুভূতিগুলো বুঝতে পারি? এ প্রশ্নের উত্তর দীর্ঘ সময় পর্যন্ত কোনো বিজ্ঞানীর কাছে ছিল না। আগের দিনে বিজ্ঞানীরা মনে করতেন, প্রাণীর শরীর ঠিক যান্ত্রিক ডিভাইসের মতো, যা মোটর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সংজ্ঞাবহ উদ্দীপনা শক্তিকে রূপান্তরিত করে। ফলে আমরা বুঝতে পারি। অর্থাৎ শরীরের কোনো স্থানে স্পর্শ অনুভূত হলে ওই স্পর্শ থেকে একপ্রকার শক্তি প্রবাহিত হয়, যা কি-না মস্তিষ্কে প্রবাহিত হওয়ার পর আমরা

সে স্পর্শের অনুভূতি বোধ করতে পারি। এ তত্ত্ব মোটামুটি ১৯০৬ সাল পর্যন্ত টিকে ছিল। কিন্তু ১৯০৬ সালে ব্রিটিশ বিজ্ঞানী চার্লস স্কট শেরিংটন (Charles Scott Sherington) নানাবিদ পরীক্ষা-নীরিক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ করতে সক্ষম হন, মূল বিষয় আসলে এমন কিছুই নয়।

মূলত মানুষসহ সকল প্রাণীর চর্মাবরণের ঠিক নিচেই থাকে নোসিসেপ্টরস (Nociceptors) ও অটোনমিক নার্ভ (Autonomic nervous) সিস্টেম। চামড়ার ঠিক নিচেই অবস্থান করায় এরা খুবই স্পর্শকাতর। চামড়ার উপরে হওয়া যে কোনো কার্যকলাপ ও অনুভূতি এরা খুবই দ্রুত গ্রহণ করে ও নিউরন সিস্টেমের মাধ্যমে আমাদের মস্তিষ্কে প্রেরণ করে। ফলে সেই কার্যকলাপ বা অনুভূতি আমরা বোধ করতে পারি। আর সমস্ত প্রক্রিয়াটি যে কত দ্রুত সম্পন্ন হয়, তা আমরা সহজেই বুঝতে পারছি। এটাই বিজ্ঞানের সর্বস্বীকৃত তত্ত্ব। এ আবিষ্কারের জন্য ১৯৩২ সালে বিজ্ঞানী চার্লস স্কট শেরিংটন চিকিৎসা এবং শরীরবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার অর্জন করেন।

এখন কুরআনের আয়াত দেখুন!

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ۞

"এতে সন্দেহ নেই যে, আমার নিদর্শনাবলির প্রতি যারা অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করবে, আমি তাদেরকে আগুনে নিক্ষেপ করব। তাদের চামড়াগুলো যখন জ্বলে পুড়ে যাবে, তখন আবার আমি তা পাল্টে দিব অন্য চামড়া দিয়ে। যাতে তারা আজাব আস্বাদন করতে থাকে। নিশ্চয় আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।" [সূরা নিসা-৫৬]

আয়াতে বলা হয়েছে, 'তাদের চামড়াগুলো যখন জ্বলে পুড়ে যাবে, তখন আবার আমি তা পাল্টে দিব অন্য চামড়া দিয়ে, যাতে তারা আজাব আস্বাদন করতে থাকে।' একথা দ্বারা এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায়, তারা চামড়ার দ্বারাই আজাব আস্বাদন করবে। অর্থাৎ মানুষ অনুভব করে চামড়ার মাধ্যমে; কোনো শক্তি বা ডিভাইসের মাধ্যমে নয়।

এখন অস্বীকারকারীদের কাছে ওই একই প্রশ্ন যা ইতোপূর্বে করা হয়েছে, এসব জটিল সূত্র আজ থেকে চৌদ্দশত বছর পূর্বে আরব মরুভূমির নিরক্ষর লোকটিকে কে জানিয়ে দিলেন? এ প্রশ্নের জবাবে একটি উত্তরই হবে, তিনি হলেন মহন রাব্বুল আলামীন আল্লাহ। সুতরাং এ কুরআন আল্লাহ তায়ালারই বাণী। এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই।

এ ছাড়া আরো অনেক এমন বৈজ্ঞানিক তথ্য রয়েছে, যেগুলো সরাসরি কুরআনের ব্যাখ্যাই মনে হয়। কলেবর অনেক বড় হয়ে যাওয়ার ভয়ে এখানে আর উল্লেখ করা যাচ্ছে না। তবে দীর্ঘদিনের গবেষণার অভিজ্ঞতা থেকে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করছি, আজ অবধি বিজ্ঞানের যত আবিষ্কার আমাদের ভাগ্যে জুটেছে, সকল আবিষ্কারের প্রতি নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করে কুরআন পাক বুঝে বুঝে তিলাওয়াত করলে যে কেউ এ কথা স্বীকার করতে বাধ্য হবে যে, কুরআন একমাত্র আল্লাহ তায়ালার বাণী। যাঁর কাছে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সর্বকালের, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও ইতিহাসসহ সকল জ্ঞান বিদ্যমান।

[নাস্তিকের যুক্তি খণ্ডন, ইন্টারনেট]

## ঐতিহাসিকভাবে সত্য প্রমাণিত কুরআনের কয়েকটি ভবিষ্যদ্বাণী

কুরাআন মাজিদ আল্লাহ তায়ালারই বাণী। যা একজন মানুষের মুখ থেকে নিঃসৃত হয়েছে। মানুষটিও অবিশ্বাস করার মতো নয়। তাঁকে শত্রুরাও আল-আমীন বলে উপাধি দিয়েছিল। আল-আমীন মানে বিশ্বাসী। সুতরাং তিনি যে গ্রন্থকে আল্লাহ তায়ালার নাযিলকৃত গ্রন্থ বলে ঘোষণা দিয়েছেন, তাতে কোনো সন্দেহ থাকার কথা নয়। সাথে সাথে এ গ্রন্থে যেসব ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, সেগুলো অক্ষরে অক্ষরে সংঘটিত হয়ে যাওয়ার পর এ কুরআন অলৌকিক গ্রন্থ হওয়ার ব্যাপারে আর কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। জ্ঞানী মাত্রই নিশ্চিতভাবে বলতে হবে—এ গ্রন্থটি মহান স্রষ্টার না হলে এমনটি হত না। যেমন, কুরআন একটি ভবিষ্যদ্বাণী করতঃ বলেছে :

الٓمٓ ۞ غُلِبَتِ الرُّوْمُ ۞ فِيْٓ أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ ۞ فِيْ بِضْعِ سِنِيْنَ لِلّٰهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ ۞ بِنَصْرِ اللّٰهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۞ وَعْدَ اللّٰهِ لَا يُخْلِفُ اللّٰهُ وَعْدَهٗ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۞

"আলিফ-লাম-মীম। রোম (সাম্রাজ্য) পরাভূত হয়েছে। [আরবের] নিকটস্থ অঞ্চলে; কিন্তু ওরা ওদের এ পরাজয়ের পর শীঘ্রই জয় লাভ করবে। কয়েক বছরের মধ্যেই। সিদ্ধান্ত মহান আল্লাহরই। সেদিন মুসলমানগণ উৎফুল্ল হবে। আল্লাহর সাহায্যে। তিনি যাকে ইচ্ছে সাহায্য করেন। আর তিনি পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু। এটা আল্লাহরই প্রতিশ্রুতি। আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করেন না, কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না।" [সূরা রূম : ১-৬]

উপরিউক্ত আয়াতসমূহে রোমক ও পারসিকদের যুদ্ধের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এ যুদ্ধে দু'পক্ষই ছিল অমুসলিম। তাদের মধ্যে কারো বিজয় আর কারো পরাজয় বাহ্যত ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য কোনো কৌতূহলের বিষয়

ছিল না। কিন্তু দুই দলের মধ্যে পারসিকরা ছিল অগ্নিপূজারী মুশরিক; রোমকরা ছিল খ্রিষ্টান—আহলে কিতাব। ফলে রোমকরা ছিল মুসলমানদের অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তী। কেননা ধর্মের অনেক মূলনীতি—যেমন : পরকালে বিশ্বাস, নবী, ওহীতে বিশ্বাস ইত্যাদিতে তারা মুসলমানদের সাথে অভিন্ন মত পোষণ করে। হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার জন্য রোমক সম্রাটের নামে প্রেরিত পত্রে এ অভিন্ন মতের কথা উল্লেখ করেছিলেন। তিনি পত্রে কুরআনের এ জাতীয় আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন। আহলে কিতাবদের সাথে মুসলমানদের এসব নৈকট্যই নিম্নোক্ত ঘটনার কারণ হয়েছিল।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর মক্কায় অবস্থানকালে পারসিকরা রোমকদের বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা করে। উল্লেখ্য যে, ৩৯৫ খ্রিষ্টাব্দে রোমক সাম্রাজ্য হতে পৃথক হয়ে পূর্ব রোমক বা বাইযানটাইন নামে যে সাম্রাজ্যটি প্রতিষ্ঠিত হয়, এ আয়াতে ওই সাম্রাজ্য উদ্দেশ্য। সিরিয়া ও প্যালেস্টাইন এ সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল। পারস্য সাম্রাজ্যের সঙ্গে এর প্রায়ই যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগে থাকত। হাফেজ ইবনে হাজার প্রমুখের উক্তি অনুযায়ী কুরআনের আয়াতের 'নিকটবর্তী অঞ্চল' হলো হিজাযের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তবর্তী শামের (সিরিয়া) আযরুয়াত ও বুসবার মধ্যবর্তী স্থান। পূর্বরোমক সম্রাট হিরাক্লিয়াস (heraclius) আর পারস্য সম্রাট খসরু পারভেজের মধ্যে এখানেই যুদ্ধ হয়।

এ যুদ্ধ চলাকালে মক্কায় পৌত্তলিকরা পারসিকদের জয় কামনা করত। কেননা পৌত্তলিকতায় তারা ছিল পারসিকদের মিত্র। অন্যদিকে মুসলমানদের আন্তরিক বাসনা ছিল রোমকগণ বিজয়ী হোক। কেননা ধর্ম ও কতিপয় নীতির দিক দিয়ে তারা ইসলামের নিকটবর্তী ছিল। কিন্তু ফল হল, তখনকার মতো অগ্নিউপাসক পারসিকগণ এ যুদ্ধে জয়লাভ করল। এমনকি বিজিত এলাকায় পারসিকদের মতো উপাসনার জন্য মক্কার পৌত্তলিকরা পাড়ি জমায়। উৎফুল্ল হয়ে তারা বলতে থাকে, আমরাও অচিরে মুসলমানদের পরাজিত করব। যাই হোক এ বিজয়ই ছিল পারস্য সম্রাট পারভেজের সর্বশেষ বিজয়। এরপর তার পতন শুরু হয়। অবশেষে মুসলমানদের হাতে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

ইবনে জারির ও ইবনে আবী হাতেম সূত্রে জানা যায় যে, পারসিকদের এ বিজয়ে মক্কার পৌত্তলিকরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল। মুসলমানদেরকে লজ্জা দিতে লাগল, তোমরা যাদের সমর্থন করতে, তারা হেরে গেছে। ব্যাপার এখানেই শেষ নয়, বরং আহলে কিতাব রোমকরা যেমন পারসিকদের সাথে পরাজয় বরণ করেছে, তেমনি আমাদের সাথে তোমরাও একদিন পরাজিত হবে। এতে মুসলমানরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত হয়। তার পরপরই উপরিক্ত আয়াতগুলো নাযিল হয়।

ইবনে জারির ও তিরমিযির হাদিস থেকে জানা যায়—হযরত আবু বকর ছিদ্দিক রাযি. যখন রোমকদের ভবিষ্যৎ বিজয় সম্পর্কিত কুরআনি আয়াত শুনলেন, তখন মক্কার চারদিকে, পৌত্তলিকদের সমাবেশ ও বাজারে উপস্থিত হয়ে ঘোষণা করলেন : 'তোমাদের হর্ষোৎফুল্ল হওয়ার কোনো কারণ নেই। কয়েক বছরের মধ্যে রোমকরা পারসিকদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করবে।'

পৌত্তলিকদের মধ্যে উবাই ইবনে খালফ কথা ধরল। বলল, তুমি মিথ্যা বলছ! এরূপ হতে পারে না। হযরত আবু বকর রাযি. বললেন, 'আল্লাহর দুশমন, তুই-ই মিথ্যাবাদী। আমি এ ঘটনার জন্য বাজি রাখতে প্রস্তুত। (সুবহানাল্লাহ!) যদি তিন বছরের মধ্যে রোমকরা বিজয়ী না হয়, তবে আমি তোকে দশটি উষ্ট্রী দিব। আর যদি বিজয়ী হয়, তবে তুই আমাকে দশটি উষ্ট্রী দিবি। উবাই এতে সম্মত হল।

উল্লেখ্য, এ ধরনের বাজি জুয়ার শামিল। তবে তখন জুয়া হারাম ছিল না।

যা হোক! উবাইয়ের সাথে বাজি রাখার পর হযরত আবু বকর রাযি. হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর কাছে উপস্থিত হয়ে ঘটনা বিবৃত করলেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি তো তিন বছরের সময় নির্দিষ্ট করি নি। কুরআনে এর জন্য 'বিদই সিনীন' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। কাজেই তিন থেকে নয় বছরের মধ্যে এ ঘটনা ঘটতে পারে। তুমি যাও এবং উবাইকে বল, আমি দশটি উষ্ট্রীর স্থলে একশত উষ্ট্রী বাজি রাখছি; কিন্তু সময়কাল তিন বছরের পরিবর্তে নয় বছর; আর কোনো কোনো সূত্র মতে সাত বছর নির্দিষ্ট করছি।

হযরত আবু বকর রাযি. আদেশ পালন করলেন। উবাইও নতুন চুক্তিতে সম্মত হয়ে গেল।

বিভিন্ন হাদিস থেকে জানা যায়, হযরত মুহাম্মদ ﷺ মক্কা থেকে মদিনায় বসবাসের জন্য যাওয়ার পাঁচ বছর পূর্বে আয়াতটি নাযিল হয় এবং ঘটনাটি সংঘটিত হয়। সাত বছর পূর্ণ হওয়ার পর বদর যুদ্ধের সময়ে রোমকরা পারসিকদের বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করে। তখন উবাই ইবনে খালফ বেঁচে ছিল না। হযরত আবু বকর রাযি. তার উত্তরাধিকারীদের কাছ থেকে একশত উষ্ট্রী দাবি করে আদায় করে নেন।

আরেক সূত্রে বর্ণিত আছে, উবাই যখন আশঙ্কা করল হযরত আবু বকরও মক্কা ত্যাগ করে মদিনায় হিজরত করতে যাবেন, তখন সে বলল– আপনাকে ছাড়ব না, যতক্ষণ না আপনি একজন জামিন পেশ করেন। নির্ধারিত সময়ে রোমকরা বিজয়ী না হলে সে আমাকে একশত উষ্ট্রী পরিশোধ করবে।

হযরত আবু বকর রাযি. নিজ পুত্র হযরত আব্দুর রহমান রাযি.-কে জামিন নিযুক্ত করে দিলেন।

'বিদই সিনীন' অর্থ ৩-১০ বছর। কুরআনের আয়াতটিতে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, অনুর্ধ্ব নয় বছরের মধ্যে রোমকরা পারসিকদের উপর বিজয়ী হবে। ৬১৬ খ্রিষ্টাব্দে এ আয়াত নাযিল হয়। ৬২৩-৬২৪ খ্রিষ্টাব্দে আয়াতে উল্লিখিত ভবিষ্যদ্বাণী সত্যে পরিণত হয়। আর সে বছরই [দ্বিতীয় হিজরি/৬২৩ খ্রিষ্টাব্দ] বদর যুদ্ধে মুসলমানগণ মক্কায় পৌত্তলিক কাফিরদের পরাজিত করে। ফলে মুসলমানরা উৎফুল্লের পর উৎফুল্ল হয়।

এরপর যখন হযরত আবু বকর রাযি. বাজিতে জিতে গেলেন এবং একশ' উষ্ট্রী লাভ করেন, তখন সেগুলো নিয়ে হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর কাছে হাজির হলেন। তিনি বললেন, উষ্ট্রীগুলো দান করে দাও।

আবু ইয়ালা ও ইবনে আসাকের বারা ইবনে আযেব রাযি. থেকে এ স্থানে এ শব্দ বর্ণিত আছে—'এটা হারাম, এটা দান করে দাও'।

ফকিহগণ বলেন, জুয়ার মাধ্যমে অর্থোপার্জন (জুয়া হারাম বলে ইসলামে ঘোষিত হওয়ার পূর্বেও) হযরত মুহাম্মদ ﷺ পছন্দ করতেন না। তাই হযরত আবু বকর রাযি.-এর মর্যাদার পরিপন্থি মনে করে এ মাল দান করে দেওয়ার আদেশ দেন। এটা এমন, যেমন মদ নিষিদ্ধ ঘোষণার পূর্বেও হযরত মুহাম্মদ ﷺ এবং হযরত আবু বকর রাযি. কখনো মদ্যপান করেননি।

ইতিহাস সাক্ষী, রোমকগণ পারস্যবাসী দ্বারা ৬১৫-৬১৬ খ্রিষ্টাব্দে পরাভূত হয়েছিল। যদ্দরুন পারসিকগণ দামেস্ক ও জেরুজালেম অধিকার করে নেয়। ৬২৪ খ্রিষ্টাব্দে রোমকগণ পারস্য সাম্রাজ্যের রাজধানীর নিকট মিডিয়া পর্যন্ত জয়লাভ করে। এভাবেই উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত হয়েছে। সুতরাং কুরআন মাজিদ এমন এক সত্তার বাণী, যিনি অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ সর্বকালের খবর রাখেন। তিনিই হলেন আমার আল্লাহ তায়ালা।

কুরআনের আরেকটি ভবিষ্যদ্বাণী :

وَأُخْرٰى تُحِبُّوْنَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۞

"আর [আল্লাহ দান করবেন] তোমাদের আকাঙ্ক্ষিত আরো একটি অনুগ্রহ। আল্লাহ তায়ালার সাহায্য ও বিজয় আসন্ন; বিশ্বাসীদের সুখবর দাও।"

[সূরা আছ্ছফ-১৩]

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ۞ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ أَفْوَاجًا ۞
فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ۞

"যখন আসবে আল্লাহ তায়ালার সাহায্য ও বিজয়। আর আপনি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দীন (ধর্ম) গ্রহণ করতে দেখবেন। তখন আপনি আপনার

প্রতিপালকের প্রশংসায় তাঁর পবিত্র বর্ণনা করুন ও তাঁর ক্ষমা প্রার্থনা করুন! নিশ্চয় তিনি ক্ষমা করবেন।" [সূরা নসর : ১-৩]

উপরিউক্ত আয়াতসমূহে যে বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, তা মূলত মক্কা বিজয় তথা সমগ্র আরব বিজয়। হযরত মুহাম্মদ ﷺ-কে আল্লাহ তায়ালা জানালেন আগাম বিজয়ের বার্তা। ইতিহাস সাক্ষ্য, অবশেষে তাই হয়েছিল। আরবের এক এতিম দরিদ্র, নিরক্ষর মানুষ আল্লাহ তায়ালার রহমতে আরবের শক্তিশালী শাসকে পরিণত হলেন। কুরআন যে আল্লাহ তায়ালার বাণী এবং আল্লাহ তায়ালাই যে মহাবিশ্বের পূর্ণ কর্তৃত্বে রয়েছেন, এটি তারই প্রমাণ।

একাধিক হাদিস ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবির উক্তিতে বর্ণিত আছে, কুরআনে মাজিদের সূরা নসরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তেকাল নিকটবর্তী হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। বলা হয়েছে, আপনার দুনিয়ায় অবস্থান করার উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে গেছে। কাজেই আপনি স্রষ্টার পবিত্রতা বর্ণনা করুন ও তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন।

মুকাতিল রহ.-এর বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাহাবিদের এক সমাবেশে সূরাটি পাঠ করলে সবাই আনন্দিত হলেন—এতে মক্কা বিজয়ের সুসংবাদ রয়েছে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিশিষ্ট সাহাবি হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. সূরাটি শুনে ক্রন্দন করতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, এতে আপনার ইন্তিকালের সংবাদ সুপ্ত রয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার কথার সত্যতা স্বীকার করলেন।

বুখারি শরিফের হাদিসে হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে এটাই বর্ণিত রয়েছে। তাতে আরো রয়েছে, হযরত উমর রাযি. এ কথা শুনে বললেন– এ সূরার মর্ম থেকে আমিও তা-ই বুঝি। [তাফ্‌সিরে কুরতুবি]

নবম হিজরি সনের হজের মাঠে রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে ভবিষ্যদ্বাণী পেয়ে ঘোষণা করলেন, তাঁর দুনিয়ার কাজ শেষ হয়ে গেছে। আর সামনের বছর তাঁকে আর পাওয়া যাবে না। তাই তাঁর জীবনের শেষ উপদেশ বাণী (বিদায় হজের ভাষণ) যেন সবাই গ্রহণ করে।

বলুন! আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে খবর না পেলে দুনিয়ার কোন্ মানুষটা বলতে পারেন, আগামী এক বছর পর আর তাকে পাবে না। ইতিহাস থেকে কেউই কি আদৌ প্রমাণ করতে পারবেন, অমুক সুস্থ ব্যক্তি কোনো বক্তৃতায় বলেছিলেন—'এটাই তাঁর জীবনের শেষ ভাষণ। সামনের বছর এ মাস পর্যন্ত তিনি বাঁচবেন না'?

আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে এ ঐতিহাসিক বিদায় হজের ভাষণের ভিন্ন কোনো ব্যাখ্যা দেওয়া যাবে কি? [যুক্তির কষ্টিপাথরে আল্লাহর অস্তিত্ব-১৭]

কুরআনের আটচল্লিশতম সূরা আল ফাতাহ-এ অনেক ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। একসময়ের ক্ষুদ্র দরিদ্র মুসলমানগণ যে ভবিষ্যতে প্রচুর বিজয় ও সম্পদের মালিক হবে, তারই ইঙ্গিত রয়েছে এ সূরায়। যেমন– ইরশাদ হচ্ছে,

قُلْ لِلْمُخَلَّفِيْنَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلٰى قَوْمٍ أُولِيْ بَأْسٍ شَدِيْدٍ تُقَاتِلُوْنَهُمْ أَوْ يُسْلِمُوْنَ فَإِنْ تُطِيْعُوْا يُؤْتِكُمُ اللهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيْمًا ❖

"গৃহে অবস্থানকারী মরুবাসীদেরকে বলে দিন, আগামীতে তোমরা এক প্রবল পরাক্রান্ত জাতির সাথে যুদ্ধ করতে আহূত হবে। তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে, যতক্ষণ না তারা মুসলমান হয়ে যায়।" [সূরা আল ফাতাহ-১৬]

হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর ইন্তিকালের পর এ আয়াতের ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবে পরিণত হয়। ইমাম কুরতুবি রহ.-এর মতে এ আয়াতে পারস্য ও রোম তথা কিসরা ও কায়সারের জাতি উদ্দেশ্য। যাদের বিরুদ্ধে হযরত উমর রাযি.-এর খেলাফত আমলে যুদ্ধাভিযান পরিচালিত হয়েছে।

কুরআন পাকের অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে,

لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا ❖ وَمَغَانِمَ كَثِيْرَةً يَأْخُذُوْنَهَا وَكَانَ اللهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ❖ وَعَدَكُمُ اللهُ مَغَانِمَ كَثِيْرَةً تَأْخُذُوْنَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هٰذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُوْنَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيْمًا ❖ وَأُخْرٰى لَمْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللهُ بِهَا وَكَانَ اللهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرًا ❖

"আল্লাহ মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন, যখন তারা বৃক্ষের নিচে (হুদায়বিয়া প্রান্তরে) আপনার (মুহাম্মদ ﷺ-এর) কাছে শপথ করল। আল্লাহ অবগত ছিলেন যা তাদের অন্তরে ছিল। এরপর তিনি তাদের প্রতি প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাদেরকে আসন্ন বিজয় পুরস্কার দিলেন। এবং বিপুল পরিমাণে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ, যা তারা লাভ করবে। আল্লাহ পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়। আল্লাহ তোমাদেরকে বিপুল পরিমাণ যুদ্ধলব্ধ সম্পদের ওয়াদা দিলেন, যা তোমরা লাভ করবে। তিনি তা তোমাদের জন্য ত্বরান্বিত করবেন। তিনি তোমাদের থেকে শত্রুদের স্তব্ধ করে দিলেন, যাতে এটা মুমিনদের জন্য এক নিদর্শন হয় ও তোমাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করেন। আরেকটি বিজয় রয়েছে, যা

এখনো তোমাদের অধিকারে আসে নি। আল্লাহ তা পরিবেষ্টন করে আছেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান। [সূরা আল-ফাতাহ : ১৮-২১]

উপরে আসন্ন বিজয় অর্থ সর্বসম্মতভাবে খায়বার বিজয়। হুদায়বিয়া থেকে হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রত্যাবর্তনের পর এ বিজয় বাস্তবরূপ লাভ করে। এ আয়াতসমূহে খয়বারের যুদ্ধলব্ধ সম্পদও উদ্দেশ্য। যদ্বারা মুসলমানদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য অর্জিত হয়।

এমন আরো অনেক ভবিষ্যদ্বাণী কুরআনে রয়েছে, যেগুলো অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত হয়েছে। কুরআন যদি মিথ্যা হত কিংবা আল্লাহ তায়ালার বাণী না হত, তা হলে এ ধরনের ভবিষ্যদ্বাণী এভাবে বাস্তবায়িত হওয়া কখনো সম্ভব ছিল না। এসব ভবিষ্যদ্বাণী সত্য প্রমাণিত হওয়াই জানিয়ে দেয়, এ কুরআন এমন এক সত্তার বাণী, যিনি অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ সর্বকালের জ্ঞান রাখেন। যিনি বান্দাদের কার্যসম্পর্কে মোটেও বেখবর নন। [নাস্তিকতা ও ইসলাম : ১১৭]

اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي بِالْقُرْآنِ اللّٰهُمَّ ارْحَمْنِي بِالْقُرْآنِ

اللّٰهُمَّ اهْدِنِي بِالْقُرْآنِ اللّٰهُمَّ ارْزُقْنِي بِالْقُرْآنِ

### ৫. ধর্মের প্রয়োজনীয়তা

নাস্তিকতার আরেকটি বাধা হলো ধর্ম। ধর্ম আছে বলেই তারা শয়তানের মিশন কার্যকর করতে পারছে না। তাই ধর্মের বিরুদ্ধে যত অপপ্রচার। আল্লাহ তায়ালার প্রতি ঈমান আনার সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরকে ধর্মও মেনে নিতে হবে। এটা যুক্তিরও দাবি। কারণ হিসাবে একটা উদাহরণ দেওয়া যায়। যথা—

আধুনিক প্রযুক্তির যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্লগ দিয়ে। এ ব্লগটির মালিক ব্লগারস ফোরাম। ব্লগারস ফোরাম কিন্তু ব্লগটি বানিয়েই ব্লগারদের কাছে ব্লগিং করার জন্য ছেড়ে দেয়নি। ব্লগটি সুন্দররূপে পরিচালিত হওয়ার জন্য তারা কিছু নিয়মও দিয়ে দিয়েছে। আবার শুধু নিয়মাবলি দিয়েই ক্ষ্যান্ত হয়নি; ব্লগাররা নিয়মাবলি মানছে কি-না দেখার জন্য একজন পর্যবেক্ষকও নিযুক্ত করেছে। তদ্রুপ নিয়মাবলি বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য বিভিন্ন সেমিনারও করে।

একটি সামান্য ব্লগের ক্ষেত্রে যদি এমনটি হতে পারে, তবে যে আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি মানুষ যেন সুন্দর, সুস্থ, পরিচ্ছন্নভাবে পৃথিবীতে বসবাস করতে পারে, তার জন্য একটি নিয়মাবলি দিতে পারেন এবং সেসব নিয়মাবলি বোঝাতে ও মানাতে কাউকে প্রেরণ করতে পারেন—এটা মেনে নেওয়া কেন কষ্টসাধ্য হবে? আর এসব নিয়মাবলি পালন হচ্ছে কি না,

তার জন্য পর্যবেক্ষক নির্ধারণ করার বিষয়টি কেন মানতে কষ্ট হচ্ছে? ধর্ম আছে বলেই যে আজ পর্যন্ত এ পৃথিবী আবাসযোগ্য আছে, ধর্ম না থাকলে যে গোটা সমাজ ব্যবস্থাই ভেঙে পড়ত, এ সভ্যতা তৈরি হত না, এ কথা বোধগম্য হয় না কেন? ধর্ম মিথ্যার বিরুদ্ধে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অসত্যের বিরুদ্ধে বলেই তো সমাজ এত সুন্দর। এককথায় সমাজের প্রতিটি মঙ্গল ধর্মেরই অবদান।

## ধর্ম সম্পর্কে কতিপয় পাশ্চাত্য চিন্তাবিদের অভিব্যক্তি

### আইনস্টাইন

পদার্থবিজ্ঞানী– *"ঈমানই শক্তিশালী ফলাফল"*

ঈমানই হল বৈজ্ঞানিক গবেষণার সবচেয়ে শক্তিশালী ও মহৎ ফলাফল। মানুষ ধর্ম ছাড়া কোনোভাবেই বাস করতে পারে না।

### ডেল কার্নেগী

মার্কিন লেখক– "ধার্মিক ও রোগী"

আমি খুব স্মরণ করি সেসব দিনগুলো, যখন মানুষ শুধু বিজ্ঞান ও ধর্মের বিরোধ নিয়েই আলোচনা করত। কিন্তু এখন সে তর্ক চিরতরে শেষ হয়ে গেছে। কারণ, সর্বাধুনিক মনোবিজ্ঞান ধর্মের মৌলিক নিয়মনীতি প্রচার করে। কিন্তু কেন?! কারণ, মানসিক ডাক্তারগণ মনে করেন মজবুত ঈমান, ধর্মাচার ও প্রার্থনা উদ্বেগ, ভয় ও স্নায়ুতন্ত্রের উত্তেজনা দমন করার জন্য এবং আমরা যেসব রোগে ভুগছি এর অর্ধেক নিরাময় করার জন্য যথেষ্ট। তাই ডক্টর এ এ ব্রেল বলেছেন, 'খাঁটি দীনদার ব্যক্তি কখনো মানসিক রোগে ভোগে না'।

এভাবে দার্শনিক ফ্রান্সিস বেকন যথার্থই বলেছেন, 'অল্প দর্শনই মানুষকে নাস্তিকতার দিকে নিয়ে যায়। পক্ষান্তরে দর্শনে গভীরতা ধর্মের পথে তাকে ফিরিয়ে আনে।'

*"ধার্মিকতা রোগের জন্য প্রতিকার"*

মানসিক ডাক্তারগণ মনে করেন, মজবুত বিশ্বাস ও ধর্মাচার মানুষের উদ্বেগ ও স্নায়ুতন্ত্রের উত্তেজনা দমন এবং এসব রোগ নিরাময়ের জন্য যথেষ্ট।

### ড. ডগলাস

রেজিনার মেয়র– *"স্পষ্ট সত্য"*

আমার ডক্টরেট ডিগ্রী অর্জনের গবেষণা ছিল, শিক্ষা ও জাতি গঠন বিষয়ে। আমি আবিষ্কার করেছিলাম, ইসলামের মূল রুকনগুলো সামাজিক আর্থিক ও আধ্যাত্মিকভাবে জাতির পুনর্গঠনের জন্য এক বিরাট বড় মূল্যবান ভিত্তি ও রূপরেখা তুলে ধরে।

**উইলিয়াম জেমস**

মার্কিন মনোবিজ্ঞানী– "নিজেই নিজের চিকিৎসা করুন"

মানসিক দুশ্চিন্তার সবচেয়ে বড় চিকিৎসা ঈশ্বরের উপর ঈমান।

**আলী ইযযাত বিগোভিচ**

সাবেক বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি–

*"দুয়ের মধ্যে অনেক বড় পার্থক্য"*

'বস্তুবাদ সবসময় জন্তু ও মানুষের যৌথ দিকগুলো সমর্থন করে, পক্ষান্তরে ধর্ম জোর দেয় এ দুয়ের মাঝে পার্থক্য নির্ণয়ক বিষয়গুলোর ওপর।'

**হেনরি ফোর্ড**

আমেরিকান ফোর্ড কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা–

"মানসিক ডাক্তাররা আধুনিক উপদেশদাতা। তারা পরকালে জাহান্নামের শাস্তির আশঙ্কায় আমাদেরকে ধর্মাচারে উৎসাহিত করেন না বরং তারা ধর্মের প্রতি উৎসাহিত করেন এ জীবনে প্রদত্ত নরকের আশঙ্কায়। তা হল জঠরাঘাত, স্নায়ুবৈকল্য ও পাগলামির নরক।"

**আর্নল্ড টয়নবি**

ব্রিটিশ ঐতিহাসিক– "ধর্মই জীবন"

ধর্ম হল মানব স্বভাবের আবশ্যক ঝোঁক।

এটুকু বলাই যথেষ্ট যে, মানুষের ধর্মশূন্যতা তাকে ধাবিত করে এক আত্মিক হতাশার দিকে। যা তাকে এমন জায়গায় ধর্মীয় সান্ত্বনা খুঁজতে বাধ্য করে, যেখানে সান্ত্বনার কিছুই নেই।

**রেনেডোলো**

নোবেল পুরস্কার বিজয়ী লেখক– " দুশ্চিন্তার যুগ"

আমরা উদ্বেগের যুগে বাস করি। নিঃসন্দেহে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও প্রযুক্তিতে মানুষের কল্যাণ ও সমৃদ্ধি ঘটেছে। কিন্তু এগুলো তার সুখ-শান্তি বৃদ্ধি করেনি। উল্টো মানুষের উদ্বেগ, হতাশা ও অনেক মানসিক রোগ বৃদ্ধি করেছে। যা এ জীবনের সুন্দরগুলোকে লীন করে দিয়েছে। [ইন্টারনেট]

**ধর্মের অবদান**

'ধর্ম' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে– যা ধারণ করে মানুষ জীবন যাপন করে। এর আরবি শব্দ 'দীন'। রাগিব ইস্পাহানির বিখ্যাত কুরআনি অভিধান 'আল-মুফরাদাত ফি গরিবিল কুরআন' (اَلْمُفْرَدَاتُ فِيْ غَرِيْبِ الْقُرْاٰنِ) গ্রন্থে বলা হয়েছে, 'দীন' শব্দের অর্থ— আনুগত্য। প্রতিদান। শরিয়তের তাঁবেদারি ও আনুগত্যকে দীন বলা হয়। [আল্‌মুফরাদাত-১৭৫,দারুল মায়ারিফা, বৈরুত]

খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী বিখ্যাত আরবি অভিধানবিদ ইলিয়াস আনতূন ইলিয়াস তাঁর 'কামূসু ইলিয়াস আল্আসরি' (Elias modern Dictionary) গ্রন্থে এর অর্থ লিখেন— Religion; Faith; belife। এর সাথে তিনি তাকওয়া শব্দও জুড়ে দিয়েছেন। এর অর্থ লিখেছেন Faith; belife। কেননা মূলত তাকওয়া বা আল্লাহভীতিই হচ্ছে ধর্মের প্রাণস্বরূপ। সারা জীবন আল্লাহ তায়ালার দীনের আনুগত্য করার পুরস্কারস্বরূপ শেষ বিচারের দিন খোদ স্রষ্টা তাঁর বান্দাদেরকে উত্তম প্রতিদান কিংবা ধর্মহীন, আনুগত্যহীন ও অনাচারীদেরকে শাস্তি দিবেন। বিধায় কিয়ামতের দিনকে পবিত্র কুরআনে 'ইয়াওমুদ দীন' (يَوْمُ الدِّيْنِ) অর্থাৎ প্রতিদান ও হিসাব-নিকাশের দিবস বলা হয়েছে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানব সৃষ্টির সাথে সাথে যে আসমানি নির্দেশ ও নির্দেশনা দান করেছেন, যার দ্বারা পৃথিবীতে মানবের সুন্দর সুস্থ জীবন যাপন এবং আখিরাতের মুক্তি অর্জিত হয়, তা-ই ধর্ম। তিনিই স্রষ্টা। তিনিই তাদের অন্নদাতা। তাই তাঁর বান্দারা কিভাবে পৃথিবীতে শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করতে পারবে, সে পন্থাটা তিনি নিজেই দয়াপরবশ জানিয়ে দিয়েছেন।

তাই তিনি আদি মানব হযরত আদম আ. ও মা হাওয়া আ.-কে বেহেশত থেকে পৃথিবীতে প্রেরণের সময় বলে দিয়েছিলেন–

فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِّنِّيْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۞

"তারপর পৃথিবীতে তোমাদের কাছে আমার যে হিদায়াত বা দিকনির্দেশনা আসবে; যারা তার অনুসরণ করবে, তাদের জন্য কোনো ভয় নেই, তাদের দুশ্চিন্তারও কারণ নেই।" [সূরা বাকারা-৩৮]

তাই ধার্মিক বা ধর্মপ্রাণ মানুষকে জীবনব্যবস্থার খোঁজে কখনো অন্ধকারে হাতড়িয়ে ফিরতে হয়নি। যুগে যুগে নবী-রাসূলগণ প্রেরিত হয়েছেন। তাঁদের মাধ্যমে দুনিয়ার মানুষ তাদের যুগোপযোগী বিধান বা দিকনির্দেশনা লাভ করেছে। ফলে কোনো যুগেই ধর্মপ্রাণ মানুষকে অন্ধকারে থাকতে হয়নি। শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ পর্যন্ত অসংখ্য নবী রাসূল পৃথিবীর বিভিন্ন জনপদে প্রেরিত হয়েছেন। তাঁদের মাধ্যমে পৃথিবী পেয়েছে তাওরাত-যাবূর-ইঞ্জিল ও পবিত্র কুরআনের মতো সুস্পষ্ট ধর্মগ্রন্থ। যেগুলোতে আল্লাহ তায়ালার বিধান পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিবৃত হয়েছে।

সুতরাং ধর্মের সবচেয়ে বড় অবদান হল, ধর্ম মানুষকে যুগে যুগে সুশৃঙ্খল, সুনিয়ন্ত্রিত, ভারসাম্যপূর্ণ জীবনবিধান দিয়ে অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে মুক্ত করেছে। স্রষ্টা হলেন বিশ্ববিধাতা। তাঁর সকল সৃষ্টির প্রতি তাঁর সমান মমতা।

তিনি সর্বপ্রকার পক্ষপাতমুক্ত। সাদা-কালো, ধনী-গরিব সকলের জন্যই তাঁর বিধান একসমান। তিনি সামর্থ্যবানের প্রতি সামর্থ্যহীনদের ও সবলদের প্রতি দুর্বলদের দেখাশোনা ইত্যাদির অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান করেছেন। সামর্থ্যহীন বা বিপদগ্রস্তদেরকে ধর্মের কোনো কঠোর বিধান দেননি। সাধ্যমতো আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করার দায়িত্বই কেবল তাদের উপর অর্পিত হয়েছে।

নবী-রাসূলগণের অনেকেই বিশাল রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বও সফলভাবে পালন করেছেন। প্রথম দিকে পৃথিবী ছিল যোগাযোগবিহীন শতধাবিচ্ছিন্ন। তাই সে যুগের ধর্মীয় বিধানসমূহ ছিল নেহাৎ সাদামাটা। রাজনীতি-অর্থনীতির জটিল মারপ্যাঁচ সে যুগে ছিল না। ছিল না জীবনযাত্রার জটিলতা। তেমনি ধর্মীয় বিধানেও সেগুলোর তেমন বিস্তৃত উল্লেখ ছিল না। পরবর্তীযুগে মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। মানুষ ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বের দেশে দেশে। তাই নবী-রাসূলও প্রেরিত হয়েছেন প্রতিটি জনপদে। পবিত্র কুরআনের ভাষায় :

وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ [الرعد: ٧]

"প্রত্যেক জাতির জন্যই রয়েছে পথপ্রদর্শক (নবী)।" [সূরা রা'দ-৭]

ধর্ম আমাদেরকে যেমন স্রষ্টার ইবাদতের জন্য উদ্বুদ্ধ করে, তেমনি সৃষ্টির প্রতি দয়ারও শিক্ষা দেয়। প্রিয়নবী ﷺ-এর হাদিসে আছে,

اِرْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ

"জমিনে যারা আছে তাদের প্রতি দয়া করো, তা হলে আসমানে যিনি আছেন তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করবেন।" [তিরমিযি, হাদিস নং ১৯২৪]

এমনকি অকারণে কোনো ছোট ইতর প্রাণীকে হত্যা করা বা কষ্ট দেওয়াও ধর্মের দৃষ্টিতে পাপ। মানুষের খাবাররূপে পশু জবাই করা বৈধ হলেও তাকে ধারালো ছুরি দিয়ে জবাই করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একটি প্রাণীর সম্মুখে আরেকটি প্রাণী জবাই করাও শরিয়তে নিষিদ্ধ।

ধর্ম আমাদেরকে দিয়েছে পরিচ্ছন্ন জীবনবোধ ও সামাজিক শৃঙ্খলা। তাই মহানবী ﷺ-এর বিদায় হজের ঐতিহাসিক ভাষণের একেকটি বাক্য পড়ে দেখুন। কী চমৎকার জীবনবোধের কথা তাতে উচ্চারিত হয়েছে। আদব-কায়দা তমীয-লেহায, সামাজিক শিষ্টাচার, এসব তো ধর্মেরই দান!

তাওরাতের বিপ্লবী বাণীর মাধ্যমে মূসা আ. মিশরের হাজার হাজার বছরের ফিরাউনী তখত ও তাজ ধুলায় লুটিয়ে দিয়েছিলেন। জুলুম-নির্যাতন থেকে বনী ইসরাঈলকে উদ্ধার করে তদানীন্তন বিশ্বের সেরা জাতিতে পরিণত করেছিলেন। আল-কুরআনের বিপ্লবী শিক্ষার মাধ্যমে মহানবী ﷺ পৃথিবীর

অবহেলিত উষর মরুর দেশ আরবের বেদুইনদেরকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত করেছিলেন। আজকের উন্নত বিশ্বের সর্বোন্নত জাতিগুলোর শিক্ষকে পরিণত করেছিলেন। মাত্র তেইশটি বছরের নবুওয়তি মিশনের মাধ্যমে যে কী আশাতীত সুফল ফলেছিল, বিশ্ব ইতিহাসের তার দ্বিতীয় নজির নেই। তদানীন্তন বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম দুটি শক্তি রোমক সাম্রাজ্য ও পারসিক সাম্রাজ্য তাঁর ওফাতের মাত্র এক যুগের মধ্যেই মুসলিম উম্মাহর দখলে চলে আসে। প্রায় দীর্ঘ আটশ' বছর পর্যন্ত মুসলমানরা অর্ধেক বিশ্বকে প্রচণ্ড দাপটে শাসন করেন। কোটি কোটি আদম সন্তানকে করেন শোষণমুক্ত।

সুতরাং ধর্ম কী দেয়নি আমাদের? এ সুজলা-সুফলা বাংলাদেশের স্বাধীন সার্বভৌম অস্তিত্বটা কার দান?

অন্ততপক্ষে আমাদের মুখে তো ধর্মের, বিশেষত ইসলামের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণের প্রশ্নই উঠে না। প্রবল ধর্মবোধ ও উগ্রপন্থি হিন্দুরাও আমাদেরকে পৃথক করে দেওয়া জরুরি বিবেচনা করেছে। সুতরাং ধর্মের প্রবল অবস্থান ও ভূমিকা কেবল মূর্খরাই অস্বীকার করতে পারে।

কাশ্মির ভূস্বর্গ অভিধায় বিশ্বব্যাপী বহুপূর্ব থেকেই চিহ্নিত হয়েছে সত্য; কিন্তু পরাধীনতার গ্লানিতে এক কোটি কাশ্মিরি মুসলিম আজ ধুঁকে ধুঁকে মরছে। আমাদের পরিণামটাও সেরূপ হলে কি খুব ভালো হত? সুতরাং ইতিহাসের সর্বনিম্ন অবস্থান থেকে বিশ্বের একটি উন্নয়নশীল ও প্রতিশ্রুতিশীল দেশে পরিণত হওয়া বাংলাদেশ যদি কারো কাছে ঋণী হয়ে থাকে, তবে তা এ ইসলামই। বাকি রইল ধর্মের নামে প্রতারণা ও শোষণের অপ্রিয় ইতিহাস। এজন্য কিছুসংখ্যক প্রতারক ও ধূর্ত লোক দায়ী হলেও ইসলামকে সেজন্য দায়ী করা চলবে না। সে ইতিহাসে আমাদেরও কমবেশি ভূমিকা অনস্বীকার্য। কেননা প্রশাসন, জাতীয় সংসদে আমাদের লোকেরাও ছিল। সে শাস্তি তারাও পাচ্ছে, আমরাও পাচ্ছি। ইসলামের অনুশাসনে ফিরে গিয়ে আমাদের এখন মুক্তির পথ খুঁজতে হবে। এ ছাড়া উপায় নেই।

ধর্ম আমাদের কী দিয়েছে, তার সামান্য কিছু নমুনা এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে। নয়তো আমাদের প্রতি ধর্মের দান ও অবদানের পরিমাণ অসংখ্য। একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনায় তার সবকিছু তুলে ধরা অসম্ভব। তাই এ বিষয়ে শিরোনাম পর্যায়ের একটি ঝলকই তুলে ধরা হল। কুরআন-হাদিস ও ধর্মীয় কিতাবাদী যত বেশি অধ্যয়ন করা হবে, পরহেজগার নির্ভরযোগ্য আলেমদের সংশ্রবে যত বেশি যাওয়া হবে, ইনশাআল্লাহ ততই এ প্রশ্নের উত্তর আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে!

[মাসিক আল-কাউসার, এপ্রিল-২০১৫]

## বিজ্ঞানের নামে ধোঁকাবাজি

নাস্তিকরা ডারউইনের বিবর্তনবাদ থিওরি দিয়ে পৃথিবীর সবকিছু অনাদি ও প্রাকৃতিক প্রমাণ করতে চায়। কিন্তু ভেবে দেখেছেন কি, বিগব্যাংগ থিওরির মাধ্যমে বিবর্তনবাদের গোমর তো অনেক দিন আগেই ফাঁস হয়ে গেছে? তার পরও তারা অনেক মিথ্যা ঘটনা সাজিয়ে এখনো বিবর্তনবাদের থিওরি দিয়ে মানুষকে ধোঁকা দিতে চাচ্ছে। গোঁড়ামি আর কাকে বলে! এসব মিথ্যাও এক এক করে ফাঁস হচ্ছে। জায়গায় জায়গায় তারা লাঞ্ছিতই হবে ইনশাআল্লাহ।

এমনই একটি ঘটনা মাসিক রাহমানী পয়গাম ডিসেম্বর-১৯৯৭ ইং সংখ্যায় অধ্যাপক গিয়াসুদ্দিন আহমদ রচিত 'আধুনিক বিজ্ঞান নাস্তিক্যবাদকে অসম্ভব করে তুলেছে' শীর্ষক প্রবন্ধে প্রকাশিত হয়েছে।

'পবিত্র কুরআনের সূরা বাকারার চতুর্থ রুকুতে সৃষ্টিধারার একপর্যায়ে মানব সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। সেখানে কয়েক আয়াতে বলা হয়েছে, মানব জাতির আদি পিতা-মাতাকে জান্নাতে সৃষ্টি করা হয়। এরপর তাদেরকে নির্দিষ্ট কিছু সময়ের জন্য পৃথিবীতে বসবাস করতে পাঠানো হয়।

কুরআনের অপরাপর আয়াত ও হাদিস থেকে স্পষ্টরূপে জানা যায়, আল্লাহ তায়ালা মানুষের আদি পিতা আদমকে সরাসরি মাটি থেকে সৃষ্টি করে তাতে রূহ বা আত্মা ফুঁকে দেন এবং আদম থেকে তার জোড়া মানব-মাতা হাওয়া আ.-কে সৃষ্টি করেন। এরপর তাঁদেরকে পৃথিবীর বুকে সৃষ্টির মহান উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হয় এবং তাদের থেকে মানব-বংশের সূত্রপাত হয়।

বলা বাহুল্য, কুরআনি বা ধর্মীয় এ সত্যের বিপরীতে দুনিয়ায় মানব সৃষ্টির বিষয়ে যত মতবাদ রয়েছে, তার সবই মানুষের মনগড়া। বিজ্ঞানের নামে ডারউইনের বিবর্তনবাদও একটি অলীক মতবাদ মাত্র; কোনো বৈজ্ঞানিক সত্য (Truth) নয়। মুসলিম বিজ্ঞানীদের তো কথাই নেই। ডারউইনের সমকালীন বিখ্যাত জার্মান বিজ্ঞানী ড. নিশতেসহ তখনকার এবং পরবর্তী বহু বৈজ্ঞানিক এ মতবাদ প্রত্যাখ্যান করেছেন।

বস্তুত বিজ্ঞান, দর্শন ও জ্ঞানের আলোকেই এ মতবাদকে সত্য বলে দাঁড় করানোর কোনো উপায় নেই। এ সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা অনেক বই-পুস্তক লিখে ডারউইনের মতবাদের অসারতা প্রমাণ করেছেন। এমনও অনেক প্রমাণ আছে যে, ডারউইনবাদের ধ্বজাধারী নাস্তিক বিজ্ঞানীরা উক্ত মতবাদকে খাঁড়া করতে গিয়ে অজস্র মিথ্যার বেসাতী ও কেলেঙ্কারীর আশ্রয় পর্যন্ত নিয়েছে ও নিচ্ছে। পাশ্চাত্যের লোকদের দ্বারা লিখিত ও প্রকাশিত 'Downpilt Forgery' নামক পুস্তক তার উজ্জ্বল প্রমাণ।

বইটির সার-নির্যাস হল, লন্ডনের ব্রিটিশ জাদুঘরে এমন দুটি ফসিল বা কঙ্কাল রাখা আছে, যা দেখতে অর্ধ মানব ও অর্ধ বানর বা শিম্পাঞ্জির মতো। জাদুঘরের নিরাপত্তারক্ষীদের একজন লোকের মনে কঙ্কাল দুটি নিবিড়ভাবে দেখতে গিয়ে তাতে কৃত্রিমতার আলামত আছে বলে সন্দেহ জাগে। এরপর তিনি তার আর এক সহকর্মীকে বিষয়টির প্রতি আকৃষ্ট করেন। কঙ্কাল দুটি যে বিজ্ঞানী সংগ্রহ করে জাদুঘরে প্রদান করেছিলেন, তার নাম ঠিকানাও সেখানে লেখা ছিল। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তারা দু'সহকর্মী যখন নিশ্চিত হলেন যে, এতে অবশ্যই কৃত্রিমতা করা হয়েছে, তখন তারা সফর করে সেই বিজ্ঞানীর বাড়িতে গেলেন। কিন্তু গিয়ে শুনলেন, কিছু দিন আগে লোকটি মারা গেছে। অনেক খুঁজে তার একান্ত একজন বন্ধু ব্যক্তিকে বের করে তার নিকট সেই বিজ্ঞানীর ব্যক্তি চরিত্র ও পেশার কথা জিজ্ঞাসা করেন। তাদের কাছে ঘটনার বৃত্তান্ত ও আগমনের উদ্দেশ্য শুনে তিনি বলেন, তার বন্ধুর একটি ব্যক্তিগত ল্যাবরেটরী ছিল। তাতে তিনি বিভিন্ন জীবজন্তুর কঙ্কাল নিয়ে কাঁটাছেড়ার মতো কিছু করতেন। তিনি আরো জানান, একদিন তিনি বন্ধুর সাক্ষাতে ল্যাবরেটরীতে বিনা নোটিশে ঢুকে গেলে তিনি খুবই অপ্রস্তুত হন এবং কোনো কিছু যেন তার দৃষ্টি থেকে আড়াল করতে চেষ্টা করেন।

মোটকথা, উল্লিখিত তিন ব্যক্তি সবকিছু আলোচনার পর নিশ্চিত হন যে, ব্রিটিশ মিউজিয়ামে পেশকৃত কঙ্কাল দুটি বর্তমান মানুষ ও তার পূর্ব আকৃতি বানর-রূপ এর মধ্যবর্তী কোনো বাস্তব জীবের নয় বরং কৃত্রিমতার মাধ্যমে মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য একে কয়েক লক্ষ বছর আগের মানুষের আকৃতি বলে আখ্যায়িত করে দেখানো হয়েছে। সেখান থেকে ফিরে এসেই দুই সহকর্মী 'Downpilt Forgery' নামক বইটি লিখেন। আর 'Downpilt' নামক স্থান হতে মাটি খননের ফলে কঙ্কাল দুটি সংগ্রহ করা হয়েছিল বলে উল্লেখ্য, তাই তারা উক্ত নামে বইটি লিখে কথিত বিজ্ঞানীর মিথ্যার বেসাতী প্রমাণ করেন। বইটিতে তারা প্রমাণ করেন, ডারউইনবাদী বিবর্তনের প্রবক্তা ও ডারউইনের ভক্তরা বিশ্বমানুষকে ধোঁকা দিয়ে ডারউইনবাদে বিশ্বাস স্থাপন করানোর জন্য কী রকম মিথ্যার আশ্রয় নিতে পারে।

আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ তায়ালা কাফিরদের দিয়েই কট্টর কাফিরদের মিথ্যার জালকে খোদ পাশ্চাত্য জগতেই ফাঁস করে দিলেন।

সৃষ্টির বুকে বাহ্যত বিবর্তনবাদের যে ধারা দেখা যায়, তা দ্বারা জীবজগতে মৌলিক কোনো পরিবর্তন প্রমাণিত হয় না। তাই বিজ্ঞানের নামে ডারউইনের বিবর্তনবাদে বিশ্বাস করা অবৈজ্ঞানিক ও ঈমানহীনতার পরিচয়।

আসলে যারা স্রষ্টায় অবিশ্বাসী, তাদের পক্ষেও সৃষ্টির একটা ব্যাখ্যা দেওয়া তো চাই। বলা বাহুল্য, ডারউইনের মতবাদ সৃষ্টি সম্পর্কে সে-রকম একটি প্রয়াস মাত্র। এর পিছনে বৈজ্ঞানিক কোনো সত্যতা নেই, ইতিহাস বা কোনো ধর্মগ্রন্থের কোনো সত্যায়ন তো আদৌ নেই। [মাসিক রাহমানী পয়গাম ডিসেম্বর-১৯৯৭ইং]

## ভ্রান্ত প্রশ্নের সঠিক সমাধান

মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য নাস্তিকরা কিছু উদ্ভট প্রশ্ন করে। যেগুলোর প্রায়গুলোই অযৌক্তি। হাতে নেওয়ার মতো প্রশ্নগুলোর উত্তরও অনেক আগেই দেওয়া হয়ে গেছে। আমরা অনেকে হয়তো জানি, অনেকে আংশিক জানি আর অনেকে তো মোটেও জনি না। তাই তাদের বিভ্রান্তি থেকে বাঁচার জন্য নমুনা হিসেবে কয়েকটি প্রশ্নের জবাব তুলে ধরা হল।

## প্রশ্নগুলো এড়িয়ে যাওয়াই নিরাপদ

হাঁ! একটা কথা অবশ্যই মনে রাখবেন। পক্ষ থেকে যেসব প্রশ্ন আমাদের সামনে আসে, সেগুলো সবই ইবলিস ও তার দোসরদের তৈরি করা। মানবাত্মা নিধনের জন্য এসব বিষতুল্য। এগুলোকে মানুষের রগরেশায় ঢুকিয়ে দেওয়ার জন্য ইবলিস সর্বদা কাজ করে থাকে। আল্লাহ না করুন! প্রশ্নগুলো বুঝতে গিয়ে যদি ইবলিস বিজয়ী হয়ে যায়, তা হলে তো সর্বনাশ। তাই এসব প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়াই সবচেয়ে নিরাপদ।

হযরত শামসুল হক ফরিদপুরী রহ. বলতেন– যুক্তিসহ ঈমানদার হওয়া উত্তম; তবে যুক্তি পিছনে না পড়ে বিনা দ্বিধায় আল্লাহ তায়ালাকে মেনে নেওয়া নিরাপদ। সুতরাং যুক্তির ব্যাপারে যখন আল্লাহর ওয়ালি এমন কথা বলেছেন, তখন অযৌক্তিক প্রশ্নগুলোর পিছনে পড়ার কোনো সুযোগই থাকে না। আর বাস্তবতার নিরিখে বিচার করলে সমস্ত প্রশ্ন অযৌক্তিক। তবে আমাদের পূর্বসূরীগণ তাদের প্রত্যেকটি প্রশ্নের দাঁতভাঙা জবাবও দিয়ে গেছেন। আমাদের আকাবিরের সে জবাব ও কুরআন-হাদিসের ভাষ্যগুলো মধু ও মিশক আম্বর তুল্য আর প্রশ্নগুলো মলমূত্র তুল্য।

এখন আপনি নিজেই চিন্তা করুন! কেউ যদি মধু, মিশক আম্বর ও মলমূত্র একসাথে পকেটে নিতে যায়, তা হলে তার উপর কিসের প্রভাব বেশি পড়বে? কোনটা তাকে অস্থির করে তুলবে? কোনটার আলামত তার মধ্যে পরিলক্ষিত হবে? কোনটার গন্ধ তার মধ্যে পাওয়া যাবে? তাই আবার বলছি, প্রশ্নগুলো একদম এড়িয়ে যাওয়াই উত্তম। তবু নমুনা হিসেবে কিছু প্রশ্ন নিম্নে দেওয়া হচ্ছে। দীন সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন ব্যক্তিগণ খুব সতর্কতার সাথে এসব যাচাই করতে পারেন। যথা—

**নাস্তিকের প্রশ্ন-১ :** মুসলমানদের খায়বার আক্রমণ ছিল অমানবিক? খায়বারে বাসিন্দারা সকাল বেলা কাজে মগ্ন থাকা অবস্থায় মুহাম্মদ ﷺ তাদের কাছে গিয়ে যুদ্ধের ঘোষণা করলেন। একটি অসম যুদ্ধ হল। মুহাম্মদের সৈন্যবাহিনী সাফিয়্যার বাবা হুয়াই ইবনে আখতাবকে হত্যা করল। সাফিয়্যার স্বামীকে হত্যা করল। এরপর সাফিয়্যাকে নিয়ে যৌনদাসী হিসেবে ব্যবহার করলেন। এরপর তাকে বিয়ে করলেন। এগুলো কোনোটিই বিবেক মানতে পারে না।

**আমাদের জবাব :** প্রশ্নকারী এখানে ধোঁকার আশ্রয় নিয়েছে। তথ্যসন্ত্রাস করে আল্লাহর বান্দাদের বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা করেছে। লোকটি ঘটনার গুরুত্বপূর্ণ অংশ গোপন রেখে শুধু পরিণতি বর্ণনা করেছে ও সত্যপক্ষকে ঘায়েল করতে সে এখানে শুধু খায়বারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অভিযানের কথা উল্লেখ করেছে। কিন্তু কেন রাসূলুল্লাহ ﷺ এ অভিযান পরিচালনা করলেন? তা উল্লেখ না করে চরম ঘৃণ্য প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছে। (নিচে উক্ত অভিযানের কারণ শুনুন!)

**খায়বারের অধিবাসী এরা কারা?**

খায়বারে যারা বসবাস করত, তারা ছিল বনূ নাজির নামে একটি ইহুদি গোত্র। বনূ নাজিরের সঙ্গে পূর্ব হতে মুসলমানদের শান্তিচুক্তি ছিল। সেমতে একটি বিষয়ে সহায়তা চাইতে একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ বনু নাজিরের বস্তিতে হাজির হলেন। তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে বসতে দিলেন। রাসূলুল্লাহ সেখানে একটি বাড়ির দেয়াল ঘেঁষে বসে ছিলেন। বনু নাজিরের লোকেরা পরস্পরে পরামর্শ করল যে, লোকটিকে এমন সুযোগে আর কখনো পাওয়া যাবে না। তাই কে আছ, তাকে হত্যা করে আমাদের প্রশান্তি দিবে? তাদের মধ্য থেকে আমর ইবনে জিহাশ প্রস্তুত হয়ে গেল। সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে হত্যা করতে বাড়ির ছাদের উপর উঠে পড়ল। ইন্নালিল্লাহ! এ ভয়াবহ সংবাদ রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আল্লাহ তায়ালা ওহির মাধ্যমে জানিয়ে দিলেন। সুতরাং রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখান থেকে উঠে মদিনায় চলে গেলেন। এ ছিল বনু নাজিরের উপর মুসলমানদের আক্রমণের কারণ। বনু নাজির দুটি জঘন্য কাজ করেছিল। [উয়ুনুল আছার-২/৭০৭১, সীরাতে ইবনে হিশাম-২/১৯০]

(১) চুক্তি ভঙ্গ করেছিল। (২) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে হত্যার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র করেছিল। তাদের গাদ্দারির শাস্তি দিতে মুসলিম বাহিনী যখন আগমণ করে, তখন তারা তাদের দুর্গে আশ্রয় নেয়। মুসলমানগণ তাদের দুর্গ অবরোধ করে। অবরুদ্ধ থাকাবস্থায় এরা আরেক কুটিল ষড়যন্ত্রের ছক আঁকে। সংবাদ পাঠায়

যে, মুসলমানদের পক্ষ থেকে তিনজনকে দুর্গে পাঠানো হোক আর বনু নাজিরের পক্ষ থেকে তিনজন পাদ্রীকে পাঠানো হবে। তারা পরস্পর আলোচনা করে যদি তিন পাদ্রী মুসলমান হয়ে যায়, তবে তারা সবাই মুসলমান হয়ে যাবে। কিন্তু তারা এখানেও গাদ্দারী করে তাদের পাঠানো পাদ্রীদের খঞ্জর লুকিয়ে নিতে আদেশ করে, যেন মুসলিম আলেমগণের সাথে সাক্ষাৎ হতেই তাদের হত্যা করতে পারে। [সীরাতে মুস্তাফা, ইদ্রিস কান্ধলবীকৃত-২/২৬৮]

এমন জঘন্য গাদ্দারী প্রকাশ হওয়ার পরও রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের হত্যা করার নির্দেশ দেন নি; তাদের মদিনা থেকে দূরে নিরাপদ স্থানে চলে যেতে সুযোগ করে দেন। এর চেয়ে বড় মানবতা আর কী হতে পারে? এরপর তারা খয়বারে গিয়ে বসবাস শুরু করে। খয়বারে যাওয়ার সময় তারা তাদের বাড়ি-ঘরের দরজার চৌকাঠও খুলে নিয়ে গিয়েছিল। তাদের সর্দার ছিল হুয়াই ইবনে আখতাব এবং কিনানা ইবনে রবি'। [উয়ুনুল আছার-২/২৬৮]

এখানেই তাদের ষড়যন্ত্র শেষ নয়। খায়বারের অধিবাসী বনু নাজিরের সর্দার হুয়াই ইবনে আখতাব মক্কায় গিয়ে কুরাইশদের এবং কিনানা ইবনে রবি' বনু গাতফানকে ফুঁসলিয়ে দশ হাজার সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে মদিনা অবরোধ করেছিল খন্দক যুদ্ধে। [ফাতহুল বারী-৭/৫৮১, খন্দক যুদ্ধ] শুধু তাই নয়। পূর্ব থেকে মুসলমানদের সাথে সন্ধিচুক্তিতে আবদ্ধ থাকা বনু কুরাইজাকেও বিদ্রোহ করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে রাজি করায় এ ইহুদি সর্দার হুয়াই বিন আখতাব। অবশ্য সে যখন বনু কুরাইজার সর্দার কা'ব বিন আসাদ কুরাজিকে তার দলে নিতে আসে, তখন কা'ব দৃঢ়ভাবে বলেছিল :

وَيْحَكَ يَا حُيَيُّ! إِنَّكَ امْرُؤٌ مَشْئُومٌ ❖ وَإِنِّي قَدْ عَاهَدْتُ مُحَمَّدًا.

فَلَسْتُ بِنَاقِضٍ مَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ ❖ وَلَمْ أَرَ مِنْهُ إِلَّا وَفَاءً وَصِدْقًا.

আক্ষেপ তোমার জন্য হে হুয়াই! নিশ্চয় তুমি এক নিকৃষ্ট ব্যক্তি। নিশ্চয় আমি মুহাম্মদ (ﷺ)-এর সাথে চুক্তিবদ্ধ। সুতরাং আমার এবং তার মাঝে যে চুক্তি রয়েছে, তা আমি ভঙ্গ করতে পারব না। আর আমি তাকে একজন অঙ্গীকার রক্ষাকারী ও সত্যবাদীই পেয়েছি। [সীরাতে ইবনে হিশাম-২/২২০, খন্দক যুদ্ধ]

এভাবে ইসলামি রাষ্ট্র ধ্বংস করার জন্য একের পর এক ষড়যন্ত্র চালিয়ে যায় খায়বারের ইহুদিরা। এমনকি ইসলামি রাষ্ট্রের প্রধান মুহাম্মদ ﷺ-কে হত্যারও চেষ্টা করেছিল এ গাদ্দাররা।

এমন জঘন্য অপরাধীদের ক্ষেত্রে তথাকথিত মুক্তমনারা কী আচরণ করবেন? তাদের শাস্তি প্রদান করা অপরাধ না-কি কঠোর শাস্তিটাই ন্যায্য

বিচার? সফিয়্যার স্বামী ছিল কিনানা বিন রবি'। যে ছিল বনু নাজিরের একজন নেতা। এ গাদ্দার বনু গাতফানকে ফুঁসলিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করে। তারপরও রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের সাথে শান্তি চুক্তি করে তাদের খায়বার ত্যাগ করে নিরাপদ স্থানে চলে যেতে নির্দেশ দেন। কিন্তু এখানেও তারা গাদ্দারী করে গনিমতের প্রচুর সম্পদ ভর্তি থলে চুরি করে পালাচ্ছিল। যার নেতৃত্ব দিয়েছিল কিনানা বিন রবি'। শুধু তাই নয়; সাহাবী মাহমুদ বিন মাসলামা রাযি.-কেও সে শহিদ করেছিল। তার এ সকল অমার্জনীয় অপরাধের কারণে তাকে হত্যা করা হয়। [সীরাতে ইবনে হিশাম]

এতগুলো অমার্জনীয় অপরাধ করার পরও অপরাধীদের ক্ষমা করে দেওয়া। নিরাপদ স্থানে চলে যেতে দু' দু'বার সুযোগ দেওয়া বলুন কত বড় উদারতা! এমন কোনো সেনানায়ক ও রাষ্ট্রবিজেতার নজির পৃথিবীর ইতিহাস কখনো দেখাতে পারেনি। দেখাতে পারবেও না।

আর স্বামীহারা অসহায় সফিয়্যাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ যথাযথ মর্যাদায় বিয়ে করে স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে তো তাকে দুনিয়া-আখিরাতে করেছেন সর্বোচ্চ সম্মানিতা। রাজিয়াল্লাহু আনহা।

**মোটকথা :** উক্ত যুদ্ধের সার্বিক পরিস্থিতি সামনে রাখলে কোনো বিবেকবান, যুক্তিবাদী ও মুক্তমনা মানুষ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খয়বার যুদ্ধ নিয়ে অভিযোগ তুলতে পারে না। [লুৎফুর রহমান ফরায়েজি]

**নাস্তিকের প্রশ্ন-২ :** উরাইনা গোত্রের লোকদেরকে হত্যা করা অমানবিক কাজ হয়েছে? জনৈক নব্য মুরতাদ তার ইসলাম ধর্ম ত্যাগের কারণ প্রসঙ্গে বলেছে : 'বুখারি শরিফের ২৩৩ নং হাদিসে আছে, উরাইনা গোত্রের লোকেরা মদিনায় অসুস্থ হয়ে পড়লে তাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ উটের দুধ ও প্রস্রাব পান করতে বলেন। তখন তারা উটের রাখালদের হত্যা করে মুরতাদ হয়ে চলে যাচ্ছিল। উরাইনা গোত্রের লোকদের তিনটা দোষ ছিল। যা হাদিসে আছে– (১) তারা মুরতাদ হয়েছে। (২) উটের রাখালদের হত্যা করেছে। (৩) উট ডাকাতি করেছে। সুতরাং তাদের গ্রেফতার করা হল। তাদের ডান হাত ও বাম পা কাটা হল। লোহার শলাকা দিয়ে তাদের চোখ তুলে ফেলা হল। তাদেরকে মরুভূমিতে রাখার পর তারা পানি চাইলে তাদের পানি না দিয়ে হত্যা করা হল। এটা কি নবীর কাজ? এসব আমার বিবেকের কাছে খারাপ লেগেছে। বিধায় ইসলাম ত্যাগ করলাম।" (নাউযুবিল্লাহ)

**আমাদের জবাব :** উরাইনা গোত্রের তিনটি অপরাধ ভালোভাবে লক্ষ্য করুন!

১. তারা প্রথমে ইসলাম কবুল করেছে। ইসলামি রাষ্ট্রের বিধান মান্য করবে বলে শপথ করেছে। এরপর তারা রাষ্ট্রদ্রোহী হয়ে মুরতাদ হয়েছে।
২. রাষ্ট্রের সম্পদ লুট করেছে।
৩. রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যদের হত্যা করেছে।

উক্ত তিনটি জঘন্য অপরাধ যারা করেছে, তাদের ক্ষেত্রে আপনি যদি রাষ্ট্রের প্রধান হতেন, তবে কী ফয়সালা করতেন? আপনার বিবেকের কাছে আমরা জানতে চাই। একজন মুরতাদ, রাষ্ট্রদ্রোহী, রাষ্ট্রীয় সম্পদ লুটকারী, প্রতিরক্ষা বাহিনীর খুনিকে সসম্মানে ছেড়ে দেওয়া হবে, নাকি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হবে? বিবেকের দাবি হল—যে তিনটি অভিযোগ, তার প্রতিটির জন্যই তার নির্মম মৃত্যুদণ্ড হওয়া উচিত। কিন্তু সেই তুলনায় শাস্তিগুলো কি একটু কমই দেওয়া হয়নি?

আরো লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে—

১. উরাইনার সন্ত্রাসীরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিযুক্ত রাখালদের হত্যা করতে গিয়ে তাদের হাত-পা কেটে দিয়েছিল। তাদের চোখ উপড়ে ফেলেছিল।
২. এসব উটের দুগ্ধ দিয়ে নবী পরিবারসহ অনেক পরিবারের রাতের খাবার সরবরাহ হত। উরাইনার সন্ত্রাসীদের সে রাতের লুণ্ঠনের কারণে সেদিন রাতে অভুক্ত কাটিয়েছে ওইসব পরিবার। তাই কিসাস হিসেবে তাদেরও উক্ত শাস্তি প্রদান করা হয়েছে।

[আর রউজুল আনফ ফী শরহি সীরাতিন নাবাবিয়্যাহ-৬/৪২]

যারা রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীর হাত-পা কেটেছে, চোখ উপড়ে ফেলেছে, রাষ্ট্র প্রধানের পরিবারকে অভুক্ত রেখেছে এবং রাষ্ট্রীয় মাল লুট করে পালিয়েছে, তাদেরকে তার অপরাধের উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া অন্যায় না-কি ন্যায়বিচার?

নিশ্চয় ন্যায়বিচার। প্রতিটি বিবেক বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি তাই বলবে। প্রতিটি আকল এটাই সাক্ষ্য দিবে। নবীজীর বিচার সঠিক ছিল, যথার্থ ছিল। কেউ যদি ভিন্ন কথা বলে, তবে বুঝতে হবে—তার বিবেক তার নিয়ন্ত্রণে নেই; বরং অন্য কারো হাতে থাকা রিমোটের ক্রীড়ানক মাত্র। সে শুধু এক দাবার গুটি। যাকে নিয়ে খেলছে কোনো ঝানু খেলোয়াড়। ইসলামের মত অমূল্য রতন এমন বোকামি করে ছেড়ে দিয়েছে শুনে আমরা যারপরনাই আশ্চর্য হলাম। আল্লাহ তায়ালা তার বিবেক বুদ্ধির সুমতি প্রদান করুন। তাকে হিদায়াত দান করুন। আমিন!

[লুৎফুর রহমান ফরায়েজি]

**নাস্তিকের প্রশ্ন-৩ :** বনু কুরাইজাকে শাস্তি দিয়ে মুহাম্মদ অন্যায় করেছেন। জনৈক মুরতাদ অভিযোগ করেছে, বনু কুরাইজার সাতশ' বা নয়শ' পুরুষকে জবাই করা হয়েছে নবীজীর নির্দেশে। এটা কি নবীর কাজ?

**আমাদের জবাব :** বিষয়টিকে যেভাবে উপস্থাপন করা হল, এ পদ্ধতিটি খুবই অন্যায় ও গর্হিত। কেননা বনু কুরাইজা মদিনায় বসবাসকারী একটি গোত্র। যাদের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শান্তি চুক্তি ছিল। কেউ কারো উপর আক্রমণ করবে না। বহিঃশত্রু আক্রমণ করলে পরস্পর সহযোগিতা করবে। [সীরাতে ইবনে হিশাম]

কিন্তু খন্দক যুদ্ধের সময় যখন কুরাইশরা দশ হাজার বাহিনী নিয়ে মদিনা ঘেরাও করে। তখন মুসলিম সেনা সদস্য ছিল মাত্র তিন হাজার। এক অসম সমরে অবতীর্ণ হয় দুই শিবির। এ সময় মিত্র শক্তির সহযোগিতা ছিল বড়ই প্রয়োজন। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় হল, মিত্র বনু কুরাইজা সহযোগিতা করবে তো দূরে থাক বরং শত্রুর সাথে হাত মেলায়। বনু কুরাইজার সাথে যে সন্ধি চুক্তি ছিল, তা তারা ভঙ্গ করে মক্কার মুশরিকদের সাথে মিলে যায়। সেই সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে গালাগাল করে।

যখন বনু নাজিরের সর্দার হুয়াই বিন আখতাব বনু কুরাইজার সর্দার কা'ব বিন আসাদ কুরাজিকে তার দলে টানতে আসে, তখন সে দৃঢ়তার সাথে বলেছিল–

وَيْحَكَ يَا حُيَيُّ! إِنَّكَ امْرُؤٌ مَشْئُوْمٌ ❖ وَإِنِّيْ قَدْ عَاهَدْتُ مُحَمَّدًا.

فَلَسْتُ بِنَاقِضٍ مَا بَيْنِيْ وَبَيْنَهُ ❖ وَلَمْ أَرَ مِنْهُ إِلَّا وَفَاءً وَصِدْقًا.

আফসোস তোমার জন্য হে হুয়াই! নিশ্চয় তুমি এক নিকৃষ্ট ব্যক্তি। নিশ্চয় আমি মুহাম্মদ ﷺ-এর সাথে চুক্তিবদ্ধ। সুতরাং আমার ও তার মাঝে যে চুক্তি রয়েছে তা আমি ভঙ্গ করতে পারব না। আর আমি তাকে একজন ওয়াদা রক্ষাকারী এবং সত্যবাদীই পেয়েছি। [সীরাতে ইবনে হিশাম-২/২২০]

কিন্তু অবশেষে সে হুয়াইয়ের ফাঁদে পড়ে চুক্তি ভঙ্গ করে শত্রুপক্ষের সাথে মিলে যায়। যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতিনিধি তার সাথে সাক্ষাতে চুক্তির কথা স্মরণ করায়, তখন সে তাচ্ছিল্যের সাথে বলে–

مَنْ رَسُوْلُ اللهِ؟ لَا عَهْدَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مُحَمَّدٍ وَلَا عَقْدَ

'রাসূলুল্লাহ কে? মুহাম্মদ এবং আমাদের মাঝে কোনো চুক্তি নেই, কোনো সন্ধি নেই।' [সীরাতে ইবনে হিশাম-২/২২২]

এভাবে শান্তি ও সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ করে বনু কুরাইজার নেতা কা'ব বিন আসাদ বিপদের মুহূর্তে শত্রুপক্ষের সাথে হাত মেলায়। মুসলমানদের জন্য চরম দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। একদিকে বহিঃশত্রু মক্কার মুশরিকদের বিরাট বাহিনী। অপরদিকে ঘরের শত্রু বনু কুরাইজা।

এ গাদ্দারির কারণে খন্দক যুদ্ধ শেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ বনু কুরাইজাকে শায়েস্তা করতে বাহিনী নিয়ে বনু কুরাইজা অভিমুখে যাত্রা করেন। বনু কুরাইজার অধিবাসীরা তাদের দুর্গ বন্ধ করে বসে থাকে। ২৫ দিন পর্যন্ত তাদের অবরুদ্ধ করে রাখা হয়। অবশেষে তাদের বন্দি করা হয়। একজন মহিলা ছাড়া আর কোনো মহিলাকে হত্যা করা হয়নি। যে মহিলার কারণে খাল্লাদ বিন সুআইদ রাযি. নামক সাহাবী শহীদ হন। [উয়ুনুল আছার-২/৭৮]

তিরমিযি, নাসায়ি ও ইবনে হিব্বানের বর্ণনা অনুপাতে চারশত লোককে হত্যা করা হয়।

অভিযোগকারী নিজেকে মুক্তচিন্তার মানুষ এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের লোক বলে দাবি করছেন। আমি উক্ত ভাইকে প্রশ্ন করতে চাই! যখন পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী আমাদের দেশের উপর আক্রমণ করেছিল, তখন আমাদের দেশের নাগরিক যেসব রাজাকাররা পাকিস্তানীদের পক্ষে কাজ করেছিল, আমাদের হত্যায় সহযোগিতা করেছিল, সেসব গাদ্দার রাজাকারদের ক্ষেত্রে মুক্তচিন্তার ধারক ভাইয়ের মতামত কী? সেই সমস্ত রাজাকারদের ছেড়ে দেওয়া হবে, নাকি তাদের শাস্তি দেওয়া হবে?

মুক্তচিন্তার অধিকারী দাবিদার ভাইয়েরাই রাজাকারদের হত্যার জন্য সবচেয়ে বেশি সোচ্চার। রাজাকারদের ফাঁসির দাবিতে দিনের পর দিন শাহবাগের রাস্তা বন্ধ করে পিজি হাসপাতালের মুমূর্ষু রোগীদের কষ্ট দিয়েছিল তথাকথিত এসব মুক্তচিন্তাবিদরা। সেই তাদের মুখেই গাদ্দার বনু কুরাইজার রাজাকারদের জন্য এ কেমন হাস্যকর দরদ উথলে উঠে? এটা কি দ্বিমুখী নীতি নয়?

আমিও আপনাকে বলি—অন্যের বলা কথাগুলো তোতা পাখির মতো না আউড়ে, নিজের বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে ঘটনাগুলো যাচাই করুন। দেখবেন, বনু কুরাইজার ঘটনার উপর কোনো সুস্থ বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তির প্রশ্ন থাকতে পারে না। আল্লাহ তায়ালা উক্ত ভাইকে হিদায়াত দান করুন। বিবেকের বন্ধ দুয়ার খুলে দিন। আমাদের সকলকে হিদায়াতের উপর অটল রাখুন। আমিন!

(লুৎফুর রহমান ফরায়েজী, আহলে হক বাংলা মিডিয়া সার্ভিস)

**নাস্তিকের প্রশ্ন-৪ :** দশ-এগারটি বিয়ে করে মুহাম্মদ নারী লোভীর পরিচয় দিয়েছেন। (নাউযুবিল্লাহ)

**আমাদের জবাব :** ইসলামপূর্ব যুগে অবাধে বহু বিবাহের প্রচলন ছিল। একমাত্র ইসলামই এমন ধর্ম, যে ধর্ম বহু বিবাহের বিধানে লাগাম টেনেছে। চারের অধিক বিবাহ সকল মুসলমানের জন্য হারাম করেছে। এ বিধান নাযিলের পূর্বে সাহাবাদের কেউ কেউ চারের অধিক বিবাহ করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও ইসলাম ও মানবতার বিভিন্ন কল্যাণ চিন্তায় পঞ্চাশ বছর বয়স হওয়ার পর একাধিক বিবাহ করতে বাধ্য হয়েছেন। এসব বিয়ের কোনোটিই নিছক যৌনচাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যে ছিল না। রাসূলুল্লাহ ﷺ যাঁদের বিয়ে করেছেন, তাঁদের অবস্থা দেখলেই সেটা আমাদের সামনে দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে যাবে। লক্ষ্য করুন!

১. **আম্মাজান হযরত খাদিজা রাযি. :** রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বয়স যখন ২৫ বছর হয়, সেসময় হযরত খাদিজা রাযি.-এর সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিবাহ হয়। আর হযরত খাদিজা রাযি.-এর বয়স ছিল ৪০ বছর। হযরত খাদিজা রাযি.-এর সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ সংসার করেন ২৫ বছর। অর্থাৎ হযরত খাদিজা রাযি.-এর ইন্তেকালের সময় রাসূল ﷺ-এর বয়স হয়েছিল ৫০ বছর। যৌবনের এ ২৫টি বছর তিনি একজন প্রায় বৃদ্ধা নারীকে নিয়ে কাটিয়েছেন, দ্বিতীয় কোনো বিবাহ করেননি। আর ৫০ বছর মানেই তো বার্ধক্যে উপনীত হওয়া। এ বার্ধক্যে এসে নানা পারিপার্শ্বিক ও রাজনৈতিক কারণে অন্য আরো দশজন নারীকে তাঁকে বিবাহ করতে হয়েছে; নিজের চাহিদার জন্য নয়।

২. **আম্মাজান হযরত সাওদা রাযি. :** হযরত খাদিজা রাযি.-এর ইন্তেকালের পর সর্বপ্রথম রাসূল ﷺ বিয়ে করেন হযরত সাওদা রাযি.-কে। যার স্বামী হিজরত করে হাবশা গিয়েছিলেন। সেখানেই তিনি ইন্তেকাল করেন। ফলে হযরত সাওদা রাযি. বিধবা হয়ে যান। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর দুঃখকষ্ট লাঘবের জন্য বিবাহ করেন।

৩. **আম্মাজান হযরত আম্মাজান আয়শা রাযি. :** যখন ইসলামের পতাকাতলে লোকজন প্রবেশ করতে শুরু করে, তখন মক্কার মুশরিকরা মুসলমানদের সাথে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করতে শুরু করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দুই কন্যা রুকাইয়া ও উম্মে কুলসুমের বিবাহ দেওয়া হয়েছিল আবু লাহাবের দুই ছেলে উতবা ও উতাইবার সাথে। তারা উভয়ে পিতা আবু লাহাবের নির্দেশে রুকাইয়া ও উম্মে কুলসুম রাযি.-কে তালাক

দিয়ে দেয়। শুধু তাই নয়, হযরত আবু বকর রাযি. তার কন্যা হযরত আয়েশা রাযি.-এর বিবাহ এক কাফির যুবায়ের বিন মুতয়িম-এর সাথে ঠিক হয়। কিন্তু তার পিতা সেই বিবাহ রদ করে দেয়। কারণ, পাছে না তার ছেলেও মুসলমান হয়ে যায়! উক্ত বিবাহ নাকচ হয়ে যাওয়ার পর হযরত আবু বকর রাযি. তার কন্যা আয়েশা রাযি.-এর সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিবাহ দিয়ে দেন।

৪. **আম্মাজান হযরত হাফসা রাযি.** : হযরত উমর রাযি.-এর কন্যা হযরত হাফসা রাযি. ও তাঁর স্বামীর সাথে হিজরত করেন। কিন্তু তাঁর স্বামীও ইন্তেকাল করেন। তখন হযরত উমর রাযি. তাঁর কন্যাকে বিয়ে করার জন্য প্রথমে হযরত উসমান রাযি.-কে, তারপর হযরত আবু বকর রাযি.-কে অনুরোধ করেন। কিন্তু তারা উভয়ে অস্বীকৃতি জানালে রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত হাফসা রাযি.-কে বিবাহ করেন।

৫. **আম্মাজান হযরত উম্মে সালমা রাযি.** : হযরত উম্মে সালমা রাযি.-এর স্বামীও কাফিরদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে হাবশায় হিজরত করেছিলেন। এরপর সেখানেই ইন্তেকাল করেছেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকেও স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে আশ্রয় প্রদান করেছেন।

৬. **আম্মাজান হযরত উম্মে হাবিবা রাযি.** : যিনি কুরাইশের সর্দার হযরত আবু সুফিয়ানের কন্যা ছিলেন। নিজ স্বামীর সাথে হিজরত করে তিনি হাবশায় চলে যান। সেখানে পৌঁছার পর তাঁর স্বামী খ্রিষ্টান হয়ে যায়। কিন্তু হযরত উম্মে হাবিবা রাযি. ইসলামের উপর অটল থাকেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে আশ্রয় প্রদান করেছেন।

৭. **আম্মাজান হযরত যয়নাব বিনতে জাহাশ রাযি.** : হযরত যয়নাব বিনতে জাহাশ রাযি.-কে তাঁর স্বামী জায়েদ বিন হারেছা রাযি. বনিবনা না হওয়ায় তালাক দিয়ে দেন। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে আশ্রয় প্রদান করেন।

৮. **আম্মাজান হযরত যয়নাব বিনতে খুজাইমা রাযি.** : উম্মুল মাসাকিন হযরত যয়নব বিনতে খুজাইমা রাযি.-এর স্বামী উহুদ যুদ্ধে শহিদ হয়ে যান। পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকেও স্ত্রীর মর্যাদায় আশ্রয় প্রদান করেন।

৯. **আম্মাজান হযরত মাইমুনা রাযি.** : হিজরতের পর তাঁর স্বামী মারা যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকেও স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে আশ্রয় প্রদান করেন।

উল্লেখ্য, হযরত যয়নব বিনতে জাহাশ রাযি. ছাড়া বাকিরা সবাই ইসলামের শুরু যুগেই ইসলাম কবুল করেন। তারপর কাফিরদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে বাধ্য হয়ে মাতৃভূমি ত্যাগ করে হিজরতে চলে যান। কিন্তু সেখানে তাদের স্বামীগণ ইন্তেকাল করলে তারা পথহারা হয়ে পড়েন। কোথায় যাবেন? কার কাছে যাবেন? আপন বাড়িতে ফিরে গেলে কাফির আত্মীয়-স্বজন অত্যাচার ও নিপীড়ন করে ধ্বংস করে দিবে। এমন অসহায় অবস্থায় পতিত নারীদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে সম্মানিত করেছেন।

**১০ আম্মাজান হযরত জুআইরিয়া রাযি. :** হযরত জুআইরিয়া রাযি. ছিলেন গোত্রপতির কন্যা। রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত জুআইরিয়া রাযি.-কে উচ্চমূল্য পরিশোধ করে বিবাহ করেন। যাতে করে মুসলমানদের সাথে সে গোত্রের দুশমনি লাঘব হয়।

**১১. আম্মাজান হযরত সফিয়্যাহ রাযি. :** হযরত সফিয়্যাহ রাযি. বনু নাজির গোত্রের সর্দারের কন্যা ছিলেন। খয়বার যুদ্ধে তিনি বন্দি হন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বিয়ে করে দাসী থেকে বিবির মর্যাদায় উন্নীত করেছেন।

বলা বাহুল্য, শেষোক্ত দুটি বিয়ে দ্বারা উদ্দেশ্য ছিল, যেন উভয় কওমের মাঝে বিদ্যমান যুদ্ধ থেমে যায়। পারস্পরিক আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার বদৌলতে শান্তি ছড়িয়ে পড়ে। পারস্পরিক সম্প্রীতি বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ তায়ালার রহমতে হয়েছিলও তাই।

এখানে আরেকটি লক্ষ্যণীয় বিষয় হল, ইসলাম পূর্বযুগে সর্বত্রই বহু বিবাহের প্রচলন ছিল এবং তা বৈধ মনে করা হত। আর এ বহু-এর কোনো সীমা ছিল না। একেকজন লোক হাজার হাজার স্ত্রীও রাখত। বর্তমান বাইবেলের দ্বারা জানা যায়, হযরত সুলায়মান আ.-এর সাতশত স্ত্রী ও তিনশত হেরেম ছিল। [প্রথম সালাতিন-১১/৩]

এভাবে হযরত দাউদ আ.-এর নিরানব্বই স্ত্রী, হযরত ইবরাহিম আ.-এর তিন স্ত্রী, হযরত মূসা আ.-এর চারজন স্ত্রী ছিলেন।

[বাইবেল ফয়দাদেশ অধ্যায় ২৯-৩০]

ষোড়শ শতাব্দি পর্যন্ত জার্মানিতে রীতিমতো বহু বিবাহের প্রচলনই ছিল। কনস্টান্টিনোপলের রাজা এবং তার সঙ্গী-সাথীদের একেক জনের অসংখ্য স্ত্রী ছিল। এভাবে বৈদিক শিক্ষা সীমাহীন বহু বিবাহ অনুমোদন করত। এ বিধানে একত্রে দশজন, তেরজন ও সাতাশজন স্ত্রী রাখার অনুমোদন পাওয়া যায়।

**মোটকথা :** ইসলামের পূর্বযুগে অবাধে বহু বিবাহের প্রচলন ছিল। বিভিন্ন ধর্ম ও দেশের ইতিহাস থেকে যতটুকু জানা যায়, তাতে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়, ইহুদি, খ্রিষ্টান, হিন্দু, আর্য, পারসিক প্রভৃতি কোনো ধর্ম বা কোনো বিধান-ই এ ব্যাপারে সীমারেখা নির্ধারণ করে দেয় নি। একমাত্র ইসলামই এমন ধর্ম, যা নারীদের এ অধিকার আদায় করে দিয়েছে, যাদের সামর্থ্য নেই তারা শুধু এক স্ত্রীতে ক্ষ্যান্ত থাকবে। আর যাদের সামর্থ্য ও প্রয়োজন হবে, তারা সর্বোচ্চ চার স্ত্রী রাখতে পারবে। এখানে বিশ্বপ্রতিপালকের মহা প্রজ্ঞা রয়েছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বহু বিবাহ ছিল পবিত্র কুরআনে চার সংখ্যার সীমা নির্ধারণ করার পূর্বে। পবিত্র কুরআনে চার সংখ্যাটি নির্ধারণ হওয়ার পর সকল সাহাবি তাঁদের কাছে থাকা চারের অধিক স্ত্রী তালাক দিয়ে দিয়েছেন। তালাক নিয়ে নারীরাও স্বাচ্ছন্দে অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে জীবন যাপন করেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রীগণ তো ছিলেন উম্মাহাতুল মুমিনীন তথা মুমিনগণের মা। তাঁদেরকে যদি তালাক দেওয়া হত, তবে এটা হত তাঁদের জন্য মস্ত বড় বিপদ। কারণ, মুমিনগণের মা হওয়ার কারণে কোনো মুমিনের পক্ষে তাঁদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়াও সম্ভব ছিল না।

অপরদিকে চারের অধিক হওয়ার কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথেও থাকতে পারছেন না। রাসূলুল্লাহ যেখানে সারা বিশ্বের জন্য রহমতস্বরূপ, সেখানে তাঁর ছায়ায় আসার কারণে যদি একজন নারীকে এ পরিণতি ভোগ করতে হত, তা হলে এটা হত দুঃখজনক ও ইসলামি শরিয়তের মেযাজ পরিপন্থি কাজ। তাই নারীজাতির একটা অংশের স্বার্থের দিকে খেয়াল করে নবীজীর জন্য চারের অধিক স্ত্রী রাখার বিধানটি আল্লাহ তায়ালা বিশেষভাবে বিধিবদ্ধ রেখেছেন।

উপরের বর্ণনা থেকে এ কথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বহু বিবাহ ছিল ইসলাম ও মানবতার কল্যাণে। চারের অধিক স্ত্রী রাখাও ছিল নারীজাতির একটি অংশের কল্যাণার্থে আল্লাহ তায়ালার বিশেষ নির্দেশে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বহু বিবাহে যৌনতা কিংবা নারীলিপ্সার লেশ মাত্রও পাওয়া যায় না। তথাপি যারা আমাদের শ্রেষ্ঠ নবী, উত্তম আখলাক ও শ্রেষ্ঠ চরিত্রবান রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পবিত্র সত্তা নিয়ে অপবাদে খড়গ তোলে, তাদের জ্ঞানপাপী বা মূর্খ ছাড়া আমরা আর কী বলতে পারি? আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে হেফাজত করুন। আমিন!

**নাস্তিকের প্রশ্ন-৫ :** শিশু আয়েশাকে বিবাহ করে মুহাম্মদ পিডোফাইল সাব্যস্ত হয়েছেন। (নাউযুবিল্লাহ)

বুখারি শরিফের একটি হাদিসে (হাদিস নং ৩৮৯৬) আছে, মুহাম্মদ (ﷺ) আয়েশাকে আয়েশার ছয় বছর বয়সে বিয়ে করেছেন এবং ৯ বছর বয়সে তার সাথে সংসার করেছেন। তাই ছয় বছরের শিশু আয়েশাকে বিয়ে করে মুহাম্মদ (ﷺ) একটি অমানবিক কাজ করেছেন। সুতরাং তিনি ছিলেন 'পিডোফাইল' বা শিশু যৌনাচারী। (নাউজুবিল্লাহ!)

**আমাদের জবাব :** তৎকালীন আরবের রেওয়াজ অনুযায়ী হযরত আয়েশা রাযি.-এর ছয় বছর বয়সে তাঁর বিবাহ আরবের অন্য একজন লোকের সাথে ঠিক হয়েছিল। কিন্তু আয়েশার পিতা মুসলমান হওয়ার কারণে বরপক্ষ সে বিবাহ সংঘটিত হতে দেয়নি। এ পরিস্থিতিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আয়েশা রাযি.-কে বিবাহ করে নেন। বয়ঃসন্ধিকালের অপেক্ষায় তিন বছর যাবৎ তাঁর সাথে কোনো যৌনাচারে রাসূলুল্লাহ ﷺ লিপ্ত হননি। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে হযরত আয়েশা রাযি.-এর যৌনাচার হয়েছে হযরত আয়েশা রাযি.-এর নয় বছর বয়সে। একথা হাদিসের আছে, নাস্তিকরাও স্বীকার করেছে। এবার নয় বছর বয়সে কোনো নারীর সাথে বৈধ যৌনাচারে লিপ্ত হওয়ার বিষয়টি আমরা স্বয়ং হযরত আয়েশা রাযি.-এর মুখেই শুনি—

قَالَتْ عَائِشَةُ: إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ تِسْعَ سِنِينَ فَهِيَ امْرَأَةٌ

"হযরত আয়েশা রাযি. বলেছেন– কোনো বালিকার বয়স নয় বছর হলে (সে আর শিশু কিংবা বালিকা থাকে না বরং) সে নারী হয়ে যায়।"

(বায়হাকি, হাদিস নং ১৫৮৯ ও তুহফাতুল আহওয়াযি-৩/১৭৬)

তাই প্রশ্নে উল্লিখিত শিশু যৌনাচারের অভিযোগটি তাদের অজ্ঞতা ও মূর্খতার পরিচায়ক। তারা তো সতের বছরের মেয়েকেও শিশু বলে বিবাহ ভেঙে দিতে যায়। কিন্তু তারাই আবার দশ বছর বয়সের মেয়ে কর্তৃক অবৈধ যৌনাচারকে আধুনিকতা বলে চালিয়ে দেয়। এমন স্ববিরোধী কথাবার্তা এবং আচরণের কারণেই এরা মানবজাতির সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ ঈমান থেকে বঞ্চিত হয়।

২০০৯ সালে 'ন্যাশন্যাল উইমেন্স হেলথ নেটওয়ার্ক'-এ প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে ক্যাথলিন ও'গ্র্যাডি বলেছেন–

'Normal puberty onset can range from ages 8-to13'

'স্বাভাবিক বয়ঃসন্ধিকাল শুরু হতে পারে ৮ থেকে ১৩ বছরের মধ্যে।'

এহেন অনৈতিক প্রশ্নের কারণে তারা যেমন উম্মতে মুহাম্মাদী হিসেবে পরিচয় দেওয়ার অধিকার হারিয়েছে, তেমনি বাংলাদেশি হিসেবে পরিচয়

দেওয়ারও অধিকার হারিয়েছে। আসুন সবাই বলি—দেশ বাঁচাও, নাস্তিক খেদাও! তবে আমরা পাপিকে নয়; পাপকে ঘৃণা করি। তাই আমরা বলব—দেশ বাঁচাও, নাস্তিকতা খেদাও! তওবা করে মুমিন হও!

**নাস্তিকের প্রশ্ন-৬ :** ইসলাম দাসপ্রথাকে সমর্থন করে অমানবিক কাজ করেছে। কারণ, স্বাধীন মানুষকে দাস বানানো বাস্তবেই অমানবিক। দাসপ্রথা মানুষের মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করেও বটে। মানুষ হয়ে মানুষকে এমন অপমান কিভাবে করতে পারে?

**আমাদের জবাব :** দাসপ্রথা মানুষের মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করেছে এ কথা সঠিক নয়। ইসলাম দাসদের যে মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে, বিংশ শতাব্দিতেও আমেরিকার কৃষ্ণাঙ্গ মানুষগুলো সেটা ভোগ করতে পারেনি।

ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ তাঁর দাস হযরত যায়েদকে মুক্ত করে দিলে তিনি চলে যেতে অস্বীকৃতি জানান। দাস যায়েদ এবং তাঁর পুত্র উসামা ছিলেন ইসলামের মহান সেনাপতিদের মধ্যে অন্যতম। তাঁদের অধীনে খাঁটি আরবি মুসলমান সিপাহিরা লড়াই করেছেন। চার খলিফার মতোই মর্যদা ছিল কৃষ্ণাঙ্গ সাহাবি সাবেক দাস হযরত বেলাল রাযি.-এর।

দাস রাজবংশ ইসলামের ইতিহাসে প্রায় সব দেশেই ছিল। যেমন– দিল্লিতে, মিশরে। প্রিয় দাসরা মুসলিম রাজা-বাদশাহদের জামাই হয়ে গেছেন। দাসীর গর্ভের সন্তান মামুনুর রশিদ আব্বাসীয় বংশের একজন শ্রেষ্ঠ খলিফা। মুসলিম বাদশাহের দাস তালিকায় অন্তর্ভুক্তি অর্থ বাদশাহর দৃষ্টিতে পড়া।

মুসলিম বাদশাহের দাস অর্থ আজকের কমিশন বা গেজেটেড চাকরি পাওয়ার মতো। আর সরকারের চাকুরেরা তো লিখেনই 'ইওর ওবিডিয়েন্ট সারভেন্ট।' আধুনিক যুগের 'সারভেন্ট'-এর চেয়ে অতীতের মুসলিম বাদশাহর দাসরা বেশি অধিকার ভোগ করত। দাস হয়ে বাদশাহর জামাই পর্যন্ত হওয়া যেত। সুলতান সবুক্তগিন, সুলতান কুতুবুদ্দিন, সুলতান ইলতুতমিস তো দাস থেকেই বাদশা হয়েছিলেন।

ইসলাম অর্থনৈতিক কারণে দাসপ্রথা কঠোরভাবে বন্ধ করেনি; তবে দাসদের মানবাধিকার প্রদানে কঠোর ধর্মীয় আইন জারি করেছে।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইন্তিকালের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে যে দুটি কাজের উপরে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন, তা হলো নামায পড়া ও দাস-দাসীর সঙ্গে সদ্ব্যবহার।

কোনো মুসলমান পরিবারের দাস হওয়া অর্থ সেই পরিবারের সদস্য হয়ে যাওয়া, এমনকি শেষ পর্যন্ত জামাই। অনেক মুসলমান বাদশা অযোগ্য পুত্রের চেয়ে যোগ্য দাসকেই উত্তরাধিকারী বা উচ্চ পদে আসীন করেছিলেন।

ইসলাম দাসপ্রথা পূর্ণ বিলুপ্ত না করলেও দাসমুক্তির উৎসাহ প্রদান করেছে। কুরআন বলেছে—

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ

وَلَكِنَّ الْبِرَّ ... وَآتَى الْمَالَ ... وَفِي الرِّقَابِ.

'পূর্ব ও পশ্চিমে তোমাদের মুখ ফিরানোয় পুণ্য নেই; কিন্তু দাসমুক্তির জন্য অর্থ দান করলে পুণ্য আছে।' [সূরা বাকারা-১৭৭]

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة: ٦٠]

"দান করা তো কেবল নিঃস্ব, অভাবগ্রস্ত ও সেই কাজে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের জন্য যাদের মনোরঞ্জন করা প্রয়োজন, দাসমুক্তির জন্য, ঋণে ভারাক্রান্তদের জন্য, আল্লাহ তায়ালার পথে সংগ্রামকারী এবং মুসাফিরদের জন্য।" [সূরা তওবা-৬০]

وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ [البقرة: ٢٢١]

'অবিশ্বাসী নারী তোমাদের চমৎকৃত করলেও নিশ্চয় ধর্মে বিশ্বাসী ক্রীতদাসী তার চেয়ে ভালো।' [সূরা বাকারা-২২১]

فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ [النساء: ٢٥]

'বিয়ের পর যদি তারা (দাসীরা) ব্যভিচার করে, তবে তাদের শাস্তি স্বাধীনা নারীদের অর্ধেক।' [সূরা নিসা-২৫]

দাস-দাসীকে ইসলাম জামাই ও রাণীর আসনে বসিয়েছে। ফরাসী প্রেসিডেন্ট মিঁতেরা তার প্রেমিকা ও জারজ কন্যাকে এমন মানবাধিকার প্রদান করতে পারেননি।

বর্তমান যুগে দাসপ্রথা নেই। কারণ, ইসলাম স্বাধীন মানুষদের ধরে দাসদাসী বানানো সমর্থন করে না।

যুদ্ধবন্দিদের জেলে আটকে নির্যাতন না করে, প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত না করে বিভিন্ন পরিবারের সঙ্গে বসবাস ও কাজ করতে দেওয়া মানবিক না-কি অমানবিক? নিশ্চয় মানবিক। যুদ্ধবন্দিদের ক্ষেত্রে এ মানবিক কাজটি ইসলামেরও আদর্শ। তবে আগেকার যুগের মতো স্বাধীন মানুষকে দাস বানানো ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ নাজায়েয ও হারাম।

ইসলামি শরিয়ত, ফিকহ ও ফতওয়ার শক্তিতে দাস-দাসীরা তাদের মনিবদের গৃহে পূর্ণ মানবাধিকার ভোগ করে থাকে। দাস-দাসীদের সঙ্গে

দুর্ব্যবহার করা ইসলামি শরিয়তে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। ইসলামি শরিয়তের নির্দেশ হল, মনিব যা খাবে, দাস-দাসী তাই খাবে, মনিব যা পরবে, দাস-দাসী সেই রকমের কাপড় পরবে। ইসলামের ফতওয়া দাস-দাসীকে যে মর্যাদা প্রদান করেছে, অন্য কোনো ব্যবস্থা কি তা প্রদান করেছে কোনো দিন?

হযরত ইবরাহিম আ., হযরত মূসা আ., হযরত ঈসা আ. একই ইসলামের প্রাচীন ধারক-বাহক। হযরত ইবরাহিম আ. তো দাসী হযরত হাজেরা আ.-কে পত্নীর মর্যাদা প্রদান করেন আর সেই বংশে বিখ্যাত নবী হলেন হযরত ইসমাইল আ. ও হযরত মুহাম্মদ ﷺ। দাসী হযরত হাজেরার অনুকরণ করে দৌড়াদৌড়ির অনুষ্ঠান মক্কার সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের মাঝে না করলে মুসলমানরা হাজীই হতে পারে না। সুতরাং মন্তব্য সম্পূর্ণভাবে অগ্রহণযোগ্য।

[নাস্তিকের যুক্তি খণ্ডন]

**আপনার বিবেকের কাছে দুটি প্রশ্ন—**

- যুদ্ধবন্দিদের ক্ষেত্রে দাসপ্রথার পরিবর্তে যারা গুয়ান্তনামো-বে কারাগার সৃষ্টি করতে চায়, তাদের ব্যাপারে আপনি কী বলবেন?
- যুদ্ধাপরাধীদেরকে প্রাণে মেরে ফেলা আর দাস বানিয়ে সাধারণ জীবন যাপন করার সুযোগ দেওয়া—কোনটি অধিক মানবিক মনে হয়?

**নাস্তিকের প্রশ্ন-৭ :** দাসীর সাথে যৌনমিলন প্রসঙ্গে

**আমাদের জবাব :** ইসলামকে আক্রমণ করার যতগুলো মোক্ষম অস্ত্র ইসলাম বিদ্বেষীদের হাতে আছে, তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে—'ইসলাম দাসী ও যুদ্ধবন্দিণীদের সাথে যৌন-সম্পর্ক স্থাপনের সুযোগ করে দিয়েছে' মর্মে অপ্রলাপ। তাদের এ অপ্রলাপে যে কেউ বিভ্রান্ত হতে পারে যে, ইসলামই বুঝি দাসী ও যুদ্ধবন্দিণীদের সাথে যৌনসম্পর্ক স্থাপনের প্রবর্তক।

অথচ বাস্তবে দাসী ও যুদ্ধবন্দিনীদের সাথে অতি প্রাচীনকাল থেকে চলে আসা যথেচ্ছা, অমানবিক ও অনিয়ন্ত্রিত যৌনাচারকে ইসলাম সীমিত, মানবিক ও নিয়ন্ত্রিত পর্যায়ে আনার পাশাপাশি তাদেরকে জৈবিক চাহিদা পূরণের একটি বৈধ ও মর্যাদাপূর্ণ সুযোগ প্রদান করেছে। ফলে একদিক দিয়ে তাদের সন্তান জন্মগতভাবে স্বাধীন ও পিতার সম্পদের ওয়ারিশ হয়। অপরদিকে সন্তান গর্ভধারণের মাধ্যমে দাসীটি ক্রমান্বয়ে মুক্তি লাভ করে। এখানে আমাদের মূল আলোচনায় যাওয়ার আগে দুটি বিষয় ভালোভাবে মনে রাখতে হবে। যথা–

১. দাসপ্রথা ইসলামের উদ্ভাবন নয় বরং দাসপ্রথা অতিপ্রাচীনকাল থেকে চলে আসা একটি সামাজিক কালচার। ইসলাম একদিকে সমাজে প্রচলিত অমানবিক দাসপ্রথাকে নিজ আওতার ভিতরে মানবিক করেছে, অন্যদিকে নানাভাবে দাসমুক্তকরণের পথ উন্মুক্ত করেছে।

২. দাসীর সাথে যৌন-সম্পর্ক স্থাপনের অধিকার দাসপ্রথার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ, ইসলামের কোনো অপরিহার্য, অবশ্য করণীয় বা আকাঙ্ক্ষিত বিষয় নয়। ইসলাম নিজ গণ্ডির ভিতরে এ বিষয়টি নিয়ন্ত্রণ করেছে মাত্র।

**দাসত্ববরণের প্রচলিত পন্থা ও ইসলামের অনুমোদন**

যুদ্ধবন্দিরা দাস/ দাসী হওয়া ইসলামপূর্ব যুগেই প্রচলিত ছিল। আবার স্বাধীন মানুষকে বিক্রি করার দ্বারা দাসত্ববরণ করানোও ইসলামের পূর্বযুগে প্রচলিত ছিল। স্বাধীন মানুষকে বিক্রি করে দাস-দাসী বানানোকে ইসলাম সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। বাকি রইলো যুদ্ধবন্দিদের দাস-দাসী বানানো, এটি যুক্তিসঙ্গত হওয়ায় ইসলাম এ পদ্ধতিকে অনুমোদন করেছে। তবে অপরিহার্য ঘোষণা করেনি। ইসলামি রাষ্ট্রনায়ক যুদ্ধবন্দিদের ব্যাপারে নিম্নোক্ত যে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন–

১. হত্যা করতে পারেন (এটা শুধু সেসব যুদ্ধক্ষম পুরুষদের জন্য প্রযোজ্য, যারা ইসলামি রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ হতে পারে, নারী-শিশু-বৃদ্ধের জন্য প্রযোজ্য নয়।)
২. নিঃশর্তভাবে মুক্ত করে দিতে পারেন।
৩. মুক্তিপণ সাপেক্ষে মুক্ত করে দিতে পারেন।
৪. যুদ্ধবন্দি বিনিময়ে ব্যবহার করতে পারেন।
৫. প্রচলিত অন্য কোনো ব্যবস্থাও গ্রহণ করতে পারেন। যেমন, দাসপ্রথা চালু থাকলে তাদেরকে দাস-দাসী হিসেবে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী যোদ্ধাদের মধ্যে বণ্টন করে দিতে পারেন।

সুতরাং যুদ্ধবন্দিদের দাস-দাসী বানানো ইসলামের কোনো বাধ্যতামূলক বা অপরিহার্য নির্দেশ নয় বরং অনেকগুলো অনুমোদিত একটি পন্থা মাত্র।

**কেন এর অনুমোদন?**

ইসলাম একটি বাস্তব, সত্য ও যুক্তিসঙ্গত ধর্ম। এক গর্তে দু'বার হোঁচট খাওয়ার ধর্ম ইসলাম নয়। ইসলামে যুদ্ধবন্দিদের দাস/দাসী বানানো কোনো জরুরি বিষয় না হলেও যুদ্ধবন্দিদের দাস/দাসী বানানো তখনকার সময়ে একটি প্রচলিত নিয়ম ছিল। যুদ্ধে মুসলিমরা অমুসলিমদের হাতে বন্দি হলে

তাদেরও এ পরিণতি বরণ করতে হত। যতদিন পর্যন্ত মুসলিম যুদ্ধবন্দিদের দাস/দাসী হওয়ার সম্ভাবনা দূর না হয়, ততদিন পর্যন্ত মুসলিমদের জন্য অমুসলিম যুদ্ধবন্দিদের দাস/দাসী বানানোর সমঅধিকার থেকে বঞ্চিত করে নিজ অনুসারীদের নিশ্চিত বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দেওয়ার মতো আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত ইসলাম কিছুতেই নিতে পারে না।

মুক্তিপণ কিংবা বন্দিবিনিময়ের মাধ্যমে মুক্তকরণের পরও যে বিপুলসংখ্যক যুদ্ধবন্দি রয়ে যেত, তাদের নিঃশর্তভাবে মুক্ত করে দেওয়া ইসলামি রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য যেমন হুমকিস্বরূপ ছিল, তেমনি কারাবন্দি করে রাখাও ছিল ব্যয়বহুল, অর্থনীতির ওপর অতিরিক্ত চাপ ও ওই বন্দিদের জীবন ধ্বংস করার নামান্তর। যা আমরা দেখি তথাকথিত আধুনিক সভ্য জাতির গুয়ান্তনামো বে কারাগারের দিকে তাকালে।

সহজ ছিল প্রচলিত নিয়মে দাস/দাসী হিসেবে তাদেরকে বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া। তা হলে একদিকে যেমনি সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় থাকত, অন্যদিকে মুনিবের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ করে দাস/দাসী নিজেকে মুক্ত করার সুযোগও পেত। অন্য আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে খুব কাছে থেকে ইসলামকে পর্যবেক্ষণ করে ইসলামে দাখিল হওয়ার একটি সুযোগও তাদের সামনে খোলা থাকত। এ যে পয়েন্ট, এটিই শয়তান ও তার দোসর নাস্তিক-মুরতাদের বরদাশত হওয়ার কথা নয়। তাই মূল কথা না বলে এদিক সেদিক জিহ্বা চালিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করার এত চেষ্টা।

### যৌনসম্পর্ক স্থাপনে ইসলামি নিয়ন্ত্রণ

বলা বাহুল্য, ইসলাম কাউকে নিজের ইচ্ছেমতো এসব যুদ্ধবন্দিনী বা দাসীর সাথে যৌনসম্পর্ক স্থাপনের নিঃশর্ত ও অবাধ অনুমোদন দেয় নি বরং নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে তাদের সাথে যৌনসম্পর্ক নিষিদ্ধ ঘোষণা করছে :

১. বণ্টনের পূর্বে যুদ্ধবন্দিনীর সাথে যৌনসম্পর্ক স্থাপন নিষিদ্ধ।
২. যুদ্ধক্ষেত্রে স্বামীসহ ধৃত যুদ্ধবন্দিনীর সাথে যৌনসম্পর্ক স্থাপন নিষিদ্ধ।
৩. ইদ্দতকাল অতিক্রমের পূর্বে যৌনসম্পর্ক স্থাপন নিষিদ্ধ।
৪. গর্ভবতী দাসী/যুদ্ধবন্দিনীর সাথে যৌনসম্পর্ক স্থাপন নিষিদ্ধ।
৫. অন্যের বিবাহাধীন দাসীর সাথে যৌনসম্পর্ক স্থাপন নিষিদ্ধ।
৬. নিজের যৌনদাসীর অন্য বোনের সাথে যৌনসম্পর্ক স্থাপন নিষিদ্ধ।
৭. অন্যের দাসীর সাথে বিবাহবহির্ভূত যৌনসম্পর্ক স্থাপন নিষিদ্ধ।

এ পর্যায়ে আমরা এসব অবস্থার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা প্রদান করা হচ্ছে।

### ১. বণ্টনের পূর্বে যুদ্ধবন্দিনীর সাথে যৌনসম্পর্ক স্থাপন নিষিদ্ধ

অনেকেই ভেবে থাকেন, যুদ্ধের ময়দানেই যে কোনো যুদ্ধবন্দিনীর সাথে যে কোনো মুসলিম যোদ্ধা ইচ্ছেমতো দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে। এতে ইসলামে কোনো বাধা-নিষেধ নেই বরং এটিই সম্ভবত ইসলামি নিয়ম। বস্তুত এটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত একটি ধারণা। যুদ্ধক্ষেত্রে তো নয়ই বরং যুদ্ধ শেষ হলেও বণ্টন হওয়ার আগে কোনো যুদ্ধবন্দিনীর সাথে যৌনসম্পর্ক স্থাপন ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কেউ যদি এ ধরনের কোনো কার্যে লিপ্ত হয়, তবে ইসলামের দৃষ্টিতে সেটাকে ধর্ষণ হিসেবে গণ্য করা হয় এবং তার ওপর ব্যভিচারের শাস্তি আরোপ করা হয়।

উদাহরণত জিরার ইবনুল আযওয়ার খলিফা/ খলিফার পক্ষ হতে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক বণ্টনের পূর্বে একজন যুদ্ধবন্দিনীর সাথে সহবাস করার কারণে উমর রাযি. তার উপর ব্যভিচারের দণ্ড প্রয়োগের নির্দেশ দিয়েছিলেন। যেমন, হাদিস শরিফে বর্ণিত আছে–

'হারুন ইবনুল আসিম বর্ণনা করেন : উমর ইবনুল খাত্তাব রাযি. খালিদ বিন ওয়ালিদ রাযি.-কে সৈন্যবাহিনীসহ প্রেরণ করেন। খালিদ রাযি. সৈন্যদলসহ জিরার ইবনুল আযওয়ারকে প্রেরণ করেন। আর তারা আসাদ গোত্রের একটি এলাকা দখল করেন। তারা একটি সুন্দরী নারীকে বন্দি করেন। জিরার তার প্রতি আকৃষ্ট হন। তিনি তার সঙ্গীদের থেকে তাকে (নারীটিকে) চাইলেন। তারা দিয়ে দিল। তিনি তার সাথে সঙ্গম করলেন। উদ্দেশ্য পূর্ণ হওয়ার পর কৃতকর্মের জন্য তিনি অনুতপ্ত হলেন এবং খালিদ রাযি.-এর নিকট গিয়ে এ সম্পর্কে বললেন। খালিদ রাযি. বললেন, অবশ্যই আমি তোমার জন্য এর অনুমোদন ও বৈধতা প্রদান করছি। জিরার বললেন, 'না, উমরকে চিঠি না পাঠানো পর্যন্ত নয়।' উমর উত্তরে লিখলেন, তাকে রজম (প্রস্তারাঘাতে হত্যা) করতে হবে। কিন্তু চিঠি পৌঁছনোর আগেই জিরার ইন্তিকাল করলেন। খালিদ রাযি. বললেন, 'আল্লাহ জিরারকে অপমানিত করতে চান নি।' [সুনানুল কুবরা লিল বাইহাকি হাদিস নং ১৮৬৮৫]

লক্ষ্য করুন! খলিফা বা খলিফা হতে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক বণ্টন হওয়ার আগে যুদ্ধবন্দিনীর সাথে সহবাস করা যে অবৈধ, সেটা সুবিদিত ছিল। উক্ত কর্মটিকে ব্যভিচার হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। কেননা উমর রাযি. এক্ষেত্রে শাস্তি হিসেবে ব্যভিচারের হদ নির্ধারণ করেছেন।

### ২. যুদ্ধক্ষেত্রে স্বামীসহ ধৃত যুদ্ধবন্দিনীর সাথে যৌনসম্পর্ক স্থাপন নিষিদ্ধ

বন্দি হওয়ার পর সাধারণভাবে বিবাহিত যুদ্ধবন্দিনীর পূর্বেকার বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হিসেবে গণ্য করা হয়। ফলে তাদেরকে উপপত্নী হিসেবে গ্রহণ করা তথা তাদের সাথে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন করা বৈধ বিবেচিত হয়।

যদি যুদ্ধক্ষেত্রে স্বামী এবং স্ত্রী উভয়েই একসাথে অথবা একজনকে যুদ্ধক্ষেত্রের পরিধির বাইরে নিয়ে যাওয়ার আগেই অন্যজন যুদ্ধবন্দি/বন্দিনী হিসেবে ধৃত হয়, তখন তাদের বিবাহবন্ধন অক্ষুণ্ন থাকবে। ফলে উক্ত যুদ্ধবন্দিনীর সাথে স্বামী ভিন্ন অন্য কারো দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন অবৈধ হবে। যদি শুধু একজন যুদ্ধক্ষেত্রে ধৃত হয়ে ইসলামি সীমানায় পৌঁছে যায়, সেক্ষেত্রে তাদের বিবাহ বন্ধন বিচ্ছিন্ন হিসেবে গণ্য হবে। [সিয়ারুস ছগির—ইমাম মুহাম্মদ রহ.]

**৩. ইদ্দতকাল অতিক্রমের পূর্বে যৌনসম্পর্ক স্থাপন নিষিদ্ধ**

দাসী ক্রয় করলেই বা বণ্টনকৃত যুদ্ধবন্দিনী লাভ করার সাথে সাথেই একজন মুসলিমের জন্য তার দাসীর সাথে যৌনসম্পর্ক স্থাপন বৈধ হয়ে যায় না বরং এক ইদ্দতকাল (একটি মাসিক ঋতুচক্র) গত হতে হয়। [এ নিয়ম সেসব দাসী-যুদ্ধবন্দিনীদের জন্য যারা গর্ভবতী নয়]

রুওয়াইফি ইবনে সাবিত আল আনসারি হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কি তোমাদেরকে বলব না রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে হুনাইনের দিনে যা বলতে শুনেছি– 'আল্লাহ তায়ালা ও শেষ দিবসে বিশ্বাসী ব্যক্তির জন্য বৈধ নয় অন্যের ফসলে পানি দেওয়া (অর্থাৎ কোনো গর্ভবতী নারীর সাথে সঙ্গম করা) এবং আল্লাহ তায়ালা ও শেষ দিবসে বিশ্বাসী ব্যক্তির জন্য বৈধ নয় কোনো যুদ্ধবন্দিনী নারীর সাথে সঙ্গম করা যতক্ষণ না এটা প্রতিষ্ঠিত হয় যে সে গর্ভবতী নয়। আল্লাহ তায়ালা ও শেষ দিবসে বিশ্বাসী ব্যক্তির জন্য বৈধ নয় বণ্টন হওয়ার আগে গণিমতের কোনো মাল বিক্রয় করা।'

[আবু দাউদ, হাদিস নং ২১৫৮]

**৪. গর্ভবতী দাসী/যুদ্ধবন্দিনীদের সাথে যৌনসম্পর্ক স্থাপন নিষিদ্ধ**

ক্রয়কৃত দাসী বা বণ্টনকৃত যুদ্ধবন্দিনী যদি গর্ভবতী হয়, তবে সন্তান প্রসবের আগে তার সাথে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন করা নিষিদ্ধ।

আবু সাঈদ আল খুদ্‌রি রাযি. আওতাসে ধৃত যুদ্ধবন্দিদের সম্পর্কে নবী ﷺ-এর নিম্নোক্ত হাদিসে বর্ণনা করেন– গর্ভবতী নারীর সাথে সঙ্গম করো না যাবৎ না সে সন্তান প্রসব করে এবং যে নারী গর্ভবতী নয় তার সাথে (সঙ্গম) করো না যাবৎ না তার একটি ঋতুচক্র সম্পন্ন হয়।

**৫. অন্যের বিবাহাধীন দাসীর সাথে যৌনসম্পর্ক স্থাপন নিষিদ্ধ**

যদি মুনিবের অনুমতিক্রমে কোনো দাসী অন্য কোনো পুরুষের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়, সেক্ষেত্রে মুনিবের জন্য উক্ত দাসীর সাথে দৈহিক সম্পর্ক তো বটেই এমনকি যৌনাঙ্গের দিকে দৃষ্টিপাত করাও নিষিদ্ধ হয়ে যায়।

আমর বিন সুহাইব তাঁর পিতার বরাতে তার দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন– যখন তোমাদের কেউ তার দাসের সাথে তার দাসীর বিবাহ দেয়, তার (দাসীর) গোপনাঙ্গের দিকে তাকানো তার (মুনিবের) জন্য উচিত নয়। [আবু দাউদ শরিফ হাদিস নং ৪১১৩]

**৬. নিজের যৌনদাসীর অন্য বোনের সাথে যৌনসম্পর্ক স্থাপন নিষিদ্ধ**

যদি সহোদর দুই বোন কোনো ব্যক্তির দাসী হিসেবে থাকে, মুনিব কোনো একজনের সাথে যৌনসম্পর্কে জড়িত থাকা অবস্থায় অন্যজনের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবে না।

ইমাম মালিক রহ. বলেন, যদি কোনো পুরুষ তার মালিকাধিন একজন দাসীর সাথে যৌনসম্পর্কে লিপ্ত থাকে, এরপর সে তার (দাসীর) বোনের সাথেও এ সম্পর্কে জড়িত হতে চায়, উক্ত বোন পুরুষটির জন্য হালাল নয় যতক্ষণ না (প্রথমোক্ত) দাসীর সাথে তার সহবাস হারাম হয়ে যায়– অন্য কারো সাথে বিবাহ দেওয়া, মুক্তকরণ, মুকাতাবা চুক্তি বা অনুরূপ কোনো ঘটনার দ্বারা। [মুয়াত্তা মালিক হাদিস নং ১১২৯]

**৭. অন্যের দাসীর সাথে বিবাহবহির্ভূত যৌনসম্পর্ক স্থাপন নিষিদ্ধ**

নিজের মালিকাধীন দাসী ব্যতীত অন্য কারো দাসীর সাথে (এমনকি নিজের স্ত্রীর দাসীর সাথেও) বিবাহবহির্ভূত যৌনসম্পর্ক নিষিদ্ধ। এটা ব্যভিচার বলেই পরিগণিত হবে।

**মনিবের যৌনসম্পর্ক অনুমোদনের যৌক্তিকতা**

মনে রাখবেন! ইসলাম দাসীর সাথে মনিবের যৌনসম্পর্কের সূত্রপাত করেনি বরং দাসপ্রথায় যেখানে দাসী যৌনপণ্যের মতো যার ইচ্ছে তার উপভোগের সামগ্রী ছিল, ইসলাম সেটাকে একজন মাত্র পুরুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ করেছে। সে পুরুষ হয়তো তার মুনিব কিংবা তাকে বিবাহকারী স্বামী। একজন দাসীর জন্য অন্য কোনো পুরুষকে বিবাহ করা হতে নিজ মনিবের সাথে যৌনসম্পর্ক রচনার যথেষ্ট সুবিধা রয়েছে– (১) দাসীর জৈবিক চাহিদা পূরণ নিশ্চিতকরণ। (২) দাসীর সামাজিক মর্যাদা ও মুক্তির সুযোগ। (৩) সন্তানের মুক্তি।

**(১) দাসীর জৈবিক চাহিদা পূরণ নিশ্চিতকরণ**

ইসলামে প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের যৌন চাহিদার স্বীকৃতি এবং তা পূরণের বৈধ ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। একইভাবে দাস-দাসীর যৌন চাহিদা পূরণের বৈধ ব্যবস্থাও ইসলামে থাকবে এটাই স্বাভাবিক। দাসীকে পতিতাবৃত্তিতে নিযুক্ত করার মতো ঘৃণ্য প্রথাকে ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে। নিজ

দাসীকে শিক্ষাদীক্ষা দিয়ে মুক্ত করে বিবাহ করতে উৎসাহিত করেছে। কিন্তু কোনো কারণে মনিব যদি দাসীকে মুক্ত করতে অপারগ হয়, সেক্ষেত্রে হয়তো তাকে নিজের সাথে জৈবিক বন্ধনে আবদ্ধ রাখবে (উপপত্নী হিসেবে) অথবা অন্য কারো বিবাহের অধীনে দিয়ে দিবে। অর্থাৎ যে কোনো অবস্থায় ক্রীতদাসীর জৈবিক চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। দাসীকে বিবাহ প্রদানের দ্বারাই যেখানে তার জৈবিক চাহিদা পূরণ সম্ভব ছিল, সেখানে মনিবের জন্য ক্রীতাদাসীর সাথে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপনের অধিকার বহাল রাখার যৌক্তিকতা কী ছিল? এ সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হলো।

### (২) দাসীর সামাজিক মর্যাদা ও মুক্তির সুযোগ

আমরা আগেই দেখে এসেছি, ইসলামে মনিবের সাথে যৌনসম্পর্ক স্থাপনকারী দাসী তথা উপপত্নী অনেকটাই তার স্ত্রী-সদৃশ। ইসলাম মনিবের সন্তান গর্ভে ধারণকারিণী দাসীর সামাজিক মর্যাদাকে নিশ্চিত করার পাশাপাশি ক্রমান্বয়ে তার মুক্তির একটি পথকেও উন্মুক্ত করেছে :

- ক্রীতাদাসী মুনিবের সন্তান গর্ভে ধারণ করার সাথে সাথে মুনিবের জন্য উক্ত দাসীকে বিক্রয় করা নিষিদ্ধ হয়ে যায়। ফলে উক্ত দাসী মনিবের পরিবারের স্থায়ী সদস্যে পরিণত হয়।
- দাসী মনিবের সন্তান প্রসব করলে (জীবিত অথবা মৃত) উক্ত দাসী 'উম্মে ওয়ালাদ' বা 'সন্তানের মা' হিসেবে অভিহিত হয়। সেই সন্তান মনিবের বৈধ, স্বাধীন সন্তান হিসেবে পরিগণিত হয় এবং পিতার সম্পত্তির ঠিক সে রকম উত্তরাধিকার পায়, যেরকম স্ত্রীর সন্তানরা পেয়ে থাকে।
- মুনিবের মৃত্যুর পর 'উম্মে ওয়ালাদ' দাসী মুক্ত হয়ে যায়।

### (৩) সন্তানের মুক্তি

দাসপ্রথা অনুসারে একজন মনিবের ক্রীতদাসীর সন্তান (যে উক্ত মনিবের ঔরসজাত নয়, দাসীর স্বামীর সন্তান) উক্ত মনিবের দাস হিসেবে গণ্য হয়। কিন্তু দাসীর সন্তান যদি মুনিবের ঔরসজাত হয়, তবে সে উক্ত মুনিবের সন্তান হিসেবে গণ্য হয়। ফলে সে সন্তান স্বাধীন ও পিতার সম্পত্তির ওয়ারিশ হয়।

দাসপ্রথায় পূর্বে দাসীর উপর অনিয়ন্ত্রিত যে যৌনাচারের সুযোগ ছিল, ইসলাম সেটাকে নিয়ন্ত্রিত ও মানবিক করে প্রচলিত উপবৈবাহিক বন্ধনের মাধ্যমে স্ত্রীর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, বৈধ ও মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানে এনে একদিকে দাসীর সন্তানকে মুক্ত, বৈধ ও পিতার সম্পত্তির উত্তারিধারী হওয়ার সুযোগ দিয়েছে, অপরদিকে দাসীকে দিয়েছে একটি পারবারিক ঠিকানা ও মুক্তির পথ। তথাপি সমালোচনা করাই যাদের লক্ষ্য তারা সমালোচনা করবেই, কিন্তু

চিন্তা ও উপলব্ধির দ্বার যারা এখনো বন্ধ করে নি, আশা করি এখান থেকে স্পর্শকাতর এ বিষয়টি সম্পর্কে তাদের অনেক ভুল ধারণারই অবসান ঘটবে ইনশাআল্লাহ।

**নাস্তিকের প্রশ্ন-৮ :** আল্লাহ তায়ালা কোথায় আছেন?

**আমাদের জবাব :** একটি ভুল ধারণাকে কেন্দ্র করে প্রশ্নটি করা হয়েছে। ধারণাটি হল–

আল্লাহ তায়ালাকে কোথাও না কোথাও থাকতে হবে। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা স্থান দ্বারা সীমাবদ্ধ। এ ধারণাটি নিতান্তই ভুল ও ভ্রান্ত। আল্লাহ তায়ালা স্থান ও কালের উর্ধ্বে। কারণ, স্থান ও কালে আবদ্ধ তো সসীম বস্তু কিংবা ব্যক্তি হতে পারে। আর আল্লাহ তায়ালা তো সসীম নন; তিনি অসীম। সুতরাং আল্লাহ তায়ালা কোনো স্থান কিংবা কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ নন। কোনো দিকের সাথে সীমাবদ্ধ নন।

**নাস্তিকের প্রশ্ন-৯ :** কুরআন প্রসঙ্গে

কুরআনের ঘোষণা হল—এটা যদি আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত অন্য কারো রচিত হত, তা হলে তাতে বৈপরিত্য দেখা যেত। (সূরা নিসা-৮২); কিন্তু কুরআনে প্রচুর আয়াত খুঁজে পাওয়া যায়, যেগুলোর একটার সাথে অন্যটার বৈপরিত্য রয়েছে। (যেমন : আন্‌কাবূত-৪৬ ও সূরা তওবা-২৯) এর মানে কি এটা নয় যে, কুরআন আসলে মুহাম্মাদেরই রচনা?

**আমাদের জবাব :** বাস্তবে কুরআনের আয়াতসমূহে কোনো ধরনের বৈপরিত্য নেই। অনেকের জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে বৈপরিত্য মনে হয়। এবার প্রশ্নে উল্লিখিত আয়াতগুলো দেখুন! প্রথম আয়াত—

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ۞

"এরা কি লক্ষ্য করে না কুরআনের প্রতি? এটা যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো পক্ষ থেকে হত, তবে এতে অবশ্যই বহু বৈপরিত্য দেখতে পেত।"

[সূরা নিসা-৮২]

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ۞

"তোমরা কিতাবধারীদের সাথে তর্ক-বিতর্ক করবে না, কিন্তু উত্তম পন্থায়; তবে তাদের সাথে নয়, যারা তাদের মধ্যে জালিম; আর বলো, আমাদের প্রতি এবং তোমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে, তাতে আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আমাদের উপাস্য ও তোমাদের উপাস্য একই এবং আমরা তাঁরই আজ্ঞাবহ।"

[সূরা আনকাবুত-৪৬]

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ۞

"তোমরা যুদ্ধ করো আহলে কিতাবের ওইসব লোকের সাথে, যারা আল্লাহ ও রোজ হাশরে ঈমান রাখে না, আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসূল যা হারাম করে দিয়েছেন তা হারাম করে না এবং গ্রহণ করে না সত্য ধর্ম—যতক্ষণ না তারা করজোড়ে জিযিয়া প্রদান করে।" [সূরা তওবা-২৯]

**দলিল বিশ্লেষণ :** দেখুন! প্রশ্নকারী এখানে একটি আয়াতকে অপ্রাসঙ্গিকভাবে আরেক আয়াতের সাথে গুলিয়ে ভুল খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছেন। একটি গল্পের এক পৃষ্ঠা থেকে হঠাৎ করে একটি বাক্য তুলে নিয়ে সেটাকে আরেক পৃষ্ঠার অন্য একটি গল্পের অপ্রাসঙ্গিক কোনো একটি বাক্যের সাথে তুলনা করা যেমনি হাস্যকর, তেমনি পবিত্র কুরআনের দু' জায়গা থেকে দু' প্রসঙ্গের দুটি আয়াত তুলে ধরে তুলনা করা তার চেয়ে অধিক হাস্যকর নয় কি?

আয়াতগুলোর অগ্র-পশ্চাতসহ পাঠ করলে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যায় যে, সূরা তওবার ২৯ নং আয়াতটি যুদ্ধ পরিস্থিতির (বদরের যুদ্ধ সময়কার) বিধান সংবলিত। আর সূরা আনকাবূতের ৪৬ নং আয়াতটি হলো স্বাভাবিক পরিস্থিতির বিধান সম্পর্কিত। আর এ কথা তো ছোট শিশুও বুঝে যে, কোনো দেশের যুদ্ধ পরিস্থিতির নিরাপত্তা বিধান আর স্বাভাবিক পরিস্থিতির নিরাপত্তা বিধান এক হয় না। এমন পার্থক্যের জন্য যদি কোনো সংবিধান অসামঞ্জস্য হয়ে যায়, তা হলে সামঞ্জস্য কোথায় পাওয়া যাবে?

আরো দেখুন! সূরা আনকাবূতের আয়াতে উত্তম কথা বলা থেকে জালিম লোকদেরকে বাদ দেওয়া হয়েছে। আর সূরা তওবার আয়াতে জালিমদের সাথে যুদ্ধ করতে বলা হয়েছে। এর চেয়ে সামঞ্জস্য আর কী হতে পারে। যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে না, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলে হারামকৃত জিনিসকে হারাম মনে করে না, তাঁদের হালালকৃত বস্তুকে হালাল মনে করে না এবং যারা সত্য ধর্মের অনুসরণ করে না, তাদের চেয়ে বেইনসাফ, নিমক হারাম ও তাদের চেয়ে জালিম আর কে হতে পারে?

এমন জালিমদেরকে জিযিয়া কর দিয়ে ইসলামি রাষ্ট্রে থাকতে দেওয়াটা ইসলামের মহা উদারতার পরিচয়। অন্য কোনো শাসন ব্যবস্থায় এর নজির পাওয়া যায়নি, যায় না, যাবেও না।

**নাস্তিকের প্রশ্ন-১০ :** কুরআনকে সহজ করা প্রসঙ্গে।

কুরআনের সূরা বাকারার প্রথম আয়াত 'আলিফ লাম মিম' অর্থ কি, কোনো মুসলিম জানে না; অথচ কুরআনে বারবার [وَلَقَدْ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ এবং يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ জাতীয় বাক্য এনে] বলা হয়েছে—কুরআন সহজভাবে নাযিল হয়েছে। যেন সবাই বুঝতে পারে। যেমন : সূরা বাকারা-৯৯, ১১৮, ১৮৭, ২১৯, ২২১, ২৪২ ও ২৬৬; সূরা আলে ইমরান-১০৩, ১৩৮; সূরা ইউসুফ-২, সূরা নূর-১৮, সূরা যুখরুফ-৩, সূরা কামার-৩২, ৪০, ২২ ও ১৭ ইত্যাদি। তাই কুরআনের আয়াতের মধ্যে কি বৈপরিত্য পাওয়া যাচ্ছে না?

**আমাদের জবাব :** কুরআনের কোনো আয়াতে কোনোপ্রকার অসামঞ্জস্য নেই। কারো কপাল মন্দ হলে তার মস্তিষ্ক উল্টে গিয়ে সবকিছুই উল্টা-পাল্টা দেখাতে থাকে।

**প্রথমে আয়াতগুলো লক্ষ্য করুন!**

الٓمٓ ۞

"আলিফ লাম মীম।" এর অর্থ আল্লাহই ভালো জানেন। [সূরা বাকারা-১]

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ ۞

"আমি আপনার প্রতি প্রকাশ্য নিদর্শনসমূহ অবতীর্ণ করেছি। অবাধ্যরা ব্যতীত কেউ এগুলো অস্বীকার করে না।" [সূরা বাকারা-৯৯]

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ۞

"যারা কিছু জানে না, তারা বলে—আল্লাহ তায়ালা আমাদের সঙ্গে কেন কথা বলেন না? অথবা আমাদের কাছে কোনো নিদর্শন কেন আসে না? এমনিভাবে তাদের পূর্বে যারা ছিল তারাও তাদেরই অনুরূপ কথা বলেছে। তাদের অন্তর একই রকম। নিশ্চয় আমি নিদর্শনসমূহ বর্ণনা করেছি তাদের জন্যে, যারা প্রত্যয়শীল।" [সূরা বাকারা-১১৮]

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۞

"রোযার রাতে তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস করা তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। তারা তোমাদের পরিচ্ছদ ও তোমরা তাদের পরিচ্ছদ। আল্লাহ তায়ালা অবগত আছেন যে, তোমরা আত্মপ্রতারণা করছিলে। সুতরাং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করেছেন এবং তোমাদের অব্যাহতি দিয়েছেন। এরপর তোমরা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস কর এবং যা কিছু তোমাদের জন্য আল্লাহ দান করেছেন, তা আহরণ কর। আর পানাহার কর যতক্ষণ না কালো রেখা থেকে ভোরের শুভ্র রেখা পরিষ্কার দেখা যায়। এরপর রোযা পূর্ণ করো রাত পর্যন্ত। আর যতক্ষণ তোমরা এ'তেকাফ অবস্থায় মসজিদে অবস্থান কর, ততক্ষণ পর্যন্ত স্ত্রীদের সাথে মেলমেশা করো না। এটা হলো আল্লাহ কর্তৃক বেঁধে দেওয়া সীমানা। কাজেই এর কাছেও যেও না। এমনিভাবে আল্লাহ তার নিদর্শনসমূহ মানুষের জন্য বর্ণনা করেন, যাতে তারা বাঁচতে পারে।" [সূরা বাকারা-১৮৭]

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ۞

"তারা আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলে দিন, এতদুভয়ের মধ্যে রয়েছে মহাপাপ আর মানুষের জন্য উপকারিতাও আছে। তবে এগুলোর পাপ উপকারিতা অপেক্ষা অনেক বড়। আর আপনার কাছে জিজ্ঞাসা করে, কি তারা ব্যয় করবে? বলে দিন, নিজেদের প্রয়োজনীয় ব্যয়ের পর যা বাঁচবে তাই খরচ করবে। এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য নিদর্শনসমূহ স্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন। যাতে তোমরা চিন্তা করতে পার।" [সূরা বাকারা-২১৯]

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۞

"আর তোমরা মুশরিক নারীদেরকে বিয়ে করো না, যতক্ষণ না তারা ঈমান গ্রহণ করে। অবশ্য মুসলমান ক্রীতদাসী মুশরিক নারী অপেক্ষা উত্তম, যদিও তাদেরকে তোমাদের কাছে ভালো লাগে। এবং তোমরা (নারীরা) কোনো মুশরিকের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ো না, যে পর্যন্ত সে ঈমান

না আনে। একজন মুসলমান ক্রীতদাসও একজন মুশরিকের তুলনায় ঢের ভালো, যদিও সে তোমাদের বিমুগ্ধ করে। তারা জাহান্নামের দিকে আহ্বান করে আর আল্লাহ নিজের হুকুমের মাধ্যমে আহ্বান করেন জান্নাত ও ক্ষমার দিকে। আর তিনি মানুষকে নিজের নির্দেশ বাতলে দেন। যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।" [সূরা বাকারা-২২১]

كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ آيَاتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ۞

"এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য স্বীয় নিদর্শনসমূহ বর্ণনা করেন। যাতে তোমরা তা বুঝতে পার।" [সূরা বাকারা-২৪২]

أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُوْنَ لَهٗ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهٗ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهٗ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيْهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ ۞

"তোমাদের কেউ পছন্দ করে যে, তার একটি খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান হবে, এর তলদেশ দিয়ে নহর প্রবাহিত হবে আর এতে সর্বপ্রকার ফলমূল থাকবে এবং সে বার্ধক্যে পৌঁছবে, তার দুর্বল সন্তান-সন্ততিও থাকবে, এমতাবস্থায় এ বাগানের একটি ঘূর্ণিবায়ু আসবে, যাতে আগুন রয়েছে, অনন্তর বাগানটি ভস্মীভূত হয়ে যাবে? এমনিভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য নিদর্শনসমূহ বর্ণনা করেন। যাতে তোমরা চিন্তা-ভাবনা কর।" [সূরা বাকারা-২৬৬]

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَلَا تَفَرَّقُوْا وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ آيَاتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ۞

"আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ় হস্তে ধারণ কর; পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। আর স্মরণ করো সে নেয়ামতের কথা, যা আল্লাহ তোমাদের দান করেছেন। তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে। এরপর আল্লাহ তোমাদের হৃদয়-মনে সম্প্রীতি দান করেছেন। ফলে এখন তোমরা তাঁর অনুগ্রহে পরস্পর ভাই ভাই হয়েছ। তোমরা এক অগ্নিকুণ্ডের পাড়ে অবস্থান করছিলে। এরপর তা থেকে তিনি তোমাদেরকে মুক্তি দিয়েছেন। এভাবেই আল্লাহ নিজের নিদর্শনসমূহ প্রকাশ করেন, যাতে তোমরা হেদায়াতপ্রাপ্ত হতে পার।" [সূরা আলে ইমরান-১০৩]

هٰذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِيْنَ ۞

"এটা হল মানুষের জন্য বর্ণনা এবং যারা ভয় করে তাদের জন্য হেদায়াত ও উপদেশ বাণী।" [সূরা আলে ইমরান-১৩৮]

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۞

"আমি একে আরবি ভাষায় কুরআন হিসেবে অবতীর্ণ করেছি। যাতে তোমরা বুঝতে পার।" [সূরা ইউসুফ-২]

إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۞

"আমি একে করেছি আরবি ভাষায় কুরআন, যাতে তোমরা বুঝ।" [সূরা যুখরুফ-৩]

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ۞

"আমি কুরআনকে বোঝার জন্য সহজ করে দিয়েছি। সুতরাং আছে কি কোনো চিন্তাশীল?" [সূরা কামার-৩২, ৪০, ২২, ১৭]

وَيُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞

"আল্লাহ তোমাদের জন্য নিদর্শনসমূহ স্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।" [সূরা নূর-১৮]

এবার আসুন কুরআনকে সহজ করার প্রসঙ্গে। তাফ্সিরবিদগণ অনেক আগেই এর সমাধান দিয়েছেন যে, সহজ করার অর্থ হলো আল্লাহ তায়ালা এ কুরআন তিলাওয়াত ও হিফজ করার জন্য সহজ করে দিয়েছেন।

**প্রশ্নের জবাব শুনুন!**

এবার আমরা প্রশ্ন প্রসঙ্গে মুফাস্সিরদের জবাব তুলে ধরব–

(১) তারা প্রথমত সূরা বাকারার ১ নং আয়াত الٓمٓ পেশ করেছেন। এর সঠিক অর্থ আল্লাহই ভালো জানেন। বাকি এ আয়াত প্রসঙ্গে তাফ্সিরবিদগণ অনেক দীর্ঘ আলোচনা করেছেন, যা এখানে বর্ণনা করা সম্ভব নয়। সামান্য কয়েকটি কথা আলোচনা করা হচ্ছে। আশা করি, এটুকুই পাঠকের জন্য যথেষ্ট হবে।

ইমাম কুরতুবি রহ. এ আয়াতের তাফ্সিরে আমের শা'বী ও সুফিয়ান ছাওরি রহ. প্রমুখ একদল মুহাদ্দিসের সূত্রে বর্ণনা করেন–

هِيَ سِرُّ اللهِ فِي الْقُرْآنِ، وَللهِ فِي كُلِّ كِتَابٍ مِنْ كُتُبِهِ سِرٌّ. فَهِيَ مِنَ الْمُتَشَابِهِ الَّذِي انْفَرَدَ اللهُ تَعَالَى بِعِلْمِهِ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَكَلَّمَ فِيهَا، وَلَكِنْ نُؤْمِنُ بِهَا وَنَقْرَأُ كَمَا جَاءَتْ. وَرُوِيَ هٰذَا الْقَوْلُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. وَذَكَرَ أَبُو اللَّيْثِ السَّمَرْقَنْدِيُّ عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُمْ قَالُوا: الْحُرُوفُ الْمُقَطَّعَةُ مِنَ الْمَكْتُومِ الَّذِي لَا يُفَسَّرُ.

অর্থাৎ, এসব কুরআনের মাঝে আল্লাহর একান্ত বিষয়। তাই এসব মুতাশাবিহ-এর অন্তর্ভুক্ত। এগুলো কেবল আল্লাহ তায়ালাই জানেন। এগুলো প্রসঙ্গে কথা বলা জায়েয নেই। তবে আমরা এগুলোতে ঈমান রাখি এবং যেভাবে এসেছে, সেভাবে তিলাওয়াত করি। এ কথাটি হযরত আবু বকর ছিদ্দিক, হযরত আলী রাযি. হতে বর্ণিত হয়েছে। আবুল লাইস সমরকান্দি রহ. হযরত উমর রাযি., হযরত উসমান রাযি. ও হযরত ইবনে মাসউদ রাযি. হতে বর্ণনা করেছেন, তাঁরা বলেন– হরুফে মুকাত্তায়াতগুলো (الٓمٓ ইত্যাদি) এমন গোপনীয় বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত, যেগুলোর ব্যাখ্যা করা যায় না। [তাফসিরে কুরতুবি]

সুতরাং আমাদের জন্যও এখানে নাক গলানোর কোনো বৈধতা নেই। যেভাবে আছে, সেভাবে আমাদের তিলাওয়াত করতে হবে এবং বিশ্বাস করতে হবে, এগুলো কুরআনের অংশ।

(২) এবার কুরআন সহজ করার যে বিষয়টি এ আয়াতের সাথে সাংঘর্ষিক, সে বিষয়ে শুনুন। সুতরাং আল্লামা বগ্‌বি রহ. সাঈদ ইবনে জুবাইর রহ.-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, يَسَّرْنَاهُ لِلْحِفْظِ وَالْقِرَاءَةِ অর্থাৎ আমি এ কুরআনকে হিফজ ও তিলাওয়াতের জন্য সহজ করেছি। [তাফ্‌সিরে বগ্‌বি]

আর আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ূতি রহ. বলেন–

"وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ" سَهَّلْنَاهُ لِلْحِفْظِ وَهَيَّأْنَاهُ لِلتَّذَكُّرِ "فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ" مُتَّعِظٍ بِهِ وَحَافِظٍ لَهُ وَالِاسْتِفْهَامُ بِمَعْنَى الْأَمْرِ أَيْ احْفَظُوهُ وَاتَّعِظُوا بِهِ وَلَيْسَ يُحْفَظُ مِنْ كُتُبِ اللهِ عَنْ ظَهْرِ الْقَلْبِ غَيْرُهُ.

আর নিশ্চয় কুরআনকে আমি সহজ করেছি স্মরণের জন্য অর্থাৎ কুরআনকে হিফজ ও নসিহতের জন্য সহজ করেছি। সুতরাং নসিহতকারী ও হিফজকারী কি কেউ আছে? এখানে প্রশ্ন করা হয়েছে নির্দেশ হিসেবে। অর্থাৎ তোমরা এ কুরআন হিফজ করো এবং নসিহত করো। আর এ কুরআন ছাড়া আর কোনো গ্রন্থ অর্থ না বুঝে মুখস্থ হয় না। [তাফ্‌সিরে জালালাইন]

সুতরাং আর কোনো বৈপরিত্য রইল না। কারণ সূরা বাকারার প্রথম আয়াতটি তিলাওয়াত করা কিংবা মুখস্থ করে নেওয়া আস্তিক-নাস্তিক কারো জন্য কঠিন নয়। আর এ আয়াতের মাধ্যমে আমরা সহজে এ নসিহত হাসিল করতে পারি যে, এটা আল্লাহ তায়ালার একান্ত বিষয়। এ ছাড়া বাকি আয়াতগুলো দিয়ে যে ধরনের নসিহত কুরআন দাতা আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্য, সে নসিহতও অতি সহজ। আশা করি, সকলের জন্য বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেছে।

(৩) প্রশ্নকারীর পেশকৃত অন্যান্য আয়াতসমূহে ঔঁ শব্দের অর্থ নিদর্শন সমূহ। এগুলো বর্ণনা করার দ্বারা কুরআন মাজিদের হরূফে মুকাত্তায়াতগুলো ( ঔঁ ইত্যাদি)-ও বর্ণনা করেছেন—এ দাবি কোনো জ্ঞানীজন করতে পারে না।

(৪) বাকি সূরা ইউসুফ-২ ও সূরা যুখরুফ-৩ আয়াতদ্বয়ের তাফ্সিরে আল্লামা কুরতুবি রহ. বলেন– যাতে তোমরা বুঝতে পার অর্থাৎ এ কুরআন বুঝতে পার। আল্লাহ তায়ালা আমাদের বুঝার তাওফিক দান করুন। আমিন!

**নাস্তিকের প্রশ্ন-১১ :** আল্লাহ তায়ালা কি সর্বত্র বিরাজমান?

সূরা বাকারার ১১৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে—'পূর্ব-পশ্চিম সর্বত্রই আল্লাহ তায়ালা বিদ্যমান। যেদিকেই তোমরা মুখ ফিরাও না কেন, সেদিকেই আল্লাহ তায়ালার উপস্থিতি আছে। আল্লাহ তায়ালা সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ'।

আবার এ সূরার ১৪৪ নং আয়াতেই বলা হয়েছে- 'তোমাকে এমন কিবলার দিকে ফিরিয়ে দিচ্ছি, যা তোমাকে সন্তুষ্ট করবে। তাই তুমি মসজিদে হারামের দিকে মুখ ফিরাও। তোমরা যেখানেই থাক না কেন, তার দিকে মুখ করো'।

উক্ত আয়াত দুটি সাংঘর্ষিক। কেননা ১১৫নং আয়াতে আল্লাহ পাক যে কোনো দিকে ফিরে নামাজ পড়ার অনুমতি দিয়েছিলেন; কিন্তু তিনি ১৪৪ নং আয়াত নাযিল করে শুধু মসজিদুল হারামের দিকে ফিরে নামাজ পড়তে বলেছেন।

**আমাদের জবাব :** আল্লাহ তায়ালা সর্বত্র বিরাজমান। সুতরাং তিনি মসজিদুল হারামের দিকেও বিরাজমান। মসজিদুল হারামের দিকে ফিরে নামায পড়লেও তাঁর দিকে ফিরেই নামায পড়া হয়। তবে আল্লাহ তায়ালা তাঁর কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যের কারণে বান্দাকে মসজিদুল হারামের দিকে ফিরে নামায পড়তে বলেছেন। আল্লাহ তায়ালার এসব নির্দেশ নিয়ে মাথা ঘামানোর অধিকার কোনো নাস্তিক কিংবা আল্লাহ তায়ালার কোনো নাফরমানের নেই। যারা সর্বদা নামায পড়ে, তারাও কোনো দিন এ নিয়ে প্রশ্ন তোলে নি; যারা নামায বিশ্বাসই করে না, তাদের এসব নিয়ে মাথা ঘামানো আমাদেরকে অবাকই করে। সুস্পষ্টত বোঝা যায়, এদের হিতাহিত জ্ঞান নেই। এরা ইবলিস ও তার দোসরদের ক্রীড়ানক ছাড়া আর কিছু নয়। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে হেফাজত করুন। আমিন!

**নাস্তিকের প্রশ্ন-১২ :** মানুষ কিসের তৈরি?

কুরআনের বিভিন্ন স্থানে মানুষ সৃষ্টির নানা উপাদান বর্ণিত হয়েছে। যেমন–

**আলাকা :** "পাঠ করুন আপনার পালনকর্তার নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে।" [সূরা আলাক : ১-২]

**পানি :** I made from water every living thing। সুতরাং ইরশাদ হচ্ছে, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ অর্থাৎ আর প্রাণবন্ত সবকিছু আমি পানি থেকে সৃষ্টি করেছি। (সূরা আম্বিয়া-৩০) অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে, وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا অর্থাৎ "তিনিই পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন মানবকে। এরপর তাকে রক্তগত বংশ ও বৈবাহিক সম্পর্কশীল করেছেন। তোমার পালনকর্তা সবকিছু করতে সক্ষম।" [সূরা ফুরকান-৫৪]

**ঠনঠনে মাটি থেকে :** I created man from sounding clay, from mud moulded into shape। সুতরাং ইরশাদ হচ্ছে, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ অর্থাৎ আর আমি মানবকে পচা কর্দম থেকে তৈরি বিশুষ্ক ঠনঠনে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছি। [সূরা হিজ্‌র-২৬]

**স্খলিত বীর্য :** ইরশাদ হচ্ছে, خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ অর্থাৎ তিনি মানবকে এক ফোটা বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছেন। এতদসত্ত্বেও সে প্রকাশ্য বিতর্ককারী হয়ে গেছে। (সূরা নাহল-৪) أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى অর্থাৎ সে কি স্খলিত বীর্য ছিল না? [সূরা কিয়ামাহ-৩৭]

**শূন্য থেকে :** ইরশাদ হয়েছে, أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا অর্থাৎ মানুষ কি স্মরণ করে না যে, আমি তাকে ইতোপূর্বে সৃষ্টি করেছি এবং সে তখন কিছুই ছিল না। [সূরা মরিয়ম-৬৭]

সুতরাং মানুষ তা হলে কিসের তৈরি?

**আমাদের জবাব :** এ জিনিসগুলোকে নাস্তিক গোষ্ঠী অসামঞ্জস্য হিসেবে দেখাতে চায়। অথচ আসলে অসামঞ্জস্য সেই জিনিস, যা একটি হলে আরেকটি হওয়া সম্ভব নয়। ধরুন! কাউকে আমি বললাম, 'রফিক সাহেব লোকটি লম্বা'। অন্যজনকে গিয়ে বললাম, 'রফিক সাহেব লোকটি বেটে'। তা হলে এ বিষয়টি অসামঞ্জস্যপূর্ণ (Contradictory)। কারণ, কেউ কখনো একই সাথে লম্বা এবং বেটে হতে পারে না। কিন্তু আমি বললাম, 'রফিক সাহেব লম্বা'; আবার বলালম, 'রফিক সাহেব মোটা', তা হলে এ কথাটি অসামঞ্জস্যপূর্ণ (Contradictory) নয়। কেননা একটি লোক একই সাথে লম্বা ও মোটা হতে পারে।

এভাবে কেউ বলল, আইসক্রীম পানি দিয়ে তৈরি হয়। আবার কেউ বলল, বরফ দিয়ে আইসক্রীম তৈরি হয়। এখন কেউ যদি 'বিষয়টা অসামঞ্জস্যপূর্ণ' বলে, তা হলে তার সম্পর্কে আপনি কী সিদ্ধান্ত দিবেন একবার চিন্তা করুন!

এবার যুক্তি বিদ্যার নিরিখে দেখুন! মানুষ বীর্য থেকে সৃষ্টি হয়েছে আর বীর্য রক্ত থেকে সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং মানুষ রক্ত থেকে সৃষ্টি হয়েছে। মানুষ রক্ত থেকে সৃষ্টি হয়েছে আর রক্ত পানি ও মাটি থেকে সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং মানুষ পানি ও মাটি হতে সৃষ্টি হয়েছে। আর পানি ও মাটি শূন্য থেকে সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং মানুষ শূন্য থেকে সৃষ্টি হয়েছে।

এবার বিজ্ঞানের নিরিখে লক্ষ্য করুন! আধুনিক বিজ্ঞান বলে দেয়, আমাদের শরীরকোষের সাইটোপ্লাজমের ৮০% পানি। আবার আধুনিক বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে, একটি জীবন্ত টিস্যু ৯৫% কার্বন, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও সালফারসহ ২৬ ধরনের উপাদান বহন করে। এ উপাদানগুলো মাটিরই উপাদান।

সুতরাং এ কথা আবারো প্রমাণিত হল যে, কুরআনে কোনো ধরনের বৈপরিত্য নেই। কুরআন একমাত্র আল্লাহ তায়ালার বাণী। কারো কপাল ভালো হলে সে বুঝতে পারবে; পক্ষান্তরে পোড়াকপাল হলে সে পথভ্রষ্ট হবে। কুরআন কিংবা কুরআন নাযিলকারীর কোনো ক্ষতি হবে না। বরং অবিশ্বাসীরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আল্লাহ তায়ালা আমাদের হেফাজত করুন। আমিন!

**নাস্তিকের প্রশ্ন-১৩ :** মানব সৃষ্টির মূল উপাদান প্রসঙ্গে

কুরআন কোথাও বলেছে, মানুষের সৃষ্টি মাটি থেকে, কোথাও বলেছে ঠনঠনে মাটি থেকে, কোথাও বলেছে কাদামাটি থেকে, বিষয়টা আসলে কী?

**আমাদের জবাব :** যখন মাটি বা ধুলোতে পানি দেওয়া হয় তখন সেটা কাদায় পরিণত হয়, আর সে কাদাকে রোদে রেখে দিলে এটা শুষ্ক মাটিতে পরিণত হয়ে যাবে। সুতরাং তথ্যগুলোর মধ্যে কোনো বৈপরিত্য নেই।

ধরুন আমি পাউরুটি খাচ্ছি। একজন এসে বলল— আপনি যা খাচ্ছেন, এটা খামির থেকে তৈরি। আরেকজন বলল– আপনি যা খাচ্ছেন, তা ময়দা থেকে তৈরি। আরেকজন বলল– আপনি যা খাচ্ছেন, তা গম থেকে তৈরি। এখানে কেউ কি অসত্য কথা বলেছে? আদৌ নয়। মাটি, কাদামাটি, ঠনঠনে মাটির বিষয়টিও ঠিক তা-ই।

এ ধরনের শিশুসূলভ অনেক প্রশ্নই নাস্তিকরা আল্লাহ তায়ালা, পরকাল, ধর্ম ও কুরআন সম্পর্কে করে থাকে যেগুলোর অনেকগুলোই জবাব পাওয়ার অধিকার রাখে না। আর যৌক্তিক সবগুলো প্রশ্নেরই যৌক্তিক ও অকাট্য জবাব রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে রক্ষা করে হেদায়াতের পথে অবিচল রাখুন। আমিন!

**নাস্তিকের প্রশ্ন-১৪ :** আকাশ জমিন সৃষ্টিতে ছয়দিন লাগার কারণ কী?

সূরা বাকারার ১১৭ নং আয়াত অনুযায়ী আল্লাহ যখন কোনো কার্য সম্পাদনের সিদ্ধান্ত নেন, তখন তিনি শুধু বলেন—'হয়ে যাও' আর তৎক্ষণাৎ তা হয়ে যায়। তা হলে আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টিতে তাঁর ৬ দিন (period) লাগল কেন? (যেমন– সূরা আ'রাফ-৫৪; সূরা ইউনুস-৩; সূরা হূদ-৭; সূরা ফুরকান-৫৯; সূরা সাজ্‌দা-৪; সূরা কাফ-৩৮; সূরা হাদিদ-৪) এখানে কি আল্লাহ তায়ালার কাজে ও কথায় কন্ট্রাডিকশন দেখা যাচ্ছে না?

**আমাদের জবাব :** আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টিতে তাঁর ছয় দিন লাগে নি, আকাশ ও পৃথিবীর লেগেছে ছয় দিন/ পর্যায়। এ ছয় দিন/ পর্যায় মানুষের perception অনুসারে। আল্লাহ তায়ালার কাছে কোনো সময় নেই। তিনি সময়ের বাইরে। যখন কোনো সত্তা সময়ের বাইরে চলে যায়, সময়ের সংজ্ঞা অনুসারে সেই সত্তা একই সাথে, একই মুহূর্তে পুরো সময়টা দেখতে পায়। সুতরাং তাঁর নির্দেশগুলো আসে এক 'মুহূর্তে', সময়ের 'বাইরে' থেকে এবং সেই নির্দেশগুলো সৃষ্টি জগতের মধ্যে কার্যকর হয় সৃষ্টি জগতের নিয়ম-শৃঙ্খলা অনুসরণ করে। Space and Time হচ্ছে সৃষ্টি জগতের অত্যাবশ্যকীয় উপাদান।

সহজ বাংলায় বলি—আল্লাহ তায়ালা যখন কোনো কিছু সৃষ্টি করতে চান, তখন তিনি শুধু 'হও' বলেন। অমনি সেটা হয়ে যায়। তাঁর মানে এটা নয় যে, তিনি 'হও' বলেন আর তা মানুষ যেভাবে সময়কে দেখতে পায়, সে সময় অনুসারে তৎক্ষণাৎ হয়ে যায়। বরং আল্লাহ তায়ালা যদি কখনো তাঁর কিছু করতে সময় লাগে বলতেন, তা হলে সেটা বিরাট ভুল হত। কারণ, সময়ের স্রষ্টার 'নিজে' কিছু করতে সময় লাগা নেহাৎ অবাস্তব।

**নাস্তিকের প্রশ্ন-১৫ :** কুরআন মাজিদ প্রসঙ্গে

কুরআন যে বাস্তবে আল্লাহ তায়ালার বাণী নয়, তার সুস্পষ্ট স্বীকৃতি তো খোদ কুরআনেই রয়েছে। কুরআন বলেছে—

১। 'নিশ্চয় এ কুরআন একজন সম্মানিত রাসূলের বাণী'। [সূরা হাক্কা-৪০]

২। 'নিশ্চয় কুরআন সম্মানিত রাসূলের বাণী'। [সূরা তাকবির-১৯]

**আমাদের জবাব :** এ প্রশ্নের জবাব ইমাম কুরতুবি রহ. ৬৫০ হিজরিতেই দিয়ে গেছেন। সুতরাং তিনি বলেন,

وَنَسَبُ الْقَوْلِ إِلَى الرَّسُوْلِ، لِأَنَّهُ تَالِيْهِ وَمُبَلِّغُهُ وَالْعَامِلُ بِهِ، كَقَوْلِنَا: هٰذَا قَوْلُ مَالِكٍ.

আর 'বাণী'কে রাসূলের প্রতি সম্বন্ধ করা হয়েছে। কেননা তিনি তা আমাদের সম্মুখে পাঠ করেছেন, আমাদের পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন এবং কাজে বাস্তবায়ন করেছেন। যেমনি বলা হয়, 'এটা মালিক রহ.-এর কথা'।

[তাফ্সিরে কুরতুবি]

এর নজির বর্তমানেও রয়েছে। যেমন বলা হয়, 'এটা ডিসি সাহেবের বার্তা'। যদিও বার্তাটি তিনি সরকারের পক্ষ থেকে জনগণের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন।

বিশিষ্ট তাফ্সির বিশারদ আল্লামা ইবনে কাছির রহ. বলেন–

فَأَضَافَهُ تَارَةً إِلَى قَوْلِ الرَّسُوْلِ الْمَلَكِيِّ، وَتَارَةً إِلَى الرَّسُوْلِ الْبَشَرِيِّ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مُبَلِّغٌ عَنِ اللهِ مَا اسْتَأْمَنَهُ عَلَيْهِ مِنْ وَحْيِهِ وَكَلَامِهِ؛ وَلِهٰذَا قَالَ: "تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ".

'আল্লাহ তায়ালা এ কুরআনকে একবার সম্পৃক্ত করেছেন ফিরিশতা জাতীয় দূত (হযরত জিবরাঈল আ.)-এর দিকে, আরেকবার সম্পৃক্ত করেছেন, মানব জাতির দূত (হযরত মুহাম্মদ ﷺ)-এর দিকে। কেননা তাঁরা উভয়েই আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে ঘোষক। যার উপর আল্লাহ তায়ালা তাঁদেরকে বিশ্বাস করেছেন। এজন্যই আল্লাহ তায়ালা বলেছেন– تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। [তাফ্সিরে ইবনে কাছির]

আল্লামা জালালুদ্দিন মহল্লি রহ. এ আয়াতের তাফ্সির করেছেন–

"إِنَّهُ" أَيِ الْقُرْآنَ "لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيمٍ" أَيْ قَالَهُ رِسَالَةً عَنِ اللهِ تَعَالَى

এ কুরআন সম্মানিত রাসূলের বাণী তথা রাসূলুল্লাহ ﷺ এটা মহান আল্লাহর তায়ালার পক্ষ থেকে বলেছেন। [তাফ্সিরে জালালাইন]

তদ্রুপ যাবতীয় খোঁড়া যুক্তির জবাব মুসলিম বিজ্ঞানীগণ জায়গায় জায়গায় বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁদের উত্তম বদলা দান করুন!

**নাস্তিকের প্রশ্ন-১৬ :** সূরা ফাতিহা প্রসঙ্গে

সূরা ফাতিহার আয়াতগুলো দ্বারা মুহাম্মদ ﷺ কর্তৃক আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করাই বোধগম্য হয়। তা হলে কুরআন কিভাবে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে প্রেরিত বাণী হতে পারে?

**আমাদের জবাব :** সূরা ফাতিহার মধ্যে মুহাম্মদ ﷺ কর্তৃক আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা পেলেন কোথায়? আয়াতগুলোর কোথাও কি বলা হয়েছে—'আমি মুহাম্মদ বলছি, সকল প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার। আমি মুহাম্মদ বলছি, তিনি পরম করুণাময়, নিরন্তর করুণাময় ... ?' বরং আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে শিখিয়ে দিয়েছেন কিভাবে তাঁকে ডাকতে হবে।

আমরা যদি চিন্তা করে বের করতাম, তা হলে কিছু হাস্যকর কথাবার্তা বের করতাম। তা না করে আল্লাহ তায়ালাই আমাদের দেখিয়ে দিয়েছেন, কিভাবে তাঁকে ডাকতে হবে, কিভাবে তাঁর প্রশংসা করতে হবে? যেমন—

অবুঝ শিশুকে তার পিতামাতা শিখিয়ে দেয়, বাবাকে কিভাবে ডাকতে হবে? মাকে কিভাবে ডাকতে হবে? দাদাকে কিভাবে ডাকতে হবে? পরবর্তীসময়ে শিশু তার পিতা-মাতার কথাগুলোই পুনরাবৃত্তি করতে থাকে। কথাগুলো কিন্তু পিতা-মাতারই কথা। আশা করি, নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন।

**নাস্তিকের প্রশ্ন-১৭ :** কুরআনে আল্লাহ তায়ালা শপথ করেন কেন?

কোনো কথা আস্থাযোগ্য না হলেই মানুষ শপথ করে। তা হলে কেন আল্লাহ তায়ালাকে কুরআনে এতবার কসম কাটতে হল?

**আমাদের জবাব :** কসম করা হয় সাধারণত শ্রোতা ও পাঠকের বিশ্বাসের দুর্বলতার বিবেচনায়; বক্তার বা লেখকের গ্রহণযোগ্যতার দুর্বলতা বিবেচনায় নয়। তবে কারো কাছে কসম চাওয়া হলে সেক্ষেত্রে কসমটা কসমকারীর গ্রহণযোগ্যতার দুর্বলতার কারণে তার কাছে কসম চাওয়া হয়ে থাকে।

এখানে প্রশ্নকারী অজ্ঞতাবশত 'বক্তা বা লেখক কর্তৃক স্বপ্রণোধিত হয়ে কসম করা' এবং 'আদালত কর্তৃক কসম চাওয়ার পর বাধ্য হয়ে কসম করা'-এর অর্থকে গুলিয়ে ফেলেছেন। বিধায় আল্লাহ তায়ালার কসম করার বিষয়টি তিনি বুঝতে পারেননি। আল্লাহ তায়ালা আমাদের রক্ষা করুন। আমিন!

**নাস্তিকের প্রশ্ন-১৮ :** একেক সম্প্রদায়ের একেকজন রাসূল?

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে,

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ۞

"আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি এ মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাগুত থেকে নিরাপদ থাকো। এরপর তাদের মধ্যে কতককে আল্লাহ হেদায়াত দান করেছেন আর তাদের মধ্যে কতকের জন্য বিপথগামিতা অবধারিত হয়ে গেল। সুতরাং তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ করো এবং দেখো মিথ্যারোপকারীদের কিরূপ পরিণতি হয়েছে।" [সূরা নাহল-৩৬]

وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ❖ [فاطر: ٢٤]

'এমন কোনো সম্প্রদায় নেই যাতে সতর্ককারী আসেনি।' [সূরা ফাতির-২]

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ❖ [يونس: ٤٧]

"আর প্রত্যেক সম্প্রদায়ের একেকজন রাসূল রয়েছে। যখন তাদের কাছে তাদের রাসূল আসল, তখন ন্যায়ের সাথে মীমাংসা হয়ে গেল, এমতাবস্থায় যে তাদের উপর জুলুম হয় না।" [সূরা ইউনুস-৪৭]

আল্লাহ তায়ালা কুরআনে যে বলেছেন, তিনি সকল জাতির কাছে নবী প্রেরণ করেছেন, তা হলে বাঙালিদের কাছে আসা নবীর নাম কী? তিনি কবে এবং কোথায় এসেছিলেন?

**আমাদের জবাব :** আমাদের বাংলাদেশের বয়স মাত্র ৪৮ বছর। আর রাসূল আগমনের ক্রমধারা তো বন্ধ হয়ে গেছে সেই চৌদ্দশত বছর পূর্বে; শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ-কে প্রেরণের মাধ্যমে।

আল্লাহ পাক বলেন–

وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. [البقرة: ٨٧]

"নিশ্চয় আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছি। পবিত্র রূহের মাধ্যমে তাকে শক্তিদান করেছি। এরপর যখনই কোনো রাসূল এমন নির্দেশ নিয়ে তোমাদের কাছে এসেছে, যা তোমাদের মনঃপূত হয়নি, তখনই তোমরা অহংকার করেছ। এরপর তোমরা একদলকে মিথ্যাবাদী বলেছ ও একদলকে হত্যা করেছ।" [সূরা বাকারা-৮৭]

কুরআন মাজিদে আরো ইরশাদ হয়েছে—এমন অনেক নবী-রাসূল আছেন, যাঁদের বৃত্তান্ত কুরআনে বলা হয় নি। যেমন, ইরশাদ হচ্ছে :

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ.

"আর নিশ্চয় আমি প্রেরণ করেছি আপনার পূর্বে অনেক রাসূল। তাঁদের মধ্যে কতক এমন আছেন, যাঁর বিবরণ আমি আপনার কাছে দিয়েছি; আর কতক এমন আছেন, যাঁর বর্ণনা আমি আপনার নিকট দেইনি।"

[সূরা হামীম-৭৮]

**নাস্তিকের প্রশ্ন-১৯ :** কুরআন কি জঙ্গিবাদে উসকানি দেয় না?

কুরআনে বলা হয়েছে,

وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ. [البقرة: ١٩١]

"আর তোমরা তাদেরকে হত্যা করো যেখানেই পাও!" [সূরা বাকারা-১৯১]

তা হলে কুরআন কি জঙ্গিবাদের উসকানি দেয় না?

**আমাদের জবাব :** ইসলামকে বর্বর ও নিষ্ঠুরভাবে দেখাতে কুরআনের পূর্ণ আয়াতের এ ভগ্নাংশটি বহু ইসলাম বিরোধী প্রকাশনা ও প্রচারণায় অসংখ্যবার ব্যবহৃত হয়েছে। তারা কখনো পূর্ণ আয়াত বা আয়াতের প্রেক্ষাপট উম্মতের সামনে স্পষ্ট করে বলে না। এটা তাদের এক ধরণের তথ্যসন্ত্রাস বলতে হবে। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে তাদের তথ্যসন্ত্রাস থেকে হেফাজত করুন। আমিন!

ইসলাম বরং জায়গায় জায়গায় হত্যা ও লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে এত বেশি উপদেশ দিয়েছে, অন্য কোনো মতে কিংবা অন্য কোনো দলে এমনটি দেখা যায় না।

পবিত্র কুরআন বলেছে—

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ. [المائدة: ٣٢]

"যে কেউ প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ বা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করা ছাড়া কাউকে হত্যা করে সে যেন সকল মানুষকেই হত্যা করে। আর যে কারো জীবন রক্ষা করে, সে যেন সকলের জীবন রক্ষা করে। তাদের কাছে আমার পয়গম্বরগণ প্রকাশ্য নিদর্শনাবলি নিয়ে এসেছেন। বস্তুত এরপরও তাদের অনেক লোক পৃথিবীতে সীমালঙ্ঘন করে।" [সূরা মায়িদা-৩২]

এখন আমরা প্রশ্নে বর্ণিত আয়াতটি পূর্বাপর পরিপূর্ণ বিবরণসহ দেখব—

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ.

"আর তোমরা লড়াই করো আল্লাহ তায়ালার পথে তাদের সাথে, যারা লড়াই করে তোমাদের সাথে। কিন্তু কারো প্রতি বাড়াবাড়ি করো না। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।" [সূরা বাকারা-১৯০]

وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ... فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. [البقرة: ١٩٠ - ١٩٣]

"আর তাদেরকে হত্যা কর যেখানে পাও সেখানেই এবং তাদেরকে বের করে দাও সেখান থেকে, যেখান থেকে তারা বের করেছে তোমাদেরকে। বস্তুত ফেতনা-ফ্যাসাদ বা দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করা হত্যার চেয়েও কঠিন অপরাধ। আর তাদের সাথে লড়াই করো না মসজিদুল হারামের নিকটে; যাবৎ না তারা তোমাদের সাথে সেখানে লড়াই করে। অবশ্য যদি তারা নিজেরাই তোমাদের সাথে লড়াই করে, তবে তাদেরকে হত্যা করো! এটা হল কাফিরদের শাস্তি। আর তারা যদি বিরত থাকে, তবে আল্লাহ বড় দয়ালু। আর তোমরা তাদের সাথে লড়াই করো, যে পর্যন্ত না ফেতনার অবসান হয় এবং আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর যদি তারা নিবৃত হয়ে যায়, তবে কারো প্রতি কোনো জবরদস্তি নেই, কিন্তু যারা জালেম (তাদের ব্যাপার আলাদা)।" [সূরা বাকারা : ১৯০-১৯৩]

প্রশ্নকারীর প্রশ্নের অসারতা বুঝতে শুধু আয়াতগুলোর অনুবাদই যথেষ্ট। একটু চিন্তা করে কেউ আয়াতগুলোর অনুবাদ পড়লেই বুঝতে পারবেন, প্রথমেই আল্লাহ তায়ালা বলে দিয়েছেন—যারা তোমাদের উপর লড়াই করতে ঝাঁপিয়ে পড়বে, তোমরা তাদের সাথে লড়াই করবে। তদুপরি এতে আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদেরকে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেছেন।

এরপর যেসব নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সবগুলোই যুদ্ধক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এখানে এসেও আল্লাহ তায়ালা নির্দেশ দিচ্ছেন, শত্রুপক্ষ যদি যুদ্ধ থেকে বিরত হয়ে যায়, তা হলে আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত দয়ালু।

তারপর আল্লাহ তায়ালা বলে দিচ্ছেন, তারা যদি নিবৃত হয়ে যায়, তা হলে তোমরা তাদের প্রতি কোনো জোর খাটাবে না। এমন বিধানকে যদি কোনো কুলাঙ্গার জঙ্গিবাদী ও অশান্তিকামী বিধান কিংবা জঙ্গিবাদের উসকানি বলতে চায়, তা হলে তাকে কী করা উচিত বলুন?

**নাস্তিকের প্রশ্ন-২০ :** সমান অধিকার প্রসঙ্গে

ইসলাম একজন পুরুষকে চারজন স্ত্রী রাখার অনুমতি দিয়েছে; কিন্তু একজন নারীকে তা দেয়নি। এটা কি নারীদের উপর স্পষ্ট জুলুম নয়?

**আমাদের জবাব :** প্রশ্নকারীকে আমি একটি কলসি দিব ও চারটি গ্লাস দিব। চারটি গ্লাসে কলসি থেকে পানি ঢালতে বলব। তারপর জিজ্ঞাস করব, প্রথম গ্লাসে কোন কলসির পানি। নাস্তিক ভাই অনায়াসে জবাব দিয়ে দিবেন, এ কলসির পানি। আবার জিজ্ঞাস করব দ্বিতীয় গ্লাসে কোন কলসির পানি? নাস্তিক ভাই সহজে জবাব দিতে পারবেন যে, এ কলসির পানি। এভাবে তৃতীয় ও চতুর্থ গ্লাসের পানির ব্যাপারে জবাব দিতে কোনো কষ্টই হবে না।

কিন্তু যদি চারটি গ্লাসের পানি একটি কলসির মধ্যে ঢেলে দেওয়ার পর এক ফোঁটা পানির ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করি, বলুন দেখি! এটুকু কোন্ গ্লাসের পানি? তা হলে গ্লাসের ডিএনএ টেস্ট করেও তা বের করা সম্ভব হবে না। তা হলে হে কপালপোড়া! তুমি তোমার বাবার পরিচয় দিবে কিভাবে? সুতরাং মানব সমাজ টিকিয়ে রাখতে হলে নারীদের জন্য একসাথে একাধিক স্বামী গ্রহণ করার কোনো যৌক্তিকতা নেই।

এখন রইলো পুরুষ কেন তা হলে একাধিক বিবাহ করবে? এ প্রশ্নের জবাবে আমি বলতে চাই, অনেক সক্ষম পুরুষ আছেন, যারা সর্বদিক থেকে একাধিক নারীর ভার বহন করতে সক্ষম। অপরদিকে নারীরা প্রতি মাসে কম পক্ষে তিনদিন সহবাস অযোগ্য থাকেন। বাচ্চা গ্রহণ করলে আগে পরে মিলিয়ে অনেক সময় ধরে সহবাস অযোগ্য থাকেন। এ সময়ে পুরুষটা কোথায় যাবে? পতিতা বা সমকামিতায় লিপ্ত হবে, না-কি বৈধ পন্থায় প্রথম স্ত্রীর সম্মতিক্রমে দ্বিতীয় বিবাহ করবে? বিবেকবান সকল মানুষ দ্বিতীয়টিকেই সমর্থন করবে। তারপরও এত মায়াকান্না কেন?

আল্লাহ তায়ালা আমাদের স্রষ্টা। আমাদের কোথায় কী আছে, কার মধ্যে কী ক্ষমতা আছে, কাকে কী দিলে ভালো হয়, কাকে কী পরিমাণ অধিকার দিতে হবে? সবই আল্লাহ তায়ালা সবচেয়ে ভালো জানেন। সেমতেই তিনি পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে বিধান দিয়েছন। এখানে নাক গলানোর কারো অধিকার নেই।

আল্লাহপ্রেমিক শেখ ফরিদ উদ্দিন আত্তার রহ. বলেন–

اوست سلطاں ہر چہ خواہد آں کند ❁ عالمے را دردم ویراں کند

ہست سلطانی مسلم مر او را ❁ نیست کس را زہرے ء چوو چرا

"তিনি (আল্লাহ) রাজাধিরাজ। তিনি যাই চান তাই করেন। এ বিশ্ব জগৎকে তিনি একমুহূর্তের মধ্যে ধ্বংস করে দিবেন। রাজত্ব একমাত্র তাঁরই জন্য নিরাপদ। সেখানে কারো কোনো চুল চেরার অধিকারও নেই।"

কারো যদি আল্লাহ তায়ালার বিধান ভালো না লাগে, তবে আল্লাহ তায়ালার রাজত্ব থেকে পারলে বেরিয়ে যাও। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ ❁ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ❁

"হে জিন ও মানবকুল! নভোমণ্ডল এবং ভূ-মণ্ডলের প্রান্ত অতিক্রম করা যদি তোমাদের সাধ্যে কুলায়, তবে অতিক্রম করো। কিন্তু ছাড়পত্র ছাড়া তোমরা

তা অতিক্রম করতে পারবে না। তাই তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে?" [সূরা আর-রহমান : ৩৩-৩৪]

**নাস্তিকের প্রশ্ন-২২:** কুরআন কি অবৈজ্ঞানিক?

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে,

حَتّٰى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ

অর্থাৎ এমনকি তিনি সূর্যের অস্তাচলে পৌঁছুলেন। দেখতে পেলেন সূর্য পঙ্কিল জলাশয়ে অস্ত যায়। [সূরা কাহ্ফ-৮৬]

সুতরাং কুরআন অবৈজ্ঞানিক! কারণ, পৃথিবীর তুলনায় তের লক্ষ গুণ বড় সূর্য পৃথিবীর অতি ক্ষুদ্র একটি অংশ পঙ্কিল জলাশয়ে অস্ত যেতে পারে না।

**আমাদের জবাব :** প্রথমত কুরআনের কোথাও আল্লাহ তায়ালা নিজে বলেননি, পঙ্কিল জলাশয়ে সূর্য অস্ত যায়। সূরা কাহ্ফের ৮৬নং আয়াতে যুলকারনাইন নিজের চোখে যা দেখেছেন, তার বর্ণনা দেওয়া আছে। দ্বিতীয়ত উক্ত আয়াত অনুযায়ী সূর্যাস্তের 'সময়' অথবা 'স্থান' যে কোনোটি হতে পারে। আধুনিক বিজ্ঞানের এ যুগেও জ্ঞানী-গুণী ও বুদ্ধিজীবীরা একে অপরের কাছে সূর্যাস্ত ও সূর্যোদয়ের সময় জানতে ও জানাতে চায়। বিভিন্ন লিখনীতে এসব শব্দ লিখে থাকে। তৃতীয়ত এ আয়াত দ্বারা কোনো বৈজ্ঞানিক তথ্য দেওয়া উদ্দেশ্য নয় বরং সে-সময়ের মানুষের ধারণার বর্ণনা দেয় উদ্দেশ্য। কেননা এখানে তো কুরআন মাজিদ তাদের ঘটনাই বয়ান করছে।

**নাস্তিকের প্রশ্ন-২৩ :** এমিবাও কি অমর হয়? সুতরাং কুরআন অবৈজ্ঞানিক! কেননা কুরআন বলছে,

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

অর্থাৎ "প্রত্যেক প্রাণীকে মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে। আর তোমরা পরিপূর্ণ বদলা প্রাপ্ত হবে পুনরুত্থানের দিন।" [সূরা আলে ইমরান-১৮৫]

বিজ্ঞান বলে এমিবা অমর; অথচ কুরআন বলে সকল প্রাণীর মৃত্যু আছে?

**আমাদের জবাব :** 'এমিবা অমর' এ তথ্যটির অসারতা আজ দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট। সুতরাং এখানেও কুরআনের একটি অলৌকিকত্ব প্রকাশ পেল।

মানুষের আমাশা হয় একপ্রকারের এমিবার কারণে। এ আমাশা থেকে মুক্তি ঘটে রোগিকে ফ্লাজিল খাইয়ে সেই এমিবাকে মেরে ফেলার মাধ্যমে।

এমিবার মৃত্যু ঘটার বিষয়টি যদি স্পষ্ট নাও হত, তথাপি নিশ্চিত কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক পৃথিবীর কোনো বৈজ্ঞানিক সূত্র অদ্যাবধি টেকেনি, ভবিষ্যতেও টিকবে না। বিজ্ঞানের অন্যান্য তথ্য যেভাবে ভুল প্রমাণিত হয়েছে, একসময় এটাও ভুল প্রমাণিত হবে। আল্লাহ আমাদের বুঝার তাওফিক দান করুন!

**নাস্তিকের প্রশ্ন-২৪ :** মানুষের অনুভূতি প্রসঙ্গে

মানুষের অনুভূতি মস্তিষ্কের উপর নির্ভরশীল। অথচ কুরআন বলছে চামড়ার উপর নির্ভরশীল। সুতরাং কুরআন অবৈজ্ঞানিক। যেমন– কুরআনে আছে,

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا. [النساء: ٥٦]

"নিশ্চয় যারা আমার নিদর্শনাবলি অস্বীকার করবে, আমি তাদেরকে আগুনে নিক্ষেপ করব। তাদের চামড়াগুলো যখন জ্বলে যাবে, তখন আবার আমি তা পালটে দিব অন্য চামড়া দিয়ে, যাতে তারা আবার আজাবের স্বাদ আস্বাদন করতে থাকে। নিশ্চয় আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" [সূরা নিসা-৫৬]

অথচ অনুভূতি ও বেদনার উপলব্ধি মস্তিষ্কের উপর নির্ভরশীল, চামড়ার উপর নয়। তা হলে কুরআন কি অবৈজ্ঞানিক নয়?

**আমাদের জবাব :** ধারণা করা হয় যে, অনুভূতি ও বেদনার উপলব্ধি মস্তিষ্কের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু সাম্প্রতিক আবিষ্কার প্রমাণ করেছে, চামড়ার মধ্যে বেদনা অনুভবকারী উপাদান রয়েছে। ওই উপাদান ছাড়া ব্যক্তি ব্যথা বেদনা অনুভব করতে পারে না। ডাক্তার যখন আগুনে পুড়ে যাওয়ার ফলে ক্ষত স্থানের চিকিৎসা করেন, তিনি একটি সরু পিন দ্বারা পোড়ার মাত্রার পরিমাণ পরীক্ষা করে দেখেন। রোগী ব্যথা অনুভব করলে ডাক্তার সাহেব খুশি হন। কেননা এর দ্বারা বোঝা যায়, হাল্কাভাবে পুড়েছে এবং ব্যথা অনুভবকারী উপাদান অক্ষত আছে। কিন্তু রোগী ব্যথা অনুভব না করলে বুঝা যায়, গভীরভাবে পুড়েছে এবং ব্যথা অনুভবকারী উপাদান নষ্ট হয়ে গেছে।

অথচ পবিত্র কুরআন চামড়ার ব্যথা অনুভবকারী উপাদানের কথা সুস্পষ্টভাবে বলেছে। যেমনটি আল্লাহ তায়ালা উপরিউক্ত আয়াতে বলেছেন।

**নাস্তিকের প্রশ্ন-২৫ :** মানুষ কি শুধুই শুক্র থেকে সৃষ্টি?

কুরআনে আছে, আল্লাহ তায়ালা মানুষকে শুক্র থেকে সৃষ্টি করেছেন। যেমন– তিনি তাকে কী থেকে সৃষ্টি করেছেন? তিনি তাকে শুক্র থেকে সৃষ্টি করেছেন। [সূরা আবাসা : ১৮-১৯]

অথচ সুস্পষ্টত শুধু শুক্রাণু থেকে মানুষ তৈরি হতে পারে না। শুক্রাণু ও ডিম্বাণু উভয়েরই প্রয়োজন হয়। কুরআনের কোথাও আপনি ডিম্বাণুর উল্লেখ পাবেন না। আর এটা তখনই সম্ভব, যখন কুরআন মানুষের রচনা হবে।

**আমাদের জবাব :** প্রথমে আমরা আয়াত দুটি লক্ষ্য করি—

مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ❖ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ❖

তিনি তাকে কী থেকে সৃষ্টি করেছেন? তিনি তাকে বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছেন। [সূরা আবাসা : ১৮-১৯]

প্রশ্নকারী এখানে আয়াতটির অনুবাদে ভুল করেছে। এখানে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন 'নুত্বফাতুন' (نُطْفَةٌ) থেকে সৃষ্টি করেছেন। নুত্বফাতুন (نُطْفَةٌ) শব্দের অর্থ— পরিচ্ছন্ন পানি, স্ত্রী-পুরুষের বীর্য।

[আল-কাওসার আধুনিক আরবি বাংলা অভিধান/ মদিনা পাবলিকেশন্স]

পরিভাষায়ও বীর্য শব্দটি স্ত্রীর শুক্রাণু ও পুরুষে ডিম্বাণু উভয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়। রাস্তাঘাটে হকারদের লেকচার, ইন্টারনেটে ডাক্তারদের প্রশ্ন যে, কিভাবে বুঝবেন, আপনার স্ত্রীর বীর্যপাত হয়ে গেছে। আবার শোনা যায়, দেখা যায়– পুরুষের বীর্যপাত বিলম্বিত হওয়ার কৌশল ইত্যাদি।

সুতরাং বুঝা গেল, পরিভাষায় বীর্য শব্দটি স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। তা হলে আয়াতের অনুবাদ হবে– তিনি তাকে স্ত্রী ও পুরুষের বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছেন। এবার বুঝে থাকলে বলুনতো! স্ত্রীর বীর্যের মধ্যে ডিম্বাণু আছে কি-না? অবশ্যই আছে। সুতরাং কুরআন পাকে মানুষের সৃষ্টি তথ্যে ডিম্বাণুর কথা উল্লেখ নেই, এ কথা সম্পূর্ণ ভুল ও ভ্রান্ত।

আরেকটু লক্ষ্য করুন! সূরা নাজ্‌মের ৪৬ নং আয়াতের মতো সূরা আবাসার ১৯ নং আয়াতে 'নুত্বফাতুন' (نُطْفَةٌ)-এর সাথে এমন কোনো বিশেষণ জুড়ে দেওয়া হয় নি যে, এটাকে নিছক পুরুষের শুক্রাণু বলা যায়। কাজেই এখানে 'নুত্বফাতুন' (نُطْفَةٌ)-এর অর্থ ডিম্বাণু ও শুক্রাণু দুটিই ধরে নিতে হবে। কারণ, ডিম্বাণুর সাথে শুক্রাণু মিলে প্রথমত ৪৬টি ক্রমোজমের অধিকারী একটি সুষম মানবকোষ সৃষ্টি করা হয় এবং এর মধ্যকার সংকেত অনুসারে ক্রমান্বয়ে (স্ত্রী/ পুরুষ) মানুষটি সুপরিমিতভাবে পরিগঠিত হতে থাকে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, এখানে স্রষ্টা আল্লাহ তায়ালা যে আরবি শব্দ 'নুত্বফাতুন' (نُطْفَةٌ) ব্যবহার করেছেন, প্রকৃত অর্থে এটি কোনো লিঙ্গ নির্দেশ করে না বরং এতে সন্তান জন্মের জন্য যে 'নুত্বফাতুন' (نُطْفَةٌ) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে প্রকৃত অর্থে এর দ্বারা স্ত্রী ও পুরুষের বীর্য তথা X ও Y ক্রমোজম বহনকারী 'শুক্রাণু ও ডিম্বাণু' উভয়টি বুঝায়। মানুষ সৃষ্টির জন্য স্ত্রীর ডিম্বাণু ও পুরুষের শুক্রাণু দুটিই যে অপরিহার্য, সে তথ্যটাই এখানে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্নকারী আরবি ভাষা সম্পর্কে অজ্ঞ হওয়ার কারণে বিভ্রান্ত হয়েছে। সুতরাং আরবি ভাষা না জেনে কুরআনের শব্দাবলি নিয়ে মাথা ঘামানো থেকে বিরত থাকার জন্য সকল মানুষের প্রতি অনুরোধ রইল। কারণ, ইংরেজি না জেনে কেউ সেক্সপিয়রের গল্পের শব্দার্থ নিয়ে কেউ বাড়াবাড়ি করলে তাকে আপনারা কী বলবেন? আর সেক্সপিয়র অবশ্যই লোকটির উপর রাগ হবেন। বিশেষত যখন শব্দের এক অর্থের জায়গায় অন্য অর্থ প্রয়োগ করে বাড়াবাড়ি করবে, তখন কী পরিমাণ রাগ তার উপর হওয়ার কথা। তাকে শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা থাকলে অবশ্য তাকে কঠিন থেকে কঠিন শাস্তি দিবেন। তেমনিভাবে যারা আরবি না জেনেও কুরআনের মর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করে এবং নিজের ভুলের উপর ভিত্তি করে আল্লাহ তায়ালার কুরআনকে বিভিন্ন অপবাদ দিতে থাকে, তাকে আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই শাস্তি দিবেন। ইহকালীন শাস্তি হিসেবে তাকে ঈমানের নূর থেকে বঞ্চিত করবেন। আর পরকালে তার জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে হেফাজত করুন। আমিন!

**নাস্তিকের প্রশ্ন-২৬ :** কুরআন মুহাম্মদেরই বাণী!?

কুরআনে বলা হয়েছে, وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ. مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ. অর্থাৎ 'আর নিশ্চয় তিনি (আল্লাহ) সৃষ্টি করেছেন যুগল নারী-পুরুষ একবিন্দু শুক্রাণু হতে, যা নির্গত হয়।' (সূরা নাজ্‌ম : ৪৫-৪৬)

I (ALLAH) have created both sexes male and female from a drop of liquid, which is ejected.

মানুষ সৃষ্টি শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর সংমিশ্রণের ফলে। অথচ উক্ত আয়াতে তো শুধু শুক্রাণুর কথা লেখা আছে। ডিম্বাণুর কথা তো লেখা নাই? মুহাম্মদ ﷺ শুধু শুক্রাণু দেখছেন। উনি তো আর ডিম্বাণু দেখেন নাই। তাই কুরআনে তিনি এ কথা লিখেন নি। বুঝা গেল, কুরআন মুহাম্মদেরই বাণী। যা তিনি আল্লাহর নামে চালিয়ে দিয়েছেন।

**আমাদের জবাব :** প্রথম কথা হল—এ আয়াতে আল্লাহ্ তায়ালা মানব সৃষ্টির মৌলিক তথ্য দেন নি বরং মানুষের sex বা লিঙ্গ তৈরির তথ্য দেওয়া হয়েছে।

এ sex বা লিঙ্গ তৈরি হয় কিসের থেকে? এ প্রশ্নের উত্তর আয়াতের পরবর্তী অংশেই বলা আছে—'যা নির্গত হয়' (which liquid is ejected) অর্থাৎ নির্গত হওয়া liquid থেকেই sex বা লিঙ্গ তৈরি হয়।

এখন প্রশ্ন হল—নির্গত হওয়া liquid টি কার liquid? নিতান্ত মূর্খ বা বুদ্ধি প্রতিবন্ধী না হলে এটি সহজেই বুঝার কথা যে, এটা পুরুষের liquid। এখন দেখা যাক, শুধু পুরুষের liquid ই কেন sex বা লিঙ্গ সৃষ্টির জন্য দায়ী?

আমরা জানি, ডিম্বাণু নিষিক্তকারী শুক্রের chromosome-এর উপর ভিত্তি করেই নিষিক্তকরণের সময় প্রাথমিকভাবে লিঙ্গ নির্ধারিত হয়। "XY" হলে শিশুটি ছেলে হবে; "XX" হলে শিশুটি মেয়ে হবে।

বুঝা গেল, ছেলে বা male child হওয়ার জন্য "Y" chromosome দায়ী। আর "X" chromosome টি বাবা-মা দুজনের কাছেই থাকে। কিন্তু "Y" chromosome টি শুধু বাবার কাছেই থাকে অর্থাৎ শুধু নির্গত হওয়া liquid-এর মধ্যেই "Y" chromosome টি থাকে। তাই মানবশিশুর লিঙ্গ নির্ধারণের জন্য শুধু "Y" chromosome ই দায়ী। কুরআন এখানে এ তথ্যটিই প্রধান করেছে। আল্লাহু আকবার! সুতরাং কুরআন একমাত্র ওই সত্তারই বাণী, যিনি সর্বদা সর্ববিষয়ে প্রজ্ঞাবান।

কাজেই আমার প্রশ্ন : ১৪০০ বছর আগে কোনো বৈজ্ঞানিক মেশিনপত্র ছাড়া মুহাম্মদ ﷺ কিভাবে জানতেন, একমাত্র পুরুষের liquid-এর মধ্যেই "Y" chromosome থাকে?

**নাস্তিকের প্রশ্ন- ২৭ :** ভূমিকম্প প্রতিরোধে পর্বতমালার ভূমিকা কী?

কুরআনে তো পর্বতমালাকে ভূমিকম্প প্রতিরোধোক হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। যেমন, সূরা আম্বিয়া-৩১ ও সূরা নাহ্ল-১৫ আয়াতে। অথচ পর্বতের আশপাশেই ভূমিকম্প অধিক হয়। সুতরাং কুরআন অবৈজ্ঞানিক নয় কী?

**আমাদের জবাব :** আমরা আগে আয়াতগুলো দেখে নিই!

وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ۞

"আমি পৃথিবীতে ভারী বোঝা রেখে দিয়েছি। যাতে তাদেরকে নিয়ে পৃথিবী ঝুঁকে না পড়ে এবং তাতে প্রশস্ত পথ রেখেছি। যাতে তারা পথ প্রাপ্ত হয়।"

[সূরা আম্বিয়া-৩১]

وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ❖

"এবং তিনি পৃথিবীর উপর বোঝা রেখেছেন, কখনো যেন তা তোমাদেরকে নিয়ে হেলে-দুলে না পড়ে এবং নদী ও পথ তৈরি করেছেন। যাতে তোমরা পথ প্রাপ্ত হও।" [সূরা নাহল-১৫]

প্রশ্নকারী আয়াতের অনুবাদ ভুল বুঝেছেন। দুটি আয়াতের কোনো জায়গায় ভূমিকম্পের কোনো কথা নেই। সুতরাং প্রশ্নটিই অবান্তর। আল্লাহ তায়ালা আমাদের হেফাজত করুন। আমিন!

**নাস্তিকের প্রশ্ন-২৭ :** আকাশকে ছাদ বলা অবৈজ্ঞানিক!?

কুরআনে আকাশকে শামিয়ানা (সলিড ছাদ) বলা হয়েছে। (সূরা বাকারা-২২) অতএব কুরআন অবৈজ্ঞানিক!

**আমাদের জবাব :** বিজ্ঞান আজ পর্যন্ত মহাশূন্য ভেদ করে উপরে যেতে সক্ষম হয়নি। তাই তারা কখনো কখনো মহাশূন্যকে অসীমও বলে ফেলে। সুতরাং আকাশ কেমন, তা নিয়ে কথা বলা বিজ্ঞান বা বিজ্ঞানমনস্কদের কোনো অধিকার নেই। এ বিষয়ে কুরআন যে কথা বলেছে সেটাই সঠিক।

**নাস্তিকের প্রশ্ন-২৮ :** পৃথিবী ঘোরে না-কি সূর্য ঘোরে?

সূরা ইয়াসিনের ৩৮ নং আয়াতে রয়েছে, 'আর সূর্য তার নির্দিষ্ট গ-ির মধ্যে আবর্তন করে'। আবার সূরা আম্বিয়া-৩৩, সূরা লুকমান-২৯, সূরা যুমার-৫ নং আয়াত দ্বারা বুঝা যায়– পৃথিবী স্থির; সূর্য তাকে প্রদক্ষিণ করছে। কুরআনের এ তথ্যটি বৈজ্ঞানিক সত্যের পরিপন্থি। সুতরাং কুরআন অবৈজ্ঞানিক।

**আমাদের জবাব :** কুরআনের যে আয়াতগুলো প্রশ্নে উল্লেখ করা হয়েছে, 'সূর্য পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে' বা 'পৃথিবী স্থির' এ কথাগুলো উল্লিখিত আয়াতগুলোর কোথাও নেই। আয়াতগুলো ভালোভাবে লক্ষ্য করুন!

وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ ❖ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ❖ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ❖ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۚ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ

"তাদের জন্য এক নিদর্শন রাত্রি; আমি তা থেকে দিনকে অপসারিত করি, তখনই তারা অন্ধকারে থেকে যায়। সূর্য তার নির্দিষ্ট অবস্থানে আবর্তন করে। এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ। চন্দ্রের জন্য আমি বিভিন্ন মনযিল নির্ধারিত করেছি। অবশেষে সে খেজুরের পুরাতন ডালার মতো হয়ে

যায়। সূর্য নাগাল পেতে পারে না চন্দ্রের আর রাত্রি অগ্রে চলে না দিনের। প্রত্যেকেই আপন আপন কক্ষপথে সন্তরণ করে।" [সূরা ইয়াসিন : ৩৭-৪০]

وَهُوَ الَّذِيْ خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِيْ فَلَكٍ يَسْبَحُوْنَ ❁

"তিনিই সৃষ্টি করেছেন রাত ও দিন, সূর্য আর চন্দ্র, প্রত্যেকেই তার চক্রাকার পথে সাঁতার কাটছে।" [সূরা আম্বিয়া-৩৩]

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يُوْلِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِيْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَأَنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ❁

"তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ রাত্রিকে দিনে আর দিনকে রাতে প্রবিষ্ট করেন এবং সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়ন্ত্রণ করেন, প্রত্যেকেই বিচরণ করছে নির্দিষ্টকৃত সময় অনুযায়ী..।" [সূরা লুকমান-২৯]

خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِيْ لِأَجَلٍ مُسَمًّى أَلَا هُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفَّارُ ❁

"তিনি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন যথাযথভাবে। তিনি রাত্রিকে দিবস দ্বারা আচ্ছাদিত করেন এবং দিবসকে রাত্রি দ্বারা আচ্ছাদিত করেন এবং তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে কাজে নিযুক্ত করেছেন। প্রত্যেকেই বিচরণ করে নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত। জেনে রাখুন, তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল।" [সূরা যুমার-৫]

আমরা নিশ্চয় লক্ষ্য করছি, এমন কথা কোনো আয়াতের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে না। এভাবেই তারা বিভিন্ন জায়গায় কুরআনের উপর মিথ্যা অপবাদ দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চায়। মজার বিষয় হচ্ছে, কোথাও তারা কুরআনের আরবি ভাষ্য উল্লেখ করে না; অবশ্য কোনো স্থানে ইংরেজি ভাষ্যে কুরআনের অনুবাদ তুলে দেয়; অথচ কুরআন নাযিল হয়েছে আরবি ভাষায়, ইংরেজি ভাষায় নয়। অতএব নাস্তিক ও তাদের দোসরদের কথায় ধোঁকা না খাওয়ার জন্য মুমিন-মুসলমান সকলের প্রতি অনুরোধ রইল। আল্লাহ তায়ালা আমাদের হেফাজত করুন। আমিন!

**নাস্তিকের প্রশ্ন-২৯ :** কুরআন আরবি ভাষায় হলো কেন?

বর্তমানে বিশ্বে মাত্র ১৫০ million আরবি ভাষাভাষী মানুষ আছে। আল্লাহ তায়ালা কেন এমন একটা ভাষায় কুরআন নাযিল করলেন না, যেটাতে অধিক মানুষ কথা বলে। যেমন– ইংলিশ (৩৫০ মিলিয়ন), Mandarin (৮০০ মিলিয়ন), স্পেনিশ (৩৫৮ মিলিয়ন), হিন্দি (২০০ মিলিয়ন) কিংবা রাশিয়ান (১৬০ মিলিয়ন)।

**আমাদের জবাব :**

১. এ প্রশ্নটি শুধু বর্তমান যুগের নাস্তিকরা নয় বরং তাদের বাবারাও করত। অথচ আল্লাহ তায়ালা চৌদ্দশ বছর পূর্বে এ প্রশ্নের জবাব দিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং কুরআন মাজিদে ইরশাদ হচ্ছে,

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ ❁

"আমি যদি একে অনারব ভাষায় কুরআন করতাম, তবে অবশ্যই তারা বলত, এর আয়াতসমূহ স্পষ্ট ভাষায় বিবৃত হয়নি কেন? কি আশ্চর্য! কিতাব অনারব ভাষায় আর রাসূল আরবি ভাষী! বলুন, এটা বিশ্বাসীদের জন্য হেদায়েত এবং রোগের প্রতিষেধক। যারা মুমিন নয়, তাদের কানে আছে ছিপি আর কুরআন তাদের জন্য অন্ধত্ব। তাদেরকে যেন দূরবর্তী স্থান থেকে আহবান করা হয়।" [সূরা হামীম আস্ সাজদা-৪৪]

২. আপনি ভালোভাবে আরবি ও ইংরেজি শিখলে বুঝতে পারবেন, আসমানি বাণী পাঠানোর জন্য ইংরেজি হতে আরবি কত সূক্ষ্ম ও যথার্থ ভাষা।

৩. কুরআন তো জান্নাতে যাওয়ার গাইডলাইন। আর জান্নাতের ভাষা আরবি। তাই গাইডলাইনের ভাষা আরবিতে হওয়াই যুক্তিসঙ্গত।

## কুরআন প্রসঙ্গে কাফিরদের কিছু মৌলিক বিভ্রান্তি

আল্লাহ তায়ালা মানবজাতিকে সৃষ্টি করে তাদের জন্য জীবনবিধানও প্রণয়ন করেছেন। জান্নাত থেকে একটা নির্ধারিত সময়ের জন্য দুনিয়াতে প্রেরণ করে পুনরায় জান্নাতের যাওয়ার পথনির্দেশনাও তিনি বান্দার জন্য প্রস্তুত করেছেন। সে পথনির্দেশনা ও জীবন বিধান হলো যুগে যুগে প্রেরিত আসমানি কিতাব ও ছহিফাগুলো। ওইসব আসমানি কিতাব ও ছহিফার মধ্যে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি কিতাব হলো 'পবিত্র কুরআন'।

কিন্তু মানবজাতির চিরশত্রু ইবলিস শয়তান কখনো চায় না, কুরআনে প্রদত্ত পথনির্দেশনা মেনে মানুষ চিরশান্তির নিবাস জান্নাতে প্রবেশ করুক। তাই সে বিভিন্নভাবে মানবজাতিকে কুরআন থেকে সরিয়ে রাখতে চায়। কারণ, আল্লাহ তায়ালা কুরআনে এমন চুম্বকীয় শক্তি দিয়ে দিয়েছেন, যার সাথে রয়েছে মানব জাতির আত্মার সাথে এক গভীর সম্পর্ক। চুম্বক লোহাকে যত দ্রুত আকর্ষণ করে, আল্লাহ তায়ালার কিতাব কুরআন পাক মানবাত্মাকে আরো অনেক দ্রুত আকর্ষণ করে। হযরত উমর রাযি.-এর ইসলাম গ্রহণ করার ঘটনাটি এর এক জ্বলন্ত উদাহরণ।

তাই শয়তানের ভিষণ ও মিশন হলো যে করেই হোক মানবজাতিকে কুরআন থেকে নিরাপদ দূরত্বে রাখতে হবে, কখনো কুরআন পাককে পূর্ববর্তীদের কিচ্ছা-কাহিনী আখ্যা দিয়ে, কখনো বা মানবরচিত গ্রন্থ আখ্যা দিয়ে, কখনো আবার কুরআনের চিত্তাকর্ষণকে জাদুর অন্তর্ভুক্ত বলে, কখনো অবৈজ্ঞানিক গ্রন্থ বলে, কখনো মানুষকে অন্য কাজে ব্যস্ত রেখে, কখনো কুরআনের মারকাজে গোলোযোগ সৃষ্টি করাসহ আরো যত মাধ্যম তার কল্পনায় আসতে পারে, সবই প্রয়োগ করে। কিন্তু মানুষ একটু চিন্তা করলেই তাদের সম্মুখে কুরআন মাজিদের বিরুদ্ধে শয়তানের বানানো এসব মিথ্যা অভিযোগগুলোর অসারতা দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে যায় এবং পরিষ্কার হয়ে যায়, এটা এমন একটা কিতাব, যা আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। যাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই।

বিশিষ্ট লেখক আব্দুর রহমান হাসান হাবান্নাকাহ আলমায়দানী রহ. বলেন–

جِدَالُهُمْ فِيْ قَضِيَّةِ الْكِتَابِ الْمُنَزَّلِ مِنْ عِنْدِ اللهِ: وَجَادَلَ الْكَافِرُوْنَ فِي الْقُرْآنِ، فَأَنْكَرُوْا نِسْبَتَهُ إِلَى اللهِ، وَاتَّهَمُوْا الرَّسُوْلَ ﷺ بِافْتِرَائِهِ عَلَى اللهِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ حُجَّةٍ إِلَّا الرَّفْضُ، وَادِّعَاءٌ أَنَّهُ أَسَاطِيْرُ الْأَوَّلِيْنَ، اِكْتَتَبَهَا الرَّسُوْلُ عَنِ الْكُتُبِ السَّابِقَةِ، أَوْ هُوَ مِنْ قَبِيْلِ السِّحْرِ، وَلَيْسَ شَيْءٌ مِنْ ذٰلِكَ بِحُجَّةٍ مَقْبُوْلَةٍ عِنْدَ الْعُقَلَاءِ.

مِنَ الطَّبِيْعِيِّ أَنَّ الْكَافِرِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ مَا يَقُوْلُوْنَهُ عَنِ الْقُرْآنِ بَعْدَ أَنْ كَذَّبُوْا بِهِ إِلَّا أَنَّهُ أَسَاطِيْرُ الْأَوَّلِيْنَ، أَوْ أَنَّ الرَّسُوْلَ وَضَعَهُ مِنْ عِنْدِهِ وَافْتَرَاهُ عَلَى رَبِّهِ، وَأَنْ يَتَّهِمُوْا قُوَّةَ تَأْثِيْرِهِ عَلَى الْعُقُوْلِ وَالنُّفُوْسِ بِأَنَّهَا مِنْ قَبِيْلِ السِّحْرِ، وَقَدْ ذَكَرَ اللهُ مَقَالَاتِهِمْ هٰذِهِ فِيْ عِدَّةِ مَوَاضِعَ مِنَ الْقُرْآنِ، مِنْهَا قَوْلُ اللهِ تَعَالَى...

## আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে অবতীর্ণ কিতাব প্রসঙ্গে কাফিরদের বাক-বিতর্ক

কুরআন নিয়েও কাফিররা বাকবিতর্কয় লিপ্ত হয়েছে। তারা এ কুরআন আল্লাহ তায়ালার কিতাব হওয়াকে অস্বীকার করেছে। তারা রাসূল ﷺ-কে আল্লাহ তায়ালার উপর মিথ্যা রটানোর অপবাদ দিয়েছে; অথচ এ ব্যাপারে তাদের কাছে অস্বীকার করা, পূর্ববর্তীদের কিচ্ছা-কাহিনী বলে উড়িয়ে দেওয়া কিংবা এটা জাদুর অন্তর্ভুক্ত বলে দাবি করা ছাড়া কোনো প্রমাণ নেই। আর এসবের কোনোটিই জ্ঞানীদের কাছে গ্রহণযোগ্য প্রমাণ কিংবা দাবি হতে পারে না।

বস্তুত কাফিররা কুরআনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার পর তারা কুরআনের বিপক্ষে তিনটি অভিযোগই উত্থাপন করেছেন–

১. এটা পূর্ববর্তীদের কিচ্ছা-কাহিনী।

২. রাসূল নিজের পক্ষ থেকে তা রচনা করে আল্লাহ তায়ালার নামে চালিয়ে দিয়েছেন।

৩. কুরআনের চিত্তাকর্ষণ জাদুর অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহ তায়ালা তাদের এ অভিযোগগুলো কুরআনের একাধিক স্থানে উল্লেখ করে সেগুলোর যুক্তিসঙ্গত জবাব দিয়েছেন। যেমন—

(১) আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন–

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا إِنْ هٰذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُوْنَ؛ فَقَدْ جَاءُوْا ظُلْمًا وَزُوْرًا ❁ وَقَالُوْا أَسَاطِيْرُ الْأَوَّلِيْنَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلٰى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيْلًا ❁ قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِيْ يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، إِنَّهُ كَانَ غَفُوْرًا رَحِيْمًا ❁

"কাফিররা বলে– এটা মিথ্যা বৈ নয়, যা তিনি উদ্ভাবন করেছেন এবং অন্য লোকেরা তাঁকে সাহায্য করেছে। অবশ্যই তারা অবিচার ও মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে। তারা বলে—এগুলো তো পুরাকালের রূপকথা, যা তিনি লিখে রেখেছেন। এগুলো সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর কাছে শিখানো হয়। বলুন! একে তিনিই অবতীর্ণ করেছেন, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের গোপন রহস্য অবগত আছেন। তিনি ক্ষমাশীল, মেহেরবান।" [সূরা ফুরকান : ৪-৬]

(২) আল্লাহ তায়ালা আরো ইরশাদ করেছেন–

وَإِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هٰذَا سِحْرٌ مُبِيْنٌ ❁ أَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُوْنَ لِيْ مِنَ اللهِ شَيْئًا، هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيْضُوْنَ فِيْهِ كَفٰى بِهٖ شَهِيْدًا بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ❁

"যখন তাদেরকে আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ পাঠ করে শুনানো হয়, তখন সত্য আগমন করার পর কাফিররা বলে, এ তো প্রকাশ্য জাদু। তারা কি বলে, রাসূল একে রচনা করেছে? বলুন! যদি আমি রচনা করে থাকি, তবে তোমরা আল্লাহর শাস্তি থেকে আমাকে রক্ষা করার অধিকারী নও। তোমরা এ সম্পর্কে যা আলোচনা কর, সে বিষয়ে আল্লাহ সম্যক অবগত। আমার ও তোমাদের মধ্যে তিনিই সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট। তিনি ক্ষমাশীল, দয়াময়।"
[সূরা আহকাফ : ৭-৮]

## কাফিরদের দাবিগুলোর অসারতা

১. তাদের দাবি হল, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ কুরআন রচনা করে তারপর আল্লাহ তায়ালার নামে চালিয়ে দিয়েছেন। এটি একটি অগ্রহণযোগ্য দাবি।

কারণ, এতে মিথ্যা ও জুলুম রয়েছে। কুরআনের বাস্তবতা এ দাবিকে মিথ্য সাব্যস্ত করে। সেটা হলো কুরআনের অলৌকিকতাই প্রমাণ হিসেবে যথেষ্ট যে, এটি কোনো মানুষের রচনা নয়; আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ কিতাব।

তা ছাড়া আল্লাহ তায়ালা মানবজাতি ও জীনজাতির প্রতি চ্যালেঞ্জ করেছেন, তারা যেন এ কুরআনের মতো একটি কুরআন রচনা করে নিয়ে আসে অথবা একটি সূরা রচনা করে নিয়ে আসে অথবা কমপক্ষে একটি আয়াত হলেও রচনা করে নিয়ে আসে; কিন্তু তারা তা পারেনি। এ অপারগতার কারণে কুরআন রাসূলের রচিত হওয়ার এবং আল্লাহ তায়ালার নামে চালিয়ে দেওয়ার দাবিটি বাতিল হয়ে গেল।

২. তাদের দ্বিতীয় দাবি হল—এ কুরআন পূর্ববর্তীদের কিচ্ছা-কাহিনী মাত্র। সেগুলো রাসূলুল্লাহ ﷺ পূর্ববর্তী পুস্তকাদি থেকে লিখিয়ে নিয়েছেন। তাদের এ দাবিও স্পষ্ট বাতিল। তা বাতিল হওয়ার স্পষ্ট প্রমাণ হল, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবন ইতিহাসের সার্বজনীন অধ্যায়ের বাস্তবতা। সাথে সাথে কুরআনের ভাষা, উপস্থাপনা ও বাচনভঙ্গির অলৌকিকত্ব দ্বারা তাদের এ দাবির অসারতা সুপ্রমাণিত হয়ে যায়।

তারা নিজের ধারণা মতে আরো প্রচার করেছে যে, মুহাম্মদ ﷺ এ কুরআন একজন অনারব মানুষ থেকে গ্রহণ করছেন। ওই অনারব লোকটি বসবাস করত মক্কায়। পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে তার ছিল অগাধ জ্ঞান। কিন্তু তাদের এ অপপ্রচারের জবাবও পবিত্র কুরআনেই দেওয়া হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে,

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ. لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ
أَعْجَمِيٌّ وَهٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ.

"আমি তো ভালোভাবেই জানি, তারা বলে– তাকে জনৈক ব্যক্তি শিক্ষা দেয়। যার দিকে তারা ইঙ্গিত করে, তার ভাষা তো আরবি নয়। অথচ এ কুরআন পরিষ্কার আরবি ভাষায়।" [সূরা নাহল-১০৩]

৩. তাদের তৃতীয় দাবি হল, কুরআন একটি জাদুগ্রন্থ। অর্থাৎ কুরআনের যে চিত্তাকর্ষণ শক্তি রয়েছে, এটা একটা জাদুশক্তি। তাদের এ দাবিটিও বাতিল। কারণ, জাদুর আকর্ষণ বাস্তব আকর্ষণ নয়। এ কথা সকলে জানে বরং জাদুর আকর্ষণ হলো সাময়িক ধোঁকা। কিন্তু কুরআনের আকর্ষণ কখনো সাময়িক হয় না বরং কুরআনের আকর্ষণ হয় বাস্তব ও স্থায়ী। সুতরাং যুক্তি-তর্কের ক্ষেত্রে এ দাবিরও কোনো গ্রহণযোগ্যতা থাকছে না।

## তারপরও গোড়ামি

বস্তুত কুরআনকে যারা অস্বীকার করে, তারা কোনো দলিল-প্রমাণের উপর ভিত্তি করে অস্বীকার করে না বরং তারা একগুঁয়েমি ও জেদের বশীভূত হয়েই অস্বীকার করে। অথচ তাদের কাছে এ ধরনের প্রমাণের কোনো অভাব নেই যে, এ কুরআন একমাত্র আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে। অবশ্য একগুঁয়েমি ও জেদের বশীভূত কাউকে কোনো দলিল-প্রমাণ দিয়ে কেউ কখনো খুশি করতে পারবে না। তাদের এ অবস্থাই আল্লাহ তায়ালা ফাঁস করে দিয়েছেন–

وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ
لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ

"যদি আমি কাগজে লিখিত কোনো বিষয় তাদের প্রতি অবতীর্ণ করতাম, এরপর তারা তা সহস্তে স্পর্শ করত, তবু অবিশ্বাসীরা বলত যে, এটা প্রকাশ্য জাদু বৈ কিছু নয়।" [সূরা আনয়াম-৭]

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন–

وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۞ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۞

"তাদের কেউ কেউ আপনার দিকে কান লাগিয়ে থাকে। আমি তাদের অন্তরের উপর আবরণ রেখে দিয়েছি। যাতে একে না বোঝে এবং তাদের কানে বোঝা ভরে দিয়েছি। যদি তারা সব নিদর্শন অবলোকন করে, তবু সেগুলো বিশ্বাস করবে না। এমনকি তারা যখন আপনার কাছে ঝগড়া করতে আসে, তখন কাফিররা বলে—এটি পূর্ববর্তীদের কিচ্ছা-কাহিনী বৈ তো নয়। তারা এ থেকে বাধা প্রদান করে এবং এর থেকে পলায়ন করে। তারা নিজেদেরকে ধ্বংস করেছে, কিন্তু বুঝছে না।" [সূরা আনয়াম : ২৫-২৬]

কুরআন সম্পর্কে কাফিরদের সর্বপ্রকার বাক-বিতর্কের পরও, তারা তাদের সর্বপ্রকার ভ্রান্ত বাতিল প্রমাণ পেশ করার পরেও, তাদের সকল দাবি ও প্রমাণ খ-িত হয়ে যাওয়ার পরেও, তাদের মধ্য থেকে একদল একগুঁয়েমি, বাড়াবাড়ি, অস্বীকার ও অবাধ্যতার অবস্থানে রয়ে গেল। সর্বশেষ তারা নিজ অবস্থানেই সন্তুষ্ট থাকল। তদুপরি কুরআন আল্লাহ তায়ালার বাণী হওয়ার ব্যাপারে সকল প্রমাণাদির সম্মিলন হওয়া সত্ত্বেও তারা ঘোষণা দিল—কুরআনের প্রতি ঈমান আনতে অস্বীকৃতির কথা।

কাজেই আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ بِهٰذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِىْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرٰى إِذِ الظَّالِمُوْنَ مَوْقُوْفُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلٰى بَعْضِ ِالْقَوْلَ، يَقُوْلُ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِيْنَ ❖ قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدٰى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِيْنَ ❖ وَقَالَ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُوْنَنَا أَنْ نَّكْفُرَ بِاللهِ وَنَجْعَلَ لَهٗ أَنْدَادًا وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِىْ أَعْنَاقِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ❖

"কাফিররা বলে—আমরা কখনো এ কুরআনে বিশ্বাস করব না এবং এর পূর্ববর্তী কিতাবেও নয়। আপনি যদি পাপিষ্ঠদের দেখতেন, যখন তাদেরকে তাদের পালনকর্তার সামনে দাঁড় করানো হবে, তখন তারা পরস্পরে কথা কাটাকাটি করবে। যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত, তারা অহংকারীদেরকে বলবে, তোমরা না থাকলে আমরা নিশ্চয় মুমিন হতাম। অহংকারীরা দুর্বলকে বলবে, তোমাদের কাছে হেদায়েত আসার পর আমরা কি তোমাদেরকে বাধা দিয়েছিলাম? বরং তোমরাই তো ছিলে অপরাধী। দুর্বলরা অহংকারীদেরকে বলবে, বরং তোমরাই তো দিবা-রাত্রি চক্রান্ত করে আমাদেরকে নির্দেশ দিতে যেন আমরা আল্লাহ তায়ালাকে না মানি এবং তাঁর শরিক সাব্যস্ত করি। তারা যখন শাস্তি দেখবে, তখন মনের অনুতাপ মনেই রাখবে। বস্তুত আমি কাফিরদের গলায় বেড়ি পরাব। তারা সে প্রতিফলই পেয়ে থাকে যা তারা করত।"

[সূরা সাবা : ৩১-৩৩]

## আমাদের আহবান

এক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিয়ম ছিল, তিনি তাদেরকে কুরআন মানতে বারবার আহবান জানাতেন—তোমরা কুরআনকে বিশ্বাস করে তদনুযায়ী আমল করো! নয়তো পস্তাবে। আমরাও রাসূলের অনুসারী হিসেবে রাসূলের সুরেই তাদের প্রতি আহবান করছি, ফিরে আসুন কুরআনের পথে। অন্যথায় সেদিন কুরআন অস্বীকারকারী নেতা-কর্মীদের মধ্যে এমন বিতর্কই চলবে :

**কর্মীবৃন্দ :** তোমরা না হলে নিশ্চয় আমরা কুরআনের প্রতি ঈমান আনতাম।

**নেতৃবৃন্দ :** তোমাদের কাছে কুরআন আসার পর আমরা কি তোমাদের টেনে ধরে রেখেছি; বরং তোমরাই অপরাধী ছিলে?

**কর্মীবৃন্দ :** বরং তোমাদের দিবা-রাত্রির চক্রান্ত আমাদের ফিরিয়ে রেখেছে। যখন তোমরা আমাদেরকে আল্লাহকে অস্বীকার করতে এবং তাঁর সাথে শিরক করতে বলতে। এটাই আমাদেরকে কুফুরি করতে উদ্বুদ্ধ করত।

**ন্যায়ের আদালত :** উভয় দলই নিজের উপার্জন মাফিক বোঝা বহন করবে। সকলেই তাদের আমল অনুপাতে প্রতিদান পাবে। আর কাফিরদের গলায় বেড়ি পরিয়ে দেওয়া হবে।

**নেতৃবৃন্দ ও কর্মীবৃন্দ :** শাস্তি দেখার পর মনের অনুতাপ মনেই রাখবে। আর কিছুই বলতে পারবে না। চিরকাল শাস্তি ভোগ করতে থাকবে। আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন! [ছুরাউন মাআল মালাহিদাতি হাত্তাল আজম /শামেলা : ১/৪১২-৪১৫]

**চা স্টলে একদিন**

ঢাকা শহরের একটি চায়ের দোকানে জনৈক নাস্তিক তরুণ এবং একজন আস্তিক তরুণ ও কয়েকজন সাধারণ লোক গল্প জুড়ে দিল। তাদের গল্প ছিল স্পর্শকাতর। কিন্তু তাতে শিক্ষণীয় কিছু কথা রয়েছে। বিধায় এ স্বল্প পরিসরে তা উল্লেখ করা হচ্ছে।

**নাস্তিক তরুণ :** বুঝছ তো? আল্লাহ তায়ালা যদি থাকতই, তা হলে সমাজে কি গরিব থাকত? ওই গরিব লোকটার কি দোষ যে, আল্লাহ তায়ালা তাকে গরিব করে বানাল?

কথাটা কানে যেতেই নড়ে বসলো সেখানে উপস্থিত একজন মুসলিম তরুণ। কথাটি যাকে উদ্দেশ্য করে বলা হচ্ছে, সে সাধারণ একজন তরুণ। তাদেরকে ঘিরে বসে আছে আরো কয়েকজন। সবাইকে ভার্সিটি পড়ুয়াই মনে হচ্ছে। উৎসুক শ্রোতাদের পেয়ে নাস্তিক তরুণ আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল।

**মুসলিম তরুণ :** ভাই! আপনার যুক্তিটা তো বুঝলাম না। সমাজে গরিব আছে বলে স্রষ্টা নেই, এটা কেমন কথা হল?

**নাস্তিক তরুণ :** স্রষ্টা থাকলে তিনি কি আর গরিব লোকদের কষ্ট দেখে চোখ বুজে থাকতেন? অবশ্যই তিনি তার সৃষ্টিকে কষ্ট দিতেন না।

**মুসলিম তরুণ :** এটা কোনো কথা হল না। অনেক মানুষেরই অনেক টাকা পয়সা আছে। তারপরও তারা কষ্টে আছে। খালি গরিব হলেই কষ্ট, এটা ভুল। কষ্ট নাই, এমন কোনো মানুষ আমি পাইনি। কারো চেহারা নিয়ে কষ্ট, কারো টাক নিয়ে কষ্ট, কারো পছন্দ মতো স্ত্রী না পাওয়ার কষ্ট।

আপনার লজিকটা অনেকটা এ রকম– 'NOKIA N8, N97 আর ৬২১০ নিজেদের মধ্যে আলাপ করছে, 'আমাদের মধ্যে তো বৈচিত্র্য আছে; তাই NOKIA COMPANY বলে কিছু নাই'। এটা কোনো কথা হল?

**নাস্তিক তরুণ :** কিন্তু আল্লাহ তায়ালা আছে, এ প্রমাণ কেউ দিতে পারেনি। এর কোনো প্রমাণই নেই। আপনার কাছেও নেই; শুধুই অন্ধ বিশ্বাস।

**মুসলিম তরুণ :** (দৃঢ়ভাবে) জি না, আমার কাছে প্রমাণ আছে। বরং স্রষ্টায় না বিশ্বাস করাটাই অন্ধ বিশ্বাস।

**অন্য একজন** (পাশ থেকে) **:** কিভাবে?

**মুসলিম তরুণ :** আমি আপনাকে এমন প্রমাণ দিব, যা চূড়ান্তভাবে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব প্রমাণ করবে।

এবার তারা কিছুটা উৎসাহিত হল। দুজনই সমস্বরে বলল, কিভাবে?

**মুসলিম তরুণ :** দেখুন! আমাদের এ মহাবিশ্বটার যদি শুরু থাকে, তবে এ প্রশ্নটা সামনে চলে আসে যে, তা কিভাবে শুরু হল?

**নাস্তিক তরুণ :** কিন্তু মহাবিশ্ব তো শুরু নাও হতে পারে, অনন্তকাল ধরেও তো চলে আসতে পারে?

**মুসলিম তরুণ :** না, মহাবিশ্ব অনন্তকাল ধরে চলে আসতে পারে না। এর অবশ্যই অবশ্যই একটা শুরু আছে।

**নাস্তিক তরুণ :** আপনি এত Sure (নিশ্চিত) হলেন কিভাবে? (বাকিরা উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে।)

**মুসলিম তরুণ :** মনে করুন, আপনি বাসে উঠার জন্য লাইনে দাঁড়ালেন। আপনার সামনে আরো ৫ জন। আপনি ক'জনের পর বাসে উঠবেন?

**একজন** (পাশ থেকে) **:** ৫ জনের পর।

**মুসলিম তরুণ :** যদি আপনার সামনে ১০ জন থাকে, তা হলে?

**নাস্তিক তরুণ :** ১০ জনের পর।

**মুসলিম তরুণ :** কিন্তু যদি আপনার সামনে অসীম সংখ্যক লোক দাঁড়িয়ে থাকে? তা হলে কয়জনের পর বাসে উঠবেন?

(ব্যাপারটা হজম করতে সময় লাগল, কেউ কথা বলছে না।)

**মুসলিম তরুণ :** তার মানে আপনি কোনো দিন বাসে উঠতে পারবেন না। কারণ, আপনার সামনের লাইন কোনো দিনই শেষ হবে না (তা অসীম)। সুতরাং আপনার serial কখনো আসবে না। এখন এ মহাবিশ্ব যদি অনন্তকাল ধরে চলে থাকে, তবে একটা প্রশ্ন করি– পৃথিবীর জন্ম কবে হয়েছে? উত্তর হবে, পৃথিবীর জন্ম এখনো হয়নি আর কখনো হবে না। কেননা পৃথিবীর জন্ম হওয়ার আগে অসীমসংখ্যক ঘটনা ঘটতে হবে। আর অসীম মানে যার কোনো শেষ নাই। সেক্ষেত্রে পৃথিবীকে অনন্তকাল জন্ম

হওয়ার জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, যেমনি আপনি বাসে উঠতে লাইনে দাঁড়িয়ে আছেন। আপনার সামনের লাইন কোনো দিনও শেষ হবে না; আপনিও বাসে উঠতে পারবেন না। পৃথিবীর সামনের লাইনও কোনো দিন শেষ হবে না। এখন মনে করি, পৃথিবীর সামনে সূর্য দাঁড়িয়ে আছে, জন্ম হওয়ার অপেক্ষায়, তারও কোনো দিন জন্ম হবে না। কারণ, তার সামনের লাইনও তো অসীম! অসীমের সাথে ১ যোগ করলেও অসীম, ১ বিয়োগ করলেও অসীম, তা হলে আগের ঘটনাগুলোই যদি এখনও শেষ না হয়, তা হলে আমি, আপনি, পৃথিবী, সূর্য কোনো কিছুরই অস্তিত্ব সম্ভব হত না। অবশ্যই একটা ঘটনার মাধ্যমে মহাবিশ্বের শুরু হয়েছে, তারপর ১, ২, ৩, ৪ করে করে ঘটনাগুলো ঘটতে আরম্ভ করেছে। এখন আমি আপনি চায়ের দোকানে আলাপ করছি!

**একজন** (মাঝখান থেকে) : ভাই! আরেকটু বুঝিয়ে বলবেন কি?

**মুসলিম তরুণ** : কঠিন হয়ে গেল? আচ্ছা, মনে করেন, আপনি শত্রু পক্ষের কাউকে স্নাইপার রাইফেল দিয়ে গুলি করবেন। আপনার উপর পাঁচজন BOSS আছে। পর্যায়ক্রমে তাদের অনুমতি পেলে আপনি গুলি করবেন। এখন আপনাকে যদি অসীম সংখ্যক BOSS এর permission নিতে হয়, তা হলে আপনি কখন গুলি করবেন? আপনার permission নেওয়া শেষ হবে না, কোনো দিন গুলিও করা হবে না। আপনার বাসায় যদি অসীম সংখ্যক মালামাল থাকে, তা হলে কোনো দিনই বাসা change করতে পারবেন না। কারণ, মালামাল নামানো কোনো দিনই শেষ হবে না।

তার মানে কোনো একটা ঘটনা যদি ঘটে, বুঝতে হবে যে তার আগে অসীম সংখ্যক ঘটনা ঘটেনি, ঘটেছে সীমিত সংখ্যক ঘটনা, আর সীমিত ঘটনা মানেই এর একটা শুরু আছে। তারপর ঘটনাগুলো ঘটতে ঘটতে আজকের এ পর্যায়ে এসেছে। সুতরাং মহাবিশ্বের অবশ্যই শুরু আছে। যে রকম ৫ জনের বা ১০ জনের পর আপনি বাসে উঠতে পারছেন, সেই রকম ৫টা, ১০টা বা ১০০টা ঘটনা ঘটার পর পৃথিবীর জন্ম হয়েছে। এর দ্বারাই প্রমাণ হয়, মহাবিশ্বের শুরু আছে। এটা অনন্তকাল ধরে চলে আসা কোনো মহাবিশ্ব নয়।

বিংশ শতাব্দির শুরুতে গণ্ডমূর্খ নাস্তিক INTELLECTUAL লোকদের যে যুক্তি উঠতি তরুণ সমাজের মাঝে নাস্তিকতার হাওয়া ছড়িয়েছিল, তার এমন পতন দেখে হতবাক হয়ে গেল তরুণগুলো।

**নাস্তিক তরুণ** (একটু নমনীয় সুরে) : আপনার কথা সঠিক। (অজানা শঙ্কায় আমতা আমতা করে) কিন্তু এতেও প্রমাণ হয় না যে, স্রষ্টা আছে।

**মুসলিম তরুণ** : এখন অবশ্যম্ভাবী প্রশ্ন চলে আসে, তা হলে মহাবিশ্ব কিভাবে শুরু হল, মানে সৃষ্টি হল? সে কি নিজেকে নিজে তৈরি হয়েছে অর্থাৎ শূন্য থেকে নিজে নিজেই তৈরি হয়েছে নাকি অন্য কেউ তাকে তৈরি করেছে?

**নাস্তিক তরুণ** : আপনার যুক্তিটা কি? Stephen Hawkings কিন্তু বলেছেন, কোনো স্রষ্টা ছাড়াই এ মহাবিশ্ব নিজেকে নিজে তৈরি করেছে।

**মুসলিম তরুণ** : (তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে) Grand Design বইটার কথা বলছেন তো? ওই বইয়ের সমালোচনার জবাবে হকিংস নিজের মুখেই স্বীকার করেছেন, 'স্রষ্টা নেই, এ কথা কেউ প্রমাণ করতে পারবে না। কিন্তু বিজ্ঞান স্রষ্টাকে অপ্রয়োজনীয় বলে রায় দিয়েছে।' সুতরাং ওই বই থেকেও 'স্রষ্টা নেই' প্রমাণ হয় না বরং লেখক নিজেই বলছেন, স্রষ্টাকে আমাদের দরকার নেই। 'দরকার নেই আর স্রষ্টার অস্তিত্ব নেই' দুটি তো এক নয়।

(সকলে মুসলিম তরুণের দিকে তাকিয়ে...)

**মুসলিম তরুণ** : তা ভাই! আপনার নামটা যেন কি?

**নাস্তিক তরুণ** : রুম্মান।

**মুসলিম তরুণ** : চা চলবে ভাই? এ মামা, চা দাও সবাইকে

**নাস্তিক তরুণ** : যা বলছিলেন, হকিংস ...

**মুসলিম তরুণ** : হাঁ! উনি বলেছেন, Gravity-এর কারণে এ মহাবিশ্ব নিজেই নিজেকে শূন্য থেকে তৈরি করতে পারে।

**নাস্তিক তরুণ** : হাঁ! এতে সমস্যা কোথায়? Virtual Gravitons-এর কারণে এ Gravity তৈরি হয়েছে। যার ফলে শূন্য থেকে এ মহাবিশ্বের সৃষ্টি।

**মুসলিম তরুণ** : সমস্যা আছে। Gravity একটা গাণিতিক সমীকরণ। দুটি বস্তুর মাঝে ভর অনুপাতে আকর্ষণ বুঝাতে এটা ব্যবহৃত হয়। কাজেই মহাবিশ্ব যদি শূন্য থেকেই আসে, তা হলে তো সেখানে কোনো বস্তুই ছিল না, তা হলে Gravity কোত্থেকে আসল? আপনি বলছেন যে, Virtual Gravitons ছিল, তখনো সেই একই প্রশ্ন এসে যায়, এরা কি অনন্তকাল ছিল? অনন্তকাল ধরে থাকতে পারে না। আর একটা জিনিস নাই, ছিল না; আবার তা হল, আবার নাই আবার হল, এ তো পুরোই irrational কথাবার্তা। আপনার সামনে আমি দাঁড়িয়ে আছি, আবার অদৃশ্য হয়ে গেলাম, আবার দাঁড়িয়ে আছি, আবার অদৃশ্য হয়ে গেলাম; science দেখি সিন্দাবাদের দৈত্যের মতো কথা

বলছে। Infact তার চেয়েও আজব কথা বলেছেন হকিংস। মানে Comment করতে তো আর পয়সা লাগে না। science বুঝে না এমন নাস্তিকরাই আসলে হকিংসকে নিয়ে হৈ চৈ করে। Richard Dawkins-ও তেমনই একজন। আমাদের দেশের নাস্তিকরাও না বুঝে ফালাফালি করে। বাস্তবে অনেক বিজ্ঞানীই হকিংসের সাথে একমত নন।

আর gravity না হয় gravitons থেকে হলো। যার কারণে মহাবিশ্ব হলো। তা হলে gravitons কোত্থেকে হলো? দ্বিতীয় আরেকটা প্রশ্ন হল, হকিংস শূন্য বলতে যে Quantum vacuum বুঝিয়েছেন, তা কিন্তু মূলত শূন্য (nothing) নয়। সেখানে energy বিরাজ করত। এখন energy Avi gravity এ মহাবিশ্বেরই অংশ। হকিংসের কথার সাদামাটা মানে হল, আপনি নিজেকে তৈরি করেছেন শূন্য থেকে, নিজেকে তৈরি করার আগে আপনার হাত আগে থেকেই ছিল (যেটা আপনারই অংশ)। তারপর সেই হাত আপনাকে তৈরি করেছে। এখন প্রশ্ন হল, হাত কিভাবে ছিল? এটা একটা অবাস্তব কথাবার্তা।

মহাবিশ্বের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত একটা জিনিস, মহাবিশ্ব তৈরি হওয়ার আগে থেকেই ছিল। এরপর মহাবিশ্বকে তৈরি করে সে নিজেই মহাবিশ্বের পেটের ভিতর ঢুকে পড়েছে, How Funny? Seems like fairy tales! অর্থাৎ আপনি আগে থেকেই ছিলেন। এরপর আপনার মাকে আপনি সৃষ্টি করেছেন। এরপর তার পেটের ভিতর ঢুকে বসে আছেন আর মায়ের কাছ থেকে পুষ্টি নিয়ে বেঁচে আছেন। বাহ্! বাহ! দারুণ মজা পেলাম।

এর চেয়ে অবাস্তব কথা আর কি হতে পারে? এ থেকেই বুঝা যায়, মহাবিশ্ব শূন্য থেকে আপনা আপনি তৈরি হয়েছে, এরকম কোনো তত্ত্ব-প্রমাণ বিজ্ঞানের কাছে আদৌ নেই। এটা শুধু থিওরি হিসেবে হকিংসের কল্পনায় Fantasy আছে, যার বাস্তব ভিত্তি নেই। না হলে কি আর হকিংস সাহেব বলতেন—'স্রষ্টার অনস্তিত্ব প্রমাণ করা সম্ভব নয়'। কম ঠেলায় কি আর বিড়াল গাছে ওঠে?

এদের ব্যাপারেই চৌদ্দশ' বছর আগে বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহ তায়ালা কুরআন পাকের সূরা আত-তূরে ইরশাদ করেছেন–

أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ۞ أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ

'তারা কি এমনি এমনিই তৈরি হয়েছে, নাকি তারা নিজেরাই স্রষ্টা? না তারা নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল সৃষ্টি করেছে? বরং তারা বিশ্বাস করে না।'

[সূরা তূর : ৩৫-৩৬]

**নাস্তিক তরুণ :** (ব্যঙ্গ করে) এ কথা আপনি মহাজ্ঞানী বুঝলেন আর হকিংস বুঝল না!?

**মুসলিম তরুণ :** (তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে) হকিংস তো অজ্ঞানান্ধ (বিজ্ঞানে অন্ধ = অজ্ঞানান্ধ)। একজন রিকশাওয়ালাও তার চেয়ে rational। এক রিকশাওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল—'চাচা! আল্লাহ তায়ালা আছেন, এটা বুঝলেন ক্যামনে?' কিছুক্ষণ চুপ থেকে তিনি উত্তর দিলেন, 'বাবারে, আমি প্যাডেল চাপি, চাক্কা ঘুরে, না চাপলে ঘুরে না। আর এত বড় দুনিয়া ঘুরতাছে, প্যাডেল তো কেউ একজন নিশ্চয় মারতাছে'

হকিংস সাহেবের এ বোধ-বুদ্ধিও নাই। দেখেননা এখন কমেডি শোতে অভিনয় শুরু করেছেন! এদের ব্যাপারেই আল্লাহ তায়ালা বলেছেন–

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ❁

"আর আমি সৃষ্টি করেছি দোজখের জন্য বহু জিন ও মানুষ। তাদের অন্তর রয়েছে, তার দ্বারা বিবেচনা করে না, তাদের চোখ রয়েছে, তার দ্বারা দেখে না, তাদের কান রয়েছে, তার দ্বারা শুনে না। তারা চতুষ্পদ জন্তুর মতো বরং তার চেয়েও নিকৃষ্টতর। এরাই হল গাফেল, উদাসীন।" [সূরা আ'রাফ-১৭৯]

**দ্বিতীয় তরুণ :** তা হলে কি দাঁড়াল? মহাবিশ্ব অসীম নয়, এর শুরু আছে। শুরুটা সে নিজে নিজে করেনি। তার মানে নিশ্চয় কেউ একজন শুরুতে এ মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন। তিনি হলেন আল্লাহ। তিনিই সকলের স্রষ্টা।

**নাস্তিক তরুণ** (কিছুক্ষণ ভেবে) **:** কিন্তু একটা সমস্যা তো রয়েই যাচ্ছে। তা হলে ওই স্রষ্টা আসল কোত্থেকে? উনাকে কে বানাইছে?

**অন্য একজন** (পাশ থেকে খোঁচা মেরে) **:** এটা তো শয়তানের প্রশ্ন। তুই তো শয়তান হয়ে গেলিরে! (হাসির রোল উঠল।)

**মুসলিম তরুণ :** স্রষ্টাকে যদি অন্য কেউ বানায়, তা হলে প্রশ্ন আসে—তাকে কে বানাল? সেই স্রষ্টার স্রষ্টা কে? এভাবে দ্বিতীয়-তৃতীয় স্রষ্টার স্রষ্টা কে? এভাবে ব্যাপারটা আবার অসীম পর্যন্ত চলতে থাকবে। একটু আগেই কিন্তু আমরা প্রমাণ করেছি, কোনো অসীম সংখ্যক ঘটনা সম্ভব নয়। তার মানে এ মহাবিশ্বের যিনি স্রষ্টা, তার কোনো স্রষ্টা নেই।

**নাস্তিক তরুণ :** তা হলে তিনি অস্তিত্বে আসলেন কিভাবে? তিনি কি নিজেকে নিজেই বানিয়েছেন?

**মুসলিম তরুণ :** তাও সম্ভব নয়। একটা জিনিস নাই, সে আবার নিজেকে নিজে কিভাবে বানাবে? আর নিজে যদি নিজেকে বানায়, তার অর্থ তিনি নিজেকে বানানোর আগে ছিলেন না। নিজেকে যখন বানালেন তখন থেকে তার শুরু। তা হলে কী দিয়ে বানালেন? আর শুরু মানেই তিনি সীমিত।

আর তাকে যদি কেউ বানায়, তা নিজেই নিজেকে বানাক আর অন্য কেউ বানাক, এখানে physical properties চলে আসছে। physical properties মানে তিনি নিয়ন্ত্রিত। তার উপর বৈশিষ্ট্য আরোপ করা হয়েছে। তাকে অন্য কারো ইশারায় চলতে হয়। তিনি স্বাধীন নন। অথচ স্রষ্টা হতে হলে তাকে হতে হবে নিয়ন্ত্রণমুক্ত, স্বাধীন এবং অনির্ভরশীল।

আর মূলকথা হল, একটা জিনিস নাই, সে আবার নিজেকে কিভাবে, কি দিয়ে বানাবে? শূন্য থেকে নিজে নিজে কিছু হয় না—এটা তো আমরা একটু আগেই আলোচনা করলাম।

**নাস্তিক তরুণ :** তা হলে স্রষ্টা আসল কোত্থেকে?

**মুসলিম তরুণ :** তিনি অসৃষ্ট। তিনি কোথাও হতে আসেননি। তিনি আগে থেকেই ছিলেন। অনাদিকাল থেকে ছিলেন। অনন্তকাল থাকবেন।

(হঠাৎ ভিড়ের মধ্যে গুঞ্জন উঠল—এটা কি হল, বুঝলাম না? অসৃষ্ট মানে? তা হলে মহাবিশ্বের অসৃষ্ট হতে সমস্যা কোথায়? এদিকে মুসলিম তরুণের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ল।)

**মুসলিম তরুণ :** আমার বক্তব্যটা একটু গুছিয়ে বলি। মহাবিশ্বকে study করে আমরা বুঝলাম যে, তার একজন স্রষ্টা আছে, তাই না?

(আশপাশে তাকিয়ে তেমন একটা support পেল না মুসলিম তরুণ। দু-একজন হাঁ-সূচক মাথা নাড়ল। তবু সে আবার বলতে শুরু করল)।

মহাবিশ্ব স্রষ্টা ছাড়া সম্ভব নয়। এখন এ স্রষ্টাকে হয় কেউ তৈরি করেছে, না হয় তিনি নিজেকে নিজে তৈরি করেছেন। এ দুটো বাদ দিলে মাত্র একটাই option থাকে। আর তা হল স্রষ্টা অসৃষ্ট। এর বাইরে আর কোনো option নাই। প্রথম দুটো point যে ভুল, তা আমি আলোচনা করেছি। আর বাকি একটাই option থাকে যে, তিনি একজন অসৃষ্ট স্রষ্টা (uncreated Creator)। তিনি যদি অসৃষ্ট (uncreated) না হন, তা হলে তিনিও 'সৃষ্টি' (created) হয়ে যান। আমাদের বুঝতে হবে, 'স্রষ্টা' (creator) আর 'সৃষ্টির' (created) মধ্যে পার্থক্য আছে। সৃষ্টি মানেই সীমাবদ্ধতা (limitation),

নির্ভরশীলতা (dependency), দুর্বলতা (weakness)। কিন্তু স্রষ্টা এ সকল সীমাবদ্ধতার উর্ধ্বে। এজন্যই স্রষ্টাকে সৃষ্টি করা যায় না। তাকে হতে হবে অসৃষ্ট (uncreated)।

(এতক্ষণে কয়েকজন বুঝল, কিন্তু প্রশ্ন শেষ হয়নি।)

**নাস্তিক তরুণ :** মহাবিশ্বের অসৃষ্ট হতে সমস্যা কোথায়? আর স্রষ্টার যে বৈশিষ্ট্য আপনি বলেছেন, তা তো কল্পনায়ও আনতে পারছি না। পুরোপুরি বোধগম্যও হচ্ছে না!

**মুসলিম তরুণ :** মহাবিশ্বের ব্যাপারটা তো বললামই, সে সীমিত (finite), সে অস্তিত্বের জন্য নির্ভরশীল। আর যে অস্তিত্বের জন্য অন্য কারো উপর নির্ভরশীল, সে তো সৃষ্টি (created)। তাই তো সে অসৃষ্ট (uncreated) নয়, তার একজন স্রষ্টাকে দরকার, কিন্তু স্রষ্টার অন্য কোনো স্রষ্টা দরকার নেই। স্রষ্টার reality আর আমার-আপনার reality এক নয়। একটা unknown reality কে আপনি known reality'র সাথে match করাতে পারবেন না।

**মোটকথা :** একটা অজানা reality সম্পর্কে যদি আপনাকে এসে বলা হয় আর আপনি যদি তা sense করতে না পারেন, তা হলে কোনো দিনই বুঝবেন না ওই reality কেমন। ওই reality বুঝতে হলে আপনাকে ওই reality-তে অবস্থান করতে হবে। স্রষ্টার reality আমাদের বাইরের reality, যা আমরা কখনো বুঝব না। এজন্যই আল্লাহ তায়ালা কেমন, কিভাবে কাজ করেন, কেমনে থাকেন–এ বিষয় নিয়ে চিন্তা করতে হাদিস শরিফে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ, একটা অজানা reality সম্পর্কে চিন্তা করতে গিয়ে আমরা শুধু fantasy নিয়ে পড়ে থাকব। এ কারণে আমরা মহাবিশ্বকে study করে স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারি, কিন্তু তিনি কেমন, কিভাবে থাকেন, কিভাবে কাজ করেন, তা প্রমাণ করতে পারি না, এটা আমাদের সীমাবদ্ধতা।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন–

يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُوْلُ مَنْ خَلَقَ كَذَا مَنْ خَلَقَ كَذَا
حَتّٰى يَقُوْلَ مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ وَلْيَنْتَهِ.

তোমাদের কারো কারো কাছে শয়তান আসে। তারপর বলে, এমনটি কে সৃষ্টি করেছে, এমনটি কে সৃষ্টি করেছে? একপর্যায়ে বলে বসে, তা হলে তোমার রবকে কে সৃষ্টি করেছে? সুতরাং কেউ যখন এ প্রশ্নে পৌঁছে যাবে, সে যেন সাথে সাথে আল্লাহ তায়ালার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং বিরত থাকে। [বুখারি, হাদিস নং ৩২৭৬; মুসলিম, হাদিস নং ৩৬২]

রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো ইরশাদ করেছেন–

لَا يَزَالُ النَّاسُ يَتَسَاءَلُونَ حَتَّى يُقَالَ هٰذَا خَلَقَ اللهُ الْخَلْقَ فَمَنْ خَلَقَ اللهَ

فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا فَلْيَقُلْ آمَنْتُ بِاللهِ

মানুষ প্রশ্ন-প্রতিপ্রশ্ন করতে থাকে। একপর্যায়ে বলা হয়, সব সৃষ্টিকে তো আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টি করেছেন, তা হলে আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছে? সুতরাং যে ব্যক্তি তার মনের মধ্যে এমন কিছু বুঝতে পারে, সে যেন বলে দেয়– 'আমি আল্লাহর ওপর ঈমান আনয়ন করলাম।' [মুসলিম, হাদিস নং ৩৬০]

রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো ইরশাদ করেছেন–

لَا تَفَكَّرُوا فِي اللهِ وَتَفَكَّرُوا فِيمَا خَلَقَ

'তোমরা আল্লাহতে গবেষণা করো না; বরং তাঁর সৃষ্টিতে গবেষণা কর।'
[উসূলুস সুন্নাহ/ইবনে আবী যিমনীন (মৃ. ৩৯৯) হাদিস নং ২৬]

**অন্য একজন** (মাঝখান থেকে) : ও, তাই বুঝি স্রষ্টার কোনো মূর্তি থাকতে পারে না! ছবি থাকতে পারে না? কেননা তাকে যদি নাই দেখলাম, তার বাস্তবতা যদি নাই বুঝলাম, তা হলে তার মূর্তি বানালে তো তাঁর উপর মিথ্যা আরোপ করা হয়। তাকে তো দেখিই নি কোনোদিন, মূর্তি বানাব কেমনে? মূর্তি তো বানাব আমার কল্পনা দিয়ে, কিন্তু সেটা তো স্রষ্টা নয়।

(প্রশংসার দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল মুসলিম তরুণ। ভাবল, না! সব নাস্তিক গাধা নয়।)

**মুসলিম তরুণ** : Exactly! আপনি ঠিক point টাই ধরেছেন। তাই ইসলাম বলেছে স্রষ্টার সাথে এ মহাবিশ্বের কোনো কিছুর তুলনা করা যায় না। তিনি অতুলনীয়। তাই মূর্তি বানালে স্রষ্টার উপর মিথ্যা আরোপ করা হয়।

(মঞ্চে এবার নতুন একজন আবির্ভূত হলেন।)

**নতুন একজন** : তার মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন, স্রষ্টা unlimited এবং independent।

(মুসলিম তরুণ ঘুরে তার দিকে তাকাল। মাঝ বয়সী ভদ্রলোক, এক কোণায় বসে মনোযোগ দিয়ে কথা শুনছিলেন এতক্ষণ। মুসলিম তরুণ বুঝল, tough guy মজাটা শুরু হবে এখন।)

**মুসলিম তরুণ** : জী, স্রষ্টা unlimited এবং independent।

(মৃদু হাসলেন ভদ্রলোক।)

**মাঝ বয়সী বাবু** : আপনি কি quark-এর কথা শুনেছেন? quark-কে কিন্তু আমরা প্রকৃতিতে আলাদাভাবে, মানে স্বাধীনভাবে বিচরণশীল পাই না।

সুতরাং একে আপনি limited বলতে পারবেন না। আর একে নিয়ন্ত্রণও করা যায় না; মানে অন্য কেউ ওর উপর খবরদারি করতে পারে না। সুতরাং একে independent বলতে পারেন। তা হলে কি বলতে চাচ্ছেন, quark-ই আপনার আল্লাহ? (হা হা হা)

**মুসলিম তরুণ :** আপনার এ কথাটাই Atheist Bangladesh Group-এর Admin আমাকে বলেছিল। তখন আমি quark সম্পর্কে জানতাম না। তাই একটু ধোঁকায় পড়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু পরে দেখি, (হাত দিয়ে মাছি তাড়ানোর ভঙ্গি করল মুসলিম তরুণ)। আপনি নিশ্চয় জানেন, quark-কে laboratory-তে তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। এর ভর আছে। এর ঘূর্ণন আছে। সুতরাং একে আপনি independent বলতে পারেন না। আর ধারণা করা হয়, নরম bang এর শুরুতে সেকেন্ডের ভগ্নাংশ সময়ে এরা প্রকৃতিতে বিরাজ করেছিল। সুতরাং unlimited একটা জিনিস limited মহাবিশ্বে বিরাজ করতে পারে না। আপনি আমার আলোচনা এতক্ষণ শুনে থাকলে বুঝবেন।

**মাঝ বয়সী বাবু :** আল্লাহ তায়ালারও তো বৈশিষ্ট্য আছে। তিনি কি জানি ... (মনে করার ভান করলেন) আর-রহমান, আর-রহিম ইত্যাদি ইত্যাদি। তা হলে তাকে dependent আর limited বলছেন না কেন?

(ব্যাটার নির্বুদ্ধিতায় বিরক্ত হল মুসলিম তরুণ।)

**মুসলিম তরুণ :** উনি যে রহমান, রহিম এগুলা উনার personality। এগুলা কোনো physical বৈশিষ্ট্য নয়। quark-এর বৈশিষ্ট্যগুলা physical বৈশিষ্ট্য, personality নয়। আর ফিজিক্যাল বৈশিষ্ট্য মানেই এগুলো আপনার উপর আরোপ করা হয়েছে। তার মানে আপনি independent নন, আপনি খাঁচার ভিতর অচিন পাখি। আপনার হাত দেড় ফুট লম্বা। এটা physical বৈশিষ্ট্য। কিন্তু আপনি মানুষের সাথে ভালো আচরণ করেন, এটা আপনার personality। আর physical property কাউকে limited করে তোলে; কিন্তু personality কাউকে limited করে না।

**মাঝ বয়সী বাবু :** কিন্তু সব পারে অর্থাৎ Omnipotent একজন স্রষ্টার কিন্তু সমস্যা আছে। আত্মবিরোধের সমস্যা। তা হল, আল্লাহ তায়ালা কি এমন কোনো পাথর তৈরি করতে পারেন, যেটা উনি ধ্বংস করতে পারেন না? আপনি যদি পাথর তৈরি করতে পারে বলেন, তা হলে তিনি ধ্বংস করতে পারবে না। আর যদি বলেন এমন পাথর তৈরি করতে পারেন না, তা হলে তো আর এ স্রষ্টা সবকিছু পারে না। দুদিকেই সমস্যা। আত্মবিরোধ। সুতরাং আল্লাহ তায়ালা সবকিছু পারেন না!

(সকলের চোখ এখন মুসলিম তরুণের দিকে।)

**মুসলিম তরুণ :** এ প্রশ্নটার structure-এ ভুল আছে। এখানে মহান আল্লাহর অসীম ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করার অপচেষ্টা করা হয়েছে। সুতরাং এ প্রশ্ন উত্তরযোগ্য নয়। একটা কথা মনে রাখবেন! সকল প্রশ্নের উত্তর হয় না। যেমন, কেউ আপনাকে জিজ্ঞাসা করল আপনি জারজ না-কি হারামজাদা? আপনি এর কী উত্তর দিবেন?

(ফাটা বেলুনের মতো চুপসে গেলেন বাবু। এ প্রশ্নের এমন উত্তর তিনি জীবনেও শুনেননি। মুসলিম তরুণ প্রশ্নটার সার্জারি করে আবর্জনার স্তূপে ছুঁড়ে ফেলল, এতে তিনি স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। অথচ এ প্রশ্ন দ্বারাই তিনি কত তরুণকে নাস্তিক ও কত হুজুরকে ঘোল খাইয়ে অপমান করেছেন!)

**মাঝ বয়সী বাবু :** বুঝলাম, কিন্তু স্রষ্টা থাকলেই যে তাকে মানতে হবে, এমন কোনো কথা নেই।

**মুসলিম তরুণ :** তার মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন, এ মহাবিশ্ব তৈরির পিছনে কোনো objective নেই

**মাঝ বয়সী বাবু :** না কোনো objective নাই।

**মুসলিম তরুণ :** কেন আপনার এমন মনে হল?

**মাঝ বয়সী বাবু :** Objective থাকলে কি মানবজাতির মধ্যে এত হানাহানি, মারামারি, কাটাকাটি হত? যে যার মতো খুশি, চলে। Objective থাকলে কি আর এরকম হত?

**মুসলিম তরুণ :** (কৌতুকপূর্ণ ভঙ্গিতে) তা হলে তো নাস্তিকরা মানবজাতির জন্য বড় উপকার করে যেতে পারে!

**মাঝ বয়সী বাবু :** কিভাবে? (সন্দেহপূর্ণ দৃষ্টিতে)

**মুসলিম তরুণ :** যেহেতু জীবনের কোনো অবজেক্টিভ নাই, তাই আপনারা একটা কাজ করলেই পারেন। (আল্লাহ্ না করুন!) গণহারে সবাই গলায় দড়ি দিতে পারেন। এতে বাংলাদেশের জনসংখ্যার সমস্যার সমাধান হবে। আপনারা মরে গিয়ে তেল, গ্যাস হবেন, আমাদের জ্বালানি সমস্যার সমাধান হবে। পৃথিবীতে আস্তিক-নাস্তিকের মারামারিও থাকবে না। এতে আপনারা মানবজাতির বিশাল উপকার সাধন করতে পারেন।

(এ কথা শুনে সবাই দাঁত কেলিয়ে হাসতে লাগল। চা বিক্রেতার পান খাওয়া লাল দাঁতও বেরিয়ে পড়ল।)

**মুসলিম তরুণ :** কি মামু? তোমার দোকানে না হয় দু' কাপ চা কম বিক্রি হবে, মাইন্ড করো না!

(দাঁত ৩২টাই বের হল এবার। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলেন মাঝ বয়সী বাবু।)

**মাঝ বয়সী বাবু :** ওরে বাপরে! সাড়ে এগারটা বেজে গেল। এবার উঠতে হয় ভাই ...। (সবাই মোচড় দেওয়া শুরু করল।)

**মুসলিম তরুণ :** হাঁ! হাঁ! আমাকেও উঠতে হবে। তা আপনি স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাস করছেন?

**মাঝ বয়সী বাবু :** না, আমি সংশয়বাদী। কোনো দিন clear cut প্রমাণ পেলে বিশ্বাস করে নিব।

**মুসলিম তরুণ :** দেইখেন আবার, নিজের সন্তানের পিতৃত্ব নিয়ে কিন্তু সংশয়ে থাইকেন না আবার! (বলেই বুঝল খোঁচাটা মারা ঠিক হয় নি।)

**ইমাম আযম রহ. ও জনৈক নাস্তিক**

**নাস্তিক :** তোমার খোদা কবে জন্মগ্রহন করেছেন?

**আবু হানিফা :** আল্লাহ সময়, কাল ও যুগের আগে থেকে আছেন। (তাঁর কোনো শুরু নেই)।

**নাস্তিক :** পার্থিব জীবনের নমুনা থেকে বল!

**আবু হানিফা :** ৩ (তিন)-এর আগের বাস্তব সংখ্যা কত?

**নাস্তিক :** ২ (দুই)।

**আবু হানিফা :** ২ (দুই)-এর আগে?

**নাস্তিক :** ১ (এক)।

**আবু হানিফা :** ১ (এক)-এর আগের বাস্তব সংখ্যা কত?

**নাস্তিক :** নাই।

**আবু হানিফা :** যদি তোমার পার্থিব সংখ্যা ১ এর আগে কোনো বাস্তব কিছু না থাকে, তবে যিনি শাশ্বত, এক ও অদ্বিতীয়, তাঁর আগে কি থাকতে পারে?

**নাস্তিক :** তোমার খোদা কোন্ দিকে মুখ করে আছেন?

**আবু হানিফা :** যদি কোনো অন্ধকার স্থানে মোমবাতি আনা হয়, সেটা কোন্ দিকে মুখ করে থাকে?

**নাস্তিক :** সব দিকে।

**আবু হানিফা :** যদি তোমার পার্থিব কৃত্রিম আলো সব দিকে মুখ করে থাকতে পারে, তা হলে যিনি আলো তৈরি করেছেন তিনি কি পারেন না?

**নাস্তিক :** তোমার খোদা কঠিন, তরল, না বায়বীয়?

**আবু হানিফা :** আপনি কি মৃত ব্যক্তির পাশে কখনো ছিলেন?

**নাস্তিক :** হাঁ! ছিলাম।

**আবু হানিফা :** মৃত্যুর পর সে কথা বলে?

**নাস্তিক :** অবশ্যই না।

**আবু হানিফা :** মৃত্যুর আগে সে চলতে, কথা বলতে পারে কিন্তু মরার পর সে নির্জীব আর বরফ হয় কেন? কে তার এ অবস্থা করে?

**নাস্তিক :** তার আত্মা চলে যায়।

**আবু হানিফা :** আত্মা কেমন আমাকে বলুন—কঠিন, তরল না-কি বায়বীয়?

**নাস্তিক :** আমি জানি না।

**আবু হানিফা :** যদি পার্থিব আত্মার কোনো সংজ্ঞা না দিতে পারেন, তা হলে কিভাবে আল্লাহ্ তায়ালার অবস্থা বলা সম্ভব?

**নাস্তিক :** তোমার খোদা কোথায় থাকে?

**আবু হানিফা :** আপনি কি বাটিতে করে এক গ্লাস দুধ নিয়ে আসতে পারেন?

**নাস্তিক :** ঠিক আছে। (নাস্তিকটি দুধ নিয়ে আসল।)

**আবু হানিফা :** বলুনতো, এর মধ্যে মাখন কোথায় থাকে?

**নাস্তিক :** সবখানে।

**আবু হানিফা :** যদি মাখনের মতো সৃষ্ট বস্তু দুধের সবখানে থাকে, তা হলে আল্লাহকে কেন একটি স্থানেই থাকতে হবে? এটা তো বিরাট আশ্চর্য!

**নাস্তিক :** জান্নাতে তো টয়লেট নাই তা হলে খাবার পর শৌচকাজ করবে মানুষ কিভাবে?

**আবু হানিফা :** মায়ের পেটে বাচ্চা ৯ মাস কিভাবে শৌচকাজ করে, সেটার তো দরকার হয় না। তা হলে জান্নাতে দরকার হবে কেন?

**নাস্তিক :** কিভাবে জান্নাতে খাওয়া ও উপভোগ করার পর জিনিস বাড়বে?

**আবু হানিফা :** যেভাবে জ্ঞান যত দান করা হয় তত বাড়ে।

**এক দরবেশের উচিত জবাব**

একবার এক নাস্তিক জনৈক দরবেশের দরবারে এসে চারটি প্রশ্নের জবাব জানতে চেয়ে বলল– আপনি যদি আমাকে এ চারটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারেন, তবে আমি মুসলমান হয়ে যাব। প্রশ্ন চারটি হল–

১. বলা হয়— আল্লাহ তায়ালা সকল কিছুর স্রষ্টা। যদি তাই হয়, তবে আমরা তাকে দেখতে পাই না কেন?

২. না দেখেই আল্লাহ তায়ালাকে বিশ্বাস করার কথা বলা হয় কেন?

৩. ইবলিস তথা জিন জাতি আগুনের তৈরি। সুতরাং ওরা জাহান্নামের আগুনে কিভাবে পুড়বে? অর্থাৎ আগুনকে আগুন দিয়ে কিভাবে পোড়ানো হবে?

৪. বলা হয়— আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা ছাড়া কিছুই হয় না। তাই যদি হয়, তা হলে মানুষ তার কৃতকর্মের জন্য শাস্তি পাবে কেন?

দরবেশ প্রশ্নগুলো শুনে নাস্তিক লোকটিকে কৃত্রিম ক্রোধ দেখিয়ে পার্শ্বে পতিত একটি মাটির ঢেলা হাতে নিয়ে ওই নাস্তিককে ছুঁড়ে মারলেন। এতে লোকটির মাথা আঘাত লেগে ফেটে গেল। তখন দরবেশ বললেন, এ হচ্ছে তোমার চারটি প্রশ্নের জবাব।

এরপর মাটির ঢেলার আঘাতে আহত নাস্তিক লোকটি আদালতে গিয়ে কাজির দরবারে দরবেশের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করল। কাজি ওই নাস্তিকের বিবরণ শুনে দরবেশকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি ওই ব্যক্তির প্রশ্নের জবাব না দিয়ে তাকে এভাবে মারলেন কেন?

উত্তরে দরবেশ বললেন, এটাই হল তার চারটি প্রশ্নের সঠিক জবাব। এর দ্বারা তাকে আহত করা আমার উদ্দেশ্য ছিল না।

ঢিল ছুঁড়ে কিভাবে প্রশ্ন চারটির জবাব দিলেন, সে রহস্য উদঘাটন করার অনুরোধ করা হলে দরবেশ বললেন—

লোকটির প্রথম প্রশ্ন ছিল, আল্লাহ সবকিছুর স্রষ্টা অথচ তাঁকে দেখা যায় না কেন? জবাব হল, ঢিলের আঘাতে এ ব্যক্তি ব্যথা পাওয়ার কথা বলছে। এর অস্তিত্ব কোথায়? ব্যথার যদি অস্তিত্ব থেকেই থাকে, তবে তা দেখা যায় না কেন? ব্যথা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও যেমনি তা চোখে দেখা যায় না, তেমনি আল্লাহ তায়ালা অস্তিত্বশীল হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে চর্মচোখে দেখা যায় না।

তার দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল, আল্লাহ তায়ালাকে না দেখে বিশ্বাস করব কেন? চোখে না দেখে যদি ব্যথার কথা বিশ্বাস করা যায়, তবে আল্লাহ তায়ালাকে না দেখে বিশ্বাস করতে অসুবিধা কোথায়?

তার তৃতীয় প্রশ্ন ছিল, শয়তান ও জিন আগুনের তৈরি হয়েও জাহান্নামের আগুনে পুড়বে কিভাবে? মানুষ তো মাটির তৈরি। মাটির তৈরি মানুষকে যদি মাটির ঢেলার আঘাতে ব্যথা দেওয়া যায়, তা হলে আগুনের তৈরি জিনকে আগুনে পোড়ানো যাবে না কেন?

তার চতুর্থ প্রশ্ন ছিল, আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা ছাড়া কোনো কিছুই ঘটে না, তা হলে মানুষের কৃতকর্মের জন্য মানুষকে শাস্তি দেওয়া হবে কেন?

এর জবাব হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছায় যখন সবকিছু হয়, তা হলে ঢিল ছুঁড়ে মারা, তার গায়ে আঘাত লাগা, রক্তপাত ও ব্যথা সবই তো তাঁর ইচ্ছায় হয়েছে। সুতরাং এ ব্যাপারে আদালতে অভিযোগ করার কি আছে? এর যদি অভিযোগ ও বিচার চলে এবং শাস্তি বর্তায়, তবে মানুষের কৃতকর্মের বিচার, সুফল ও কুফল ভোগ কেন মিথ্যা হবে?

দরবেশের এ অদ্ভুত জবাব শুনে নাস্তিক লোকটি হতভম্ব হয়ে গেল এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করল। [মাসিক আত-তাহ্‌রিক/অনলাইন]

## নাস্তিকতা থেকে ইসলামের ছায়ায়

—মাওলানা আব্দুল মাজিদ দরিয়াবাদি রহ.

### নাস্তিকতার সূচনা

একটি ধার্মিক সম্ভ্রান্ত পরিবারে আমার জন্ম। ধর্মীয় পরিবেশেই প্রতিপালন হয়েছে আমার। বড় বোনকে নিয়মিত তাহাজ্জুদ পড়তে দেখেছি। আম্মাজানও নামায-রোযার প্রতি যত্নবান ছিলেন; বড় ধর্মপ্রাণ ছিলেন। বড় ভাইও একদম বেনামাযী কিংবা ধর্মবিরোধী ছিলেন না। আমাদের পরিবারে ধার্মিকতার সাথে সাথে ধর্মীয় জ্ঞানের চর্চা ও অনুশীলন ছিল। দাদাজান বিদগ্ধ ফকিহ ও মুফতি ছিলেন। নিয়মিত ফতওয়া প্রদান করতেন। নানাজানের দীনি জ্ঞান-গরিমা ও ধর্মীয় কীর্তি-অবদানের খ্যাতি জীবনের সূচনালগ্ন থেকেই শুনেছি। চাচাজান তো একেবারে শৈশবকাল থেকেই লেবাস-পোশাক সম্পূর্ণ মৌলভি ধরনের পরতেন। ছোট্ট দেহে ছোট্ট জুব্বা। মাথায় চন্দন কালারের বড় পাগড়ি। হাতে বড় দানার তাস্‌বিহ। পড়াশোনার অধিকাংশ বইপুস্তক ধর্মীয়। গৃহশিক্ষক হলেন একজন মৌলভি সাহেব। পাঠশালার আরবি শিক্ষক হলেন একজন হাজি সাহেব। উভয়ের সান্নিধ্য সোনায় সোহাগার কাজ করছিল।

বার-তের বছর বয়সে যখন সপ্তম শ্রেণিতে পৌঁছুলাম, তখন তো বলতে গেলে একেবারে একপ্রকার মৌলভীই ছিলাম। এমনকি কিতাবাদি পড়ে পড়ে সেগুলোর বিষয়বস্তু চুরি করে করে আর্যসমাজ, খ্রিষ্টান মিশনারী বিরুদ্ধে বড়সড়

প্রবন্ধ রচনা শুরু করলাম। আরো মনে পড়ে সে বয়সে দেশের সবচেয়ে বড় পণ্ডিত ও ধর্মবিদ বরং মুজাদ্দিদ মনে করতাম মাওলানা আব্দুল হাই ফিরিঙ্গি মহল্লিকে। তার তিরোধানের ২৫-২৬ বছর গত হওয়া সত্ত্বেও হৃদয়ে তাঁর গভীর ভক্তি-শ্রদ্ধা বেশ দাগ কেটেছিল। মাওলানা মুহাম্মদ আলী রহমানি মুঙ্গেরীর প্রভাবে খ্রিস্টবাদ খ-নে ও মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরীর প্রভাবে আর্যসমাজের ফেতনার মোকাবেলায় তনুমনে নিয়োজিত ছিলাম। নবম শ্রেণিতে উঠে বাতিল ফেরকাগুলো নিয়ে বিতর্কের মনোভাব আরো চাঙ্গা হল। ইতোমধ্যে উপমহাদেশের বিদগ্ধ মনীষী আল্লামা শিবলী রচিত আল-কালাম, রাসায়েল ইত্যাদি গ্রন্থের সঙ্গে পরিচিত হলাম। এতে দর্শন ও ইলমে কালামের প্রতি ঝোঁক সৃষ্টি হল। খ্রিষ্টবাদ ও আর্যসমাজের মোকাবেলার পরিবর্তে নাস্তিক ও বস্তুবাদীদের মোকাবিলায় মনোযোগ নিবিষ্ট হল। তখনো জামাতের সহিত নামায-রোযা পালনসহ অন্যান্য ধর্মীয় বিধি-বিধানের প্রতি যত্নবান ছিলাম।

ধর্মীয় জোশ-উদ্দীপনার এ ভাবাবেগ নিয়ে যৌবনের ষোড়শ বছরে পদার্পণ করলাম। সীতাপুর হাই স্কুল থেকে মেট্রিক পাশ করে প্রাদেশিক রাজধানী লক্ষ্ণৌ চলে আসলাম। জুলাই ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দে কেনিঙ্গ কলেজে ভর্তি হলাম। ভর্তির ক'দিন পূর্বে লক্ষ্ণৌ চলে এসেছিলাম। সেখানে এক আত্মীয়ের কাছে একটি ইংরেজি গ্রন্থ হঠাৎ চোখে পড়ে গেল। বেশ বড়সড় সাইজের গ্রন্থ। সব ধরনের গ্রন্থ পড়া ও পড়ে শেষ করে ফেলার 'ব্যাধি' তো আগে থেকেই ছিল, যাকে বলে গ্রন্থকীট। অনায়াসে ওই গ্রন্থ অধ্যয়ন শুরু করলাম। কিন্তু এ কী! কী ঘটতে শুরু করল! কিভাবে ভাষায় ব্যক্ত করব। অধ্যয়ন যতই অগ্রসর হচ্ছিল ততই যেন যুক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হচ্ছিল। আকাইদ, আখলাক, প্রাচীন বিশ্বাস ও সার্বজনীন মূল্যবোধের পুরো জগতে প্রচ- ভূ-কম্পনে সবকিছু তছনছ হয়ে যেতে লাগল!

গ্রন্থটা ধর্মবিষয়ক ছিল না। সমাজ ও সামাজিকতার নীতিমালা ছিল গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়; Element Of Social Science এ মুদ্রণে গ্রন্থকারের নাম ছিল অনুপস্থিত। নামের পরিবর্তে শুধু তার ডাক্তারি ডিগ্রি এম.ডি লেখা ছিল। পরবর্তী মুদ্রণগুলোতে নাম আসল ডাক্তার ড্রেসডেল। আরো পরে প্রকাশ পেল সে আপন যুগের কট্টর নাস্তিক ছিল। তার বইটি তো বই নয়; যেন বারুদ বিছানো সুড়ঙ্গ। আক্রমণের মূল লক্ষ্যবস্তু ছিল ওইসব নৈতিক ও সার্বজনীন মূল্যবোধ ও বিধিনিষেধ, যা ধর্মপ্রাণ মানুষ আজো প্রচলিত ও স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান ও সার্বজনীন মূল্যবোধ হিসেবে আঁকড়ে ধরে রেখেছে এবং এসবকে ধর্মীয় বিধান ও নৈতিক মূল্যবোধের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছে।

যেমন : নারীর জন্য সতীসাধ্বী হওয়া এবং পুরুষের জন্য আপন যৌবনকে নিষ্কলুষ ও নির্দাগ রাখা। বইয়ের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু ছিল এ ধরনের দামি মূল্যবোধগুলো।

তার দাবি ছিল, যৌনকামনা তো দেহের একটি স্বভাব-দাবি। একে দমন করা, এর জন্য নিয়মতান্ত্রিক বিবাহের অপেক্ষায় থাকা শুধু নিরর্থক কাজই নয় বরং স্বাস্থ্যের জন্য চরম ক্ষতিকর আর যৌনশক্তি ও অন্যান্য দৈহিক শক্তির স্বাভাবিক বৃদ্ধির পথে কঠিন অন্তরায়। কাজেই এ ধরনের সমস্ত বাধা ও অর্গল ভেঙে ফেলো। ধর্ম ও নীতি শাস্ত্রের স্বরচিত জীবনবিধান পদদলিত করো!

এখানে শুধু একটি বিষয় উল্লেখ করা হল। এভাবে বইটার প্রতিটি আঘাত সব শেষ এসে পড়ত প্রত্যেক এমন মূল্যবোধের ওপর, যা সর্বদা ধর্ম ও নীতি শাস্ত্রের দৃষ্টিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হয়েছে। মালথেসের জন্মনিয়ন্ত্রণ এবং গর্ভপাতের বৈধতা ও প্রয়োজনীয়তার আলোচনা সর্বপ্রথম পড়ার সুযোগ হয় এ বইয়ে। আলোচনাশৈলী ছিল বড় প্রাঞ্জল ও বক্তৃতাসুলভ। ষোল বছরে এক অনভিজ্ঞ বালক এ মহাপ্লাবনের সামনে নিজের ঈমান-আখলাক, বিশ্বাস ও মূল্যবোধের জীর্ণ-শীর্ণ তরীটা কিভাবে নিরাপদ রাখতে পারবে। বিশেষত বইয়ের আহ্বান ও প্রচারণা যখন হয় সম্পূর্ণ প্রবৃত্তি ও কামনা মাফিক।

ধর্মের পক্ষাবলম্বন ও ধর্মদ্রোহীদের প্রতিরোধের যে উৎসাহ-উদ্দীপনা অন্তরে সঞ্চিত ছিল, তা এ প্রচ- বোমাবর্ষণ সহ্য করতে পারল না। ফলে ধর্ম ও নৈতিক মূল্যবোধের বিরুদ্ধে দ্বিধা-সংশয়ের বীজ রোপিত হয়ে গেল (আল্লাহ ক্ষমা করুন)। ভাবতে লাগলাম, আজ পর্যন্ত কেমন ধোঁকায় পড়েছিলাম। প্রথাগতভাবে যেসব বিষয়কে বিশ্বাসের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ স্থির করে রেখেছিলাম, তা যুক্তি-বুদ্ধিনির্ভর সমালোচনার মুখে কিভাবে কর্পুরের মতো মিলিয়ে গেল। কতটা দুর্বল ও অন্তঃসারশূন্য সাব্যস্ত হল। এটাই ছিল ওই বিষক্রিয়া, যা বই সমাপ্তির পর মন-মস্তিষ্ককে ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন করে নিচ্ছিল—সফল ও স্বার্থক প্রোপাগাণ্ডা ও অপপ্রচার হলো—লক্ষ্যবস্তুর উপর সরাসরি ও প্রত্যক্ষ আক্রমণ না করা বরং লক্ষ্যবস্তুর আশপাশে কামান দাগিয়ে দুর্গের অবস্থা এতই ক্ষত-বিক্ষত ও জীর্ণ-শীর্ণ করে ফেলা, যাতে খোদ দুর্গরক্ষী ও প্রতিরোধকারীদের অপরাজেয় মনোভাবটাও নড়বড়ে হয়ে পড়ে। আর তারা স্বপ্রণোদিত হয়ে প্রতিরোধ ছেড়ে অস্ত্রসমর্পণ করে বসে।

দ্বিধা ও সংশয়ের এ বীজ তো রোপিত হয়েই গিয়েছিল, ঠিক সেই সময়েই লক্ষ্ণৌর গ্রন্থাগারে International Library Of Famous Literature নামে কয়েক খণ্ডের বড়সড় একটি গ্রন্থ নজরে পড়ল। এ গ্রন্থটাও ধর্ম-বিষয়ক নয়।

নির্বাচিত সাহিত্য ও প্রবন্ধ সমগ্র। সারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্ম বাছাই করে এতে একত্র করে দেওয়া হয়েছে। এর এক খণ্ড কুরআন ও ইসলাম সম্বন্ধে। প্রশংসা যদিও নেই, কিন্তু বিশেষ কোনো নিন্দা-সমালোচনাও তাতে ছিল না। তবে এ খণ্ডের পুরো এক পৃষ্ঠা জুড়ে ইসলাম প্রবর্তকের একটি ছবি দেওয়া হয়েছিল। মধ্যম গড়নের একজন মানুষ। আর নিচে এ উদ্ধৃতি দেওয়া আছে, অমুক হস্তশিল্পীর অঙ্কিত চিত্রের ফটোকপি এ ছবি। যেন সব ধরনের সন্দেহ-সংশয়ের ঊর্ধ্বে। অনাচারী শিল্পী এক বেদুঈনের গায়ে জুব্বা, মাথায় পাগড়ি, মুখমণ্ডলে কোনো প্রকার নম্রতা ও কোমলতার পরিবর্তে রুক্ষতা ও কর্কশতার ছাপ এঁকে দিয়েছিল। হাতে ধনুক, কাঁধে তূণীর। বাজুবন্ধে তরবারি। নাউযু বিল্লাহ! পুরো চিত্রটাই যেন এক দুর্ধর্ষ নিষ্ঠুর প্রকৃতির বেদুঈন সরদারের। আল্লাহ তায়ালা না করুন! এখন যদি এ ধরনের কোনো চিত্র দৃষ্টিগোচর হয়, তা হলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মুখ দিয়ে আস্তাগফিরুল্লাহ বেরিয়ে যাবে! বস্তুনিষ্ঠতার সঙ্গে এ কাল্পনিক চিত্রের কোনো দূরতম সম্পর্কও ছিল না। হাদিস শরিফে তো প্রিয়নবী ﷺ-এর সদা হাস্যোজ্জ্বল চেহারা, লেবাস-পোশাকসহ প্রতিটি বিষয়ের খুঁটিনাটি বিবরণ রয়েছে। হাদিসের বিবরণের সঙ্গে এ চিত্রের কোনো দূরতম সাদৃশ্যও ছিল না। নিশ্চিত এটা কোনো শয়তানি মস্তিষ্কের কারসাজি। তখন সেই হুঁশ-জ্ঞান আর কোত্থেকে থাকবে! প্রচণ্ড আঘাত যুগপৎ মন-মস্তিষ্কে হানল। ভিতর থেকে আওয়াজ এল তওবা করো! কেমন ধোঁকায় পড়েছিলে। দয়া-মায়া, নম্রতা, উদারতার সমস্ত কাহিনি অন্তঃসারশূন্য প্রমাণিত হল। এই না সাক্ষাৎ পাওয়া গেল প্রকৃত সত্যের!

ইউরোপের নামে বাতিকগ্রস্ত মানসিকতা কল্পনা করতেও অক্ষম ছিল যে, খোদ এ চিত্রেই কোনো কারসাজি ও জালিয়াতি আছে। এ গ্রন্থকারের কথাও মিথ্যা হতে পারে। গবেষণা ও অনুসন্ধান হোক না হোক, কথা সেটাই সত্য যা চিত্র থেকে প্রতিফলিত হচ্ছে। কোনো আর্যসমাজী, কোনো খ্রিষ্টবাদী কিংবা অন্য কোনো ইসলামের শত্রুর সঙ্গে বিতর্কে পরাজিত হওয়া ছাড়াই বছরের পর বছরের মেহনত, পরিশ্রম ও অতি যত্নে গড়া দুর্গ এভাবে মুহূর্তেই তাসের ঘরের মতো ধসে পড়ল। রাসূল হিসেবে নবীজীর সত্তার ব্যাপারে শ্রদ্ধাপূর্ণ স্বতন্ত্র বিশ্বাস, রাসূল হিসেবে নবীসত্তার অর্থ এমনকি একজন মহামানব কিন্তু শ্রেষ্ঠতম মানব হওয়ার ধারণাটাও ধীরে ধীরে হৃদয় থেকে তিরোহিত হয়ে গেল। ঈমান ও ইসলামের সুমহান ধন সামান্যতেই চরম ধিকৃত ধর্মদ্রোহিতায় পর্যবসিত হল।

আমার আত্মজীবনীর এ অংশটুকু প্রতিটি মুসলমানের গভীর চিন্তা-ভাবনা করে পড়া উচিত। ধর্মীয় পরিবেশে লালিত পালিত, ধর্মীয় আবহে বেড়ে উঠা

কিশোর—বলা ভালো ধর্মীয় পরিবেশে বেড়ে উঠা যুবক শয়তানের প্রাথমিক দু-এক দফার আক্রমণে কত সহজেই ধরাশায়ী হয়ে পড়ল। ভ্রষ্টতার কত অসংখ্য দরজা খুলে রাখা হয়েছে। আর শয়তান হানা দেওয়ার কত অসংখ্য পথ তৈরি করে রাখা হয়েছে! অবস্থা এতদূর গড়ানোর পর নামায-রোযার অস্তিত্ব আর কিভাবে থাকতে পারে!

প্রথমে নিয়মিত থেকে অনিয়মিত হল। নামাযের প্রতি যত্ন ও পাবন্দি ছুটে গেল। নামায ছুটতে শুরু করল। একাধারে কয়েক ওয়াক্ত ছুটতে লাগল। এমনকি একসময় একদম ছুটে গেল। অজু, তিলাওয়াত, রোযা—এসবের সঙ্গেও আর কোনো সম্পর্ক রইল না। প্রথম প্রথম আব্বাজানের কিছুটা ভয় ও লেহাজ ছিল, কিন্তু তা আর কতক্ষণ কাজে দেওয়ার! লক্ষ্ণৌ থেকে যখন সীতাপুর তাঁর কাছে যেতাম, তখন নামাযের সময় হলে তার কাছ থেকে কেটে পড়তাম। এদিকে-সেদিক সরে পড়তাম। কখনো কখনো ঘুমের ভান করতাম। জুমার নামাযের বিষয়টি বড় কঠিন হয়ে দাঁড়াল। প্রথম প্রথম আব্বাজান আমাকে ঘুম থেকে উঠিয়ে সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়ার অনেক চেষ্টা করেছেন। আমি অপদার্থকে যখন উঠাতেই পারতেন না, আর সময়ও শেষ হওয়ার উপক্রম হত, তখন তিনি আমাকে নিজ অবস্থায় রেখে মসজিদে চলে যেতেন। হৃদয়ের কী অবস্থা নিয়ে যেতেন—এখন তা কে বলতে পারবে?

আজ যখন বসে বসে ভাবি, আল্লাহ তায়ালার এ বান্দা আমি অপদার্থের কাছ থেকে কী নির্মম আচরণের সম্মুখীন হয়েছেন, তখন মনে হয় আমার দুর্ভাগ্যে ভূমি প্রকম্পিত হচ্ছে, আকাশ গর্জন করছে। কিন্তু বলা বাহুল্য, আমি যেহেতু আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণেও প্রস্তুত ছিলাম, তখন বাপ বেচারাকে আর কেয়ার করব কেন? ধর্মবিষয়ক অধ্যয়ন তখনো এতটা কম ছিল না, কিন্তু ইউরোপীয় নাস্তিকতা ও ধর্মদ্রোহের যে মহাপ্লাবনের সঙ্গে সংঘর্ষ ছিল, তা মোকাবিলা ও প্রতিরোধের জন্য ওই অধ্যয়ন যথেষ্ট ছিল না।

উপাদান চতুষ্টয়ে গড়া প্রাকৃতিক মহাজগতের মহাকর্মশালায় মহাজগতের স্রষ্টা আপন প্রাকৃতিক বিধানের ক্ষেত্রে কারো প্রতি সামান্যতম ভিন্নতা করেননি, নিজ প্রেরিত ও অবতীর্ণ ধর্মের পর্যন্তও নয়। আপন ঘর মসজিদেরও নয়, আপন গ্রন্থ কুরআন শরিফেরও নয়, আপন সম্মানিত গৃহ কাবারও নয়, আপন নবী-রাসূল কারো নয়। শাণিত তরবারিতে যে ধার রেখেছেন, তা সর্বত্র নিজ কারিশমা দেখাবেই—পবিত্র গ্রন্থের উপরেও, মসজিদের মেহরাব-মিম্বরেও, কাবার দ্বার-দেয়ালেও, ওয়ালি-ছিদ্দিকের দেহেও; এমনকি মহাসম্মানিত নবীর পবিত্র দেহেও!

پیش ایں فولاد اس پر میا ❖ کز بریدن تیغ را نبود حیا

ধাতব লৌহের চাপায় বড় নেককার মানুষকে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলতে নিষ্ঠুর তরবারির সামান্যতমও বাধে না।

**নাস্তিকতা ও ধর্মদ্রোহ**

কলেজে এসে প্রথমে যুক্তিবিদ্যা, তারপর দর্শনের প্রতি গভীর মনোযোগী ছিলাম। যুক্তিবিদ্যা তো কলেজ-কোর্সের অন্তর্ভুক্ত ছিল। যখন কোর্সে অন্তর্ভুক্ত ছিল না তখনো অর্থাৎ স্কুল যুগ থেকেই তা লুকিয়ে লুকিয়ে পড়া শুরু করি। আমি সীতাপুর হাইস্কুলে নবম শ্রেণিতে পড়তাম আর ভাইজান তখন লক্ষ্ণৌতে এম.এ-র শিক্ষার্থী। দীর্ঘ ছুটিছাটা কাটাতে যখন সীতাপুর আসতেন, তখন তার কোর্সের বই Stocks Logic নিয়ে পড়া শুরু করতাম। উল্টা-সিধা এক রকম বুঝেও নিতাম। যুক্তিবিদ্যার প্রাথমিক গ্রন্থ, প্রাথমিক যুক্তিবিদ্যা এবং উচ্চতর যুক্তিবিদ্যাও অধ্যয়ন করে ফেলি। কলেজে এসে এ নেশা পূরণেরও সুযোগ হয়ে গেল। যুক্তিবিদ্যার পাঠ্যবই ছাড়া যুক্তিবিদ্যার অন্যান্য আরো বহু গ্রন্থ কলেজ-লাইব্রেরি থেকে নিয়ে পড়তে শুরু করি। এমনকি মিল এর বড় সাইজের সূক্ষ্মগ্রন্থ সিস্টেম অফ লজিকও একপ্রকার চেটেপুটে পড়ে নিলাম। অথচ এটা যতখানি যুক্তিবিদ্যার নয়, তার চেয়ে বেশি দর্শন শাস্ত্রের। এখান থেকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন চর্চা ও দর্শন শাস্ত্রের অধ্যয়নও শুরু হয়ে গেল। বিশেষ করে দর্শনের অন্যতম শাখা সাইকোলজি ও মনোবিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা। সাইকোলজির বিভাগ সাইন্সের শাখা হিসেবে ছিল না, দর্শনের শাখা ও বিভাগ হিসেবেই ছিল। আর স্বয়ং এরই কয়েকটা শাখা ও বিভাগ ছিল। ব্যক্তি-মনোবিজ্ঞান ছাড়া সামাজিক মনোবিজ্ঞান, মর্জিমনোবিজ্ঞান-সাইকোলজি ইত্যাদি—নাস্তিক বা প্রায় নাস্তিক দার্শনিকদের ইংরেজি গ্রন্থের অভাব নেই। খুঁজে খুঁজে বাছাই করে করে তাদের গ্রন্থ ভালো করে পড়েছি। মিল এর গ্রন্থ তো পাঠ্য তালিকার শীর্ষে ছিল। সংশয়বাদ ও উপযোগবাদী ধ্যান-ধারণা দ্বারা তখন খুবই প্রভাবিত ছিলাম। হুয়ূম ও স্পেনারের রচনাবলি চেটেপুটে পড়ে ফেলেছিলাম।

কিছু এমন লেখকও ছিল যারা মূলত বিজ্ঞানী। তবে নাস্তিক দার্শনিক ছাড়াও যারা শুধু কট্টর, তাদেরকেও খুব সমীহ করেছি। যেমন : বৃটেনের চার্লস ব্রেডল, জার্মানীর বুশনার এবং আমেরিকার এঙ্গরসৌল। বলা বাহুল্য, এদের লেখা ও রচনা পড়াশোনার দ্বারা নিজের সংশয়বাদ আরো হৃষ্টপুষ্ট হচ্ছিল। নাস্তিকতা আরো জোরালো ও বেগবান হওয়ার পথ পেয়েছে। কিন্তু

ঈমান ও ইসলাম থেকে দূরে ঠেলে দেওয়া এবং সরাসরি কুফর ও ধর্মদ্রোহের অঙ্গনে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে নাস্তিক এবং প্রায় নাস্তিক লেখকদের রচনা এতটা প্রভাব ও ক্রিয়াশীল প্রমাণিত হয়নি যতটা ওইসব শাস্ত্রীয় রচনাবলি প্রমাণিত হয়েছে, যেগুলো মনোবিজ্ঞান বিষয়ে মনোবিজ্ঞানীদের হাতে রচিত ছিল। বাহ্যত ধর্মের সঙ্গে এগুলোর কোনো যোগসূত্র ছিল না। নেতিবাচকও না, ইতিবাচকও না। আসল বিষয় ওইসব বাহ্যিক নিরামিশ শ্রেণির রচনাবলিতে একেবারে খোলামেলা পাওয়া গেছে। যেমন– ড. মাডেসলি (Maudesley) নামে এক ব্যক্তি গত হয়েছে। তার বড়সড় ও মোটা সাইজের দুটি গ্রন্থ সে যুগে বিপুল খ্যাতি লাভ করেছিল—

**এক.** Mental Physiology (মানসিক শরীর বৃত্ত)

**দুই.** Mental Pathology (মানসিক রোগবিজ্ঞান)

শেষোক্ত গ্রন্থটিতে মানসিক বৈকল্য ও মানসিক রোগের বিবরণ দিতে দিতে একপর্যায়ে এ নরাধম দৃষ্টান্ত হিসেবে মুহাম্মদী আসমানি বাণীকে নিয়ে আসল। এ মহামানবের প্রতি অবিচার করে এ জালিম লিখে দিল—মানসিক বৈকল্যের শিকার ব্যক্তির পক্ষে এ বিষয়টি খুবই সম্ভব যে, সে জগদ্বাসীর জন্য বিরাট কীর্তি ও অবদান রেখে যাবে!

ঈমান ও বিশ্বাসের ভিত্তিমূল পূর্বেই নড়বড়ে হয়ে গিয়েছিল। এ ধরনের নরাধম শাস্ত্রবিদগণের মুখে এমন অতুলনীয় গবেষণাজাত অমৃতবচন শুনে অবশিষ্ট ঈমানটুকুও নিঃশেষ হয়ে গেল। নাস্তিকতা ও ধর্মদ্রোহ ষোলকলায় পূর্ণ হলো।

ঈমান ও ইসলামের তরে প্রাণউৎসর্গকারী প্রিয় ভাই ও বোনেরা! আমার এ দ্ব্যর্থহীন স্বীকারোক্তিগুলো গভীর মনোযোগ দিয়ে পাঠ করুন! একটু থামুন! চিন্তা করুন! যে শিক্ষার নরককুে- আপনারা নিজ কলিজার টুকরো সন্তানদের ঠেলে দিচ্ছেন, তা তাদের কোথায় নিয়ে যাবে?

ইন্টারমিডিয়েটের শিক্ষার্থী ছিলাম। ধর্মহীনতায় ভর করে সামনে অগ্রসর হচ্ছিলাম। ইতোমধ্যে লন্ডন রেশনালিস্ট পারবাস এসোসিয়েশন (RPA)-এর প্রকাশিত মহামূল্যবান গ্রন্থরাজির সূচিপত্র জনৈক ব্যক্তির নিকট দেখতে পেলাম। যেন দীর্ঘ প্রতীক্ষিত এবং বহু প্রত্যাশিত পরম আরাধ্য বস্তু পেয়ে গেলাম। যুক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তিক ধ্যান-ধারণা প্রচারের নামে এসব গ্রন্থ ধর্মদ্রোহ ও নাস্তিকতা বিস্তারেই বেশি ভূমিকা রাখছিল। এগুলোর সরাসরি ও প্রত্যক্ষ আঘাত যদিও খ্রিষ্টবাদের উপরই পড়ত; কিন্তু কোনো ধর্মই তাদের সে ঘৃণ্য

আক্রমণের বাইরে নিরাপদ ও সংরক্ষিত ছিল না। প্রতিটি গ্রন্থ ছয় আনাতেই পাওয়া যেত। সুলভতার সেই যুগে এতটা সুলভতা বড়ই আশ্চর্যজনক ছিল।

প্রথম প্রথম এসব বই ধার নিয়ে নিয়ে পড়তে হয়েছে। পরবর্তীসময়ে যখন ঝোঁক সৃষ্টি হয়ে গেল এবং নেশা আরো তীব্র হল, তখন ফিস দিয়ে সংগঠনের নিয়মতান্ত্রিক সদস্য হয়ে গিয়েছি। যখন অনেক বইয়ের একটি সংগ্রহশালা তৈরি হয়ে গেল, তখন গর্বভরে নিজেকে রেশনালিস্ট-যুক্তিবাদী বলে পরিচয় দিতাম। এ নিয়ে খুব গৌরববোধ করতাম। এ ছোটখাট গ্রন্থাগারটিতে চোখ বুলিয়ে খুশিতে বাগ বাগ হয়ে যেতাম। ভারতে এ সংগঠনের কোনো শাখা ছিল না। লন্ডন থেকে প্রকাশিত সংগঠনের অর্ধমাসিক মুখপত্র রেশনালিস্ট রিভিউ কিংবা লিটারেরী গাইড এর কার্যালয়ে পত্রিকার অগ্রিম মূল্য পাঠিয়ে তার গ্রাহক হয়ে গিয়েছিলাম। ধীরে ধীরে ইসলামের নাম নিতেও লজ্জাবোধ করতে লাগলাম। ইন্টারমিডিয়েটের বার্ষিক পরীক্ষার সময় তো পরীক্ষা ফরমে ধর্মবিষয়ক খালি ঘরে মুসলিম লেখার স্থলে শুধু 'রেশনালিস্ট' লিখেছিলাম।

চিন্তাগত, বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে পুরোপুরি ইউরোপীয় বা বিলেতি হয়ে গেলাম। এ পর্যায়ে স্বভাবতই মুসলমানদের সঙ্গে মেলামেশা কমে যেতে থাকল। ইসলামি সভা-সমাবেশ ও অনুষ্ঠানে গমনাগমন পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেল। বড় হিত প্রমাণিত হলো এটিই অর্থাৎ আপন আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে পারিবারিক বন্ধন দস্তুর মতো ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে ঠিক ছিল। আমার সঙ্গীদের একজন ওই সময়ই আপনজনদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পুরোপুরি অন্যদের সঙ্গে একীভূত হয়ে গিয়েছিল। পোশাক-আশাক চলাফেরা সম্পূর্ণ হিন্দুয়ানি করে ফেলেছিল। আমি নিজের পানাহার, লেবাস-পোশাক ও সাধারণ সামাজিকতায় বরং বলা ভালো একটা সীমা পর্যন্ত ভাবাবেগের দিক থেকেও মুসলমান রয়ে যাই; তবে একজন সুশীল ও প্রগতিবাদী নামধারী মুসলমান।

আর তখনকার তরুণদের প্রগতিবাদী নামধারী মুসলমানকে না চেনে? আর আল হামদুলিল্লাহ মুসলিম সম্প্রদায় থেকে আমার শেকড় তখনো পুরো বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়নি। দীনে ইসলামের পরে মুসলিম জাতীয়তার নেয়ামতও এক বিরাট নেয়ামত। কেউ যেন এ নেয়ামতকে বেকার মূল্যহীন মনে না করে। ভবিষ্যতে এ সামান্য নেয়ামতটিই আমার কাছে বড় মূল্যবান মনে হয়েছে। প্যান্ট-শার্ট যা পরেছি, তাতে কোনো নতুনত্ব ও অভিনবত্ব ছিল না। এটুকু সকলেই পরত। যাত্রা-থিয়েটারে যতটা গিয়েছি, ততটা সকলেই যেত। অবশ্য কখনো মদ পান করিনি, তবে বারবার এটি পরীক্ষা করার স্বাদ মনে

জেগেছে। যদি পান করেও নিতাম তবু তা অবাক হওয়ার মতো কিছু হত না। মোটকথা, এমন কোনো বিষয় ঘটেনি যার দ্বারা সম্পূর্ণ সমাজচ্যুত হওয়ার ঘটনা ঘটতে পারে এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের কোনো শ্রেণি আমাকে বয়কটে উদ্বুদ্ধ হয়ে যেতে পারে।

বড় কথা হল, কখনো এমন কোনো উক্তি করিনি যার দ্বারা মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লাগতে পারে। যা-ই বলেছি ইলমি ও একাডেমিক পরিধির ভিতরে থেকে মূল বিষয় নিয়ে বলেছি। সমালোচনা যখন করেছি, তখনো বিশ্বাসগত বিষয় নিয়ে সমালোচনা করেছি। কোনো ব্যক্তি-ব্যক্তিত্বকে কখনো সমালোচনার পাত্র বানাইনি। ভাবাবেগের ক্ষেত্রে অনেকটা মুসলমান রয়ে যাওয়ার ধারাক্রমে শোনার মতো মজার বিষয় হচ্ছে, কোনো অমুসলিম যখন ইসলাম সম্পর্কে কোনো আপত্তি করত, তখন তার পক্ষ নিতে এবং সহায়তা করতে হৃদয় সাড়া দিত না বরং পূর্ণ নাস্তিকতা ও ধর্মদ্রোহের কবলে থাকা সত্ত্বেও অন্তর প্রতিউত্তর দিতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসত।

অক্টোবর ১৯১১ এর ঘটনা। খ্রিষ্টানদের একটি বড় কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করতে চরম ইসলামবিদ্বেষী খ্যাত পাদরি যোয়মের (Zuemer)-ও বাহরাইন থেকে এসে উপস্থিত হল। তার ইসলামবিদ্বেষের খ্যাতি তার আগমনের পূর্বেই এ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। আমি বি.এ-র শিক্ষার্থী ছিলাম। বিশ্বাস-আদর্শে পুরোপুরি ইসলামবিরোধী। আপন এক বন্ধু মাওলানা আব্দুল বারী নদভিকে সঙ্গে করে চট করে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলাম। সাক্ষাতে পাদরি সাহেব খুব ভদ্র ও বিনীত আচরণ করলেন। কিন্তু অভ্যাসবশত কথাবার্তায় ইসলামের উপর আক্রমণ করতে থাকলেন।

প্রিয় পাঠক! বিশ্বাস করুন! নদভি সাহেব যেমনি পাদরিকে আরবিতে প্রত্যুত্তর দিতে লাগলেন তদ্রুপ আমিও ইংরেজিতে তার জবাব দিতে শুরু করলাম। পাদরি সাহেব কিছু বুঝে উঠতে পারলেন না যে, আমি তো নিজেই ইসলামত্যাগী মুরতাদ (তবু কেন ইসলামের পক্ষ নিয়ে তার বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছি।) কোনো পাদরি, আর্যসমাজী বা কোনো প্রকাশ্য ইসলামবিরোধীর কোনো প্রভাব একেবারেই আমার উপর ছিল না। যতটা প্রভাবিত হয়েছিলাম তার সবই ছিল ইসলামের গোপন শত্রুদের দ্বারা। তাদের জ্ঞান-গরিমা ও পাণ্ডিত্য, তাদের উন্নত গবেষণা ও পর্যালোচনা, যারা মুখে পূর্ণ নিরপেক্ষতার দাবি করত, কিন্তু জানতে-অজান্তে সর্বাবস্থায় বিষাক্ত ইনজেকশন পুশ করতে থাকে। অনভিজ্ঞ, সরলপ্রাণ, বেখবর পাঠক আত্মরক্ষা ও প্রতিরোধ শক্তিশূন্য অবস্থায় নিজেকে সজাগ রেখেও তাদের সহজ শিকারে পরিণত হতে থাকে।

মন ও মস্তিষ্ক তো 'ইউরোপীয় পণ্ডিত' ও পশ্চিমা দার্শনিকদের বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব এবং ইলমী ও একাডেমিক ভক্তিতে পুরোপুরি আচ্ছন্নই ছিল। তাদের প্রতিটি বাণী ও বচন যেন অমৃত বচন এবং সর্বপ্রকারে সন্দেহ ও সংশয় থেকে বহু উর্ধ্বে। সর্বপ্রকার অগ্রাহ্যতা থেকে পবিত্র। সাংবাদিকতার বিবরণ দিতে গিয়ে আলোচিত হয়েছে যে, ১৯১০ সালের মার্চ থেকে শেষ বছর পর্যন্ত আননাযের সাময়িকীতে আল্লামা শিবলী রচিত আলকালাম এর নিয়মিত সমালোচনা হত। মাওলানার কিতাব তো এক আড়াল ছিল মাত্র। নতুবা মূলত সমালোচনার লক্ষ্যবস্তু ছিল, সমস্ত মৌলিক আকিদা-বিশ্বাস। আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্ব, রিসালাত, পরকাল ইত্যাদি। আর এগুলো আমার নাস্তিকতা তো নয় বরং আমার চূড়ান্ত মূঢ়তা ও সংশয়বাদের উপর মোহর অঙ্কিত করে দেয়।

১৯১২ সালে হজ পালনরত অবস্থায় আব্বাজান ইন্তিকাল করেন। আমার নাস্তিকতা ও ধর্মহীনতার দরুন স্বভাবত তিনি বড় ব্যথিত ও মর্মাহত ছিলেন। যার কাছে আমার সামান্য সংশোধনের সম্ভাবনা দেখতেন তার কাছে আমাকে নিয়ে হাজির হতেন ও আমার সংশোধনের জন্য ধরনা দিতেন। যে আত্মীয়-স্বজনরা হজের সফরে তার সঙ্গে ছিলেন, তাদের কাছ থেকে পরে জানতে পেরেছি যে, মরহুম আব্বাজান কাবার গিলাফ ধরে অন্তরের অন্তস্থল থেকে আপন কলিজার টুকরার হেদায়াত ও সুপথে ফিরে আসার দুয়া করেছিলেন। অনন্যোপায় মর্দে মুমিনের তীর দেরিতে হলেও লক্ষ্যবস্তুতে বিদ্ধ না হয়ে পারে? যে মহাক্ষমতাধর সত্যনবী হযরত ইয়াকুবকে কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে তার পুত্রকে ফিরে পাওয়ার দুয়া শেষে কবুল করেছিলেন, তিনি উম্মতে মুহাম্মদির এক নগণ্য সদস্য ও ইয়াকুব পরিবারের এক সামান্য মানুষ আব্দুল কাদের তথা মহাক্ষমতাধরের দাসকে সদা বঞ্চিত রাখতে পারেন?

## টানাপোড়েন

নাস্তিকতা ও ধর্মদ্রোহের এ সময়কাল বলতে গেলে দশ বছর স্থায়ী হয়। ১৯০৯ সালে কিংবা তার কিছুকাল আগে থেকেই শুরু হয়েছিল এবং ১৯১৮ এর শেষ তিন মাস পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। বর্তমানে দশ বছর সময় অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পর এবং তারপরও এত দিন বিগত হওয়া সত্ত্বেও একে বেশি বড় ও দীর্ঘ মনে হয় না। কিন্তু কল্পনার চোখের সামনে নাস্তিকতার যুগটি একটু মেলে ধরুন, যখন তা 'অতীত' ছিল না 'বর্তমান' ছিল, অব্যাহতভাবে চলছিল ও বড় জোরে শোরে চলছিল—আল্লাহ মাফ করুন—কত দীর্ঘ মনে হচ্ছিল। মনে হত না যে জীবনের এ অধ্যায়ের কখনো পরিসমাপ্তি ঘটবে।

নিজের কাছেও এমনই মনে হত; পরিচিত জনদের কাছেও। দোস্ত-দুশমন, স্বপক্ষ-প্রতিপক্ষ সকলের কাছেই। (হাতে গোনা দু-চারজন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব ছাড়া, যারা এ অবস্থার সাময়িক হওয়াটা আঁচ করে ফেলেছিলেন)।

সময়টা ছিল ১৯১৮ এর আগস্ট মাস। আমি হায়দারাবাদ থেকে লক্ষ্ণৌ ফিরে এলাম। নিজের পুরোনো নেশা ও আসক্তির সুবাদে ধর্মপ্রাণ কিংবা প্রায় ধর্মপ্রাণ শ্রেণির দার্শনিকদের রচিত গ্রন্থরাজি পড়া শুরু করলাম। ইউরোপের শোপেন হায়েরদের মতো লেখকদের রচনার দ্রুত পাঠ চুকিয়ে প্রথম নম্বরে চীনা দার্শনিক কনফুসিয়াশের পালা আসল। এ দার্শনিকের শিক্ষা ও দর্শন আর যা-ই হোক, শোপেন হায়েরের মতো নিরেট বস্তুতান্ত্রিক ছিল না। নৈতিক ও চারিত্রিক উপাদান তাতে এতদূর বিস্তৃত ছিল যে, তার আলোচনার সূত্রগুলো সবশেষে আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে গিয়ে যুক্ত হত। অদৃশ্য জগতের সঙ্গে তার অল্পবিস্তর যোগাযোগও ছিল। বলা ভালো, এটাই কোনো দার্শনিকের রচিত প্রথম গ্রন্থ ছিল, যা নিরেট বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে লেখার পরিবর্তে অনেকটা আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা হয়েছিল। অনুসন্ধানী মানসিকতা কদমকে আরো অগ্রসর করল। আর এ ধাপে কলেজের পুরোনো সহপাঠী ডক্টর মুহাম্মদ হাফিজ সায়িদ থেকে অনেক সহযোগিতা পেয়েছি। ধীরে ধীরে বুদ্ধ-মতবাদ, চীনা ধর্মমত এবং যিয়সুফি মতবাদের সন্ধান পেলাম। সর্বময় প্রজ্ঞার আধার মহান সত্তার পক্ষ থেকে হেদায়াত ও দীক্ষার যথার্থ উপকরণের ব্যবস্থা প্রত্যেক ধাপে ধাপে এমনকি প্রত্যেক কদমে কদমে হতে থাকল!

বুদ্ধ-মতবাদের সূক্ষ্ম ও একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ পড়লাম। আর এতে বুঝতে পারলাম—বুদ্ধ-মতবাদ নিছক কিছু অলীক কল্পনার সমষ্টির নাম নয় বরং এতে আত্মা ও মানবাত্মা সম্পর্কে গভীর কিছু তত্ত্ব-রহস্য, নিগূঢ়তা ও তাৎপর্য রয়েছে। এরপর যিয়সুফি মতবাদের পালা শুরু হলো (আর বলাবাহুল্য এসব পড়াশোনাই চলছিল ইংরেজি ভাষার সহায়তায়) যিয়সুফিকে হিন্দু সন্ন্যাসবাদ কিংবা হিন্দু সন্ন্যাসবাদী দর্শন মনে করতে পারেন। এতে আত্মা এবং আত্মার বিকাশ ও উৎকর্ষের প্রতি সর্বাধিক জোর দেওয়া হয়েছে। এর ধরন কিছুটা জিন উপস্থিত করার তদবিরের সঙ্গে মিলে।

মিসেস এনি বিসেন্ট (খ্রিষ্টধর্ম ছেড়ে হিন্দুধর্ম গ্রহণকারিনী) এ মতবাদের প্রাণ ও প্রেরণা ছিলেন। এর জোরদার প্রচারক ও আহ্বায়ক ছিলেন। আর বেনারসের দার্শনিক সাধু ডক্টর ভগবান দাস (যিনি ক'দিন পূর্বে নব্বই বছর বয়সে মারা গেছেন) হিন্দু সন্ন্যাসবাদ এবং হিন্দু-দর্শনের শ্রেষ্ঠ মুখপাত্র ও

ব্যাখ্যাকার ছিলেন। এ দুজনের লেখা ও রচনার অনেকটাই পড়েছি আর তা থেকে অনেক কিছু শিখেছি। আর মহারাষ্ট্রের লোকমান্য তিলক এবং অবিভক্ত বাংলা ও দক্ষিণ ভারতের আরবিন্দ ঘোষের সমস্ত রচনা পড়ে শেষ করে ফেলার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছি। এ সময়েই শ্রীকৃষ্ণের ভগবত গীতার যত নুসখা ও এডিশন হাতের কাছে পাওয়া যায় সব সংগ্রহ করে পড়ে ফেললাম। এ গ্রন্থ যেন চোখের সামনে এক নতুন দিগন্ত খুলে দিল। আর আধ্যাত্মিক জগৎ তথা বস্তুজগতের বাইরের আরেকটি জগৎ দৃষ্টিগোচর হতে লাগল। ওই সময়ে মহাত্মা গান্ধীর লেখা বিভিন্ন রচনা অধ্যয়নে আসতে থাকে। তার বহু রচনায় মহাজগতের ছোট-বড় প্রতিটি বস্তুতান্ত্রিক ঘটনা ও দুর্ঘটনার কোনো না কোনো আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা বারবার দেখার সুযোগ হতে থাকে।

দেড়-দুই বছরের (১৯১৯-১৯২০) লাগাতার অধ্যয়নের সারনির্যাস দাঁড়াল যে, হৃদয়ে আসন গেড়ে থাকা ইউরোপীয় বস্তুবাদী দর্শনের প্রতিমা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল। অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে পরিষ্কার দৃষ্টিগোচর হতে লাগল, মহাজাগতিক রহস্য ও গুপ্তভেদ সম্পর্কে চূড়ান্ত ও সর্বশেষ ব্যাখ্যা ইউরোপীয় বস্তুবাদীদের ব্যাখ্যা নয়; পৃথিবীতে এর চেয়ে উন্নত ও সন্তোষজনক আরো ব্যাখ্যা রয়েছে। আধ্যাত্মিকতার অকূল অথৈ জগৎ নিছক ধারণা ও অজ্ঞতাপ্রসূত নয়; তাচ্ছিল্য ও উপহাসজনক নয় বরং চিরসত্য ও বাস্তব জগৎ এবং শ্রদ্ধা ও সমীহযোগ্য।

গবেষণা ও সূক্ষ্মতার দিক থেকে গৌতম বুদ্ধ এবং শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষা-দীক্ষা কোনো অংশেই মিল ও স্পেন্সার থেকে কম তো নয়ই বরং অনেকাংশে উন্নত ও সমৃদ্ধ। এদের সামনে ইউরোপীয় দার্শনিকদের অত্যন্ত ক্ষুদ্র ও অগভীর দৃষ্টির অধিকারী মনে হতে লাগল। এদের নীতি-শিক্ষা-দীক্ষাও ইসলাম থেকে যথেষ্ট দূরে ছিল। তবে যা-ই হোক, এখন জীবনতত্ত্ব, মহাজাগতিক তত্ত্ব ও গুপ্ততত্ত্বের বিষয়ে দৃষ্টির সম্মুখে এক নব দিগন্ত উন্মোচিত হয়ে গেল। বস্তুবাদ, অজ্ঞতাবাদ ও সংশয়বাদের যে গগনচুম্বী সৌধ বছরের পর বছর ধরে নির্মিত হয়েছিল, তা ধূলিসাৎ হয়ে গেল। অন্ত:করণে এ বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়ে গেল যে, বস্তুবাদের বাইরে তার চেয়ে বহু ঊর্ধ্বে আরেক জগৎ আছে, সেটা আধ্যাত্মিক জগৎ। পঞ্চইন্দ্রিয়ের দেখা-শোনা ও ধরা-ছোঁয়াই সবকিছু নয়। এসবের অতল তলে, এসবের বহু ঊর্ধ্বে অদৃশ্য ও দৃষ্টিশক্তির ধরা-ছোঁয়ার বাইরে একটি স্বতন্ত্র জগতের অস্তিত্ব বিদ্যমান। মহাগ্রন্থ আল কুরআন একেবারে সূচনাতে যে ঈমানের কথা বর্ণনা করেছে, তাতে 'ঈমান বিল গায়ব'/ অদৃশ্যে বিশ্বাস স্থাপনের গুণের কথা বলেছে, তা খুবই সারগর্ভ ও তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথমে তো খোদ অদৃশ্যের প্রতি ঈমান ও বিশ্বাস থাকতে হবে। এরপর তার শাখা-প্রশাখা ও বিশদ বিবরণ অবগতি লাভ হতে থাকবে।

আমাদের মাওলানা সাহেবরা হয়তোবা আমার এ পর্যায়টাকে অবমূল্যায়ন করতে পারেন। কিন্তু বস্তুত এটাই ছিল সংশয়বাদ ও নাস্তিকতার লশকরের বিরুদ্ধে ঈমান-আকিদা ও আধ্যাত্মিকতার বিরাট ও প্রকাশ্য বিজয়।

এ অধ্যায়ের সবেমাত্র সূচনা, ইতোমধ্যে আল্লামা শিবলীর সীরাতুন্নবীর প্রথম খ- প্রেস থেকে ছেপে পাঠকদের হাতে চলে এসেছে। গ্রন্থটি ছিল শিবলীর মতো মনীষীর কলমে রচিত। সুতরাং বিষয়বস্তু যা-ই হোক, তা কি আর পরম আগ্রহে না পড়ে থাকা যায়। তাই পরম আগ্রহে গ্রন্থটি হাতে নিয়ে চোখের সামনে মেলে ধরলাম। আদ্যোপান্ত পড়ে শেষ করা পর্যন্ত দম নিলাম না। মনের আসল চোর তো এখানেই ছিল। দুর্ভাগা প্রবৃত্তি সবচেয়ে বড় যে হোঁচট খেয়েছিল, তা তো এ পবিত্র সীরাতের ব্যাপার নিয়েই ছিল। প্রাচ্যবিদ ও ইউরোপীয় গবেষকদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যবস্তু তো প্রিয়তম রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সত্তাই ছিল। বিশেষত প্রিয়নবী ﷺ-এর যুদ্ধ-বিগ্রহসমূহের ব্যাপারে মতলববাজ লেখকরা বিভিন্নভাবে মন-মস্তিষ্কে এ কথা বদ্ধমূল করে দিয়েছিল যে, প্রিয়নবী ﷺ এক একজন জালিম বিজেতার চেয়ে আলাদা কিছু ছিলেন না (নাউযুবিল্লাহ)। আল্লামা শিবলী তার গ্রন্থে এ ব্যথারই অব্যর্থ প্রতিষেধক দিয়েছেন। ওই জখমের উপরই মলমের শীতল প্রলেপ দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা তার কবরকে জান্নাতের টুকরোয় পরিণত করে দিন।

বই যখন বন্ধ করলাম, তখন কল্পনার চোখে রাসূলে আরাবি ﷺ-এর যে চিত্র ভেসে উঠল, তা ছিল দেশ ও জাতির এক সুমহান সংস্কারক এবং এক উদার ও দয়ালু শাসকের চিত্র, যাকে যুদ্ধ-বিগ্রহে জড়াতে হয়েছে তো একদম শেষ পর্যায়ে জড়াতে হয়েছে, সম্পূর্ণ অনন্যোপায় হয়ে। এ মর্যাদা নিঃসন্দেহে আজ প্রত্যেক মুসলমানের কাছে অনেক নগণ্য ও নিচে মনে হবে। এক্ষেত্রে লেখক শিবলীর কোনো মূল্য ও অবদান চোখে পড়বে না। কিন্তু এর মূল্য ওই ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করে দেখুন, যার অন্তর—নাউযুবিল্লাহ—প্রিয়নবীর প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষে পরিপূর্ণ। শিবলীর এ গ্রন্থের অনুগ্রহ আমি কখনো ভুলতে পারব না। বিশ্বাসীদের কাছে আবু তালিবের মর্যাদা যতটাই থাকুক আর যে পরিমাণই হোক, আবু লাহাব ও আবু জাহেলের শত্রুতার সঙ্গে তার কোনো তুলনাই চলতে পারে না।

এ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে কেবল বই-পুস্তকের আলোচনাই হয়েছে। এখন কিছুক্ষণের জন্য মূল আলোচনা থেকে সরে গিয়ে ওইসব ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্বের নাম শুনে নিন, যারা এ ক্রান্তিকালে আমার ও ইসলামের মধ্যে দূরত্ব ঘুচাতে সহায় হয়েছেন। স্বভাবতই পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগবে—আমার সম্পর্ক যখন

মুসলমান আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুদের সঙ্গে যথারীতি বহাল ছিল, তা হলে কেন এদের অধিকাংশই আমার এ দুর্যোগে নীরব রইল, তারা প্রকাশ্যে বা গোপনে কেন তাবলিগের গুরুদায়িত্ব আঞ্জাম দিল না? উত্তরে প্রথমত অনেকটা মুসলিম সমাজের ব্যাপক গাফলতি-উদাসীনতা, নির্জীবতা ও স্থবিরতা, অনুভূতিশূন্যতা ও মনরক্ষার একধরনের ভুল রীতির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। দ্বিতীয়ত আপন সাধ্য ও সামর্থ্য অনুযায়ী অনেকে হাত-পা মেরেছে, কিন্তু আমার নিকট তা গ্রাহ্যই হয়নি। ফলে আমার উপর কারো চেষ্টা-তদবিরের প্রভাব পড়বে কোত্থেকে? লক্ষ্ণৌর ফিরিঙ্গি মহলের এক বিখ্যাত মাওলানা সাহেব, ইউপির এক বিখ্যাত পীর সাহেব, দিল্লির এক প্রসিদ্ধ বুযুর্গ সকলেই আমাকে ধরতে নিজ নিজ শিকার-জাল ফেলেছেন; কিন্তু আমি কারো কাছেই ধরা দিইনি।

ہر چہ کردند از علاج و از دوا ❁ رنج افزوں گشت و حاجت نا روا

"রোগ নিরাময়ে যতই ঔষধ প্রয়োগ চলতে লাগল, ততই রোগ বাড়তে থাকল এবং নানা বিপত্তি দেখা দিতে থাকল।"

তবে হাঁ! কারো আন্তরিক ও প্রজ্ঞাপূর্ণ চেষ্টা তদবির যদি চুপে চুপে কাজ করে, তা হলে শুধু দুই মহান ব্যক্তিত্বের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। এক. এলাহাবাদের বিখ্যাত রসিক কবি জনাব আকবর এলাহাবাদী রহ.। তিনি কখনো তর্ক-বিতর্কের ছায়াও মাড়াননি। আর কখনো নসিহত ও উপদেশের ঝুলি খুলেননি। শুধু সময়ে সুযোগে চুপে চুপে আপন মধুর ভঙ্গিতে এমন দু-চারটি কথা বলতেন, যা হৃদয়ে গেঁথে যেত। আর মন-মস্তিষ্কে যে ঝাঁকুনি দিত তাতে আর যা-ই হোক, হক ও সত্য কবুল করে নেওয়ার মানসিকতা তৈরি হতে থাকত।

একদিন তিনি বললেন, জনাব! আপনি তো কলেজে বিষয় হিসেবে আরবি ভাষাকেও গ্রহণ করেছিলেন। এখন কি তার সঙ্গে সম্পর্ক বহাল আছে? বিদ্যা ও ভাষা যেটাই হোক, তার তো মূল্যায়ন করা উচিত।

আমি বললাম—'এখন আর তা চর্চা করার সময় কোথায়?'

তিনি বললেন—'তা এমন কঠিন কিছু তো নয়। কুরআন শরিফের অনুপম সাহিত্যকে তো ইউরোপীয়রাও স্বীকার করে। শুনেছি জার্মানির ভার্সিটিগুলোর আরবি সাহিত্যের কোর্সে কুরআন শরিফের শেষ পনের পারাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আপনি আকিদা-বিশ্বাসের দৃষ্টিকোণ থেকে না হোক, অন্তত আরবি সাহিত্যের দৃষ্টিকোণ থেকে কুরআন শরিফের সঙ্গে বন্ধন অটুট রাখুন। দৈনিক

যে কয় মিনিট সময় বের করতে পারেন, তাতেই কিছুটা পড়ে নিবেন। যে যে জায়গা বুঝে না আসবে, তা ছেড়ে দিবেন। আর ধরে নিবেন, ওই অংশগুলো আপনার জন্য নয়। এভাবে পাঠ অব্যাহত রাখলে দু-একটি বাক্য আপনার ভালো লেগেই যাবে। ব্যস, ওই বাক্যগুলো দু-চারবার পড়ে নিবেন। আর আপনার জন্য অজু করে পড়ার শর্তও রক্ষা করতে হবে না।'

এটা হলো তাঁর তাবলিগের একটি নমুনা।

দ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব হলেন বিখ্যাত দেশবরেণ্য নেতা মাওলানা মুহাম্মদ আলী জাওহার রহ.। বড় জোরদার ও প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। আর আমার তো একপ্রকার প্রিয়তম ব্যক্তিই ছিলেন। কখনো চিঠিতে, কখনো মুখে যখনই সামান্য সুযোগ পেতেন, বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে আমাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়তেন। কখনো হেসে, কখনো গর্জন করতে করতে, কখনো চোখের পানি ফেলতে ফেলতে তাবলিগের কাজ সেরে ফেলতেন। তাঁর উন্নত মস্তিষ্ক, প্রখর ধীশক্তি, শাণিত বুদ্ধি, গভীর জ্ঞান এবং নিখাদ আন্তরিকতা পূর্ব থেকেই আমার নিকট স্বীকৃত ছিল।

তাই এ দু' মনীষীর তাবলিগ কখনো ভারী ও কষ্টকর মনে হয়নি। তাঁরা নসিহত ও কল্যাণকামিতার হক পুরোপুরি আদায় করে পুণ্যের ভা-ার সমৃদ্ধ করছিলেন। এ দুই মহান গুরুভার ব্যক্তিত্বের পর তৃতীয় আরেকটি নাম শুনে নিন। তিনি হলেন আমার প্রিয় সঙ্গী মাওলানা আব্দুল বারী নদভি। আর সেই তিনি আজ (১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দে) মাওলানা শাহ আব্দুল বারী, খলিফায়ে থানভী হিসেবে সারাদেশে সমধিক পরিচিত। ধীরে ধীরে তাঁর ভালোই প্রভাব পড়ছিল। চতুর্থজন হিসেবে একজন অমুসলিম ব্যক্তিত্বের নাম না নিলেই নয়। তিনি হলেন বেনারসের বিদগ্ধ দার্শনিক সন্ন্যাস বাবু ভগবান দাস। বস্তুবাদের অতল গহ্বর থেকে বেরিয়ে আসতে এবং আধ্যাত্মিকতার আলোকরৌশ্নিতে পৌঁছতে তাঁর বিশেষ অবদান রয়েছে। তার লেখা ও রচনা দ্বারা উপকৃত হওয়ার পাশাপাশি প্রায়ই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ ঘটত।

গীতা অধ্যয়নের সুবাদে মন-মানসিকতায় সূফিবাদের প্রতি একটা আকর্ষণ সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। অলী-বুযুর্গদের কারামত ও অলৌকিক ঘটনার ব্যাপারে এখন আর বিরূপ মনোভাব নেই বরং এসবের প্রতি একটা ঝোঁক ও আকর্ষণ সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। আর এ সম্পর্কে উর্দু-ফার্সিতে অনেক বই-পুস্তকও পড়া হয়ে গিয়েছিল।

অন্তর্জগৎ ও মনোজগতে গভীর প্রভাব বিস্তারকারী উল্লেখযোগ্য মহান ব্যক্তিদের মধ্যে অন্যতম, দেওয়া অঞ্চলের প্রসিদ্ধ বুযুর্গ হাজি ওয়ারেছ আলী শাহ। তার বাণীসংকলন বড় বিমুগ্ধ নয়নে পড়তাম। স্বচ্ছ ও পরিষ্কার ধারণা নিয়ে সচেতনভাবে মুসলমান হওয়ার আগেই তাঁর কারামত ও অলৌকিক ঘটনাবলি আগ্রহ ভরে শুনতে লাগলাম।

১৯১৯ সালের শেষের দিকের কথা। লক্ষ্ণৌর বাসিন্দা এক নিকটাত্মীয় সৈয়দ মমতাজ আহমদের নিকট কানপুরের ঝকঝকে ছাপা, সুন্দর বাঁধাইয়ের মাওলানা রুমীর অমর কাব্যগ্রন্থ মসনবি শরিফের পুরো ছয় খ- দেখতে পেলাম। পাঠের পুরোনো অভ্যাস মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। বেচারা বড় খুশি মনে এক এক খ- দিতে শুরু করলেন। গ্রন্থখানা অধ্যয়ন শুরু করতে দেরি ছিল, কিন্তু এ কথা মনে হতে দেরি হল না যে, কে যেন আমাকে মন্ত্রমুগ্ধ করে ফেলেছে। গ্রন্থখানা আমি রেখে উঠতে চাইলেও গ্রন্থখানা আমাকে ছাড়ে না। তখন ফার্সি ভাষায় যোগ্যতাই বা কতখানি ছিল। হাজারো কবিতার আগা-মাথার কিছুই বুঝে আসত না; কিন্তু তবুও তার আকর্ষণ ও সম্মোহন এতই প্রবল ছিল যে, একপ্রকার আত্মহারা হয়ে পড়ে চলেছি এবং গ্রন্থখানা থেকে চোখ সরাতে পারছি না। এ অস্পষ্ট ও ভাসাভাসা বুঝেই সম্পূর্ণ আত্মহারা হয়ে একপ্রকার মত্ততা অনুভব করতে লাগলাম। কোথায় নাওয়া-খাওয়া আর কোথায়-নিদ্রা বিশ্রাম। মনেপ্রাণে শুধু একই কামনা রুদ্ধদ্বারে, নির্জনে অধ্যয়ন চালিয়ে যেতে পারা। পড়তে পড়তে কখনো চোখের পানিতে ভেসে যাওয়া, আর কখনো অজান্তেই চিৎকার করে ওঠা। গ্রন্থখানার টীকা ছিল আরো মারাত্মক। উপরন্তু তা ছিল 'মুরশিদুনা কেবলায়ে আলম'-এর কলমে লেখা। দেখতে সংক্ষিপ্ত, কয়েক শব্দের। কিন্তু ছিল পুরো পঙক্তির সারনির্যাস।

(পরে জানতে পারলাম, 'মুর্শিদুনা' হলেন যুগশ্রেষ্ঠ অলি, মহান বুযুর্গ হাজি ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কি রহ.।)

মনে নেই গ্রন্থখানা কত দিনে খতম হয়েছে। যখনই শেষ হয়ে থাক, তবে এতটুকু মনে পড়ে—অন্তর মমতাজ মিয়ার প্রতি কৃতজ্ঞতায় টইটুম্বুর ছিল। কারণ, এ অমূল্য রত্ন তার মাধ্যমেই পেয়েছিলাম। কোনো প্রকার তর্ক-বিতর্ক ছাড়াই সংশয়-সন্দেহের ছিটেফোঁটা আর অন্তরে বাকি রইল না। অন্তরাত্মা তখন মসনবি রচয়িতার প্রতি চূড়ান্ত বিশ্বাস স্থাপনে ব্যাকুল হয়ে পড়েছিল। যেন খোদা এবং রাসূল সবই তিনি (নাউযুবিল্লাহ)। প্রকৃত অর্থে যদিও তখনো মুসলমান হইনি; কিন্তু কুফর ও কুফুরি মতবাদ থেকে অন্তর পুরোপুরি সরে গিয়েছিল। সংশয়বাদ ও ইউরোপীয় নাস্তিকতাকে শতমুখে অভিশাপ দিচ্ছিল।

ধারাবাহিক পরিবর্তনের এ ধাপে এ পর্যায়ে এসে তাসাউফের অনেক ফার্সি বই-পুস্তক পড়ে ফেললাম। ফরিদুদ্দিন আত্তারের মানতিকুত তাইর ও মোল্লা জামীর নফহাতুল উনস ইত্যাদি। অদ্ভুত ও অলৌকিক ঘটনাবলি হৃদয়কে নাড়া দিত। অন্তরাত্মাকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করত। কাশফ ও কারামতের ঘটনাবলি গভীর আগ্রহ এবং পরম ভক্তি-বিশ্বাস নিয়ে শ্রবণ করতাম। লক্ষ্ণৌর ওই বাড়িতে নাঈমুজ্জামান নামে আমার এক খালাত ভাই এসে সময় কাটাত। ও নিজেই একটা সূফি বিশ্বকোষ ছিল। তার সান্নিধ্য সোনায় সোহাগার কাজ দিল। সময় সময় মাযারে যাওয়া, ওরস ও কাওয়ালিতে অংশগ্রহণ করা শুরু হয়ে গেল। লক্ষ্ণৌতে ও লক্ষ্ণৌর বাইরে দেওয়া অঞ্চলের হাজি ওয়ারিস আলী শাহকে তো কিছুকাল পর্যন্ত সর্বত্র হাজির-নাজির মনে করতাম (নাউযুবিল্লাহ)! ইসলাম থেকে দূরত্ব এখন দিন দিন কমতে থাকল এবং প্রতি পদক্ষেপ তারই পানে ধাবিত হচ্ছিল। হোক তা কবরপূজা ও পীরপূজার হাত ধরে।

## ইসলামে প্রত্যাবর্তন

পর্যায়ক্রমিক অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন ধীরে ধীরে ইসলামের পানে অগ্রসর হচ্ছিল। বলা যায় পঞ্চাশ ভাগের বেশি মুসলমান হয়ে গিয়েছি। ইতোমধ্যে ১৯২০-এর অক্টোবরে এক আত্মীয় নাযির ইয়ার জঙ্গের বাসায় আওরঙ্গাবাদে অবস্থানের সুযোগ হয়। তার গ্রন্থাগারে মুহাম্মদ আলী লাহোরি আহমদি কৃত (জনসাধারণ্যে কাদিয়ানি হিসেবে খ্যাত) কুরআন শরিফের ইংরেজি অনুবাদ ও তাফ্সির নজরে পড়ল। ব্যাকুল হয়ে তা আলমারি থেকে বের করে পড়া শুরু করলাম, পড়া যতই অগ্রসর হচ্ছিল—আলহামদুলিল্লাহ—ঈমান ততই বৃদ্ধি পাচ্ছিল। তখন পর্যন্ত 'বাবুয়ানা মানসিকতায়' আক্রান্ত ছিলাম। তারই প্রতিক্রিয়া ছিল, যে অর্থ-মর্ম ও তাৎপর্য উর্দুতে নিষ্প্রাণ ও প্রতিক্রিয়াহীন মনে হত, ঠিক তা-ই ইংরেজির মোড়কে ক্রিয়াশীল, প্রাণবন্ত ও সুদূর প্রভাবময়ে পরিণত হত। এটা কোনো মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবতা হোক বা না হোক, আমার বেলায় তা প্রত্যক্ষ বাস্তবতা বলে প্রমাণ হয়েছে—এ ইংরেজি তরজমা সমাপ্ত করে অন্তরে তন্ন তন্ন করে তল্লাশি চালিয়ে নিজেকে মুসলমান বলেই আবিষ্কার করেছি। আর তখন নিজ বিবেকের সঙ্গে প্রতারণা না করে নির্দ্বিধায় কালিমায়ে শাহাদাত পড়ে নিয়েছিলাম।

মির্জা কাদিয়ানির ব্যাপারে তার আকিদা ভ্রান্ত ছিল, না সঠিক ছিল এ নিয়ে আমার আলোচনা নয়। ব্যক্তিগত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে কী করে আর উপেক্ষা করা যায়। কারণ, আমার কুফর ও ধর্মদ্রোহের কফিনের শেষ পেরেক ঠুকে দেওয়ার কাজটি এর দ্বারাই ঘটেছে। একদা ইসলাম থেকে সন্তর্পণে চুপিসারে

যেমন বেরিয়ে গিয়েছিলাম, আল্লাহ তায়ালার অশেষ কৃপায় আজ তেমনি ধীরে ধীরে ইসলামে দাখেল হয়ে গেলাম। ইসলাম ত্যাগ ও ধর্মদ্রোহের সময়টাকে যেমন দিন-তারিখ দিয়ে সুনির্দিষ্ট করা কঠিন, অদ্রুপ ইসলামে প্রত্যাবর্তনের সময়টিকে দিন-তারিখ দিয়ে কাঁটায় কাঁটায় স্থির নির্দিষ্ট করা সহজ নয়। তবে ১৯২০ অক্টোবরে তা পূর্ণাঙ্গতা লাভ করেছিল। ভ্রষ্টতা অধ্যয়নের পথ ধরেই এসেছিল। আলহামদুলিল্লাহ! হেদায়াতও এ পথেই নসিব হয়েছে।

কবি আকবর এলাহাবাদীর কালজয়ী পঙ্‌ক্তি :

دل بدل جائیں گے تعلیم بدل جانے سے

'শিক্ষাব্যবস্থা পরিবর্তনের দ্বারা মানসিকতা বদলে যাবে।'

আমার আত্মজীবনী দ্বারা তা পুরোপুরি সত্য প্রমাণিত হয়েছে। কারণ, আমার এত বৈপ্লবিক পরিবর্তনে জীবন্ত ব্যক্তির বড় একটা ভূমিকা ছিল না।

হিন্দুদর্শন ও যোগবাদী তাসাউফ কুফুর ও ঈমানের মধ্যে অনেকটা সেতু-বন্ধনের কাজ দিয়েছে। যে শুষ্ক ধার্মিকগণ হিন্দুদর্শনের নাম শুনেই উত্তেজিত হয়ে ওঠেন আর একে আগাগোড়া কুফুরি ও ভ্রষ্টতা আখ্যায়িত করে থাকেন, তারা আমার অভিজ্ঞতা গুরুত্ব সহকারে নোট করে রাখতে পারেন যে, এটাকে [হিন্দুদর্শন ও যোগবাদকে] সহজেই হেদায়াতের মাধ্যম বানানো যেতে পারে। আর তাঁরা যেন নিজেদের ধার্মিকতার জোশে আল্লামা শিবলী ও মুহাম্মদ আলী লাহোরির তাবলিগি অবদানকে তাচ্ছিল্যভরে উড়িয়ে না দেন। আমি তো এ দুজনের বিরাট সহায়তা অনুভব করেছি। এমনকি স্পিরিট অফ ইসলামের লেখক জাস্টিস আমীর আলীর কর্ম ও অবদানকেও হেয় ও তুচ্ছ মনে করবেন না। অথচ বেচারা কুরআন শরিফকেও সম্ভবত প্রিয়নবী ﷺ-এর বাণীসংকলন মনে করত। আপন জীবনের অন্ধকার অধ্যায়ের সারকথা হচ্ছে, চিন্তা ও মন-মানসিকতার যে স্তরে তখন ছিলাম, সেখানে হযরত থানভি রহ.-এর মতো মনীষীর লেখা ও রচনা ভ্রূক্ষেপের অযোগ্যই ভাবতাম। ওসব দিকে চোখ তুলেও তাকাতাম না বরং তার ওয়াজ-নসিহত থেকে বিরূপ প্রতিক্রিয়া গ্রহণ করতাম। খাদ্য নিশ্চয় উপাদেয় ও শক্তিবর্ধক বটে, তবে যদি সেটা রোগীর পাকস্থলীর উপযোগী না হয়, তা হলে তো তাতে উল্টো ক্ষতিই হবে।

ঈমানের মহামূল্যবান দৌলত তো নসিব হয়ে গিয়েছিল ঠিক, কিন্তু তখনো প্রথাগত পীর-মুরিদি, দরগাহ ও দরবার-কেন্দ্রিক হয়ে মাথা ঠুকছিল। দরগাহ ও মাযারে হাজিরা দেওয়া, বার্ষিক ওরস-কাওয়ালিতে অংশগ্রহণ বেশ জোরে শোরে চলছিল। আজ আজমীরে হাজিরা দিলে কাল খাজা বখতিয়ার কাকীর দরগাহে। অনুরূপ লক্ষ্ণৌর দরগাহ ও দরবারসমূহ (শাহ মীনা ও সূফি আবদুর

রহমানের দরগাহে) ঘুরতে থাকি। লক্ষ্ণৌর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মাযারসমূহে যেমন রুদৌলির মাযার, বাঁনসা এলাকার মাযার এবং দেওয়ার দরগায় ঘনঘন চক্কর লাগাতে থাকি। বিশেষ নিসবত ও সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছিল হযরত খাজা নিজামুদ্দিন আউলিয়ার সঙ্গে।

সেই সুবাদে সর্বদা খাজা হাসান নিজামির মেহমান হতে থাকি। ১৯২১-এর সূচনালগ্নে লক্ষ্ণৌ থেকে দরিয়াবাদে চলে আসি এবং একেই স্থায়ী নিবাস হিসেবে গ্রহণ করি। পরপর দু বছর আপন প্রধান পূর্বপুরুষ পীর দরিয়াবাদির ওরস পালন করেছি। বড় ধুমধামের সঙ্গে জোরদার কাওয়ালি মাহফিলের আয়োজন করেছি। ১৯২২-এর প্রথম ত্রৈমাসিক ছিল, ওয়াজ ও ভাবোদ্দীপক কিছু নাত ও গজল মাওলানা মুহাম্মদ আলীর হাতে পড়ে গেল। এতে তিনি নিজেও গজল গাইলেন। কাওয়ালি গায়কদের দিয়েও গাওয়ালেন। ঘটনাক্রমে দরিয়াবাদের হাতের কাছে সহজেই ভালো ভালো কাওয়ালি গায়ক পাওয়া গেল। তন্মধ্যে কাওয়ালি গায়ক মরহুম আফজাল সাহেব উল্লেখযোগ্য। আমার কাওয়ালি শোনা দৈনন্দিন রুটিনে পরিণত হয়ে গেল। ধীরে ধীরে আত্মহারা হয়ে রোনাজারির হালত হতে লাগল। বিশেষত ভোর-সকালের লোকারণ্যে।

নাত-গজলের ক্ষেত্রে তো পরিষ্কার মনে আছে, সর্বপ্রথম যে বিষয়বস্তু শুনে অজান্তে অনিচ্ছায় অশ্রুপ্রবাহ শুরু হয়ে গিয়েছিল, তা ছিল মাওলানা জামী রহ.-এর বিখ্যাত গজলের সূচনা পঙ্‌ক্তি :

بہ خرام باز جلوہ دہ آں سرو ناز را ❁ پامال خویش کش سر اہل نیاز را

প্রেমবাজিকরের উচিত ওই ঢং ও ভঙ্গিমা প্রদর্শন করা অর্থাৎ প্রিয়তমের সম্মুখে আপন সত্তাকে বিলীন করে দাও।

প্রিয়তম নবী ﷺ-এর নাম মোবারক শুনে অজান্তে অনিচ্ছায় চোখ টলমল করে অশ্রুপ্রবাহ জারি হওয়ার কথাও মনে পড়ে। স্বপ্নযোগে মরহুম বুযুর্গদের বহুবার সাক্ষাৎ লাভ করেছি। আর অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী জীবিত আধ্যাত্মিক পীর-মাশাইখদের যিয়ারতও বারবার হতে থাকে।

ঈমান ও ইসলামের পথের যাত্রায় ক্রমপরিবর্তনের অধ্যায়টি আড়াই কি তিন বছর স্থায়ী হয়। সময়টা সম্ভবত ১৯২৩-এর সেপ্টেম্বর মাস ছিল। তখন সময় মুজাদ্দিদে আলফেসানীর মাকতুবাত অধ্যয়ন করার তৌফিক হয়। দামি কাগজে উন্নত বাঁধাইয়ে সুন্দর হস্তাক্ষরে লেখা ঝকঝকে ছাপা চমৎকার একটি সংস্করণ। অমৃতসর থেকে ছাপা টীকাসহ (কানপূর থেকে ছাপা 'মসনবি'র এ্যাডিশনের মতো) নয় খণ্ডে পেয়ে গেলাম। এটাও মনের মধ্যে প্রায় তেমনি

গভীর দাগ কেটেছে, যেমন দাগ কেটেছিল তিন-চার বছর পূর্বে মসনবি শরিফ। পার্থক্য শুধু এতটুকু ছিল যে মসনবি জোশ ও আবেগের এক অত্যুষ্ণ তাপ সৃষ্টি করে দিয়েছিল। (মাকতুবাতের কল্যাণে) উদভ্রান্তের মতো এদিক-সেদিক ছুটাছুটি এবং প্রত্যেক মাযারওয়ালার সঙ্গে সম্পর্ক পাতানোর পরিবর্তে শরিয়ত অনুসরণের সুনির্দিষ্ট রাজপথ পেয়ে গেলাম। কাঙ্ক্ষিত গন্তব্য, অভীষ্ট লক্ষ্য স্থির হয়ে গেল। আর তা হল—'রেজায়ে এলাহী ও আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি'। ওই গন্তব্যে পৌঁছা এবং সেই অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের একমাত্র মাধ্যম হল, আখেরী নবীর আনীত বিধানাবলি। মসনবি ও মাকতুবাত—এতদুভয়ের অনুগ্রহ আজীবন ভুলতে পারব না। বলা যায়, হেদায়াত যা ভাগ্যে জুটেছে চূড়ান্ত পর্যায়ে এ দু গ্রন্থ অধ্যয়নেরই ফল ও ফসল। আর তাও ঘটেছে কোনো উস্তাদের তত্ত্বাবধান ও পথনির্দেশ ছাড়া। নিজের যোগ্যতার কমতির দরুন সবটাই রয়ে গেছে ভাসাভাসা ও অগভীর।

এ পর্যায়ে এসে নিরেট ধর্মীয় বই পুস্তক অধ্যয়ন শুরু করলাম। কলেজে পড়ে আসা ভাঙাচোরা আরবি কাজে দিল। তাফ্সির, হাদিস, ফিকহ ও ইলমে কালামের গ্রন্থরাজির অধ্যয়ন বড় উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে করতে লাগলাম। অধিকাংশই উর্দু তরজমার সাহায্য নিয়ে। আলহামদুলিল্লাহ! এসব বিদ্যার গুরুত্বপূর্ণ বই-পুস্তক উর্দু ভাষায় অনুদিত হয়ে গেছে। কুরআন শরিফের উর্দু ও ফার্সি তরজমা হাতে পেয়ে গেলাম। সবগুলো একে একে মন্থন করলাম। তারপর বায়যাবি, কাশশাফ ইত্যাদি তাফ্সির গ্রন্থের পালা আসল। হাদিসের পুরো ভা-ার মন্থনের সুযোগ ও সামর্থ্য আর কোথায় পাব। তথাপি হাদিসের সহিহ কিতাবগুলোর গুরুত্বপূর্ণ ও নির্বাচিত অংশগুলো আপন রুচি অনুযায়ী কিছু না কিছু অধ্যয়ন করেই নিয়েছি।

তদ্রুপ ফিকহের প্রসিদ্ধ ও ব্যাপক সমাদৃত গ্রন্থরাজির দরকারি অংশগুলো টীকা, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা গ্রন্থের সাহায্যে পড়ে নিয়েছি। কুরআন শরিফের শব্দমালার অভিধান, হাদিসের অভিধান, ফিকহের অভিধান জাতীয় যে গ্রন্থ-কিতাবই হাতের কাছে পেয়েছি, তা থেকেই সহযোগিতা নিতে শুরু করেছি। পড়া ও পড়ে শেষ করে ফেলার যে 'ব্যাধি' শুরু থেকেই ছিল, তা এ ক্ষেত্রেও বড় কাজে দিল। বুঝে, না বুঝে বহু পৃষ্ঠা মন্থন করে ফেলেছি।

লক্ষ্ণৌতে মৌলভি কাসমণ্ডি নামে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন একজন বুযুর্গ ছিলেন। বাহ্যত কালেক্টরির চাকরি করতেন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আধ্যাত্মিক ক্ষমতাসম্পন্ন ছিলেন। তার খেদমতে সীমাছাড়া রকমে পড়ে থাকতাম। ১৯২৯ সালে তিনি ইন্তিকাল করলেন। বারাবানকি অঞ্চলের শহরতলিতে মৌলভি আবেদ হুসাইন

ফতেহপুরী নামে একজন আলেম, শরিয়তের পাবন্দ, সাহেবে নিসবত বুযুর্গ ছিলেন। তিনি ১৯২৭ সালে ইন্তেকাল করেন। উক্ত দুই মহান মনীষী থেকেও আপন যোগ্যতা অনুযায়ী শিক্ষা লাভ করেছি।

সর্বাধিক ঈমানি উপকার লাভ করেছি মাওলানা মুহাম্মদ আলী জাওহার থেকে। দেখতে না দরবেশ, না আলেম, না সংস্কারক কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হাতে গোনা দশজনের একজন। যেন দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকা ঈমানি উত্তাপের তন্দুর। ইশকে রাসূল ও ইশকে কুরআনকে নিজের শয়ন ও স্বপন বানিয়ে নিয়েছিলেন। আমার ঈমান যদি প্রাণ পেয়ে থাকে, তা হলে তারই সান্নিধ্যের বরকতে প্রাণ পেয়েছে। ১৯২৩-১৯৩০ পর্যন্ত শেষ অবধি তাঁর সঙ্গে বারবার সাক্ষাতের ধারা অব্যাহত ছিল। বেশির ভাগই লক্ষ্ণৌ-দিল্লিতে। আর কখনো বম্বেতে, কখনো আলীগড়ে। প্রতিটি সাক্ষাৎ-সান্নিধ্য ঈমান বৃদ্ধির কারণ হয়।

খেলাফত কমিটিতে জড়িয়ে পড়ার সুবাদে ১৯২৫ সালে মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানি রহ.-এর সঙ্গে পরিচয় ঘটে। তারপর লক্ষ্ণৌ, সাহারানপুর ও খোদ দরিয়াবাদেও তাঁর পদধূলি লাভের সুযোগ হতে থাকে। ১৯২৮ সালে তার মাধ্যমেই হযরত থানভির সংশ্রব-সান্নিধ্যে উপনীত হই। হযরত থানভি রহ. থেকে দীনি, রুহানি-আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক দিক থেকে যে পরিমাণ ফায়েদা হাসিল হয়েছে, তা বর্ণনাতীত। হযরতেরই একজন গুণী শিষ্য হাজি মুহাম্মদ শফি' বিজ্‌নুরি (মৃত্যু : ১৯৫১) এতটাই হৃদ্যতা ও আন্তরিকতাপূর্ণ আচরণ করেছেন, যেন আমি তার কোনো নিকটতম স্বজন। আল্লাহ তায়ালা এসব বুযুর্গকে সর্বোচ্চ মাকাম ও মর্যাদা দান করুন! এক সাধারণ গোবেচারা পাপী-তাপী তাদের বিপুল অনুগ্রহ-বদান্যতার বিনিময়ে তাদের জন্য কল্যাণের দুয়া ছাড়া আর কীইবা করতে পারে। [মাসিক নেয়ামত-মার্চ ২০১৬]

**যারে তারে নাস্তিক বলার সংস্কৃতি**

ইদানিং ইন্টারনেটে ঢুকলেই সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রী-এমপির নাম দিয়ে তাঁদেরকে নাস্তিক বলে অপবাদ দিতে দেখা যায়; অথচ কয়েক দিন আগেও ওই এমপি কিংবা মন্ত্রীকে নামায পড়তে দেখা গেছে। বিষয়টি দেখে অনেক অবাক লাগে। মুসলমান মুসলমানকে কিভাবে নাস্তিক বলে সম্বোধন করতে পারে! ভুলক্রমে কেউ যদি কোনো কথা বলে ফেলে, তবে তাকে হৃদ্যতার সাথে অবগত করা উচিত। তারপর তওবা করতে বলা চাই।

তিনি যদি তওবা করতে অস্বীকৃতি জানান এবং তাঁর নামে ছড়ানো কথায় সম্মতি প্রকাশ করেন আর ওই কথার দ্বারা আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্ব অস্বীকার করা বাধ্যতামূলক হয়, তবেই তাকে নাস্তিক্যবাদের আওতায় আনা যায়।

তদুপরি বিজ্ঞ আলেমগণই এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিবেন। এ ছাড়া আমাদের মতো সাধারণ মানুষ যারে তারে নাস্তিক বলার সংস্কৃতি পরিহার করতে হবে।

**কবিরা গুনাহ করলে নাস্তিক হয় না**

ইসলাম ছাড়াছাড়ি যেমন সমর্থন করে না, বাড়াবাড়িও পছন্দ করে না। আমাদের মধ্যে অনেকেই আছেন, যারা কোনো মানুষ কোনো কবিরা গুনাহ করলেই তাকে নাস্তিক বেঈমান বলে ফেলে। এটা ইসলাম সমর্থন করে না। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকিদা হল—কবিরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তিকে ফাসেক তো বলা যাবে; কিন্তু ইসলাম থেকে খারেজ মনে করা কিংবা কাফির-নাস্তিক বলা যাবে না। নাস্তিক তো শুধু তাকে বলা যাবে, যে আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্বকে অস্বীকার করে। কবিরা গুনাহ করলে মানুষ ইসলাম থেকে বের হয়ে যায়, এটা বাতিল ফেরকা মু'তাযিলাদের আকিদা-বিশ্বাস। কবিরা গুনাহ করলে কাফির হয়ে যাবে, এটা বাতিল ফেরকা খারেজিদের আকিদা-বিশ্বাস। এ ধরনের আকিদা পোষণ করা মুসলমানের জন্য বৈধ নয়।

**নাস্তিকতা একটা অপমান**

এ পুস্তক লিখতে গিয়ে আমার উস্তাদ হযরত মাওলানা লিয়াকত আলী দা. বা.-এর সাথে পরামর্শ করলাম। একপর্যায়ে আমি বললাম, আমি এ পুস্তকে একটা তালিকা পেশ করব। উস্তাদ বললেন, তারা তোমার বিরুদ্ধে মামলা করবে; দুনিয়ার আদালতে, বাস্তবতার পরিপন্থি হলে আল্লাহ তায়ালার আদালতে। কারণ, তুমি কি তার কলব ছিঁড়ে দেখেছ—সে কোন্ আকিদা পোষণ করে? বর্তমানে যদি সে এমন আকিদা পোষণ করেও পরবর্তী সময়ে সে তওবা করে বসে, তখন তোমার বইয়ের তথ্যের কী হবে?

আমি বললাম, তবে যারা মারা গেছে তাদের নাম লিখি? উস্তাদ বললেন, তাদের নামও লিখা যাবে না। তারা কেউ নিজেকে প্রকাশ্যভাবে নাস্তিক বলে ঘোষণা দেয়নি। এখন তুমি যদি তাদেরকে নাস্তিকের তালিকায় পেশ কর, তবে তাদের ওয়ারিশরা তোমার বিরুদ্ধে মামলা করবে—দুনিয়ার আদালতে, বাস্তবতার পরিপন্থি হলে তারা তোমার বিরুদ্ধে মামলা করবে আল্লাহ পাকের দরবারে। কেননা নাস্তিকতা একটা অপমান।

**নাস্তিকতা একটি অভিশাপ**

গুনাহের ক্ষতিসমূহের মধ্যে লিখা আছে, গুনাহের কারণে মানুষের অন্তরের নূর চলে যায়। আর ঈমানও একটি নূর। আমাদের সমাজের নাস্তিকগুলোর দিকে খেয়াল করলেই আমরা দেখতে পাই যে, তারা মুসলিম থাকা অবস্থায় অনেক অনেক মারাত্মক গুনাহসমূহে লিপ্ত হয়েছে। যেমন– সুন্নাতের উপর

আমল না করা, দাড়ি কাটা বা ছাঁটা, বেপর্দায় লিপ্ত হওয়া, চোখের যেনা করা, হাতের যেনা ও পায়ের যেনা করা, পরনারীর সাথে অবৈধ আলাপ, অবৈধ প্রেম করা, একপর্যায়ে দুনিয়াতে দণ্ডযোগ্য যেনায় লিপ্ত হয়ে যাওয়া (আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন), মদ খাওয়া, জুয়া খেলা ইত্যাদি।

এসব গুনাহ করতে করতে একসময় গুনাহকারীদের অন্তর অন্ধকার হয়ে যায়। তখন গুনাহকে আর গুনাহ মনে হয় না। এটাও গুনাহের একটি অভিশাপ। তখন তারা গুনাহকে বৈধ মনে করেই গুনাহে লিপ্ত হতে থাকে। শরিয়তের বিধি-বিধানের সাথে তাদের তখন মানসিক দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে যায়। এভাবে চলতে চলতে নফসে আম্মারা (অসৎ আত্মা) ও শয়তান তাদের উপর প্রবল হয়ে যায় এবং একসময় ঈমানহারা করে দেয়। পাপের জগতে সবচেয়ে নিকৃষ্ট পাপ—আল্লাহ তায়ালাকে অস্বীকার করার মতো পাপ করিয়ে ছাড়ে। তখন থেকে সে শরিয়তের বিধানগুলোর বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে দেয়। এ আন্দোলন মূলত তার আন্দোলন নয়; শয়তানের আন্দোলন। শয়তান তো অবাধ্যতাবশত আল্লাহ তায়ালার সামনে ঘোষণা দিয়ে এসেছে, আমি অবশ্যই মানুষদের বিপথগামী করে ছাড়ব। যেমন, কুরআন পাকে ইরশাদ হয়েছে :

وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ❖ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ❖ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ ❖ قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ❖ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ❖ قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ❖ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ❖ قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ ❖

আর আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি। এরপর আকার-অবয়ব তৈরি করেছি। এরপর আমি ফিরিশতাদেরকে বলছি—আদমকে সাজ্‌দা করো! তখন সবাই সাজ্‌দা করেছে, কিন্তু ইবলিস সে সাজ্‌দাকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

আল্লাহ বললেন– আমি যখন নির্দেশ দিয়েছি, তখন তোকে কিসে সাজ্‌দা করতে বারণ করল? সে বলল, আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আপনি আমাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটির দ্বারা।

তিনি বললেন, তুই এখান থেকে যা। এখানে অহংকার করার কোনো অধিকার তোর নাই। সুতরাং তুই বের হয়ে যা। তুই হীনতমদের অন্তর্ভুক্ত। সে বলল, আমাকে কেয়ামত দিবস পর্যন্ত অবকাশ দিন। আল্লাহ বললেন, তোকে সময় দেওয়া হল। সে বলল, আপনি আমাকে যেমনি পথভ্রষ্ট করলেন, আমিও অবশ্যই তাদের জন্য আপনার সরল পথে বসে থাকব।

এরপর তাদের কাছে আসব তাদের সামনের দিক থেকে, পিছন দিক থেকে, ডান দিক থেকে এবং বাম দিক থেকে। আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবেন না। আল্লাহ বললেন– বের হয়ে যা এখান থেকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে। তাদের যে কেউ তোর পথে চলবে, নিশ্চয় আমি তোদের সবার দ্বারা জাহান্নাম পরিপূর্ণ করে দিব। [সূরা আ'রাফ : ১১-১৮]

কুরআন মাজিদে সূরা হিজরে ইরশাদ হয়েছে,

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ❖ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ ❖ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ❖ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ❖ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ❖ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ❖ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ❖ قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ❖ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ❖ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ❖ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ❖ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ❖ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ❖ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ❖ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ❖ قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ ❖ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ❖ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ❖ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ ❖ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ❖ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ ❖ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ ❖ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ ❖ نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ❖ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ

"আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি পচা কর্দম থেকে তৈরি বিশুষ্ক ঠনঠনে মাটি দ্বারা। আর জিনকে সৃষ্টি করেছি এর আগে লু এর আগুনের দ্বারা। আর আপনার পালনকর্তা যখন ফিরিশতাদেরকে বললেন– আমি পচা কর্দম থেকে তৈরি বিশুষ্ক ঠনঠনে মাটি দ্বারা সৃষ্ট একটি মানব জাতির পত্তন করব। এরপর যখন তাকে ঠিকঠাক করে নিব এবং তাতে আমার রূহ থেকে ফুঁক দিব, তখন

তোমরা তার সামনে সাজ্‌দায় পড়ে যেয়ো। তখন ফিরিশতারা সবাই মিলে একযোগে সাজ্‌দা করল। কিন্তু ইবলিস; সে সাজ্‌দাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে অস্বীকার করল। আল্লাহ্ বললেন—হে ইবলিস! তোমার কি হলো যে, তুমি সাজ্‌দাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে অস্বীকার করলে? সে বলল– আমি এমন নই যে, একজন মানবকে সাজ্‌দা করব, যাকে আপনি পচা কর্দম থেকে তৈরি ঠনঠনে বিশুষ্ক মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্ বললেন– তবে তুমি এখান থেকে বের হয়ে যাও। তুমি বিতাড়িত। আর তোমার প্রতি ন্যায়বিচারের দিন পর্যন্ত অভিসম্পাত। সে বলল– হে আমার পালনকর্তা! আপনি আমাকে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবকাশ দিন। আল্লাহ্ বললেন– তোমাকে অবকাশ দেওয়া হল। সেই অবধারিত সময় উপস্থিত হওয়ার দিন পর্যন্ত। সে বলল– হে আমার পালনকর্তা! আপনি যেমন আমাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, আমিও তাদের সবাইকে পৃথিবীতে নানা সৌন্দর্যে আকৃষ্ট করব এবং তাদের সবাইকে পথভ্রষ্ট করে দিব। আপনার মনোনীত বান্দাদের ব্যতীত। আল্লাহ্ বললেন– এটা আমার পর্যন্ত সোজা পথ। যারা আমার বান্দা, তাদের উপর তোমার কোনো ক্ষমতা নেই; কিন্তু পথভ্রান্তদের মধ্য থেকে যারা তোমার পথে চলে, তাদের সবার নির্ধারিত স্থান হচ্ছে জাহান্নাম। এর সাতটি দরজা আছে। প্রত্যেক দরজার জন্য এক একটি পৃথক দল আছে। নিশ্চয় আল্লাহভীরুগণ জান্নাত ও নির্ঝরণীসমূহে থাকবে। বলা হবে– এগুলোতে নিরাপত্তা ও শান্তি সহকারে প্রবেশ করো। তাদের অন্তরে যে ক্রোধ ছিল, আমি তা দূর করে দিব। তারা ভাই ভাইয়ের মতো মুখোমুখী আসনে বসবে। সেখানে তাদের একদম কষ্ট হবে না আর তারা সেখান থেকে বহিষ্কৃত হবে না। আপনি আমার বান্দাদেরকে বলে দিন—আমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল দয়ালু। আর এটাও যে, আমার শাস্তিই যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি।" [সূরা হিজর : ২৬-৫০]

কুরআন মাজিদে অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে,

إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ ۞ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ۞ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ۞ إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ۞ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ ۞ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ۞ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ۞ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ۞ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۞ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ۞ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ۞ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ۞ قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ ۞ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ۞

"যখন আপনার পালনকর্তা ফিরিশতাদেরকে বললেন, আমি মাটির মানুষ সৃষ্টি করব। যখন আমি তাকে সুষম করব এবং তাতে আমার রূহ ফুঁকে দিব, তখন তোমরা তার সম্মুখে সাজদাবনত হয়ে যেয়ো। এরপর সমস্ত ফিরিশতাই একসঙ্গে সাজদাবনত হল; কিন্তু ইবলিস, সে অহংকার করল এবং হয়ে গেল অস্বীকারকারীদের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ বললেন, হে ইবলিস! আমি স্বহস্তে যাকে সৃষ্টি করেছি, তার সম্মুখে সাজদা করতে তোমাকে কিসে বাধা দিল? তুমি কি অহংকার করলে, না তুমি তার চেয়ে উচ্চ মর্যাদাবান? সে বলল– আমি তার চেয়ে উত্তম। আপনি আমাকে আগুনের দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। আর তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটির দ্বারা। আল্লাহ বললেন– বের হয়ে যা, এখান থেকে। কারণ, তুই অভিশপ্ত। তোর প্রতি আমার এ অভিশাপ বিচার দিবস পর্যন্ত স্থায়ী হবে। সে বলল, হে আমার পালনকর্তা! আপনি আমাকে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবকাশ দিন। আল্লাহ বললেন, তোকে অবকাশ দেওয়া হল একটি নির্ধারিত সময়ের দিন পর্যন্ত। সে বলল– আপনার ইযযতের কসম! আমি অবশ্যই তাদের সবাইকে বিপথগামী করে দিব। তবে তাদের মধ্যে যারা আপনার খাঁটি বান্দা, তাদেরকে ছাড়া। আল্লাহ বললেন– তাই ঠিক, আর আমি সত্য বলছি—তোর দ্বারা আর তাদের মধ্যে যারা তোর অনুসরণ করবে, তাদের দ্বারা আমি জাহান্নাম পূর্ণ করব। [সূরা ছাদ : ৭১-৮৪]

**শয়তান তাদের ভালো হওয়ার পথও বন্ধ করে রেখেছে!**

কিন্তু কুরআনের বাণী শুনে যে তারা কখনো হেদায়েতপ্রাপ্ত হবে, শয়তান সে পথ তো বন্ধ করার কৌশল অবলম্বন করে রেখেছে! সেজন্য কুরআনকেও তাদের দৃষ্টিতে প্রশ্নবিদ্ধ করার চেষ্টা করছে। তাই তো দেখা যাচ্ছে, কুরআন সম্পর্কেও তাদের মুখ থেকে আবোল-তাবোল কথা বের হচ্ছে (হে আল্লাহ! আমাদের হেফাজত করুন)। শয়তান তাদেরকে সুকৌশলে গোমরাহীর উপর অটল রাখার চেষ্টা করছে। এ কৌশলের অংশ হিসেবেই তাদের সামনে কুরআন প্রশ্নবিদ্ধ, রাসূল প্রশ্নবিদ্ধ, পরকাল প্রশ্নবিদ্ধ, আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্ব পর্যন্ত প্রশ্নবিদ্ধ। আহ! তা হলে তারা ফিরে আসবে কিভাবে?

আল্লাহ! আপনার কুদরতি কদমে মিনতি করছি—তাদেরকে ফিরে আসার তাওফিক দিন। আল্লাহ! আপনার অবুঝ বান্দাদের উপর দয়া করুন! আপনার দয়ায় তাদের গুনাহগুলো মাফ করে দিয়ে তাদের অন্তরে ঈমানের নূর জাগিয়ে দিন। আল্লাহ! আর কোনো মুসলিম যেন নাস্তিক না হয়, সে রকম একটা পরিবেশ সৃষ্টি করার তাওফিক দান করুন! আল্লাহ! বিশেষভাবে এ আমাকে চিরস্থায়ীভাবে হেফাজত করে নিন! সব গুনাহ মাফ করে দিন। অন্তরের সকল অন্ধকার দূর করে দিন।

**ফিরে আসুন!**

ফুল নাস্তিক, হাফ নাস্তিক, সেমি নাস্তিক ও সংশয়বাদীদের প্রতি করজোর আহ্বান জানাই—ফিরে আসুন! মানুষ মাত্র ভুল করতে পারে। আল্লাহ তায়ালা ফিরিশতাদেরকে ভুল করার যোগ্যতা দান করেননি। আর শয়তান ভুল করার পরও নিজের ভুল স্বীকার করে না। মানুষ তো ভুল করে, আবার নিজের ভুল স্বীকার করে অনুতপ্ত হয়। অনুতপ্ত হওয়া মানবতার একটি মহৎ গুণ। অনুতপ্ত হয়ে ফিরে আসাকে তওবা বলে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন–

كُلُّ بَنِيْ آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِيْنَ التَّوَّابُوْنَ.

'মানুষ মাত্রই প্রচুর ভুলকারী। আর উত্তম ভুলকারী হল, তওবাকারী।'
[মুস্তাদরাক, হাদিস নং ৭৬১৭; তিরমিযি, হাদিস নং ২৪৯৯]

সুতরাং যারা আল্লাহ তায়ালার দেওয়া জান-মাল, আলো-বাতাস, আগুন-পানি ইত্যাদি ভোগ করার পরও আল্লাহ তায়ালার পরিচয় না পাওয়ার ফলে আল্লাহ তায়ালার নাফরমানিতে লিপ্ত হয়েছেন, তাদের পায়ে হাত রেখে বলছি—ফিরে আসুন! আল্লাহ তায়ালার পথে ফিরে আসুন!!

আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টিতে গবেষণা করে দেখুন, সৃষ্টির বিন্দু বিন্দুতে আল্লাহ তায়ালাকে চিনতে পাবেন। একটু ভেবে দেখুন! সাধারণ একটি চকলেটও কোনো নির্মাতা ছাড়া অস্তিত্বে আসা আপনার বিবেক সাপোর্ট করবে না, তা হলে ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলের এত সৃষ্টি, এত কিছু, এত সৌন্দর্য, এত বৈচিত্র্য, এত সুর, এত রূপ-গুণ, এত লীলা-খেলা স্রষ্টা ছাড়া কিভাবে অস্তিত্বে আসতে পারে? আল্লাহ তায়ালা সকলকে তাওফিক দান করুন! আমিন!

**নিজে বাঁচুন! অপরকেও বাঁচান!!**

নাস্তিকতা একটি অভিশাপ। নাস্তিক মানেই নিমক হারাম। সে আল্লাহর নেয়ামত ভোগ করল, আল্লাহর দেওয়া জান-মাল উপভোগ করল, আল্লাহর দেওয়া পৃথিবীতে বসবাস করল, চাঁদের আলো ভোগ করল, সূর্য-তাপ আহরণ করল, অক্সিজেন গ্রহণ করল; কিন্তু স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাকেই অস্বীকার করল। তাকেই তো মানুষ নিমক হারাম বলে থাকে। নিমক হারামকে যেমন কেউ পছন্দ করে না, নাস্তিককেও কেউ পছন্দ করে না। এমনকি নাস্তিক নিজেও না। হেরোইনখোরদেরকে মানুষ যত নিকৃষ্ট মনে করে, নাস্তিককে তার চেয়ে অধিক নিকৃষ্ট মনে করে। শুধু মানুষ নয়; সারা বিশ্বের আগুন পানি মাটি বাতাস জড়বস্তু ও জীবজগত সকলেই নাস্তিককে অপছন্দ করে। তাদের দেখে কষ্ট পেতে থাকে। তাদের জন্য মহান আল্লাহর দরবারে বদদুয়া করতে

থাকে। নাস্তিকতা এ জগতেও জাহান্নামস্বরূপ। এজন্যই নাস্তিকরা সমকামিতার মতো ঘৃণ্য কাজে বাধ্য হয়। কেননা ক্ষেত্রবিশেষে এ ছাড়া তাদের কোনো গতি থাকে না। আর পরকালের কথা তো বলাই বাহুল্য।

আপনি চিন্তা করে দেখুন! কেউ যখন কোনো সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে আর সে সরকার তার উপর প্রবল হয়ে যায়, তখন ওই বিদ্রোহী লোকটার কী অবস্থা হয়। সুতরাং নাস্তিকতার মতো এমন ভয়াবহ ও মারাত্মক বিপদ থেকে নিজে বাঁচতে হবে। অপর ভাইকেও বাঁচাতে হবে। বিশেষভাবে নিজের পরিবারের সদস্যদের প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۞

"হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে সেই অগ্নি থেকে রক্ষা করো, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও প্রস্তর, যাতে নিয়োজিত আছে পাষাণহৃদয়, কঠোরস্বভাব ফিরিশতাগণ। আল্লাহ যা আদেশ করেন, তা তারা অমান্য করে না বরং যা করতে আদেশ করা হয়, তা-ই করে।"

[সূরা তাহ্‌রিম-৬]

**সন্তানের প্রতি খেয়াল রাখুন**

পরিবারের মধ্য থেকে বিশেষ করে সন্তানের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে। সন্তান কেমন ছেলেদের সাথে উঠাবসা করছে? সে কোন পরিবেশে থাকছে? এসব বিষয়ে বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে। সন্তানকে ইসলামি শিক্ষার আলোয় আলোকিত করার পরে সম্ভব হলে ও প্রয়োজন মনে করলে, জাগতিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিতে হবে।

এমন যেন না হয় যে, সে ইসলাম সম্পর্কে কিছুই জানল না আর তাকে জাগতিক শিক্ষায় একেবারে উচ্চস্তরে তুলে দিলাম। তখন সে জাগতিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর বিভিন্ন মানসিকতার শিক্ষকদের দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে এবং নিজের ঈমানের দৌলতকে বিসর্জন দিতে বাধ্য হয়ে পড়ে।

সবচেয়ে বড় কথা, মানুষকে আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টি করেছেন। তার রিযিকের ব্যবস্থা তিনি তাঁর কুদরতি হাতে রেখেছেন। অনেক অশিক্ষিত লোকও কোটি কোটি টাকার মালিক। আর অনেক এমএ পাস লোকও ওই অশিক্ষিত লোকের চাকরি করে জীবিকা নির্বাহ করে এবং তার কথায় ওঠে আর বসে।

كَمْ عَاقِلٍ عَاقِلٍ أَعْيَتْ مَذَاهِبُهُ ❖ وَكَمْ جَاهِلٍ جَاهِلٍ تَلْقَاهُ مَرْزُوْقًا.
تَحَيَّرَ النَّاسُ فِيْ هٰذَا فَقُلْتُ لَهُمْ ❖ هٰذَا الَّذِيْ أَوْجَبَ الْإِيْمَانَ بِالْقَدَرِ.

কত শত জ্ঞানী-গুণী কষ্ট করে মরে,
মূর্খ নাদান কত যে বিলাসিতায় ঘোরে।
মানুষ হলো হতবুদ্ধি বললাম আমি তাদের
তাকদিরে পূর্ণ ঈমান আনতে হবে মোদের।
[গিযাউল আলবাব ফী শরহি মানযূমাতিল আদাব-২/৪৩৮]

তাই জাগতিক শিক্ষায় উচ্চ শিক্ষিত হলেই সে অনেক রিযিক পাবে, আর জাগতিক শিক্ষা না থাকলে সে রিযিক পাবে না, এমন চিন্তা-চেতনা নেহাৎ ভুল। সুতরাং নিছক পেট পালার জন্য দীনি শিক্ষা ছেড়ে জাগতিক শিক্ষার পিছনে পড়ে নিজের পরকাল নষ্ট করা কোনো জ্ঞানী লোকের কাজ নয়। বরং জাগতিক শিক্ষাগুলো মানব সেবার উদ্দেশ্যে শিখতে হবে। আগে নিজের পরকাল ঠিক করে পরে মানব সেবার চিন্তা করাই জ্ঞানীদের কাজ।

**অমুসলিমদের সাথে বন্ধুত্ব নয়**

গবেষণা করে দেখা গেছে, ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে যারা মুরতাদ/ নাস্তিক হয়েছে, তাদের অধিকাংশই সঙ্গদোষে হয়েছে। কথায় বলে, 'সৎসঙ্গে স্বর্গবাস; অসৎসঙ্গে সর্বনাশ। তাই অমুসলিমদের সাথে উঠাবসা ও তাদের সাথে বন্ধুত্ব করা থেকে মুসলিমদের দূরে থাকতে হবে।

কেউ হয়তো বলতে পারে, ইসলাম ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বের ধর্ম। কথা তো ঠিক আছে; কিন্তু সে ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্ব মুসলিম ভাইদের পরস্পরের মধ্যে হবে। এমন লোকদের সাথে নয়, যার সাথে ভ্রাতৃত্ব আর বন্ধুত্ব করলে মুসলমান ভাইদের সাথে ওঠাবসার সময় হারাতে হবে। আপনি মনে করুন! আপনার চব্বিশ ঘণ্টা সময়ের মধ্য থেকে দুই ঘণ্টা সময় বন্ধুদের সাথে ওঠাবসা করার জন্য বরাদ্দ করেছেন। এখন যদি আপনার সকল বন্ধুই মুসলিম হয়, তা হলে মুসলিমদের সাথেই আপনি দুই ঘণ্টা সময় দিলেন। পক্ষান্তরে যদি আপনার একজন বন্ধু অমুসলিম হয় এবং তার সাথে আপনি ৫ মিনিট সময় দিয়ে দেন, তা হলে মুসলিমদের সাথে আপনি দুই ঘণ্টা সময়ে পরিবর্তে দিতে হচ্ছে এক ঘণ্টা পঞ্চান্ন মিনিট। চিন্তা আপনিই করুন। তবে তাদের সাথে ফাসাদ সৃষ্টি করা থেকে তো অবশ্যই দূরে থাকতে হবে। অর্থাৎ তাদের সাথে বন্ধুত্বসুলভ দহরম-মহরমও নয় আবার শত্রুতামূলক হিংসাত্মক আচরণও নয় বরং ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বিবেচনায় তাদের সাথে সাধারণ

মানুষের মতো আচরণ করতে হবে। সুতরাং নিজের মধ্যে মেযাজ তৈরি করতে হবে, অমুসলিমদের সাথে বন্ধুত্ব নয়।

আমরা মুসলমান। আমরা একমাত্র আল্লাহ তায়ালাকে পালনকর্তা, ত্রাণকর্তা ও সৃষ্টিকর্তা বলে বিশ্বাস করি। এখন আল্লাহ তায়ালা যদি আমাকে বলে দেন, অমুক ব্যক্তির সাথে বন্ধুত্ব করো না; আর সারা পৃথিবীর লোকেরা বলে, তার সাথে বন্ধুত্ব করো, তা হলে আদিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে ঈমানের সামান্য নূর বাকি থাকলেও সে আল্লাহ তায়ালার হুকুমই পালন করবে। দেখুন! আল্লাহ তায়ালা এ বিষয়ে কী বলছেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ۞ هَا أَنْتُمْ أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ. قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۞ إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ۞

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা মুমিন ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করো না, তারা (মুমিন ব্যতীত অন্যরা) তোমাদের অমঙ্গল সাধনে কোনো ত্রুটি করে না—তোমরা কষ্টে থাক, তাতেই তাদের আনন্দ। শত্রুতাপ্রসূত বিদ্বেষ তাদের মুখেই ফুটে বের হয়। আর যা কিছু তাদের মনে সুপ্ত রয়েছে, তা আরো অনেক গুণ বেশি জঘন্য। তোমাদের জন্য নিদর্শন বিশদভাবে বর্ণনা করে দেওয়া হল, যদি তোমরা তা অনুধাবন করতে সমর্থ হও।

দেখো! তোমরাই তাদের ভালবাস, কিন্তু তারা তোমাদের প্রতি মোটেও সদভাব পোষণ করে না। আর তোমরা সমস্ত কিতাবেই বিশ্বাস কর। অথচ তারা যখন তোমাদের সাথে এসে মিশে, বলে—আমরা ঈমান এনেছি। আর যখন তারা পৃথক হয়ে যায়, তখন তোমাদের প্রতি আক্রোশে আঙুল কামড়াতে থাকে। বলুন! তোমরা আক্রোশে মরতে থাক। আর আল্লাহ তায়ালা মনের কথা ভালোই জানেন।

তোমাদের যদি কোনো মঙ্গল হয়; তা হলে তাদের খারাপ লাগে। আর তোমাদের যদি অমঙ্গল হয়, তা হলে তারা আনন্দিত হয়। আর তাতে যদি

তোমরা ধৈর্য্য ধারণ কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর, তবে তাদের প্রতারণায় তোমাদের কোনো ক্ষতি হবে না। নিশ্চয় তারা যা কিছু করে, সেসব আল্লাহর আয়ত্তে রয়েছে।" [সূরা আলে ইমরান : ১১৮-১২০]

আল্লাহ তায়ালা আরো ইরশাদ করছেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ
أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا ❖

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা কাফিরদেরকে বন্ধু বানিও না মুসলমানদের বাদ দিয়ে। তোমরা কি এমনটি করে নিজের উপর আল্লাহর প্রকাশ্য দলিল কায়েম করে দিবে?" [সূরা নিসা-১৪৪]

অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করছেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۘ
وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ❖

"হে মুমিনগণ! তোমরা ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ জালেমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না।"
[সূরা মায়িদা-৫১]

ইহুদি-খ্রিষ্টানরা কিন্তু আল্লাহ তায়ালাকে বিশ্বাস করে এবং তারা আসমানি ধর্মের অনুসরণ করে (অবশ্য সেগুলো বাতিল হয়ে গেছে)। তাদের বন্ধুত্বের ব্যাপারে আল্লাহ পাকের এমন নির্দেশ হলে অন্যদের কথা তো বলাই বাহুল্য।

আল্লাহ তায়ালা আরো ইরশাদ করেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا
بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ
جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ
وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ❖

"মুমিনগণ! তোমরা আমার ও তোমাদের শত্রুদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তোমরা তো তাদের প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাও; অথচ তোমাদের কাছে আগত সত্যকে তারা অস্বীকার করেছে। তারা রাসূলকে ও তোমাদেরকে বহিষ্কার করে এ অপরাধে যে, তোমরা তোমাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস রাখ। যদি তোমরা আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য ও আমার পথে জিহাদ করার

জন্য বের হয়ে থাক, তবে কেন তাদের প্রতি গোপনে বন্ধুত্বের পয়গাম প্রেরণ করছ? তোমরা যা গোপন কর এবং যা প্রকাশ কর, তা আমি ভালো জানি। তোমাদের মধ্যে যে এটা করে, সে সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়।"

[সূরা মুমতাহিনা-১]

আল্লাহ তায়ালা আমাদের ঈমান নিয়ে টিকে থাকার তাওফিক দান করুন!

**আল্লাহ তায়ালার সত্তা নিয়ে কল্পনা নয়**

অনেক মানুষ এমন আছে, যাদের কাছে শয়তান আল্লাহপ্রেম নিয়ে হাজির হয়। আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে বেশি বেশি কল্পনা করতে শেখায়। এরপর আল্লাহ তায়ালার জাত বা সত্তা নিয়ে প্রশ্ন করতে শেখায়। একপর্যায়ে তাকে আল্লাহ তায়ালার কট্টর নাফরমান বানিয়ে দেয়। আল্লাহ তায়ালা বান্দাদেরকে শয়তানের এমন চক্রান্ত থেকে বাঁচাতে যুগে যুগে অসংখ্য নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। সর্বশেষ আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ-কে প্রেরণ করেছেন। তাঁর মাধ্যমে বান্দাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন :

يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُوْلُ مَنْ خَلَقَ كَذَا مَنْ خَلَقَ كَذَا حَتّٰى يَقُوْلَ

مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ وَلْيَنْتَهِ.

"তোমাদের কারো কারো কাছে শয়তান আসে। তারপর বলে—এমনটি কে সৃষ্টি করেছে? এমনটি কে সৃষ্টি করেছে? একপর্যায়ে বলে বসে, তা হলে তোমার রবকে কে সৃষ্টি করেছে? সুতরাং কেউ যখন এ প্রশ্নে পৌঁছে যাবে, সে যেন সাথে সাথে আল্লাহ তায়ালার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে ও নিবৃত হয়।"

[বুখারি, হাদিস নং ৩২৭৬, মুসলিম, হাদিস নং ৩৬২]

রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো ইরশাদ করেছেন–

لَا يَزَالُ النَّاسُ يَتَسَاءَلُوْنَ حَتّٰى يُقَالَ هٰذَا خَلَقَ اللهُ الْخَلْقَ فَمَنْ خَلَقَ اللهَ

فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا فَلْيَقُلْ آمَنْتُ بِاللهِ

"মানুষ প্রশ্ন-প্রতিপ্রশ্ন করতে থাকে। একপর্যায়ে বলা হয়, সব সৃষ্টিকে তো আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টি করেছেন, তা হলে আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছে? সুতরাং যে ব্যক্তি তার অন্তরে এমন কিছু বুঝতে পায়, সে যেন বলে দেয়—আমি আল্লাহ তায়ালার উপর ঈমান আনয়ন করলাম।" [মুসলিম, হাদিস নং ৩৬০]

রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো ইরশাদ করেছেন–

لَا تَفَكَّرُوْا فِي اللهِ وَتَفَكَّرُوْا فِيْمَا خَلَقَ

'তোমরা আল্লাহতে গবেষণা করো না; বরং তাঁর সৃষ্টিতে গবেষণা কর।'

[উসূলুস সুন্নাহ/ইবনে আবী যিমনীন (মৃ. ৩৯৯) হাদিস নং ২৬]

বর্তমান কম্পিউটার ও মেমোরি কার্ডের যুগে এ কথা বোঝানো একেবারে সহজ। আপনার হয়তো কম্পিউটার আছে। না থাকলেও আশেপাশে কারো তো অবশ্যই আছে। কোনো কম্পিউটারের হার্ড ডিস্কে যদি এক টেরাবাইট ডাটা থাকে; কিন্তু আপনার কাছে দুই টেরাবাইটের একটি সফ্টওয়্যার আছে। বুঝে থাকলে বলুন! দেখি আপনি কি ওই হার্ড ডিস্কে এ সফটওয়্যারটি প্রয়োগ করতে পারবেন?

অবশ্যই আপনাকে বলতে হবে, কখনো সম্ভব নয়। সফ্টওয়্যারটি ওই হার্ড ডিস্কে দিয়ে কাজ করা সম্ভব তো নয়-ই বরং হার্ড ডিস্কটিও বাতিল হয়ে যেতে পারে। এটা তো সসীমের সাথে সসীমের তুলনার কথা।

তা হলে আপনার আমার ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে কতটুকুই আর মেমোরি রয়েছে! এ মেমোরি দিয়ে মানুষ তো আল্লাহ তায়ালার সসীম মাখলুকের চিন্তা করেই শেষ করতে পারে না বরং মানবদেহের একেকটি অঙ্গকে নিয়ে গবেষণা করতে গিয়েই তো কয়েক প্রজন্ম শেষ হয়ে যায়। তা হলে আল্লাহ তায়ালাকে নিয়ে চিন্তা করার Space কোথায়? সৃষ্টিজগতের সসীম মেমোরিতে অসীম আল্লাহ তায়ালাকে কল্পনা করার মতো ডাটা কী করে ইনপুট করা সম্ভব। কেউ ইনপুট করতে চাইলে সঠিক তথ্য তো পাবেই না বরং মেমোরি নষ্ট হয়ে পাগল বা নাস্তিক হওয়ার সম্ভাবনাই শতভাগ। আল্লাহ তায়ালা আমাদের রক্ষা করুন!

**বই পড়তে হুঁশিয়ার**

হাকিমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভি রহ.-এর দরবারে এক ব্যক্তি একটি নবরচিত গ্রন্থ নিয়ে এলেন। যেখানে লিখক আম্বিয়ায়ে কিরামের ব্যাপারে সমালোচনা করেছে। তখন হাকিমুল উম্মত রহ. বললেন, এটা বন্ধ করুন। এ ধরনের পুস্তকাদি দেখলেও অন্তরে অন্ধকার সৃষ্টি হয়। যে গাছের গোড়াই খারাপ, সে গাছের ডাল-পালা দিয়ে কি কাজ হবে? এতে আম্বিয়ায়ে কিরামের উপর হামলা করা হয়েছে। এর সাহিত্যিকতা আর অন্য ফায়েদা দিয়ে কি হবে? [উস্তাদ আওর শাগরিদ কে হুকূক-৮৭]

হযরত থানভি রহ. বলেন– অভিজ্ঞতা হল, আহলুল্লাহগণের কথার মধ্যে নূর রয়েছে। আর অবিশ্বাসীদের কথায় রয়েছে অন্ধকার। যদিও আল্লাহওয়ালাদের কথা সাজানো গোছানো হয় না। কিন্তু অধ্যয়ন করলে অন্তরে নূর আসে। আর যারা শরিয়তের অনুসরণ করে না, তাদের কথা সাজানো গোছানো হলেও তাতে অন্ধকার থাকে। [উস্তাদ আওর শাগরিদ কে হুকূক-৮৮]

হযরত হাকিমুল উম্মত থানভি রহ. আরো বলেন– আল্লাহ তায়ালার কসম! আহলে বাতিলের কিতাব পাঠের কারণে বহু আলেমও পথভ্রষ্ট হয়েছে। তা হলে সাধারণদের কি অবস্থা হবে? [উস্তাদ আওর শাগরিদ কে হুকূক-৮৬]

নিজ ধর্ম সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞানার্জন না করে অন্যান্য ধর্মের গ্রন্থাদি পাঠ ও অধ্যয়ন করা কিংবা তাদের আলোচনা করা বড় ক্ষতিকর। আল্লাহ না করুন! শয়তান যদি জয়ী হয়ে যায়, তা হলে পরিণাম কি হবে?

সুতরাং কোনো বই পড়ার পূর্বে আপনার বিশ্বস্ত কোনো আলেমকে দেখিয়ে তারপর অধ্যয়ন করুন। আল্লাহ তায়ালা আমাদের হেফাজত করুন! আমিন!

**ধোঁকাবাজ ব্লগ থেকে সাবধান**

আমাদের বাংলাদেশে ইসলামের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় ব্লগিং সাইট হচ্ছে 'সামহোয়্যার ইন ব্লগ'। এ ছাড়া সরলমনা মুসলমানদের ধোঁকা দেওয়ার জন্য ইসলামবিদ্বেষীরা নানা ভুয়া ইসলামিক সাইট বানিয়ে প্রচার করছে। পিএইচডি করা উচ্চ শিক্ষিতদের দিয়ে শত শত আর্টিকেল লিখিয়ে সেসব ব্লগে প্রকাশ করে ইসলামি শরিয়াহকে ভুলভাবে উপস্থাপন করে।

এমনও সাইট আছে, যা দেখে আপনি ভাবতেই পারবেন না, তলে তলে এটাও ইসলামের বিরুদ্ধে কাজ করে যাচ্ছে। কারণ, পুরো ওয়েবসাইট ভালো ভালো লেখা, হামদ-নাত ইত্যাদি দিয়ে সাজানো। কিন্তু দেখা গেলো এসবের আড়ালে দু'একটি এমন আর্টিকেলও আছে, যা শরিয়াহ সম্পর্কে আপনাকে ভুল ধারণা দিবে।

উদাহরণস্বরূপ দুই দশক আগ থেকে আলি সিনা নামে এক ভদ্রলোক ইন্টারনেটে বিভিন্ন বিষয়ে লিখতে শুরু করে, যার সিংহভাগই হল ইসলামের নবী মুহাম্মদ ﷺ ও তার পুণ্যবতী স্ত্রীদের নিয়ে। সে নিজেকে এক্স-মুসলিম বা পূর্বে মুসলিম ছিল বলে দাবি করে, এখন সে খ্রিষ্টান। তার একটা নিজস্ব সাইট আছে Alisina.ong নামে। সেখানে লেখা আছে– Everything you Need to know about Islam. অর্থাৎ ইসলাম সম্পর্কে আপনার যা জানা দরকার তার সবই পাবেন এখানে। অনেকেই ধোঁকা খেয়ে এ সাইটে তার কাছে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করে আর সে তার মতো করে সত্য-মিথ্যার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে তার উত্তর দিয়ে থাকে।

তার আরেকটা সাইট আছে ফেইথফ্রিডম (www.faithfreedom.org) বা মুক্তবিশ্বাস নামে। তার সাইটে সে মুসলিমদের প্রতি কিছু প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়ে বলেছে—'যদি কোনো মুসলিম আমার প্রশ্নের জবাব দিতে পারে, তবে আমি আমার সাইট মুছে ফেলব'। পরবর্তী সময়ে আলি সীনার জবাবে ইংরেজি ও আরবিতে কয়েকটি ওয়েবসাইট তৈরি হয়। অনেক আলেম তার সেসব প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন। কিন্তু তার একই কথা—উত্তর যথার্থ হয়নি। অনেকটা 'বিচার মানি, তালগাছ আমার'-এর মতো।

এমনকি তাকে বহুবার সরাসরি বিতর্কের আহ্বান জানানো হয়; সে সাড়া দেয়নি। আসলে সে আদৌ কখনো মুসলিম ছিল কি-না তাও স্পষ্ট নয়। অনেকে বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন করে দেখিয়েছেন, সে আসলে একজন ইহুদি। মূলত মুসলিমদের মধ্যে সন্দেহ ঢুকিয়ে দেওয়ার জন্যই সে এসব করে যাচ্ছে। ইউরোপজুড়ে ইসলামের প্রসাররোধে যেসব সংগঠন কাজ করে যাচ্ছে, তার মধ্যে অন্যতম হলো Stop Islamization of Nation. লোকটি এ সংগঠনের একজন সক্রিয় সদস্যও।

বর্তমানে অনেকে দীন শেখার জন্য বিভিন্ন ওয়েবসাইটের দ্বারস্থ হচ্ছেন। তাদের আরো সতর্ক হওয়া উচিত। কোনো ওয়েবসাইট থেকে ইসলামি জ্ঞান আহবান করার আগে অবশ্যই ভালোভাবে যাচাই-বাছাই করে নিশ্চিত হয়ে নিন যে, এটা ভুয়া ইসলামিক সাইট নয়।

আল্লামা ইবনে সিরিন রহ. বলেছেন–

إِنَّ هٰذَا الْعِلْمَ دِيْنٌ فَانْظُرُوْا عَمَّنْ تَأْخُذُوْنَ دِيْنَكُمْ.

"নিশ্চয় এ জ্ঞানই দীন। সুতরাং কার কাছ থেকে তোমরা তোমাদের দীন গ্রহণ করছ, সে বিষয়ে লক্ষ্য রেখো।" [মুসলিম শরিফ, হাদিস নং ২৬]

**ইসলামি ব্লগ প্রতিষ্ঠা করুন**

বর্তমান কার্যক্রম, তাদের চিন্তা-চেতনার প্রচার ও অধিকাংশ তরুণ-যুবকদের পথভ্রষ্ট হওয়ার অন্যতম ক্ষেত্র হচ্ছে অনলাইন জগৎ। নতুন প্রজন্মের কাছে বড় চমকপ্রদ ও আকর্ষণীয় একটি যোগাযোগমাধ্যম হল ব্লগ। নানা কারণে এর জনপ্রিয়তা এখন আকাশচুম্বী। প্রতিনিয়ত নিত্য-নতুন ব্লগের আগমন আমাদের তা-ই বলে। তবে এসব ব্লগের অধিকাংশই অনৈসলামিক। বিধায় যুবসমাজকে রক্ষা করতে এসব ব্লগের বিপরীতে ইসলামপন্থিদেরও ব্যাপকহারে গঠনমূলক ও মানসম্পন্ন ব্লগ সাইট তৈরির উদ্যোগ নিতে হবে। এসব ব্লগে ব্লগার ও সাধারণ পাঠকদের সামনে ইসলামের সুমহান আদর্শ

তুলে ধরতে হবে। বর্তমানে মানুষের ঘরে ঘরে ইসলামের সৌন্দর্য ও রাসূল ﷺ-এর আদর্শের কথা পৌছানোর সহজতম পথ হলো অনলাইন। ব্লগের মান ও পোস্টের বিষয়বস্তু উন্নত উপস্থাপনার এবং তথ্যসমৃদ্ধ হলে অবশ্যই তাদের আকৃষ্ট করবে। তা ছাড়া যারা পুরোপুরি নাস্তিক হয়ে গেছে, তাদের তুলনায় যারা পাতা ফাঁদে পা দিয়ে পথভ্রষ্ট হয়ে যেতে পারে, তাদের নিয়ে বেশি ভাবা দরকার। আর এর জন্য এ জাতীয় ব্লগের খুব প্রয়োজন। কেননা করা বিভ্রান্তিমূলক প্রশ্নগুলো যখন একজন তরুণের মাথায় ঘুরপাক খেতে থাকে, তখন অনেক সময় সে ইন্টারনেট থেকেই সেই বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানতে চায়। কিন্তু বিন্যস্ত আকারে সেসব বিষয়ে সঠিক তথ্য ও বুদ্ধিবৃত্তিক উত্তর তেমন একটা না পেয়ে ভুল বুঝে বসে। কথাই তার কাছে শক্তিশালী বলে মনে হয়। তাই আজ ব্যাপকহারে মানসম্পন্ন ব্লগ তৈরি এবং সেগুলোতে তথ্যভিত্তিক শক্তিশালী উপস্থাপনার লেখার সমারোহ ঘটানো দরকার।

[নাস্তিকতার স্বরূপ সন্ধান]

**ব্যাপকহারে মক্তব প্রতিষ্ঠা করুন**

গ্রামবাংলার আবহমান ঐতিহ্য ও গৌরবোজ্জ্বল বাঙালি সংস্কৃতির সাথে মিশে আছে মুসলিম শিশুদের রবডাকা ভোরে ঘুম থেকে উঠে মক্তবে পড়তে যাওয়া। পাখ-পাখালির কলরবের সাথে ছোট ছোট শিশুদের আলিফ যবর-আ, বা যবর-বা পড়ার ধ্বনি মিলেমিশে তৈরি হত অনাবিল জান্নাতি পরিবেশ।

কচি বয়সেই একটা শিশু প্রতিদিন সকালে মক্তবে গমন করার মধ্য দিয়ে ইসলামের মৌলিক চেতনা ধারণ করে নিত নিজের বুকে। শুদ্ধভাবে কুরআন পাঠসহ ধর্মীয় নানা বিধিবিধান ও আদব-কায়দা সম্পর্কে হত সম্যক অবগত। শিশুরা হল কাদামাটির মতো। কচি বয়সে তাদের হৃদয়ের জমিনে যেমন বৃক্ষ রোপিত হয়, যৌবনে তাই পত্র-পল্লবে সুশোভিত হয়ে বিশাল মহীরূহের আকার ধারণ করে। এ বয়সে শিশুর অন্তরে যে বিশ্বাস ও চেতনা এঁকে দেওয়া হয়, তা পাথরে খোদাইয়ের মতো আজীবন হৃদয়ে থেকে যায়। শত পাপাচারে লিপ্ত হলেও হৃদয়ে অঙ্কিত সেই বিশ্বাসের রেখা একদিন তার মধ্যে বোধোদয় ঘটায়। পঙ্কিলতার পথ ছেড়ে তাকে নিয়ে আসে কলুষমুক্ত পবিত্র জীবনের পথে। অনুশীলনকারী মুসলিম না হলেও এমন ছেলেরা কখনোই ধর্মদ্রোহী নাস্তিক হয় না।

এ উপমহাদেশে মুসলিম শাসনামলে সরকারি ব্যবস্থাপনায় অসংখ্য মক্তব প্রতিষ্ঠিত ছিল। মুসলিম শাসকরা মক্তবগুলোর উন্নতিকল্পে অনেক লা-খেরাজ

জায়গা-সম্পত্তি দান করেছিল। কিন্তু ইংরেজ শাসকরা ১৭৯৩ সালে এক ডিক্রি জারি করার মাধ্যমে লা-খেরাজ ভূমি অধিগ্রহণ করে সরকারের তত্ত্বাবধানে নিয়ে নেয়। ফলে সে-সময় অর্থের অভাবে ৮০ হাজার মাদরাসা বন্ধ হয়ে যায়। যেসব মাদরাসাগুলোর একেকটির অধীনে শত শত মক্তব পরিচালিত হত। এ ছাড়া মুসলমানরা ব্যক্তিগতভাবেও নিজেদের সন্তানদের কেন্দ্র করে অনেক মক্তব পরিচালনা করত। ইংরেজ বেনিয়াদের কুটকৌশলে সেগুলো ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তাদের ষড়যন্ত্র যে কত মারাত্মক ছিল, তা বর্তমান কওমি মাদরাসাগুলোর বিরুদ্ধে তাদের দোসরদের চক্রান্তের দিকে লক্ষ্য করলে কিছুটা অনুমান করা যায়। মোটকথা, এভাবে মাদরাসা ও মক্তবগুলো বন্ধ হয়ে মুসলমানদের ইতিহাসে এক দুঃখজন সময় গত হয়েছিল ইংরেজ শাসনামলে।

দীর্ঘ বিরতির পর মুসলমানরা আবার ধীরে ধীরে সাবাহি (প্রভাতী) মকতব প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে মুসলিম সন্তানদের মনমানসকে ইসলামি শিক্ষার আলোয় গঠন করার কাজ শুরু করে। ধারাবাহিক প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে তা গ্রাম-গঞ্জে, শহর-বন্দরে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।

কিন্তু দুঃখের কথা হল, সুদীর্ঘ কৌশলী প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন বিদেশী ও বিধর্মী এনজিও তাদের শিশু শিক্ষা বা প্রাথমিক শিক্ষার সময়সূচি এদেশের ধর্মীয় মক্তবগুলোর বিপরীতে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। দেশীয় কিন্ডারগার্টেন ও ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলোর সময় ও কার্যক্রমও এমনভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে, যেন মুসলিম শিশুরা মক্তবে যাওয়ার সময়ই করতে না পারে। বাস্তবে তাই হচ্ছে।

বর্তমানের শিশুরা রবডাকা ভোরে বিছানা ছেড়েই হাত-মুখ ধুয়ে নাকে মুখে সামান্য নাশতা গুঁজেই পিঠে ব্যাগ নিয়ে ছুটতে থাকে স্কুলের দিকে। ফলে দীনি শিক্ষার পরশ না পেয়েই তাদের বেড়ে উঠতে হচ্ছে। অধিকাংশ ছেলেই এখন কুরআন তিলাওয়াত করতে পারে না। পারলেও তা অশুদ্ধতায় ভরা। দীনের অন্যান্য জরুরি জ্ঞানের অভাব তো আছেই। ফলে নাস্তিকতার সামান্য বাতাস গায়ে লাগলেই এরা সহজেই ঢলে পড়ে। এ অবস্থা পরিবর্তন করার জন্য বেশি বেশি মক্তব প্রতিষ্ঠা ও মা-বাবাদের নিজেদের সন্তানদের দীনের প্রাথমিক জ্ঞান অর্জনের সুযোগ করে দেওয়ার ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করার কোনো বিকল্প নেই।

আরেকটা বিষয় খেয়াল রাখতে হবে! যেহেতু সকাল বেলায় তারা স্কুলের সময়সূচির কারণে মক্তবে আসতে পারে না; তাই তারা যে সময় আসতে পারে সে সময়ের দিকে লক্ষ্য রেখে মক্তবের সময়সূচি তৈরি করতে হবে।

ডিজিটাল মক্তব পদ্ধতি হলে আরো ভালো হয়। অর্থাৎ যে যখন আসতে পারবে, তাকে তখনই পড়ানো হবে। সারাদিন মক্তবে উস্তাদ প্রস্তুত থাকবে। সেজন্য শিফটওয়ারি দুজন উস্তাদ নিয়োগ দেওয়া যেতে পারে। উক্ত উস্তাদের বেতনের ব্যবস্থা করবেন ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণ। পরিবেশ পরিস্থিতি বুঝে ছাত্র-ছাত্রীদের থেকে সামান্য বেতনও নেওয়া যেতে পারে। তবে যারা দিতে পারবে না, তাদেরকে বাধ্য করা যাবে না। একটা মুসলিম শিশুও যেন শৈশবে প্রয়োজনীয় ধর্মীয় শিক্ষার বাইরে না থাকে—তা নিশ্চিত করতে হবে। তবেই আশা করা যায়, পরবর্তী জীবনে তাদের পা পিছলে পড়বে না।

[নাস্তিকতার স্বরূপ সন্ধান]

**প্রয়োজনীয় গ্রন্থ রচনা করতে হবে**

মতাদর্শ প্রচারের অন্যতম হাতিয়ার হলো গ্রন্থ রচনা করা। পৃথিবীতে যত দর্শন, আদর্শ ও চিন্তাধারার জন্ম হয়েছে, তা প্রচার ও প্রসারের অন্যতম প্রধান মাধ্যম ছিল গ্রন্থ রচনা। কারণ, গ্রন্থের মাধ্যমে সহজেই চিন্তা-ভাবনা সংরক্ষণ করে অন্যের নিকট পৌঁছে দেওয়া যায়। তাই সব যুগেই সর্বমহলে গ্রন্থ রচনা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হয়ে আসছে।

আমাদের দেশের নাস্তিকরাও তাদের কার্যক্রম ও চিন্তা-বিশ্বাস ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে গ্রন্থরচনাকে অন্যতম মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছে।

আক্রমণের অন্যতম লক্ষবস্তু হচ্ছে রাসূল ﷺ-এর মোবারক জীবনী ও পূতঃপবিত্র উম্মাহাতুল মুমিনীন। নবীজীবনের নানান দিক নিয়ে তারা প্রশ্ন উত্থাপন করে থাকে। বিশেষ করে তাঁর বহু বিবাহ, বিভিন্ন সময়ে পরিচালিত জিহাদ অভিযান তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য। এ জাতীয় বিদেশি বই বাংলায় অনুবাদ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর গায়ে কলঙ্ক লেপনের অপচেষ্টায়ও তারা পিছিয়ে নেই।

বাংলা ভাষায় রাসূল ﷺ-এর জীবনীর উপর বেশ কিছু গ্রন্থ রচিত হলেও তা সময়ের প্রয়োজনে যথেষ্ট নয়। উত্থাপিত বিভিন্ন আপত্তি ও অভিযোগ সামনে রেখে নতুন আঙিকে পরিপূর্ণ ভাষা-সাহিত্যের মান রক্ষা করে নবী-জীবনী রচনা করা বর্তমানে একান্ত প্রয়োজন। সেই সাথে উম্মুল মুমিনীনের উপরও নতুন করে কিছু গ্রন্থ রচনা হওয়া দরকার। আর ইসলামের অন্যান্য যেসব বিধি-বিধানের উপর পক্ষ থেকে আপত্তি-অভিযোগ উত্থাপন করা হচ্ছে, সেগুলো নিয়েও স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচিত হতে পারে। যার মধ্যে আধুনিক উপস্থাপনায় সেসব বিধানের যৌক্তিকতা জোরালোভাবে তুলে ধরে তাদের আপত্তির সমুচিত জবাব দেওয়া হবে।

স্রষ্টা-ধর্ম-সৃষ্টিজগত ইত্যাদি নিয়ে নাস্তিকরা যেসব যুক্তি-প্রমাণ তুলে ধরে তার অধিকাংশই দর্শন-নির্ভর। এগুলোর দাঁতভাঙা জবাব বহু আগেই আরবি ভাষায় আলেমগণ লিপিবদ্ধ করে গেছেন। কিন্তু এসব গ্রন্থ এখনো আমাদের বাংলা ভাষায় অনুবাদ হয়নি। যারা অনুবাদে দক্ষ, তারা এ বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দিলে সাধারণ মুসলমানদের উপকার হত। আধুনিক বিজ্ঞাননির্ভর যেসব তথ্য-প্রমাণ নাস্তিকরা প্রদান করছে, সেগুলোর জবাব প্রদানে জেনারেল শিক্ষিত দীনদার ভাইয়েরা এগিয়ে আসতে পারেন।

**মোটকথা :** লেখালেখির মাধ্যমে নাস্তিকতার কালো থাবা থেকে আমাদের প্রজন্মকে বাঁচাতে যত রকম খেদমত আনজাম দেওয়া সম্ভব, তার সবটার প্রতিই লক্ষ্য রাখা উচিত। আমাদের মনে রাখা দরকার, লিখনীর মোকাবিলা লিখনী দিয়েই করা সম্ভব। [নাস্তিকতার স্বরূপ সন্ধান]

## ইসলামিক সেন্টার প্রতিষ্ঠা করতে হবে

একটা সমাজের সকলেই দীনি বিদ্যাপীঠে ভর্তি হয়ে আলেম হবে, সেটা জরুরি নয়; এমন চিন্তা করাও বিবেকবহির্ভূত। কারণ, সমাজের স্থিতিশীলতা রক্ষার্থেই অন্যান্য শাস্ত্রেও বিশেষজ্ঞ মানুষের প্রয়োজন রয়েছে। যাতে মানুষ প্রয়োজনের সময় তাদের শরণাপন্ন হতে পারে। তবে দীনের মৌলিক ও জরুরি জ্ঞান অর্জন করা সকলের উপর ফরয। হাদিস শরিফে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন—

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

'ইলমে দীন শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয।'

[ইবনে মাজাহ শরিফ হাদীন নং ২২৪]

কিন্তু নানা প্রতিবন্ধকতা ও সমস্যার কারণে সকল মুসলমানের প্রয়োজনীয় দীনি ইলম অর্জন করা হয়ে উঠে না। নিয়মতান্ত্রিকভাবে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়ে দীন শেখার সময়-সুযোগও তাদের থাকে না। এমন মানুষদের জন্য 'ইসলামিক সেন্টার' প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে।

যেখানে সাপ্তাহিক বা মাসিক প্রোগ্রামের আয়োজন করা হবে। ইসলামের মৌলিক শিক্ষাসমূহ প্রয়োজনীয় মাসআলা-মাসায়েল এবং ইসলামের সঠিক আদর্শ তাদের সামনে তুলে ধরা হবে। এ কার্যক্রম মসজিদভিত্তিকও হতে পারে। স্থায়ী কোনো জায়গার বন্দোবস্ত হলে সবচেয়ে ভালো হয়। অন্যথায় স্কুল কিংবা কোচিং সেন্টারগুলোতে সাপ্তাহিক ছুটির দিনে এমন প্রোগ্রামের আয়োজন করা যেতে পারে। এতে করে যারা নিয়মতান্ত্রিকভাবে দীন শিখতে পারেনি, তাদের জন্য দীন জানার একটা সহজ ব্যবস্থা হবে।

## সাধারণ শিক্ষিত ও আলেমসমাজের পরস্পর কাছাকাছি আসা উচিত

—মুফতি আবুল হাসান মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ

মুসলমানদের হাজার বছরের ঐতিহ্যপূর্ণ ইতিহাসের ধারা যদি আজ পর্যন্ত অব্যাহত থাকত, তা হলে এ কাজটি এখন আলাদা করে শুরু করার দরকার হত না। বিভিন্ন খেলাফতআমলে মুসলমানদের যে শিক্ষাব্যবস্থা ছিল, তাতেও ভাগাভাগি ছিল না। শিক্ষার একটা স্তর পর্যন্ত সকল মুসলমানের শিক্ষা এক। মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষাতে ভাগাভাগি ছিল না। মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত যতগুলো জাগতিক শিক্ষা দরকার, তা সকল শিক্ষার্থী জানবে; ফরযে আইন ইলম ও মুসলমান হিসেবে যা যা জানা দরকার, তা সকলে জানবে। কোনো শিক্ষার্থী মুসলমান হিসেবে চলার জন্য আবশ্যকীয় যেসব বিষয় রয়েছে, তা জানা থেকে পিছে থাকবে না। আবার জাগতিক বিষয়ের যেগুলো অপরিহার্য সেগুলো জানাও বাকি থাকবে না।

এ রকম শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের ছিল। এক দুই বছর নয়, হাজার বছর ধরে ছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে ঈমানি দুর্বলতা ও ইসলাম থেকে দূরে সরার কারণে অন্যরা আমাদের উপর আগ্রাসন চালিয়েছে। অন্যদের আগ্রাসনে ধীরে ধীরে আমাদের ক্ষমতা গেছে, শিক্ষা গেছে, অর্থ ব্যবস্থা গেছে। সবকিছুই আমরা হারিয়ে ফেলেছি। নিজেদেরটা হারিয়ে অন্যদের শিক্ষাব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। যা আমাদের উপর চাপিয়ে দিয়েছে এমন এক শিক্ষাব্যবস্থা, যা এক অংশ শেখায় আরেক অংশ শেখায় না। যে শিক্ষাব্যবস্থা উন্নয়ন শেখায়; কিন্তু সে উন্নয়ন সত্যিকারের উন্নয়ন কিভাবে হবে ও ইনসাফপূর্ণ উন্নয়ন কিভাবে হবে, তা শিখায় না। এ কথাগুলো এখন জেনারেল শিক্ষিত বন্ধুদের সামনে ব্যাখ্যা করে বলার প্রয়োজন নেই।

ধরুন! আমাদের দেশসহ গোটা পথিবীই অর্থনীতিতে খুব এগিয়ে গেল। মানুষের সম্পদ বাড়ল। কিন্তু এতে কী হবে? এতে মূলত বৈষম্যও বাড়বে। ক'দিন আগেও আপনারা দেখেছেন, পথিবীর অর্ধেক মানুষের হাতে যা সম্পদ আছে, আটজন লোকের হাতে এ পরিমাণ সম্পদ আছে। এ আটজন লোকের সম্পদের দশ ভাগের একভাগ যদি ওই বাকি অর্ধেক গরিব লোকদের কাছে যেত, তা হলে এরা হতদরিদ্র থাকত না। এরা একটা মাঝামাঝি পর্যায়ে উঠে আসত। বিশ্বের একেবারে বড় ধনীদের বাদ দিয়ে আমাদের দেশের কথা বলি। আমরা যে শহরে বাস করি, দেখতে পাই একদিকে বিল্ডিংয়ের সারি অন্যদিকে ঘিঞ্জি বস্তি। আমরা যে গাড়ি ব্যবহার করি, তাতেও খুব দৃশ্যমান প্রকাশ্য বৈষম্য। শিক্ষার উন্নতি হয়েছে, কিন্তু এ বৈষম্য দূর হচ্ছে না কেন?

পার্থক্য থাকবে, সম্পদের ব্যবধান থাকবে, কাজের ফারাক থাকবে, কাজ কেউ উঁচু করবে, কেউ নিচু। কেউ কর্মচারী থাকবে, কেউ কর্মকর্তা। কিন্তু মানুষ হিসেবে চলার জন্য ন্যূনতম যা দরকার, সেটা সকলকেই পেতে হবে। এ শিক্ষাটা সে কথা বলে না। এটা রয়েছে ইসলামি শিক্ষায়।

একটি উদাহরণ দিয়েছি; আরেকটি উদাহরণ দিই। দুর্নীতি দূর করার জন্য হালালভাবে চলার চেষ্টা করে। কিন্তু এই যে আরেকটা শ্রেণি, এ শ্রেণিটা এত লাগামহীন কিভাবে হয়ে উঠল? মুসলমান হয়ে তো এত লাগামহীন হতে পারে না। বোঝা গেল, তার শিক্ষার মধ্যে মুসলমানিত্ব ঢোকেনি, খোদাভীতি ঢোকেনি। যখন থেকে সে পড়ছে, সে শুধু পড়াই পড়ছে। যদি এর মধ্যে মুসলমানিত্ব ঢুকত, তাকওয়া ঢুকত তা হলে এরকম লাগামহীন হত না।

**মোটকথা :** মুসলমান হিসেবে আমার বৈশিষ্ট্য কী? মুসলমান হিসেবে একটি সুন্দর পথিবী গড়ায় অংশীদার হওয়া এবং একটি সুন্দর পথিবী পরিচালনার জন্য আমাকে কিভাবে চলতে হবে—তা আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় নেই।

অন্যদিকে আমাদের মাদরাসা শিক্ষা। যখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পরে উপমহাদেশে ইংরেজদের শাসন আসল, তখন তারা শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করেছিল। সেটারই ধারাবাহিকতা আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে। তখন মুসলমানদের সন্তানদের ন্যূনতম দীনি শিক্ষা দেওয়াটা জটিল হয়ে দাঁড়াল। তখন ভারতবর্ষের বুযুর্গ আলেমগণ চিন্তা করলেন যে, এ অবস্থা যদি দীর্ঘদিন চলতে থাকে তা হলে শুধু নামের মুসলমান থাকবে; মুসলমানের সন্তানেরা কালিমা জানবে না, দীন জানবে না, নামায পড়ার লোকও থাকবে না। তখন তারা নিছক ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তৈরি করলেন। ধর্মীয় দায়িত্ববোধ মূল উদ্দেশ্য হওয়ায় তাতে জাগতিক শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি; আপাতত ধর্মীয় চাহিদার মারাত্মক অভাব দূর করার জন্য ধর্মীয় শিক্ষা নিয়ে শুরু করলেন।

প্রতিষ্ঠাতাগণ বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। জেনারেল শিক্ষিতদের সাথে তাদের যোগাযোগও ছিল। তাদেরকে জিজ্ঞাসাও করা হয়েছে, আপনারা জাগতিক শিক্ষা বাদ দিয়ে ওটা করলেন কেন? তারা বলেছেন, সব তো সয়লাব হয়ে গেছে। এখনকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দীন বলতে কিছু নেই। সুতরাং বিকল্প হিসেবে এখন শুধুই ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হোক। ধর্মীয় শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা অগ্রসর হলে আস্তে আস্তে আবার সমন্বয় ঘটবে।

কালক্রমে সে শিক্ষাব্যবস্থা এখন উন্নতি করেছে। এখন দীনি মাদরাসায় যে দীন শিক্ষা দেওয়া হয়, ওখানে প্রাথমিক পর্যায়ে জাগতিক শিক্ষারও ব্যবস্থা

আছে। উপমহাদেশের মাদরাসাসমূহে আছে। আমাদের দেশের মাদরাসায়ও আছে। কিন্তু যে জেনারেল শিক্ষাব্যবস্থা বর্তমানে আছে, সেখানে এমন একটা মানসিকতায় আমরা পৌঁছেছি যে, শিক্ষার বইয়ের মধ্যে মনে হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার নাম থাকাটা অপরাধ, উড়না শব্দ থাকাটা দোষণীয়—সেটা নিয়ে বিতর্ক হচ্ছে, বিক্ষোভ হচ্ছে। এখন আমরা কোন্ জায়গায় পৌঁছেছি, যেখানে এ শব্দগুলোই সহ্য করানো হচ্ছে না।

এজন্য আমরা চাই এবং অনেক উলামায়ে কেরাম চান, জেনারেল শিক্ষা ও দীনি শিক্ষা দুটোই কাছাকাছি আসা উচিত। জেনারেল শিক্ষিত শ্রেণি এবং আলেম-উলামা পরস্পর কাছাকাছি আসা উচিত। উন্নত সমাজব্যবস্থার জন্য পরস্পরের সহযোগিতা দরকার এবং প্রত্যেকেই প্রত্যেকের কাছ থেকে কিছু কিছু অর্জন করা দরকার। এ প্রয়োজন চিন্তা করেই এ ধরনের একটি প্রতিষ্ঠান ছোট পরিসরে হলেও শুরু হতে যাচ্ছে। মাশুক ভাইয়ের (খ্যাতিমান চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট) মেহনতে। তিনি কুমিল্লারই সন্তান। তাঁর দীনি অভিপ্রায়—কিছু দীনি খেদমত করার। এ বাড়ি তিনি ভাড়া নিয়েছেন এবং সংস্কার করেছেন। তিনি বলেছেন দীনি কাজ করার কথা। কী কাজ করা হবে সেটা বলেননি। তাঁর কথা, আপনাদের যা ইচ্ছা হয় করুন। আমরা চিন্তা করেছি, এ ধরনের একটা কাজ এখান থেকে শুরু হোক।

আমরা এখানে যেটা শুরু করতে চাই, তা নিছক একটি প্রতিষ্ঠান নয় বরং এর মাধ্যমে আমরা একটা পথ দেখাতে চাই। এটা মহল্লায় মহল্লায় হবে এবং ইনশাআল্লাহ পুরো দেশে হবে। আমরা চাই, আমাদের কচিকাঁচারা যারা এখন স্কুলে পড়ছে, এরা স্কুল থেকে কলেজে যাবে, ইউনিভার্সিটিতে পড়বে, এরপর কর্মজীবনে কোনো সরকারি চাকরি নেবে, কেউ কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানে যোগ দেবে, কেউ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খুলবে, যেখানেই সে থাকুক, একজন আদর্শ মানুষ হিসেবে থাকুক। আদর্শ মানুষ হওয়ার জন্য যা যা গুণ অর্জনের কথা আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, সেগুলো সে অর্জন করবে। যতটুকু তার স্কুলের সিলেবাসে আছে, ততটুকু সেখান থেকে শিখবে। অতিরিক্ত আরো প্রয়োজনীয় যে দীনি বিষয়গুলো আছে, তা এ ধরনের প্রতিষ্ঠান থেকে শিখবে। এভাবে ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ পাবে আদর্শ মুসলমান ডাক্তার, মুসলমান ইঞ্জিনিয়ার, মুসলমান ডিসি, এসপি, সচিব ইত্যাদি। তখন দুদকের মতো বিভিন্ন সংস্থার পিছনে রাষ্ট্রের কোটি কোটি টাকা ব্যয় করতে হবে না।

আমরা ছেলেদের উপর বোঝা চাপাতে চাই না। আমরা চাই, কয়েক বছর লাগিয়ে শিখবে এবং অল্প অল্প সময় করে শিখবে। এক ঘণ্টা বা দু' ঘণ্টার

প্রোগ্রাম। এর ভিতরে তাকে কুরআনে কারিম সহিহ-শুদ্ধ করে শিক্ষা দেওয়া, দীনের অন্যান্য জরুরি বিষয়াদি, জরুরি মাসআলা-মাসায়েল এবং কর্মজীবনে গেলে সে কিভাবে দীনি বিষয়গুলো সমাধা করবে, তার দিকনির্দেশনা দেওয়া হবে। সে যেন পরিবারের একজন আদর্শ সদস্য হতে পারে।

আদর্শ সন্তান, আদর্শ ভাই, আদর্শ ভাতিজা, আদর্শ পিতা ও আদর্শ দাদা হতে পারে—তার নির্দেশনাগুলো এ প্রতিষ্ঠান থেকে দেওয়ার চেষ্টা করা হবে। ইনশাআল্লাহ হবে। যাদের স্কুল সকাল শিফটে তারা বিকেলে সময় দিবে এবং যাদের স্কুল বিকেলে তারা সকালে সময় দিবে। আর যারা বয়স্ক, তাদের জন্য বাদ মাগরিব সান্ধ্যকালীন ব্যবস্থা থাকবে।

প্রথম যেদিন পরামর্শ হয়েছিল, সেদিন অনেকে কলেজ ও ইউনিভার্সিটির ছাত্রদের জন্যও প্রোগ্রাম রাখার প্রস্তাব করেছিলেন।

কলেজ-ইউনিভার্সিটির ছাত্ররা সান্ধ্যকালীন প্রোগ্রামে যুক্ত হতে পারবেন। তারপরও আমরা কিছু চিন্তা করেছি, উচ্চ পর্যায়ের ছাত্ররা দীনি বিভিন্ন বিষয়ে বিভ্রান্তির শিকার হয় ও বিভিন্ন মতাদর্শ সামনে আসার কারণে অনেক বিষয়ে সংশয়গ্রস্ত হয়। সে ধরনের বিষয় নিয়েও মাঝে মাঝে এখানে দিনব্যাপী বা খ-কালীন আলোচনা সভা-সেমিনারের ইচ্ছা আছে। আল্লাহ তায়ালা তাওফিক দান করুন ও কবুল করুন। [মাসিক আল-কাউসার]

### আরো কিছু করতে হবে

এ ছাড়াও সমাজে লাইব্রেরি পাঠাগার প্রতিষ্ঠা, ওয়াজ-মাহফিল ও জুমার খুতবার আলোচনায় এসব বিষয়ে হৃদয়গ্রাহী ভাষায় আলোচনা উপস্থাপন, সভা-সেমিনারের আয়োজন করার মতো বহু মাধ্যম রয়েছে, যেগুলো দ্বারা নাস্তিকতার কালো থাবা থেকে মুসলিম তরুণ-যুবকদের ও আগামী প্রজন্মের সন্তানদের রক্ষা করা সম্ভব। আল্লাহ তায়ালা আমাদের তাওফিক দান করুন।

### আল্লাহ তায়ালার কোনো হুকুম অযৌক্তিক নয়

হযরত মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী রহ. লিখেছেন– অন্ধ বিশ্বাসের ঈমান হতে যুক্তি ও প্রমাণভিত্তিক ঈমানের মর্যাদা বেশি, যদিও তা আপদমুক্ত নয় বরং প্রথমটিই নিরাপদ। কেননা যুক্তির ধারায় চলতে থাকলে শয়তানের কাছে পরাভূত হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

কুরআন ও হাদিস থেকে এ যাবৎ যত বিধান নজরে পড়েছে, সবগুলোতেই চিন্তা-গবেষণা করে দেখা হয়েছে, কোনো বিধানই অযৌক্তিক নয় বরং আল্লাহ তায়ালার প্রত্যেকটি বিধানই যুক্তিসঙ্গত। অবশ্য আল্লাহ

তায়ালার উপর এটা আবশ্যক নয় যে, বান্দাকে শুধু যুক্তিসঙ্গত বিধানেই বাধ্য করা হবে। যুক্তির বাইরে বা অযৌক্তিক বিধানে বাধ্য করা যাবে না। বরং আল্লাহ তায়ালা সকল যৌক্তিকতা ও অযৌক্তিকতার উর্ধ্বে। তিনি ইচ্ছা করলে বান্দাকে অযৌক্তিক বিধানেও বাধ্য করতে পারেন। আল্লাহ তায়ালা সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

## আল্লাহর বিধানে যুক্তি খোঁজা অযৌক্তিক

বান্দাদেরকে কোনো কাজে বাধ্য করার ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালা সকল যুক্তি-তর্কের উর্ধ্বে; কিন্তু কোনো কোনো পাগল, বোকা, নির্বোধ ও হতভাগা বান্দা আছে, যারা মনে করে আল্লাহ তায়ালার বিধানও যুক্তিসঙ্গত হতে হবে। তাদের এ খবরও নাই যে, সকাল ৬টা থেকে নিয়ে পরদিন সকাল ৬টা পর্যন্ত চব্বিশ ঘণ্টা সে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অসীম নেয়ামতের মধ্যে ডুবে থাকে। সেমতে পূর্ণ চব্বিশ ঘণ্টা সাজ্‌দায় পড়ে থাকলেও আল্লাহর নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা কখনো শেষ হবে না। সুতরাং আল্লাহ তায়ালা আমার উপর যেসব বিধান বাধ্যতামূলক করেন, তা তাঁর নেয়ামতের তুলনায় অতি নগণ্য। এখানে যুক্তি খুঁজতে যাওয়া নিমকহারামির পরিচয়ই বটে। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলে দীনের সঠিক বুঝ ও আমলের তাওফিক দান করুন। আমিন!



## চতুর্থ অধ্যায় : আমি মুসলিম

আল্লাহ তায়ালা দয়া ও মায়া করে মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন। এ মানব জাতিকে এ পৃথিবীতে পথ চলার জন্য আল্লাহ তায়ালা যুগে যুগে ধর্ম বা বিধান দিয়েছেন। সর্বশেষ হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা ﷺ কর্তৃক আনীত ধর্ম ইসলাম দান করেছেন। ইসলাম পূর্ণাঙ্গ একটি জীবনবিধান। আজ একমাত্র গ্রহণযোগ্য ধর্ম ইসলাম। এ ইসলাম যারা অনুসরণ করে, তাদেরকে বলা হয় মুসলিম। ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম কিংবা অন্য কোনো মত গ্রহণযোগ্য নয়। তাই নাজাত পেতে হলে আমাকে স্বীকার করতে হবে—'আমি মুসলিম'। আমাকে ব্যক্তিজীবনে, সমাজজীবনে, রাষ্ট্রজীবনে তথা জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলামের বিধি-বিধান মেনে চলতে হবে। তাই আমাকে ইসলাম সম্পর্কে জানতে হবে। এখানে আমরা ইসলাম ও মুসলিমের পরিচয় নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব।

### মুসলিমের পরিচয়

মুসলিম শব্দের আভিধানিক অর্থ, আত্মসমর্পণকারী। শরিয়তের পরিভাষায় মুসলিম বলা হয়, যার মধ্যে ঈমান ও ইসলামের পরিপূর্ণ প্রতিফলন ঘটেছে।

### ইসলামের পরিচয়

ইসলামের সংজ্ঞায় হাদিস শরিফে বর্ণিত হয়েছে,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَجَاءَ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثِيَابُ السَّفَرِ فَقَعَدَ بَيْنَ يَدَىْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ قَالَ: مَا الْإِسْلَامُ ؟ قَالَ: "شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، وَتُصَلِّي الْخَمْسَ، وَتَصُوْمُ شَهْرَ رَمَضَانَ، وَتُؤَدِّى الزَّكَاةَ، وَتَحُجُّ الْبَيْتَ. قَالَ: فَإِذَا فَعَلْتُ ذٰلِكَ فَأَنَا مُسْلِمٌ ؟ قَالَ: "نَعَمْ"!

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে ছিলাম। ইত্যবসরে এক ব্যক্তি আসল, যার পরনে সফরের কাপড় ছিল। তারপর তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে বসে গেলেন। দুই হাঁটুর উপর হাত রাখলেন। এরপর বললেন, ইসলাম কী? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন–

"এ কথার সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই, মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহ তায়ালার রাসূল, পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়া, রমাযানের রোযা রাখা, যাকাত আদায় করা এবং বাইতুল্লাহ শরিফের হজ করা।"

লোকটি বলল, এগুলো পালন করলেই কি আমি মুসলিম? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হাঁ! [মুসনাদু আব্দিল্লাহিবনি উমর, হাদিস নং-৭২ ও বুখারি, হাদিস নং-৫০]

## ঈমানের হাকিকত

—মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল মালেক

কারো মধ্যে ঈমান থাকলে তাকে মুমিন বলা হয়। মুমিনের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ হল ঈমান। ঈমানের বিপরীত কুফর। ঈমান সত্য, কুফর মিথ্যা। ঈমান আলো; কুফর অন্ধকার। ঈমান জীবন; কুফর মৃত্যু। ঈমান পূর্ণ কল্যাণ আর কুফর পূর্ণ অকল্যাণ। ঈমান সরল পথ; কুফর ভ্রষ্টতার পথ।

ঈমান মুসলমানের কাছে প্রাণের চেয়েও প্রিয়। ঈমানদার সকল কষ্ট সহ্য করতে পারে, মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে পারে, কিন্তু ঈমান ছাড়তে পারে না। ঈমানই তার কাছে সবকিছুর তুলনায় মহৎ।

ঈমান শুধু মুখে কালেমা পড়ার নাম নয়; ইসলামকে তার সকল অপরিহার্য অনুষঙ্গসহ মনেপ্রাণে কবুল করার নাম। আর তাই মুমিনকে হতে হবে সুদৃঢ়, সত্যবাদী ও সত্যনিষ্ঠ। মুমিন কখনো শৈথিল্যবাদী হতে পারে না। কুফরির সাথে যেমন তার সন্ধি হতে পারে না, তেমনি মুরতাদ-অমুসলিমদের সাথেও বন্ধুত্ব হতে পারে না।

এ ইসলামের পূর্ণ পরিচয় কী? তার অপরিহার্য দাবি ও অনুষঙ্গগুলোই বা কী? এরই সংক্ষিপ্ত আলোচনা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

দ্বীন ও ঈমান সম্পর্কে বেপরোয়া লোকদের এসব বিষয়ের জ্ঞান নেই বা জ্ঞান থাকলেও পরোয়া নেই, তাই তাদের মতে ঈমান-কুফরের সন্ধিও অসম্ভব কিছু নয়। (লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম)

সুতরাং ঈমান কাকে বলে এবং তার অপরিহার্য অনুষঙ্গ কি কি? এ বিষয়ে নিচে আলোচনা করা হচ্ছে। এখানে আমরা পুরো বিষয়টি নিম্নোক্ত শিরোনামে তুলে ধরব। যথা—

১. ঈমান অহীর মাধ্যমে জানা সকল সত্যকে সত্য বলে বিশ্বাস করার নাম।
২. ঈমান অবিচল বিশ্বাসের নাম।
৩. কোনো বিষয়কে শুধু আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি আস্থার ভিত্তিতে মেনে নেওয়ার নাম ঈমান।

৪. ঈমান সত্যের সাক্ষ্যদান এবং আরকানে ইসলাম পালনের নাম।
৫. ঈমান অর্থ আত্মসমর্পণ।
৬. ঈমান শরিয়ত ও উসওয়ায়ে হাসানাকে গ্রহণ করার নাম।
৭. ঈমান শুধু গ্রহণ নয়, বর্জনও : সত্যকে গ্রহণ আর বাতিলকে বর্জন।
৮. আস্থা-ভালবাসা ও ভক্তি-শ্রদ্ধা ছাড়া ঈমান হয় না। আর বিদ্রুপ ও অবজ্ঞা অস্বীকারের চেয়েও ভয়াবহ কুফর।
৯. ঈমান একটি একক : এতে বিভাজনের অবকাশ নেই।
১০. ঈমানি আকাইদ ও আহকাম সুস্পষ্ট বর্ণিত : এতে বিকৃতি ও অপব্যাখ্যা একপ্রকার অস্বীকার।
১১. অন্তর ও মুখের একাত্মতা ঈমান : এখানে কপটতার কোনো স্থান নেই।
১২. ঈমান একটি চিরন্তন অঙ্গীকার; ধর্মান্তর সাধারণ কুফর হতেও ভয়াবহ।
১৩. ঈমানের প্রধান রোকন তাওহিদ, শিরক মিশ্রিত ঈমান অগ্রহণযোগ্য।
১৪. মুমিনের বন্ধুত্ব-শত্রুতা হবে ঈমানের ভিত্তিতে।
১৫. ঈমান অতি সংবেদনশীল : মুমিন বিজাতির মধ্যে লীন হতে পারে না।
১৬. ঈমান পরীক্ষার উপায়।

এ পর্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা শুনুন!

### ১. ঈমান অহীর মাধ্যমে জানা সকল সত্যকে সত্য বলে বিশ্বাস করার নাম

অজ্ঞতা-অনুমান আর কল্পনা-কুসংস্কারের কোনো অবকাশ ঈমানে নেই। ঈমান ওই সত্য সঠিক আকিদাকে স্বীকার করার ও সত্য বলে বিশ্বাস করার নাম, যা আসমানি ওয়াহির দ্বারা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত, যে ওয়াহি 'আল কুরআনুল কারিম' এবং 'আস্‌সুন্নাতুন নাবাবিয়্যাহ' রূপে এখনো সংরক্ষিত আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত সংরক্ষিত থাকবে ইনশাআল্লাহ।

### ২. ঈমান অবিচল বিশ্বাসের নাম

ঈমান তো অটল ও দৃঢ় বিশ্বাসের নাম। সংশয় ও দোদুল্যমানতার মিশ্রণও এখানে হতে পারে না। সংশয়ই যদি থাকলই, তা হলে তা 'আকিদা কিভাবে হয়'? বিশ্বাস যদি দৃঢ়ই না হল, তা হলে তা ঈমান কিভাবে হয়?

কুরআন মাজিদের ইরশাদ ইরশাদ হয়েছে,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ❁

"তারাই মুমিন যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনে, এরপর সন্দেহ পোষণ করে না এবং জীবন ও সম্পদ দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে তারাই সত্যনিষ্ঠ।" [সূরা হুজরাত-১৫]

সংশয় ও দোদুল্যমানতা কাফির ও মুনাফিকের বৈশিষ্ট্য, মুমিনের নয়। ইরশাদ হয়েছে–

لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ۞ إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ ۞

"যারা আল্লাহতে ও শেষ দিবসে ঈমান আনে, তারা নিজ সম্পদ ও জীবন দ্বারা জিহাদে অব্যাহতি পাওয়ার প্রার্থনা তোমার নিকট করে না। আল্লাহ মুত্তাকীদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত। তোমার নিকট অব্যাহতি প্রার্থনা শুধু ওরাই করে যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসে ঈমান আনে না এবং যাদের চিত্ত সংশয়যুক্ত। ওরা তো আপন সংশয়ে দ্বিধাগ্রস্ত।" [সূরা তওবা : ৪৪-৪৫]

### ৩. কোনো বিষয়কে শুধু আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি আস্থার ভিত্তিতে মেনে নেওয়ার নাম ঈমান

ঈমানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রোকন হল, কোনো বিষয়কে শুধু আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসূলের প্রতি আস্থার ভিত্তিতে সন্দেহাতীতভাবে মেনে নেওয়া ও বিশ্বাস করা। সচক্ষে প্রত্যক্ষ করার পর ঈমান আনার আর কী অর্থ থাকে? চোখে দেখা বিষয় কে অস্বীকার করে?

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও দৃশ্যমান বস্তুসমূহ বা সাধারণ বিবেক বুদ্ধি দ্বারা বোঝা যায়, এমন বিষয়সমূহ ঈমানের বিষয়বস্তু হতে পারে না। এসব তো মানুষ এমনিই মেনে নেয়। এতে ঈমান আনা না আনার প্রশ্নই অবান্তর।

দেখা বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপনের নাম ঈমান নয়। মুমিনকে তো এজন্য মুমিন বলা হয়, সে না দেখা বিষয় শুধু আল্লাহ তায়ালা বা তাঁর রাসূলের সংবাদের উপর ভিত্তি করে মেনে নিয়েছে ও বিশ্বাস করেছে।

পক্ষান্তরে দাহরিয়ারা বলে—'স্বচক্ষে দেখা ছাড়া আমরা কিছু মানি না।' আর যুক্তিপূজারীরা বলে—'যা বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে উপলব্ধি করা যায় না, তা আমরা মানি না।' কিন্তু মুমিন বলে, 'সত্য সংবাদদাতার সংবাদ মেনে নেওয়া সুস্থ বিবেকেরই ফয়সালা।'

তাই আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসূলের বাণী পৌছার পর তা গ্রহণে বিলম্ব করার কোনো অবকাশ নেই। আল্লাহ তায়ালা কুরআন মাজিদের শুরুতেই মুমিনের গায়েবে বিশ্বাস করার এ বৈশিষ্ট্যের প্রশংসা করে বলেছেন–

الٓمٓ ۞ ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِلْمُتَّقِيْنَ ۞ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۞ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ۞ أُولٰئِكَ عَلٰى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۞

"আলিফ লাম মীম। এটি সেই কিতাব এতে কোনো সন্দেহ নেই। এটা হিদায়াত এমন আল্লাহভীরুদের জন্য, যারা অদৃশ্য জিনিসসমূহে ঈমান রাখে এবং নামায কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যা কিছু দিয়েছি, তা থেকে (আল্লাহর সন্তোষজনক কাজে) ব্যয় করে। এবং যারা ঈমান রাখে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তাতে আর আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তাতেও এবং তারা পরকালে পরিপূর্ণ বিশ্বাস রাখে। এরাই এমন লোক, যারা তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে সঠিক পথের উপর আছে এবং এরাই এমন লোক, যারা সফলতা লাভকারী।" [সূরা বাকারা : ১-৫]

যে ব্যক্তি মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও কুরআন-সুন্নাহে বর্ণিত অদৃশ্যের বিষয় মেনে নিতে এজন্য সন্দিহান থাকে যে, সে সকল বিষয়ের ধরন ও বিস্তারিত বিবরণ তার বুঝে আসছে না। অথবা শরিয়তের কোনো হুকুম কবুল করতে এজন্য দ্বিধাগ্রস্ত যে, তার এ হুকুমের রহস্য বুঝে আসছে না অথবা কুরআন-হাদিসে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত কোনো বিষয়ে সে এজন্য সন্দেহ পোষণ করে যে, সে বিষয়ে কোনো বিজ্ঞানীর সাক্ষ্য নেই। এ সকল লোক আসলে ঈমান ও ইসলামের বাস্তবতাই বোঝে না।

এদেরকে কে বোঝাবে—যে বিষয়টি আপনি স্বচক্ষে দেখেছেন বা বুদ্ধি-বিবেকের মাধ্যমে অনুধাবন করেছেন, ফলে আপনি তা বিশ্বাস করেছেন; তা হলে এটা ঈমান কিভাবে হয়?

আপনার এ মেনে নেওয়া তো আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর রাসূলের কথার উপর নির্ভর করে হয়নি। (দেখা বা বোঝার উপর নির্ভর করে হয়েছে।) ঈমান তো তখন ঈমান বলে গণ্য হবে যখন আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসূলের প্রতি আপনার আস্থা ও নির্ভরতা থাকবে। যার প্রতি আস্থা ও নির্ভরতাই নেই তার উপর ঈমানের দাবি কিভাবে হয়?

আল্লাহপ্রদত্ত ইলমে ওয়াহির মাধ্যমে প্রাপ্ত গায়েবের প্রতি ঈমানের নেয়ামত থেকে যারা বঞ্চিত, তারা অকাট্য ইলম ছেড়ে নিছক ধারণা-অনুমান ও নিজের

অবান্তর খেয়াল-খুশির পিছনে ছুটে বেড়ায়। আল্লাহ রাববুল আলামীন যিনি 'আসদাকুল ক্ব-ইলীন', রাসূলুল্লাহ ﷺ যিনি 'আস সাদিকুল মাসদূক' ও 'আস সাদিকুল আমীন' তাঁদের সংবাদের উপর নির্ভর না করে এরা না বুঝে না দেখে এমন অনেকের কথা মেনে নেয়, যাদের কাছে অদৃশ্যের ইলম নেই আর তাদের বিশ্বস্ততাও সন্দেহাতীত নয়। নেয়ামতের কদর না করলে এটাই হয়।

### ৪. ঈমান সত্যের সাক্ষ্যদান এবং আরকানে ইসলাম পালনের নাম

অন্তরের বিশ্বাসের সাথে মুখেও সত্যের সাক্ষ্য দেওয়া ঈমানের অন্যতম রোকন। হাদিস শরিফে আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ রবিয়া গোত্রের প্রতিনিধি দলকে এক আল্লাহ তায়ালার উপর ঈমান আনার আদেশ করে জিজ্ঞাসা করেছিলেন,

أَتَدْرُوْنَ مَا الإِيمَانُ بِاللهِ وَحْدَهُ؟ قَالُوا اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ ؛ قَالَ : شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ ، وَصِيَامُ رَمَضَانَ ، وَأَنْ تُعْطُوْا مِنَ الْمَغْنَمِ الْخُمُسَ.

অর্থাৎ তোমরা কি জান—'এক আল্লাহর উপর ঈমান' কাকে বলে? তারা বললেন, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, (এক আল্লাহর উপর ঈমান আনার অর্থ) এ সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কোনো সত্য মাবুদ নেই। মুহাম্মদ (ﷺ) আল্লাহ তায়ালার রাসূল। আর নামায কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, রমাযানের রোযা রাখা ও গনিমতের এক-পঞ্চমাংশ প্রদান করা। [বুখারি শরিফ, হাদিস নং ৫৩]

সত্যের সাক্ষ্য দেওয়া মুমিনের পরিচয়। মুমিন কখনো সত্য গোপন করে না অর্থাৎ সত্য জেনেও তা স্বীকার করা থেকে বিরত থাকে না। কখনো মিথ্যা ও অবাস্তব সাক্ষ্যও দেয় না। অসত্য ও অবাস্তবের সাক্ষ্য দেওয়া তো কাফির মুশরিকদের বৈশিষ্ট্য। মুমিন তো এমন সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করে। যেমন, আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন :

شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۞ إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللهِ فَإِنَّ اللهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۞ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّٰهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّيْنَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوْا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللهُ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ ۞ إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِآيَاتِ اللهِ

وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُوْنَ الَّذِيْنَ يَأْمُرُوْنَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ❖ أُولٰئِكَ الَّذِيْنَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِيْنَ ❖

"আল্লাহ তায়ালা সাক্ষ্য দিয়েছেন, তাঁকে ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই। ফিরিশতাগণ এবং ন্যায়নিষ্ঠ জ্ঞানীগণও সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়। নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য দীন একমাত্র ইসলাম এবং যাদের প্রতি কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদের নিকট প্রকৃত জ্ঞান আসার পরও ওরা মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছে, শুধু পরস্পর বিদ্বেষবশত, যারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহের প্রতি কুফরি করে তাদের জানা উচিত যে, নিশ্চিতরূপে আল্লাহ হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত দ্রুত। যদি তারা তোমার সাথে বিতর্কে অবতীর্ণ হয় তবে বলে দাও—'আমি এবং আমার অনুসরীগণ আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণ করেছি।' আর আহলে কিতাবদের এবং নিরক্ষরদের বলে দাও যে, তোমরাও কি আত্মসমর্পণ করেছ? তখন যদি তারা আত্মসমর্পণ করে, তবে সরল পথ প্রাপ্ত হল, আর যদি মুখ ঘুরিয়ে নেয়, তা হলে তোমার দায়িত্ব হলো শুধু পৌছে দেওয়া। আর আল্লাহর দৃষ্টিতে রয়েছে সকল বান্দা। যারা আল্লাহর নিদর্শনাবলি অস্বীকার করে ও নবীগণকে হত্যা করে অন্যায়ভাবে, আর সেসব লোককে হত্যা করে যারা ন্যায়নিষ্ঠার নির্দেশ দেয় তাদেরকে বেদনাদায়ক শাস্তির সংবাদ দিন। এরাই সে লোক, যাদের সমগ্র আমল দুনিয়া এবং পরকাল উভয় লোকেই নষ্ট হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে তাদের কোনো সাহায্যকারীও নেই।" [সূরা আলে ইমরান : ১৮-২২]

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللّٰهُ شَهِيدٌ بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ وَأُوْحِيَ إِلَيَّ هٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهٖ وَمَنْ بَلَغَ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُوْنَ أَنَّ مَعَ اللّٰهِ آلِهَةً أُخْرٰى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِيْ بَرِيْءٌ مِمَّا تُشْرِكُوْنَ ❖ الَّذِيْنَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ أَبْنَاءَهُمُ الَّذِيْنَ خَسِرُوْا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ❖ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهٖ إِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ❖

বলুন (তাদের জিজ্ঞাসা করুন), সাক্ষ্যতে সর্বশ্রেষ্ঠ বিষয় কী? (তারা এ প্রশ্নের জবাব দিতে সক্ষম নয়। বিধায় আপনিই) বলে দিন, আল্লাহ আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী। আমার প্রতি এ কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে—যাতে আমি তোমাদেরকে ও যাদের কাছে এ কুরআন পৌছে সবাইকে ভীতি প্রদর্শন করি। তোমরা কি সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহর সাথে অন্যান্য উপাস্যও রয়েছে? বলুন, আমি এরূপ সাক্ষ্য দেব না। বলুন, তিনিই একমাত্র উপাস্য; অবশ্য

আমি তোমাদের শিরক হতে মুক্ত। যাদেরকে আমি কিতাব দান করেছি, তারা তাকে চেনে, যেমনি তাদের সন্তানদেরকে চেনে। যারা নিজেকে ক্ষতির মধ্যে ফেলেছে, তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না। আর যে আল্লাহর প্রতি অপবাদ আরোপ করে বা তাঁর নিদর্শনাবলিকে মিথ্যা বলে, তার চাইতে বড় জালেম কে? নিশ্চয় জালেমরা সফলকাম হবে না। আর যেদিন আমি তাদের সবাইকে একত্র করব, এরপর যারা শিরক করেছিল, তাদের বলব—যাদেরকে তোমরা অংশীদার বলে ধারণা করতে, তারা কোথায়?" [সূরা আনয়াম : ১৯-২১]

### ৫. ঈমান অর্থ আত্মসমর্পণ

ঈমান আনার অনিবার্য অর্থ, বান্দা নিজেকে আল্লাহ তায়ালার কাছে সমর্পণ করবে। তাঁর প্রতিটি আদেশ শিরোধার্য করবে। আল্লাহ তায়ালার প্রতি ঈমান আর আল্লাহ তায়ালার বিধানে আপত্তি একত্র হতে পারে না। রাসূলের প্রতি ঈমান আর তাঁর আদর্শের উপর আপত্তি, কুরআনের প্রতি ঈমান আর তার কোনো আয়াত বা বিধানের উপর আপত্তি কখনো একত্র হয় না।

মুমিনের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সমর্পণ আর ইবলিস ও তার অনুসারীদের বৈশিষ্ট্য উল্টো যুক্তি। এখন তো শুধু আপত্তি বা বিপরীত যুক্তিই নয়; রাসূল, কুরআন ও ইসলামের প্রতি প্রকাশ্য বিদ্রোহকারীকেও মুসলমান মনে করা হয়। কারো প্রতি ঈমান, এরপর তার বিরোধিতা এ দুটি সমাবেশ অসম্ভব হলেও 'অসহায়' ইসলামের ব্যাপারে বর্তমানের 'বুদ্ধিজীবী'দের কাছে তা পুরোপুরিই সম্ভব। বুদ্ধিমান মানুষ মাত্রই জানেন, ইসলাম বিহীন তথা সমর্পণ বিহীন ঈমানের কল্পনাও করা যায় না। আর তা গ্রহণযোগ্যও হতে পারে না। এ তো ঈমানের সাথে সরাসরি উপহাস ছাড়া আর কিছুই নয়।

وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ، وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ۞ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۞ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ۞

"যে নিজেকে নির্বোধ করেছে সে ছাড়া ইবরাহিমের ধর্ম-আদর্শ হতে আর কে বিমুখ হবে! পৃথিবীতে তাকে আমি মনোনীত করেছি আর আখিরাতেও সে অবশ্যই সৎকর্মশীলদের অন্যতম। তার প্রতিপালক যখন তাকে বলেছিলেন, আত্মসমর্পণ কর, সে বলেছিল, বিশ্বজগতের প্রতিপালকের নিকট আত্মসমর্পণ করলাম। এবং ইবরাহিম ও ইয়াকুব এ সম্বন্ধে তাদের পুত্রগণকে নির্দেশ দিয়ে বলেছিল, হে পুত্রগণ! আল্লাহই তোমাদের জন্য এ দীন মনোনীত করেছেন। সুতরাং আত্মসমর্পণকারী না হয়ে তোমরা কখনো মৃত্যুবরণ করো না।"

[সূরা বাকারা : ১৩০-১৩২]

قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ❁ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ❁ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ❁

"বলুন! আমার প্রতিপালক তো আমাকে সৎপথে পরিচালিত করেছেন, সেটাই সুপ্রতিষ্ঠিত দীন, ইবরাহিমের ধর্ম-আদর্শ। তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ। আর তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। বলুন! আমার নামায, আমার ইবাদত, আমার জীবন ও আমার মরণ বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহরই উদ্দেশ্যে। তাঁর কোনো শরিক নেই। আমাকে এরই হুকুম দেওয়া হয়েছে আর আমি তাঁর সম্মুখে সর্বপ্রথম মাথানতকারী।" [সূরা আনয়াম : ১৬১-১৬৩]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ❁

"হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে যথার্থভাবে ভয় করো এবং তোমরা আত্মসমর্পণকারী না হয়ে কোনো অবস্থায় মৃত্যুবরণ করো না।"
[সূরা আলে ইমরান-১০২]

### ৬. ঈমান শরিয়ত ও উসওয়ায়ে হাসানাকে গ্রহণ করার নাম

ইসলামকে শুধু সত্য ও সুন্দর জানা বা বলার নাম ঈমান নয়। সত্যকে শুধু জানা বা মুখে বলা ঈমান সাব্যস্ত হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। ঈমান তো তখনই হবে, যখন এ সত্যকে মনেপ্রাণে কবুল করবে ও এর সম্পর্কে অন্তরে কোনো দ্বিধা থাকবে না। ইসলাম তো 'আকিদা' ও 'শরিয়ত' উভয়ের সমষ্টির নাম। এ দুটোর বিশ্বাস এবং মেনে নেওয়ার দ্বারাই ঈমান সাব্যস্ত হতে পারে। শরিয়ত মানে দীনের বিধি-বিধান এবং ইসলামি জীবনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আদর্শ, কুরআন যাকে মুমিনের জন্য উসওয়ায়ে হাসানা সাব্যস্ত করেছে।

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا

فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ❁

"কিন্তু না, আপনার প্রতিপালকের শপথ! তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচারভার আপনার ওপর অর্পণ না করে; এরপর আপনার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে কোনো দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তকরণে মেনে নেয়।" [সূরা নিসা-৬৫]

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ❁ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا ❁

"আপনি কি তাদেরকে দেখেন নি, যারা দাবি করে যে, আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে ও তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে তারা বিশ্বাস করে, অথচ তারা তাগুতের কাছে বিচার প্রার্থী হতে চায়, যদিও তা প্রত্যাখ্যান করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং শয়তান তাদেরকে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট করতে চায়? তাদেরকে যখন বলা হয়, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তার দিকে ও রাসূলের দিকে এসো, তখন মুনাফিকদেরকে আপনি আপনার নিকট হতে মুখ একেবারে ফিরিয়ে নিতে দেখবে।" [সূরা নিসা-৬০-৬১]

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ❁ إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ ❁ هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ❁

"এরপর আমি আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করেছি দীনের বিশেষ শরিয়তের ওপর। সুতরাং আপনি তার অনুসরণ করুন, অজ্ঞদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করবেন না। আল্লাহর বিপরীতে তারা আপনার কোনো উপকার করতে পারবে না। জালেমরা একে অন্যের বন্ধু আর আল্লাহ তো মুত্তাকিদের বন্ধু। এ কুরআন মানবজাতির জন্য সুস্পষ্ট দলিল এবং নিশ্চিত বিশ্বাসী জাতির জন্য পথনির্দেশ ও রহমত।" [সূরা জাছিয়া : ১৮-২০]

### ৭. ঈমান শুধু গ্রহণ নয়, বর্জনও : সত্যকে গ্রহণ আর বাতিলকে বর্জন

কোনো আকিদাকে মেনে নেওয়ার পাশাপাশি তার বিপরীত বিষয়কেও সঠিক মনে করা স্ববিরোধিতা। মানুষের সুস্থ বুদ্ধি তা গ্রহণ করতে পারে না। ইসলামেও তা অকল্পনীয়। ঈমান তখনই সাব্যস্ত হবে, যখন বিপরীত সবকিছু বাতিল ও মিথ্যা মনে করবে এবং তা থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করবে। সর্বপ্রকার শিরক ও কুফর থেকে সম্পর্কোচ্ছেদ করা সরাসরি ঈমানেরই অংশ। যেমনি ঈমানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ তাওহিদ। বলুন! তাওহিদ কি শুধু আল্লাহ তায়ালাকে মাবুদ মানা? না! শুধু তা-ই নয় বরং—

> তাওহিদ অর্থ এক আল্লাহ তায়ালাকে সত্য মাবুদ বলে বিশ্বাস করা এবং আল্লাহ ছাড়া কাউকে বা কোনো কিছুকে মাবুদ বলে স্বীকার না করা।

তাওহিদ অর্থ, আল্লাহ তায়ালারই ইবাদত করা; আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কারো ইবাদত না করা।

তাওহিদ অর্থ, উপায়-উপকরণের ঊর্ধ্বের বিষয়ে শুধু আল্লাহ তায়ালার কাছেই সাহায্য চাওয়া, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে সাহায্য না চাওয়া।

তাওহিদের অর্থ, একমাত্র আল্লাহকে কল্যাণ-অকল্যাণ এবং জীবন-মরণের মালিক মনে করা; অন্য কাউকে এসব বিষয়ে ক্ষমতাশালী মনে না করা।

তাওহিদ অর্থ, শুধু আল্লাহ তায়ালাকে আহকামুল হাকিমীন মনে করা। আল্লাহ তায়ালার হুকুমের বিরুদ্ধে কারো হুকুম স্বীকার না করা।

তাওহিদ অর্থ, শুধু শরিয়তে মুহাম্মাদিয়ার আনুগত্যকেই অপরিহার্য মনে করা, অন্য কোনো শরিয়তের আনুগত্য বৈধ মনে না করা।

তাওহিদ অর্থ, শুধু ইসলামকেই হক ও সত্য মনে করা, অন্য কোনো দীনকে হক ও সত্য মনে না করা।

**মোটকথা :** দীনের জরুরি (ও সর্বজনবিদিত) বিষয়াবলি, অকাট্য আকিদা-বিশ্বাস ও বিধি-বিধান এ প্রকারভুক্ত। এসব বিষয়ে ঈমান তখনই সাব্যস্ত হবে যখন তার বিপরীত বিষয়কে বাতিল ও মিথ্যা বলে বিশ্বাস করা হবে। আর তা থেকে تَبَرِّی (সম্পর্কহীনতা) অবলম্বন করা হবে। এসব তো مُجْتَهَدٌ فِيْهِ (যাতে শরিয়তের দলিলের ভিত্তিতে একাধিক মত হতে পারে) বা تَنَاعُ السُّنَّةِ (যাতে একাধিক সুন্নাহসম্মত পদ্ধতি রয়েছে)-এর ক্ষেত্র নয় যে, বিপরীত দিকটিকেও গ্রহণযোগ্য বা নিরবতার যোগ্য মনে করা যায়।

আজকাল দীন ও ঈমানের বিষয়ে যেসব বিপদ ও ফিৎনার ব্যাপক বিস্তার ঘটছে তন্মধ্যে সবচেয়ে বড় ফিৎনা এটাই যে, দীনের জরুরি বিষয়, মৌলিক আকিদা ও ঐকমত্যপূর্ণ বিষয়কেও একাধিক মতের সম্ভাবনাযুক্ত বিষয়াদির মতো মত প্রকাশের ক্ষেত্র বানিয়ে নেওয়া হয়েছে। অথচ এগুলো হচ্ছে হুবহু মেনে নেওয়ার বিষয়। এগুলো তো 'ধারণা' ও 'মতামত' প্রকাশের ক্ষেত্র নয়। এসব ক্ষেত্রে একমাত্র তা-ই সত্য, যা কুরআন মাজিদ, সুন্নতে মুতাওয়াতিরাহ (মুসলিম উম্মাহর মাঝে সর্বযুগে প্রতিষ্ঠিত সুন্নাহ) ও ইজমার দ্বারা প্রমাণিত।

এখানে বিপরীত দিকগুলোর কোনো অবকাশই নেই। সেগুলো নিঃসন্দেহে বাতিল ও ভ্রান্ত। এ হক ও সত্যকে গ্রহণ করা এবং সকল বিরোধী মত, চিন্তা ও দর্শন, যা নিঃসন্দেহে বাতিল ও ভ্রান্ত, তা থেকে تَبَرِّی (সম্পর্কহীনতা) গ্রহণ করার নাম ঈমান।

ইবরাহীম আ. তাঁর কওমকে বলেছিলেন :

يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ۞ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۞

"হে আমার জাতি! তোমরা যাকে আল্লাহর সাথে শরিক কর তার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। আমি একাগ্রভাবে তাঁর দিকে মুখ ফিরাচ্ছি, যিনি আকাশম-লী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।"
[সূরা আনয়াম : ৭৮-৭৯]

হূদ আ. তার কওমের উত্তরে বলেছিলেন–

إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ۞ مِنْ دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُونِ ۞ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۞

"আমি তো আল্লাহকে সাক্ষী করছি এবং তোমরাও সাক্ষী হও যে, নিশ্চয় আমি তা হতে মুক্ত, যাকে তোমরা আল্লাহর শরিক কর। আল্লাহ ছাড়া তোমরা সকলে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর। এরপর আমাকে অবকাশ দিও না। আমি নির্ভর করি আমার ও তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহর ওপর; এমন কোনো জীবজন্তু নেই, যে তাঁর পূর্ণ আয়ত্তাধীন নয়, নিশ্চয় আমার প্রতিপালক আছেন সরল পথে।"
[সূরা হূদ : ৫৪-৫৬]

সূরা মুমতাহিনায় বলা হয়েছে,

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ۞ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۞ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ۞

"তোমাদের জন্য ইবরাহিম ও তাঁর সঙ্গীগণের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে। তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল, তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার এবাদত কর, তার সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদের মানি না। তোমরা এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না

করলে তোমাদের মধ্যে ও আমাদের মধ্যে চিরশত্রুতা থাকবে। কিন্তু ইবরাহিমের উক্তি তাঁর পিতার উদ্দেশে এ আদর্শের ব্যতিক্রম। তিনি বলেছিলেন, আমি অবশ্যই আপনার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করব। আপনার উপকারের জন্য আল্লাহর কাছে আমার আর কিছু করার নেই। হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা তোমার উপরেই ভরসা করেছি, তোমার দিকেই মুখ করেছি আর তোমার কাছেই আমাদের প্রত্যাবর্তন।

হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি আমাদেরকে কাফিরদের জন্য পরীক্ষার পাত্র করো না। হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের ক্ষমা কর। নিশ্চয় তুমি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

তোমরা যারা আল্লাহ ও পরকাল প্রত্যাশা কর, তোমাদের জন্য তাদের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে। আর যে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার জানা উচিত যে, আল্লাহ অমুখাপেক্ষী, প্রশংসার মালিক।" [সূরা মুমতাহিনা : ৪-৬]

কাফির, মুশরিক ও মুনাফিকদের জন্য মাগফিরাতের দুয়া করা হারাম। এরপরও ইবরাহিম আ. আযরের জন্য কেন দুয়া করেছেন– তার জবাব স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা সূরা তওবায় দিয়েছেন–

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ۞ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ ۞

নবী ও মুমিনদের জন্য সঙ্গত নয় যে, তারা মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে যদিও আত্মীয়-স্বজন হয় যখন এটা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, নিশ্চিত ওরা জাহান্নামি। ইবরাহিম তার পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছিল, তাকে এর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বলে; এরপর যখন তার নিকট স্পষ্ট হল যে, সে আল্লাহর শত্রু তখন ইবরাহিম তার থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করলেন। ইবরাহিম তো কোমল হৃদয় ও সহনশীল। [সূরা তওবা : ১১৩-১১৪]

ইসলাম ছাড়া অন্যসব ধর্ম ও মতবাদ থেকে এবং ইসলামের দুশমনদের থেকে তাবার্রি (বিমুখতা ও সম্পর্কহীনতা) ঈমানের রোকন হওয়ার কারণ, একমাত্র ইসলামই হক ও সত্য। ইরশাদ হচ্ছে,

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

'নিশ্চয় আল্লাহর কাছে দীন একমাত্র ইসলাম।' [সূরা আলে ইমরান-১৯]

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

"কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দীন গ্রহণ করতে চাইলে, তা কখনো কবুল করা হবে না এবং সে হবে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।
[সূরা আলে ইমরান-৮৫]

**মোটকথা :** লা-দীনি (ধর্মহীনতা) যেমন কুফর তেমনি ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দীন অন্বেষণ করাও কুফর। হক ও সত্য আকিদাসমূহ গ্রহণ করা আর কুফরি কর্ম ও বিশ্বাস থেকে সম্পর্কহীনতা অবলম্বন—এ দুটির সমন্বয়ে ঈমান অস্তিত্ব লাভ করে। ঈমান ও ঈমান বিনষ্টকারী বিষয় একত্র হবে কিভাবে? এ তো অজু ভঙের কারণ বিদ্যমান থাকার পরও অজু আছে বলে দাবি করার মতো। এটা যেমন সম্ভব নয়, ওটাও সম্ভব নয়।

### ৮. আস্থা-ভালবাসা ও ভক্তি-শ্রদ্ধা ছাড়া ঈমান হয় না

কোনো ব্যক্তি বা বিষয়ের প্রতি ঈমান তখনই হতে পারে, যখন তার উপর থাকে পূর্ণ আস্থা, অন্তরে তাঁর প্রতি থাকে ভক্তি-শ্রদ্ধা। আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসূল, তাঁর নাযিলকৃত আসমানি কিতাব, তাঁর বিধান ও শরিয়ত এবং তাঁর দীনের সকল নিদর্শনের সাথে মুমিনের সম্পর্ক ওই আস্থা-বিশ্বাস এবং ভক্তি-শ্রদ্ধারই সম্পর্ক।

যার প্রতি বা যে বিষয়ে ঈমান আনা হয়েছে, তার প্রতি বা ওই বিষয়ে আস্থা-বিশ্বাস এবং ভক্তি-ভালবাসাই হচ্ছে ঈমানের প্রাণ। চিন্তা-ভাবনা এবং আমল ও আলোচনার দ্বারা একে শক্তিশালী করা এবং গভীর থেকে গভীরতর করা প্রত্যেক মুমিনের ঈমানি দায়িত্ব।

বিদ্বেষ ও ঈমান একত্র হওয়া অসম্ভব। যার প্রতি ঈমান থাকবে তার প্রতি ভালবাসাও থাকবে। পক্ষান্তরে যার প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতা থাকবে তার প্রতি ঈমান থাকতে পারে না। অন্তরের বিদ্বেষ সত্ত্বেও যদি মুখে ঈমান প্রকাশ করে তবে তা হবে মুনাফিকি।

মুসলমানের ভালবাসা হবে আল্লাহ তায়ালা, তাঁর রাসূল ও তাঁর নেক বান্দাদের প্রতি। আর কাফির, মুশরিক ও মুনাফিকের ভালবাসা হবে তাদের নিজ নিজ উপাস্য ও নেতাদের প্রতি। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে,

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ
كَحُبِّ اللهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ

"অবশ্য মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহ ছাড়া অপরকে আল্লাহর সমকক্ষ হিসেবে গ্রহণ করে এবং আল্লাহকে ভালবাসার মতো তাদের ভালবাসে; কিন্তু যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি ভালবাসায় তারা সুদৃঢ়।" [সূরা বাকারা-১৬৫]

পবিত্র কুরআনে অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ❖ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ❖ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ❖

"হে মুমিনগণ! তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ দীন হতে ফিরে গেলে নিশ্চয় আল্লাহ এমন এক সম্প্রদায় আনবেন, যাদেরকে তিনি ভালবাসেন এবং যারা তাঁকে ভালবাসেন; তারা মুমিনদের প্রতি কোমল ও কাফিরদের প্রতি কঠোর হবে; তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং কোনো নিন্দুকের নিন্দার ভয় করবে না; এটা আল্লাহর অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তিনি দান করেন এবং আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ। তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনগণ, যারা বিনীত হয়ে সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয়। কেউ আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং মুমিনদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে আল্লাহর দলই তো বিজয়ী হবে।"

[সূরা মায়িদা : ৫৪-৫৬]

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ.

"নবী মুমিনদের নিকট তাদের নিজেদের অপেক্ষা ঘনিষ্ঠতর এবং তাঁর পত্নীগণ তাদের মাতা।" [সূরা আহযাব-৬]

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ❖ لِتُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ❖

"(হে রাসূল!) আমি আপনাকে পাঠিয়েছি সাক্ষ্যদাতা, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে। যাতে (মানুষ) তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আন এবং রাসূলকে শক্তি যোগাও, তাঁকে সম্মান কর। আর সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।" [সূরা ফাতহ : ৮-৯]

হাদিস শরিফে বলা হয়েছে,

«لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ».

"তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হবে না, যাবৎ না আমি তার কাছে তার সন্তান ও পিতামাতার চেয়ে এবং সকল মানুষের চেয়ে অধিক প্রিয় হব।"

[মুসলিম শরিফ, হাদিস নং-১৭৮; বুখারি শরিফ, হাদিস নং-১৪]

অন্য হাদিসে আছে,

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ عِنْدَهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ نَفْسِهِ

"তোমরা কেউ ওই পর্যন্ত মুমিন হবে না, যাবৎ না আমি তার কাছে তার প্রাণের চেয়েও বেশি প্রিয় হই।" [বুখারি শরিফ হাদিস নং ৬৬৩২]

সূরা তওবায় দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা হয়েছে,

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ❖

"বলুন, তোমাদের নিকট যদি আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং আল্লাহর পথে জিহাদ অপেক্ষা অধিক প্রিয় হয়, তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভ্রাতা, তোমাদের পত্নী, তোমাদের স্বগোত্রীয়, তোমাদের অর্জিত সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য, যার মন্দা পড়ার আশঙ্কা কর এবং তোমাদের বাসস্থান, যা তোমরা ভালবাস, তবে আল্লাহর নির্দেশ (আজাব) আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করো। আল্লাহ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না।" [সূরা তওবা-২৪]

আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর বিধানসমূহের প্রতি শ্রদ্ধা ও আনুগত্য যে পর্যন্ত ওইসব লোক, বস্তু ও মতবাদের আসক্তির উপর প্রাধান্য না পায়, যা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসূলের প্রতি ভালবাসা এবং আল্লাহ তায়ালার বিধানসমূহের প্রতি সশ্রদ্ধ আনুগত্যের পথে প্রতিবন্ধক হয়, সে পর্যন্ত ব্যক্তিকে 'মুমিন' বলা হবে না, 'ফাসিক' (কাফির) বলা হবে। আর যে এ কুফরের উপর অবিচল থাকবে, সে কখনো হেদায়েত পাবে না।

মোটকথা, আল্লাহ তায়ালা, তাঁর রাসূল ও তাঁর দীনের (ইসলামের) প্রতি অনুরাগ-ভালবাসাই হচ্ছে মুমিনের বৈশিষ্ট্য। আর এঁদের প্রতি বিরাগ-বিদ্বেষ হল কাফির, মুশরিক ও মুনাফিকের বৈশিষ্ট্য। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে,

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ❖

"যে কেউ আল্লাহর, তাঁর ফিরিশতাগণের, তাঁর রাসূলগণের এবং জিবরীল ও মীকাঈলের শত্রু, সে জেনে রাখুক! নিশ্চয় আল্লাহ কাফিরদের শত্রু।" [সূরা বাকারা-৯৮]

## অবজ্ঞা ও বিদ্রুপ বিরাগ-বিদ্বেষের চেয়েও হীন ও ভয়াবহ

ভদ্রতা ও মানবতার ছিটেফোঁটাও যার মধ্যে আছে, তার কোনো ব্যক্তি, ধর্ম বা মতবাদের প্রতি বিদ্বেষ থাকলেও কখনো সে হীনতা ও অশ্লীলতায় নেমে আসতে পারে না। তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য, অবজ্ঞা-বিদ্রূপ এবং কটূক্তি ও গালি-গালাজের মতো নীচ কর্মে অবতীর্ণ হতে পারে না। কারণ, এটা বিদ্বেষ ও শত্রুতা প্রকাশের চরম হীন উপায়। ভদ্রতার লেশমাত্র আছে এমন কেউ তা গ্রহণ করতে পারে না। যেহেতু ইসলামই একমাত্র সত্য ধর্ম, তাই দুষ্কৃতিকারী ও ভ্রান্ত মতে বিশ্বাসীই এর শত্রু। এদের অতিমাত্রায় উগ্র ও কট্টর শ্রেণিটি তাচ্ছিল্য, বিদ্রুপ ও অশ্লীল বাক্যের দ্বারা শত্রুতার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে থাকে। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, সকল যুগের উগ্র কাফির-মুশরিকের প্রবণতা এটাই ছিল। এদের যে শ্রেণিটি এ অসভ্যতাকে মুনাফিকির আবরণে আবৃত রাখার চেষ্টা করেছে, তারাও এতে সফল হতে পারেনি।

এদের সাথে মুসলিম জনগণের আচরণ কী হবে এবং রাষ্ট্রপক্ষের আচরণ কী হবে তা আলাদা আলোচনা। এখানে যে কথাটি বলতে চাই, তা এতই স্পষ্ট যে, বলারও প্রয়োজন ছিল না; কিন্তু আমরা এমন এক পরিবেশে বাস করি, মনে হয় এ সুস্পষ্ট কথাটিও অনেকের জানা বা উপলব্ধিতে নেই।

অর্থাৎ ইসলাম, ইসলামের নবী কিংবা ইসলামের কোনো নিদর্শন সম্পর্কে কটূক্তিকারী, আল্লাহ তায়ালার ও তাঁর রাসূল বা তাঁর কোনো বিধানের অবজ্ঞা ও বিদ্রুপকারী যদি মুসলিম পরিবারের সন্তান হয়, মুখে কালিমা পাঠকারীও হয়, তথাপি সে কাফির—মুসলমানের দুশমন। শরিয়তের পরিভাষায় এ ধরনের কাফিরের নাম মুনাফিক, মুলহিদ ও যিন্দিক। এ সুস্পষ্ট বিধান এখন এজন্যই বলতে হচ্ছে যে, আমাদের সমাজে এমন লোকদের কুফরি কর্মকা-থেকেও 'সম্পর্কহীনতা' প্রকাশ নিজের ঈমান রক্ষার জন্য অপরিহার্য মনে করা হয় না; এদের সাথেও মুসলমানদের মতো আচরণ করা হয়, এদের প্রশংসা করা হয়, এদেরকে 'জাতীয় বীরে' পরিণত করার চেষ্টা করা হয়।

কুরআন মাজিদ পাঠ করুন। খোদ আল্লাহ তায়ালার নিকট থেকেই শুনুন, ইসলাম ও ইসলামের নিদর্শনের সাথে মুসলমানের সম্পর্ক কেমন হয় আর কাফির-মুনাফিকের আচরণ কেমন হয়? এরপর নিজেই সিদ্ধান্ত করুন, আপনি কাদের সাথে থাকবেন।

কুরআন কারিমে আরো দেখুন, যারা ইসলামের সাথে, ইসলামের নবীর সাথে ও ইসলামের নিদর্শনসমূহের সাথে বিদ্রুপ করে, আল্লাহ তায়ালা, তাঁর

রাসূল ও মুসলমানদের কষ্ট দেয়, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালার রায় কী? কুরআন মাজিদে ইরশাদ হচ্ছে,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۞ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ۞

"হে মুমিনগণ! তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদের মধ্যে যারা তোমাদের দীনকে হাসি-তামাশা ও ক্রীড়ার বস্তুরূপে গ্রহণ করে তাদেরকে ও কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। যদি তোমরা মুমিন হও, তবে আল্লাহকে ভয় করো। তোমরা যখন নামাযের জন্য আহবান কর, তখন তারা ওটাকে হাসি-তামাশা ও ক্রীড়ার বস্তুরূপে গ্রহণ করে। এটা এজন্য যে, তারা এমন এক সম্প্রদায় যাদের বোধশক্তি নেই।" [সূরা মায়িদা : ৫৭-৫৮]

বোঝা গেল, নামাযের অবজ্ঞাকারী ও নামায থেকে বাধাদানকারী ওই যুগেও ছিল, কিন্তু মুসলমানদের জন্য আল্লাহ তায়ালার বিধান হচ্ছে—আমরা কখনো তাদের কথায় কর্ণপাত করো না; বরং আল্লাহকেই সাজ্‌দা করতে থাকো এবং তাঁর নৈকট্য অর্জন করতে থাকো। সুতরাং কুরআন মাজিদে ইরশাদ হচ্ছে,

كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ۞

"সাবধান! তুমি ওর অনুসরণ করো না বরং সাজ্‌দা করো এবং আমার নিকটবর্তী হও।" [সূরা আলাক-১৯]

আশ্চর্যের বিষয় হল, গাইরুল্লাহর সাজ্‌দায় এদের কোনো গাত্রদাহ নেই! এতে কোনো ক্ষোভ ও যন্ত্রণাও নেই যে, এদের অন্তর (যা আল্লাহ তায়ালারই মাখলুক) সর্বদা তাদের মিথ্যা উপাস্যদের, যেমন প্রবৃত্তি, কুফরি মতবাদসমূহ ও নিজেদের নেতাদের) প্রতি সাজ্‌দাবনত। বিচার-বুদ্ধির সঠিক ব্যবহার করলে এদের মনেও গায়রুল্লাহর সাজ্‌দায় ঘৃণা ও ক্ষোভ জাগত এবং তারা তা বর্জন করত। এরপর হৃদয় ও ললাট উভয়ের দ্বারাই নিজের মতো সৃষ্টির পরিবর্তে আপন স্রষ্টার সামনে সাজ্‌দাবনত হত। বান্দার জন্য তার প্রকৃত মাবুদের সামনে সাজ্‌দাবনত হওয়াই তো পরম সৌভাগ্য।

দুনিয়াতে যে সাজ্‌দা থেকে বিমুখ থাকে বা তার অবজ্ঞা ও বিদ্রুপ করে, পরকালে শত চেষ্টা করেও সে সাজ্‌দার সুযোগ পাবে না। ইরশাদ হচ্ছে,

يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ۞ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ ۞

"স্মরণ করো সেই দিনের কথা, যেদিন 'সাক' উন্মোচিত করা হবে। সেই দিন তাদেরকে আহবান করা হবে সাজ্‌দা করার জন্য, কিন্তু তারা সক্ষম হবে না। তাদের দৃষ্টি অবনত, হীনতা তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে। অথচ যখন তারা নিরাপদ ছিল, তখন তো তাদেরকে আহবান করা হয়েছিল সাজ্‌দা করতে।"
[সূরা কলম : ৪২-৪৩]

মুনাফিকরা একদিকে কুরআন, ইসলাম ও ইসলামের নবীর প্রতি অবজ্ঞা ও বিদ্রুপ করে অন্যদিকে মুসলমানদের থেকে তা গোপন করারও চেষ্টা করে। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তা প্রকাশ করেই দেন। কুরআন মাজিদে ইরশাদ হচ্ছে,

يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ ۞ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ۞ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ۞

"মুনাফিকরা ভয় করে, তাদের সম্পর্কে এমন এক সূরা না অবতীর্ণ হয়, যা তাদের অন্তরের কথা ব্যক্ত করে দিবে। বলুন, বিদ্রুপ করতে থাকো; তোমরা যা ভয় কর আল্লাহ তা প্রকাশ করে দিবেন। এবং তুমি তাদেরকে প্রশ্ন করলে তারা নিশ্চয় বলবে, আমরা তো আলাপ-সালাপ ও ক্রীড়া-কৌতুক করছিলাম। বলুন, তোমরা কি আল্লাহ, তাঁর আয়াত ও তাঁর রাসূলকে বিদ্রুপ করছ? তোমরা অজুহাত দেখিও না। তোমরা ঈমানের পর কুফরি করেছ। তোমাদের মধ্যে কোনো দলকে ক্ষমা করলেও অন্যদলকে শাস্তি দিব। কারণ, তারা অপরাধী।"
[সূরা তওবা : ৬৪-৬৬]

অর্থাৎ অবজ্ঞা ও বিদ্রুপ করে এ অজুহাত দাঁড় করানো যে, আমরা এমনি একটু ঠাট্টা করছিলাম কিংবা আমরা তো শুধু একসাথে বসে ছিলাম, মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়।

এ আয়াত দ্বারা আরো জানা গেল, মুনাফিক যদিও ঈমানহীন, কিন্তু ভাষায় বা ভাবে যেহেতু ঈমানের দাবিদার তাই তার কুফরি কথাবার্তা বা কুফরি আচরণ ইরতিদাদ হিসেবে গণ্য। তার বিধান হবে মুরতাদের বিধান।

আর এই যে বলা হয়েছে, মুনাফিকদের কাউকে কাউকে আল্লাহ তায়ালা মাফ করেন, তার অর্থ—দুনিয়ার শাস্তি স্থগিত করা। যাকে দেখা যায়, কুফর

ও ঈসলাম বিদ্বেষে কতদূর সে যেতে পারে। আখিরাতের শাস্তি থেকে এদের কারো মুক্তির কোনো উপায় নেই। কুরআন মাজিদে ইরশাদ হচ্ছে,

وَعَدَ اللهُ الْمُنَافِقِيْنَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِيْنَ فِيْهَا

هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيْمٌ ❖

"মুনাফিক নর, মুনাফিক নারী ও কাফিরদেরকে আল্লাহ ওয়াদা দিয়েছেন জাহান্নামের অগ্নির; যেখানে তারা স্থায়ী হবে, এটাই তাদের জন্য যথেষ্ট এবং আল্লাহ তাদেরকে লা'নত করেছেন আর তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী শাস্তি।"

[সূরা তওবা-৬৮]

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে,

إِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًا ❖

"বরং মুনাফিকরা তো জাহান্নামের নিম্নতম স্তরে থাকবে আর তাদের জন্য আপনি কখনো কোনো সহায় পাবে না।" [সূরা নিসা-১৪৫]

অবজ্ঞা ও বিদ্রুপ কেন, এর চেয়েও অনেক কম কষ্টদায়ক বিষয়ও কঠিন আজাবের কারণ। আর সেটাও বৈশিষ্ট্য মুনাফিকদেরই। ইরশাদ হচ্ছে,

وَمِنْهُمُ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ النَّبِيَّ وَيَقُوْلُوْنَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ رَسُوْلَ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ ❖ يَحْلِفُوْنَ بِاللهِ لَكُمْ لِيُرْضُوْكُمْ وَاللهُ وَرَسُوْلُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوْهُ إِنْ كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ ❖ أَلَمْ يَعْلَمُوْا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيْهَا ذٰلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيْمُ ❖

"এবং তাদের মধ্যে এমনও লোক আছে, যারা নবীকে কষ্ট দেয় এবং বলে, সে তো কান-পাতলা। বলুন, তার কান তোমাদের জন্য যা মঙ্গল তা-ই শোনে। তিনি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনেন এবং মুমিনদেরকে বিশ্বাস করেন; তোমাদের মধ্যে যারা মুমিন তিনি তাদের জন্য রহমত এবং যারা আল্লাহর রাসূলকে কষ্ট দেয় তাদের জন্য আছে মর্মন্তুদ শাস্তি।

তারা তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য তোমাদের নিকট আল্লাহর শপথ করে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এরই অধিক হকদার যে, ওরা তাদেরকেই সন্তুষ্ট করবে, যদি ওরা মুমিন হয়। ওরা কি জানে না, যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করে, তার জন্য তো রয়েছে জাহান্নামের অগ্নি, সে স্থানে সে স্থায়ী হবে। সেটাই চরম লাঞ্ছনা।" [সূরা তওবা : ৬১-৬৩]

মুনাফিকদের কাছে আল্লাহ তায়ালার দীন, আল্লাহ তায়ালার ইবাদত ও তার হুকুম-আহকাম অতি অপছন্দনীয়। ইরশাদ হচ্ছে,

الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ❁ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ❁ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ❁

"কুফরি ও কপটতায় মরুবাসীগণ কঠোরতর এবং আল্লাহ তাঁর রাসূলের প্রতি যা অবতীর্ণ করেছেন, তার সীমা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার যোগ্যতা এদের অধিক। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। মরুবাসীর কেউ কেউ, যা তারা আল্লাহর পথে ব্যয় করে তা অর্থদণ্ড বলে গণ্য করে এবং তোমাদের ভাগ্যবিপর্যয়ের প্রতীক্ষা করে। মন্দ ভাগ্যচক্র ওদের হোক। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

মরুবাসীদের কেউ কেউ আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে এবং যা ব্যয় করে তাকে আল্লাহর সান্নিধ্য ও রাসূলের দুয়া লাভের উপায় মনে করে। বস্তুত ওটা তাদের জন্য আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের উপায়; আল্লাহ তাদেরকে নিজ রহমতে দাখিল করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

[সূরা তওবা : ৯৭-৯৯]

নামাযও তাদের কাছে অপছন্দনীয়। এরপরও মুনাফিকি গোপন রাখার জন্য কখনো কখনো লোক দেখানো নামায পড়ে। ইরশাদ হচ্ছে,

مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَٰلِكَ لَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَلَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ❁

"দোটানায় তারা দোদুল্যমান—না এদের দিকে, না ওদের দিকে। আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন আপনি তার জন্য কখনো কোনো পথ পাবে না।"

[সূরা নিসা-১৪৩]

আল্লাহ তায়ালার নাযিলকৃত কিতাব এবং তার প্রদত্ত শরিয়ত অপছন্দ করা কুফরি। যে এ কুফরিতে লিপ্ত ব্যক্তিদের কিছুমাত্র সমর্থন করবে সে মুরতাদ। কুরআন মাজিদে ইরশাদ হচ্ছে,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ❁

وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ❁

"হে মুমিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর, আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করবেন ও তোমাদের অবস্থান দৃঢ় করবেন। যারা কুফরি করে তাদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ এবং তিনি তাদের কর্ম ব্যর্থ করে দিবেন।" [সূরা মুহাম্মদ : ৭-৮]

আরো ইরশাদ হয়েছে–

إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ ۞ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ۞ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ۞ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ۞

"যারা নিজেদের নিকট সৎপথ ব্যক্ত হওয়ার পর তা ত্যাগ করে, শয়তান তাদের কাজকে শোভন করে দেখায় এবং তাদেরকে মিথ্যা আশা দেখায়। এটা এজন্য যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেন, তা যারা অপছন্দ করে তাদেরকে ওরা বলে, 'আমরা কোনো কোনো বিষয়ে তোমাদের আনুগত্য করব' আল্লাহ ওদের গোপন অভিসন্ধি অবগত আছেন। ফিরিশতারা যখন ওদের মুখম-লে ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত করতে করতে প্রাণ হরণ করবে, তখন ওদের দশা কেমন হবে! এটা এজন্য যে, ওরা তার অনুসরণ করে, যা আল্লাহর অসন্তোষ জন্মায় ও তাঁর সন্তুষ্টি অপ্রিয় গণ্য করে। তাই তিনি এদের কর্ম নিষ্ফল করে দেন।"

[সূরা মুহাম্মদ : ২৫-২৮]

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে এটুকু বেয়াদবীও আল্লাহ তায়ালা সহ্য করেন না যে, কথা বলার সময় তাঁর স্বরের চেয়ে স্বর উঁচু করবে। ইরশাদ হয়েছে, শুধু এ অশিষ্ট আচরণের কারণে সকল আমল ধ্বংস হয়ে যেতে পারে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ۞ إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ۞

"হে মুমিনগণ! আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সমক্ষে তোমরা কোনো বিষয়ে অগ্রণী হয়ো না এবং আল্লাহকে ভয় করো। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। হে মুমিনগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর নিজেদের কণ্ঠস্বর উঁচু করো না এবং নিজেদের মধ্যে যেভাবে উচ্চৈঃস্বরে কথা বল, তাঁর সাথে সেইরূপ উচ্চৈঃস্বরে কথা বলো না। কারণ, এতে তোমাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে তোমাদের অজ্ঞাতসারে। যারা আল্লাহর রাসূলের সম্মুখে নিজেদের কণ্ঠস্বর নিচু করে, আল্লাহ তাদের অন্তরকে তাকওয়ার জন্য পরীক্ষা করে নিয়েছেন। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।"

[সূরা হুজরাত : ১-৩]

**মোটকথা :** ইসলাম, ইসলামের নবী, ইসলামের নিদর্শন ও ইসলামের বিধানসমূহের প্রতি ভালোবাসা ও ভক্তি-শ্রদ্ধা ঈমানের অপরিহার্য অংশ, যা ছাড়া ঈমান কল্পনাও করা যায় না। আর এইসব বিষয়কে অবজ্ঞা, বিদ্রুপ করা, বিদ্বেষ পোষণ করা, এমনকি অপ্রীতিকর মনে করাও কুফরি ও মুনাফিকি। এ মানসিকতা পোষণকারীদের ঈমান-ইসলামের সাথে বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই।

**৯. ঈমান একটি একক : এতে বিভাজনের অবকাশ নেই**

এটি ঈমান-সংক্রান্ত এক গুরুত্বপূর্ণ নীতি, যা পুরোপুরি স্পষ্ট ও স্বীকৃত হওয়ার পরও অনেককে উদাসীনতা প্রদর্শন করতে দেখা যায়। ঈমান সাব্যস্ত হওয়ার জন্য ইসলামের সকল অকাট্য বিধান ও বিশ্বাসকে সত্য জ্ঞানে কবুল করা অপরিহার্য। এর কোনো একটিকে অস্বীকার করা বা কোনোটির উপর আপত্তি তোলাও ঈমান নষ্ট হওয়ার জন্য যথেষ্ট। যেমন– অজু হওয়ার জন্য অজুর সবগুলো ফরয পালন করা জরুরি, কিন্তু তা ভেঙে যাওয়ার জন্য অজু ভঙের সবগুলো কারণ পাওয়া জরুরি নয়। যে কোনো একটি কারণ দ্বারাই অজু ভেঙে যায়। অদ্রূপ ঈমান তখনই অস্তিত্ব লাভ করে, যখন ইসলামের সকল অকাট্য বিধান ও বিশ্বাস মন থেকে কবুল করা হয়। পক্ষান্তরে এসবের কোনো একটিকেও অস্বীকার করার দ্বারা ঈমান নষ্ট হয়ে যায়।

আর অবজ্ঞা-বিদ্রূপ তো খুবই ভয়াবহ। এটা শরয়ি দলিলে প্রমাণিত ছোট কোনো বিষয়েও অবজ্ঞা প্রকাশ পেলে সাথে সাথে ওই ব্যক্তির ঈমান শেষ হয়ে যাবে এবং তার উপর কুফরের বিধান আরোপিত হবে।

আকাইদ ও আহকামের বিদ্রুপ বা অস্বীকার তো এজন্যই কুফর যে, তাতে আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য বর্জন এবং তাঁদের প্রতি ঔদ্ধত্য প্রকাশ হয়। সুতরাং পূর্ণ ইসলামকে অস্বীকার বা বিদ্রুপ করা আর ইসলামের কোনো একটি বিষয়কে অস্বীকার বা বিদ্রুপ করা একই কথা! দুটিই সমান।

বস্তুত ওই ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে; ঔদ্ধত্য ও বিরোধিতা প্রকাশ করেছে। ইবলিস তো কাফির-মরদূদ হয়েছিল একটি হুকুমের উপর আপত্তি করেই। বিষয়টি এমনিই স্পষ্ট। তদুপরি আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে একাধিক জায়গায় তা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন :

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۞

"তা হলে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশে বিশ্বাস কর আর কিছু অংশ প্রত্যাখ্যান কর? সুতরাং তোমাদের যারা এরকম করে, তাদের একমাত্র পরিণাম পার্থিব জীবনে হীনতা ও কেয়ামতের দিন তারা কঠিন শাস্তির দিকে নিক্ষিপ্ত হবে, তাদের কর্মকান্ড সম্পর্কে আল্লাহ বেখবর নন।" [সূরা বাকারা-৮৫]

আরো ইরশাদ হয়েছে–

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُوْنَ أَنْ يُفَرِّقُوْا بَيْنَ اللهِ وَرُسُلِهٖ وَيَقُوْلُوْنَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُوْنَ أَنْ يَتَّخِذُوْا بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا ۞ أُولٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِيْنَ عَذَابًا مُهِيْنًا ۞ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللهِ وَرُسُلِهٖ وَلَمْ يُفَرِّقُوْا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيْهِمْ أُجُوْرَهُمْ وَكَانَ اللهُ غَفُوْرًا رَحِيْمًا ۞

"যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের মধ্যে পার্থক্য করতে চায় আর বলে, আমরা কতক (রাসূল)-এর প্রতি তো ঈমান রাখি এবং কতককে অস্বীকার করি। আর (এভাবে) তারা (কুফর ও ঈমানের মাঝখানে) মাঝামাঝি একটি পথ অবলম্বন করতে চায়। এরূপ লোকই সত্যিকারের কাফির। আর আমি কাফিরদের জন্য লাঞ্ছনাকর শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি। যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনবে এবং তাদের কারো মধ্যে কোনো পার্থক্য করবে না, আল্লাহ তাদেরকে তাদের কর্মফল দান করবেন। আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

[সূরা নিসা : ১৫০-১৫২]

যারা শরিয়তের শুধু শান্তির বিধান গ্রহণ করেন আর জিহাদের বিধানকে সন্ত্রাস বা উগ্রবাদ বলেন; উপদেশের কথাগুলো গ্রহণ করেন আর ইসলামি দণ্ড-বিধান পরিত্যাজ্য মনে করেন; ইবাদতের বিষয়গুলো গ্রহণ করেন আর লেনদেন ও হালাল-হারামের বিধান মানতে অসম্মত থাকেন; ব্যক্তিজীবনের বিধি-বিধান গ্রহণ করেন, কিন্তু সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের বিধি-বিধান (প্রশাসন, নির্বাহী ও বিচার-বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট) সম্পর্কে বিরূপ থাকেন বা ইবাদত ও লেনদেনের বিধান মানেন, কিন্তু বেশ-ভূষা, আনন্দ-বিষাদ, পর্ব-উৎসব ও জীবন যাপনের আদব-কায়েদার ইসলামি নির্দেশ ও নির্দেশনার প্রতি বিরূপ থাকেন বা মানাকে জরুরি মনে করেন না—এরা সবাই ইসলামের কিছু অংশ অস্বীকার বা কিছু অংশের বিরোধিতা প্রশ্নে নিজের ঈমান হারিয়ে বসেছেন। তাদের ঈমান মূলত আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসূলের উপর নয়; নিজ পছন্দ-অপছন্দের উপর কিংবা নেতা ও গুরুর পছন্দ-অপছন্দের ওপর। অথচ মহান আল্লাহ আদেশ করেছেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا
خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ۞

"হে মুমিনগণ! তোমরা পূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করো এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।" [সূরা বাকারা-২০৮]

ভালোভাবে বুঝে নিন, শরিয়তের বিধি-বিধানকে হক ও অবশ্যপালনীয় বলে স্বীকার করার পর পালনে ত্রুটি হলে তা গুনাহ, কুফর নয়। কারণ এ ব্যক্তি নিজেকে অপরাধী মনে করে। পক্ষান্তরে কোনো বিধানের বিরোধিতা বা প্রতিবাদের অর্থ সরাসরি আনুগত্য-ত্যাগ, যা সাধারণ অপরাধ নয়, বিদ্রোহ। এটা মানুষকে দুনিয়ার বিধানে 'মোবাহুদ দম' (হত্যাযোগ্য) আর আখিরাতের বিধানে চির জাহান্নামি সাব্যস্ত করে।

### ১০. ঈমানি আকাইদ ও আহকাম সুস্পষ্ট বর্ণিত : এতে বিকৃতি ও অপব্যাখ্যা একপ্রকার অস্বীকার

ঈমানি আকাইদ ও আহকাম অস্বীকার করা, অবজ্ঞা ও বিদ্রুপ করা এবং বিরোধিতার লক্ষ্যবস্তু বানানো যেমন কুফর, তেমনিভাবে এগুলোর কোনোটির এমন কোনো 'ব্যাখ্যা' করাও সরাসরি কুফর, যার দ্বারা তার প্রতিষ্ঠিত অর্থই বদলে যায়। কোনো কিছুর অপব্যাখ্যা ও অর্থের বিকৃতি হচ্ছে ওই বিষয়টি অস্বীকারের ভয়াবহতম প্রকার। ঈমানের বিষয়গুলোর ওপর প্রতিষ্ঠিত অর্থেই ঈমান আনতে হবে। নিজের পক্ষ হতে সেগুলোর কোনো অর্থ নির্ধারণ করে, কিংবা কোনো বেদ্বীনের নব উদ্ভাবিত অর্থ গ্রহণ করে ঈমানের দাবি করা সম্পূর্ণ অর্থহীন ও সুস্পষ্ট মুনাফিকি।

'ব্যাখ্যা' তো করা হয় যেখানে ভাষার বাকরীতি ও মর্মোদ্ধারের নীতিমালা অনুযায়ী একাধিক অর্থের সম্ভাবনা থাকে; কিন্তু যেখানে কোনো বিধান বা বিশ্বাসের অর্থ ও মর্ম রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগ থেকে অসংখ্য মুমিনের সুসংহত সূত্রে প্রজন্ম পরম্পরায় চলে আসে এবং যাতে প্রতি যুগে মুসলিম উম্মাহর ইজমা ও ঐকমত্য বিদ্যমান থাকে, সেখানে ভিন্ন ব্যাখ্যার অবকাশ থাকে কিভাবে? সেখানে তো ওই অর্থই নিশ্চিত ও নির্ধারিত। ওখানে ভিন্ন 'ব্যাখ্যার' অর্থ ওই অকাট্য ও প্রতিষ্ঠিত বিষয়কে অস্বীকার করা। যেমন—

- কেউ বলল, 'নামায সত্য, কিন্তু তা পাঁচ ওয়াক্ত নয়, দুই ওয়াক্ত।' কিংবা বলল, 'নামায সত্য, কিন্তু আসল নামায তা নয়, যা মুসল্লিগণ মসজিদে আদায় করেন, আসল নামায তো মনের নামায। যে তা আদায় করতে পারে, তার দেহের নামাযের প্রয়োজন নেই।' (নাউযুবিল্লাহ)

- কেউ বলল, 'শরিয়ত সত্য, কিন্তু তা আম বা সাধারণ মানুষের জন্য, খাস বা বিশেষ ব্যক্তিদের জন্য আছে আলাদা শরিয়ত।' (নাউযুবিল্লাহ)
- কিংবা বলল, 'শরিয়ত তো প্রাচীন যুগের ব্যাপার, আজকের উন্নতির যুগে এর সংস্কার প্রয়োজন।' (নাউযুবিল্লাহ)
- কিংবা বলল, 'শরিয়ত মানা একটি ঐচ্ছিক ব্যাপার। মানলে ভালো, না মানলেও দোষ নেই।' (নাউযুবিল্লাহ)
- কেউ কাদিয়ানী গোষ্ঠীর মতো বলল—মুহাম্মদ ﷺ রাসূলুল্লাহ ও খাতামুন্ নাবিয়্যিন। তবে গোলাম আহমদ কাদিয়ানিও নবী, তিনি জিল্লি বা বুরুজি নবী। এতে খতমে নবুওতের আকিদায় কোনো ধাক্কা লাগে না। (নাউযুবিল্লাহ)

তা হলে এসব কুফরি ব্যাখ্যা এবং এ জাতীয় আরো অসংখ্য ব্যাখ্যা, যার ছদ্মাবরণে বেদীন-মুলহিদ চক্র দীনের জরুরি তথা সর্বজনবিদিত বিষয় এবং ইসলামের অকাট্য বিষয়াদি অস্বীকার করে। তদুপরি কুফরিটা ঢেকে রাখারও অপচেষ্টা করে। এতে তাদের কুফরি আরো ভয়াবহ হয়ে যায়। অস্বীকার-এর সাথে 'অপব্যাখ্যা' যুক্ত করে নিজেকে সাধারণ কাফিরের চেয়েও মারাত্মক প্রকারের কাফির-মুলহিদ, যিন্দিক ও মুনাফিকের সারিতে অন্তর্ভুক্ত করে।

আল্লাহ্ তায়ালার নিম্নোক্ত হুঁশিয়ারি এদের সকলের মনে রাখা উচিত!

إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا أَفَمَنْ يُلْقَىٰ فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞

"যারা আমার আয়াতসমূহ বিকৃত করে তারা আমার অগোচরে নয়, শ্রেষ্ঠ কে? যে ব্যক্তি জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে সে, না যে কিয়ামতের দিন নিরাপদে থাকবে সে? তোমাদের যা ইচ্ছে কর; তোমরা যা কর তিনি সবই দেখেন।"

[সূরা হামীম আস্ সাজদা-৪০]

দ্বীনকে অপব্যাখ্যার হাত থেকে রক্ষার জন্য আল্লাহ তায়ালা 'সাবীলুল মুমিনীন'কে মানদণ্ড বানিয়েছেন এবং 'সাবীলুল মুমিনীন' (মুমিনের সর্বসম্মত পথ) থেকে বিচ্যুতিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিরোধিতার মতো জাহান্নামে যাওয়ার কারণ সাব্যস্ত করেছেন। এ কারণে কোনো ইসলামি আকিদা বা হুকুমের (বিশ্বাস বা বিধানের) এমন সকল 'ব্যাখ্যা'র গন্তব্য জাহান্নাম, যা উম্মাহর সর্বসম্মত 'ব্যাখ্যার' বিরোধী।

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ

نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيْرًا ❖

"কারো নিকট সৎপথ প্রকাশ হওয়ার পর সে যদি রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং মুমিনদের পথ ব্যতীত অন্য পথ অনুসরণ করে, তবে যে দিকেই সে ফিরে যায়, সে দিকেই তাকে ফিরিয়ে দিব ও জাহান্নামে তাকে দগ্ধ করব আর তা কত মন্দ আবাস!" [সূরা নিসা-১১৫]

আল্লাহ তায়ালা কুরআন মাজিদে আরো জানিয়ে দিয়েছেন, মুনাফিকদের কাছে আল্লাহ তায়ালার এ মানদণ্ড পছন্দনীয় নয়। তারা ঈমানের দাবি করে, কিন্তু মুমিনদের মতো ইমান আনে না, নিজেদের মনমতো ঈমান আনে। এরা মুমিনদের মনে করে বুদ্ধিহীন। আজও আমরা একই প্রবণতা লক্ষ্য করছি।

যেমন– পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে,

وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا كَمَا اٰمَنَ النَّاسُ قَالُوْا أَنُؤْمِنُ كَمَا اٰمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلٰكِنْ لَا يَعْلَمُوْنَ ❖ وَإِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْا اٰمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلٰى شَيَاطِيْنِهِمْ قَالُوْا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُوْنَ ❖ اللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ❖ أُولٰئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدٰى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ ❖

"যখন তাদেরকে বলা হয়, যেসব লোক ঈমান এনেছে, তোমরাও তাদের মতো ঈমান আনয়ন করো! তারা বলে, নির্বোধগণ যেরূপ ঈমান এনেছে আমরাও কি সেরূপ ঈমান আনব? জেনে রাখ, এরাই নির্বোধ, কিন্তু তারা জানে না। যখন তারা মুমিনগণের সংস্পর্শে আসে তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি। আর যখন নিভৃতে তাদের শয়তানদের সঙ্গে মিলিত হয়, তখন বলে, আমরা তো তোমাদের সাথেই আছি। আমরা শুধু তাদের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে থাকি। আল্লাহ তাদের সাথে বিদ্রুপ করেন এবং তাদেরকে তাদের অবাধ্যতায় বিভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়ানোর অবকাশ দেন। এরাই হিদায়াতের বিনিময়ে ভ্রান্তি ক্রয় করে। সুতরাং তাদের ব্যবসা লাভজনক হয়নি, তারা সৎপথেও পরিচালিত নয়।" [সূরা বাকারা : ১৩-১৬]

সুতরাং হেদায়াত এদের কাছে পাওয়া যাবে না। পাওয়া যাবে তাদেরই কাছে, যাদের এরা 'বুদ্ধিহীন' বলে।

### ১১. অন্তর ও মুখের একাত্মতা ঈমান : এখানে কপটতার কোনো স্থান নেই

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ. اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.

"যখন মুনাফিকরা তোমার কাছে আসে, তারা বলে—আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি নিশ্চয় আল্লাহর রাসূল। আল্লাহ জানেন, তুমি নিশ্চয় তাঁর রাসূল এবং আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। ওরা ওদের শপথগুলোকে ঢালরূপে ব্যবহার করে এবং ওরা আল্লাহর পথ হতে মানুষকে নিবৃত্ত করে। ওরা যা করছে তা কত মন্দ!" [সূরা মুনাফিকূন : ১-২]

এরপর আরো ইরশাদ হয়েছে,

هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا وَلِلهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ❖ يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ❖

ওরাই বলে—'তোমরা আল্লাহর রাসূলের সহচরদের জন্য ব্যয় করো না, যাতে ওরা সরে পড়ে'। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর ধন-ভাণ্ডার তো আল্লাহরই, কিন্তু মুনাফিকরা তা বোঝে না। ওরা বলে, 'আমরা মদিনায় প্রত্যাবর্তন করলে যারা মর্যাদাবান তারা হীনদেরকে সেখান থেকে বহিষ্কার করবে'। কিন্তু মর্যাদা তো আল্লাহর এবং তাঁর রাসূল ও মুমিনদের। কিন্তু মুনাফিকরা তা জানে না। [আল মুনাফিকূন : ৭-৮]

### ১২. ঈমান একটি চিরন্তন অঙ্গীকার; ধর্মান্তর সাধারণ কুফর হতেও ভয়াবহ

ঈমান আল্লাহ তায়ালা ও বান্দাদের মধ্যকার এক স্থায়ী অঙ্গিকারের নাম; যার কোনো মেয়াদ নেই। যখনই ঈমানের সম্পদ পাওয়া গেল, তখন থেকেই এর পুষ্টি ও বর্ধন, শক্তি ও সংস্কারে মগ্ন থাকা জরুরি। সব সময় সতর্ক থাকা চাই, এমন কোনো কথা বা কাজ যেন প্রকাশিত না হয়, যা ঈমান নষ্ট করে। আর আল্লাহ তায়ালার দরবারে তাঁর শেখানো দুয়া করতে থাকা উচিত।

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ

"আমাদের প্রতিপালক! সরল পথ প্রদর্শনের পর তুমি আমাদের অন্তরকে বক্র করো না এবং তোমার নিকট হতে আমাদেরকে করুণা দাও, নিশ্চয় তুমি মহাদাতা।" [সূরা আলে ইমরান-৮]

আল্লাহ তায়ালার কাছে ওই বান্দার ঈমানই গ্রহণযোগ্য, যে ঈমানের ওপর অবিচল থাকে। পক্ষান্তরে যে ঈমান থেকে সরে যায় সে তো দুই বিদ্রোহে লিপ্ত-কুফরের বিদ্রোহ ও ইরতিদাদের বিদ্রোহ।

অবিচল মুমিনদের জন্য আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে সুসংবাদ শুনুন!

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ❖

أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ❖

"যারা বলে, আমাদের প্রতিপালক তো আল্লাহ; এরপর অবিচল থাকে, তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না। তারাই জান্নাতের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে, তাদের কৃতকর্মের পুরস্কার স্বরূপ।"

[সূরা আহ্কাফ : ১৩-১৪]

অন্য আয়াতে আছে,

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ❖ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ❖ نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ ❖

"যারা বলে, আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ; এরপর অটল থাকে, তাদের নিকট অবতীর্ণ হয় ফিরিশতা এবং বলে, তোমরা ভীত হবে না, চিন্তিতও হবে না বরং তোমাদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, তার জন্য আনন্দিত হও। আমরাই তোমাদের বন্ধু দুনিয়ার জীবনে ও পরকালে। তথায় তোমাদের জন্য রয়েছে যা কিছু তোমাদের মন চায় এবং সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে যা তোমরা ফরমায়েশ কর। এটা ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু আল্লাহর পক্ষ হতে আপ্যায়ন।" [সূরা হামীম আস্সাজদা : ৩০-৩২]

পক্ষান্তরে যারা ঈমানের উপর কায়েম থাকে না বরং পশ্চাদপসরণ করে বা বারবার এদিক-ওদিক আসা-যাওয়া করে এদের কাছে দীন এক ক্রীড়ার বস্তু। ইরতিদাদ (ঈমান আনয়নের পর কুফরি করা)। এটা মূলত মুনাফিকদের কাজ। এর দ্বারা তারা দুর্বল ঈমানদারদের সংশয়গ্রস্ত করতে চায়। কুরআন মাজিদে তাদের এ অপকৌশলের বিবরণ আছে,

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ❖ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللهِ أَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ❖

"আর আহলে কিতাবগণের একদল বলল, মুসলমানগণের উপর যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে তাকে দিনের প্রথম ভাগে মেনে নাও, আর দিনের শেষ ভাগে অস্বীকার কর, হয়তো তারা মুখ ফিরিয়ে নিতে পারে।

যারা তোমাদের ধর্মমতে চলবে, তাদের ছাড়া আর কাউকে বিশ্বাস করবে না। বলে দিন নিঃসন্দেহে হেদায়েত সেটাই, যে হেদায়েত আল্লাহ করেন। আর এসব কিছু এ জন্য যে, তোমরা যা লাভ করেছিলে তা অন্য কেউ কেন প্রাপ্ত হবে, কিংবা তোমাদের পালনকর্তার সামনে তোমাদের উপর তারা কেন প্রবল হয়ে যাবে! বলে দিন, মর্যাদা আল্লাহরই হাতে; তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন আর আল্লাহ প্রাচুর্যময় ও সর্বজ্ঞ।" [সূরা আলে ইমরান : ৭২-৭৩]

যে কোনো ইরতিদাদ সাধারণ কুফর থেকে ভয়াবহ। সাধারণ কুফর তো সত্য দীন থেকে বিমুখ থাকা বা গ্রহণ না করার নাম, কিন্তু ইরতিদাদ নিছক বিমুখতাই নয়, এ হচ্ছে বিরোধিতা। সত্য দীন গ্রহণ করার পর তা বর্জনের অর্থ ওই দীনকে অভিযুক্ত করা, যা নির্জলা অপবাদ। বরং ইরতিদাদ তো সত্য দীনের প্রতি বিরোধিতার পাশাপাশি 'ইফসাদ ফিল আরদ' (ভূ-পৃষ্ঠে দুস্কৃতি)ও বটে। বিশেষত মুরতাদ (মুমিন হওয়ার পর কাফির হয়ে যাওয়া ব্যক্তি) যখন কটাক্ষ-কটূক্তি এবং অবজ্ঞা বিদ্রুপে লিপ্ত হয়, তখন সে তো সরাসরি মুহারিব (যুদ্ধ ঘোষণাকারী) ও ভূপৃষ্ঠে দুস্কৃতিকারী হয়ে যায়।

মুরতাদ সম্পর্কে কুরআন কারিমের আসমানি হুঁশিয়ারি শুনুন!

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ۞ بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۞ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ۞

"যারা ঈমান আনে ও পরে কুফরি করে এবং আবার ঈমান আনে, আবার কুফরি করে, এরপর তাদের কুফরি প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পায়, আল্লাহ তাদের কিছুতেই ক্ষমা করবেন না এবং তাদেরকে কোনো পথে পরিচালিত করবেন না। মুনাফিকদেরকে শুভ সংবাদ দাও যে, তাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে! মুমিনগণের পরিবর্তে যারা কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে তারা কি ওদের নিকট সম্মান চায়? সমস্ত সম্মান তো আল্লাহরই।" [সূরা নিসা : ১৩৭-১৩৯]

كَيْفَ يَهْدِى اللهُ قَوْمًا كَفَرُوْا بَعْدَ إِيْمَانِهِمْ وَشَهِدُوْا أَنَّ الرَّسُوْلَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّالِمِيْنَ ۞ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ ۞ خَالِدِيْنَ فِيْهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ۞ إِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَأَصْلَحُوْا فَإِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ ۞

"আল্লাহ কিরূপে সৎপথে পরিচালিত করবেন সেই জাতিকে, যারা ঈমান আনার পর, রাসূলকে সত্য বলে সাক্ষ্য দেওয়ার পর ও তাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শন আসার পরও কুফরি করে? আল্লাহ জালেম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না। এরাই হল তারা, যাদের কর্মফল হল—তাদের উপর আল্লাহর, ফিরিশতাগণের এবং মানুষসকলের লানত। তারা তাতে স্থায়ী হবে। তাদের শাস্তি লঘু করা হবে না এবং তাদেরকে অবকাশও দেওয়া হবে না। তবে এরপর যারা তওবা করে ও নিজেদেরকে সংশোধন করে নেয় তারা ব্যতিরেকে। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" [সূরা আলে ইমরান : ৮৬-৮৯]

কিন্তু যারা সারা জীবন কুফরের উপর অটল থাকে আর মৃত্যু উপস্থিত হলে তওবা করে, তাদের তওবা কবুল হয় না। ইরশাদ হচ্ছে,

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْدَ إِيْمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوْا كُفْرًا
لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّوْنَ ۞

"ঈমান আনার পর যারা কুফরি করে এবং যাদের সত্য প্রত্যাখ্যান-প্রবৃত্তি বাড়তে থাকে তাদের তওবা কখনো কবুল হবে না। এরাই পথভ্রষ্ট।"
[সূরা আলে ইমরান-৯০]

আরো ইরশাদ হয়েছে,

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّئَاتِ حَتّٰى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّيْ
تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِيْنَ يَمُوْتُوْنَ وَهُمْ كُفَّارٌ، أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيْمًا ۞

"তওবা কবুলের বিষয়টি তাদের জন্য নয়, যারা অসৎকর্ম করতে থাকে। পরিশেষে তাদের কারো যখন মৃত্যুক্ষণ এসে পড়ে, তখন বলে—এখন আমি তওবা করলাম এবং তাদের জন্যও নয়, যারা কুফর অবস্থায়ই মারা যায়। এরূপ লোকদের জন্য তো আমি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।"
[সূরা নিসা-১৮]

এখন কথা হল, দুনিয়ায় মুরতাদের শাস্তি কী, এর জবাব সুস্পষ্ট। মুরতাদ যেহেতু আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর সাথে যুদ্ধ ঘোষণাকারী ও

ভূ-পৃষ্ঠে অনাচার বিস্তারকারী, বিধায় তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। এটা কার্যকর করা সরকারের উপর ফরয। ইরশাদ হচ্ছে,

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۞

"যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কার্য করে বেড়ায় এটাই তাদের শাস্তি যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলে চড়ানো হবে অথবা বিপরীত দিক হতে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে অথবা তাদের দেশ হতে নির্বাসিত করা হবে। দুনিয়াতে এটাই তাদের লাঞ্ছনা আর পরকালে তাদের জন্য মহাশাস্তি রয়েছে। তবে তোমাদের আয়ত্তে আসার পূর্বে যারা তওবা করবে তাদের জন্য নয়। তাই জেনে রেখো! আল্লাহ অবশ্যই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" [সূরা মায়িদা : ৩৩-৩৪]

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ অর্থাৎ যে তার ধর্ম (ইসলাম) পরিবর্তন করে তাকে হত্যা কর। [বুখারি শরিফ, হাদিস নং ৬৯২২]

অন্য হাদিসে আছে, একবার মুয়ায রাযি. আবু মূসা আশয়ারি রাযি.-এর সাথে সাক্ষাৎ করতে এলেন। (তাঁরা উভয়ে তখন ইয়ামানে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পক্ষ হতে দায়িত্বশীল হিসেবে প্রেরিত হয়েছিলেন) মুয়ায রাযি. দেখলেন, এক লোককে তার কাছে বেঁধে রাখা হয়েছে। জিজ্ঞাসা করলেন, কী ব্যাপার? আবু মূসা আশয়ারি রাযি. বললেন, এ লোকটি ইহুদি ছিল। এরপর ইসলাম গ্রহণ করেছে। এখন আবার ইহুদি হয়ে গেছে। আপনি বসুন! মুয়ায রাযি. বললেন, একে হত্যা করার আগ পর্যন্ত আমি বসব না। এটিই আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসূলের রায়। তিনি একথা তিনবার বললেন। সুতরাং ওই মুরতাদকে হত্যা করা হল। [বুখারি, হাদিস নং-৬৯২৩; মুসলিম, হাদিস নং-১৭৩৩]

বিশেষত যে নাস্তিক-মুরতাদ রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে কটূক্তি করে কিংবা ইসলামের নিদর্শনের অবমাননা করে সে তো সরাসরি 'মুফসিদ ফিল আরদ' (ভূ-পৃষ্ঠে দুষ্কৃতিকারী)। এ ব্যক্তি রাসূল অবমাননাকারী হিসেবেও 'ওয়াজিবুল কতল' (অপরিহার্যভাবে হত্যাযোগ্য) এবং দুষ্কৃতিকারী হিসেবেও 'ওয়াজিবুল কতল'। অর্থাৎ তাকে হত্যা করা সরকারের ওপর ফরয।

এজন্য প্রত্যেক মুসলিম জনপদের দায়িত্বশীলদের উপর ফরয, উপরিউক্ত দণ্ড কার্যকর করে নিজেদের ঈমানের পরিচয় দেওয়া। যেখানে এ আইন নেই, তাদের কর্তব্য, অবিলম্বে এ আইন প্রণয়ন করে তা কার্যকর করা, যদি তাঁরা আখিরাতের কল্যাণ চান।

তাঁরা যদি এ সৎ সাহস করেন তবে তা তাদের 'মসনদে'র জন্যও উত্তম। নতুবা মনে রাখতে হবে, যাদের নারাজির ভয়ে তাঁরা এসব দণ্ড কার্যকর করা থেকে বিমুখতা প্রদর্শন করছেন, তারা তাদের মসনদ রক্ষা করতে পারবে না; আখিরাতের কঠিন পাকড়াও থেকে মুক্ত করতে পারবে না। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শাফায়াত থেকে তাদের বঞ্চিত হওয়া তো অনিবার্য।

## ১৩. ঈমানের প্রধান রোকন তাওহিদ; শিরক মিশ্রিত ঈমান অগ্রহণযোগ্য

ঈমানের সর্বপ্রথম রোকন হচ্ছে 'ঈমান বিল্লাহ' তথা আল্লাহ তায়ালার উপর বিশ্বাস স্থাপন। আর ঈমান বিল্লাহর প্রথম কথা হল, আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্ব স্বীকার করা, একমাত্র তাঁকেই 'রব' ও সত্য মাবুদ বলে মানা, পালনকর্তা ও উপাস্য হওয়ার বিষয়ে তাঁর সাথে কাউকে শরিক না করা। একমাত্র আলিমুল গাইব, হাজির-নাজির, মুখতারে কুল বা সর্ববিষয়ে নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী, সঙ্কট উন্মোচনকারী ও বিপদাপদে তাঁকেই ত্রাণকারী মনে করবে। তাঁর বিশেষ হক ও একান্ত বৈশিষ্ট্যসমূহে কাউকে শরিক করবে না। সাধারণ কার্যকারণ ও উপায়-উপকরণের উর্ধ্বের বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কারো কাছে সাহায্য প্রার্থনা করবে না। দৃঢ় বিশ্বাস রাখবে—জীবন-মৃত্যু, উপকার-অপকার, সুস্থতা ও নিরাপত্তা একমাত্র তাঁরই হাতে। তিনিই তা দান করেন। একমাত্র তিনিই রিযিকদাতা। তিনিই বিশ্বজগতের এক, অদ্বিতীয় স্রষ্টা ও নিয়ন্ত্রকও। শরিয়ত প্রদান ও হালাল-হারাম নির্ধারণ তাঁরই অধিকার। এতে কাউকে শরিক করবে না—কোনো ইজম বা মতবাদ, কোনো নেতা বা দল, রাষ্ট্র বা সম্প্রদায়কেই নয়। মোটকথা, তাওহিদকে পূর্ণরূপে ধারণ করা ও শিরক থেকে পুরাপুরি বেঁচে থাকা ঈমানের সবচেয়ে বড় রোকন। আল্লাহ তায়ালার কাছে মুশরিকের ঈমান ঈমানই নয়। মুশরিককে তিনি কখনো মাফ করেন না।

মুশরিকের বিষয়ে আল্লাহ তায়ালার অভিযোগ তো এটাই যে, সে ঈমানের সাথে শিরক সংমিশ্রণ করে। ইরশাদ হচ্ছে,

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ۞ أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۞ قُلْ هٰذِهٖ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّٰهِ عَلٰى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۞

"তাদের অধিকাংশ আল্লাহতে বিশ্বাস করে না, তবে তারা মুশরিক। তবে কি তারা আল্লাহর সর্বগ্রাসী শাস্তি থেকে বা তাদের অজ্ঞাতসারে কিয়ামতের আকস্মিক উপস্থিতি থেকে নিরাপদ? বলুন! এটাই আমার পথ : আল্লাহর প্রতি মানুষকে আমি আহবান করি সজ্ঞানে—আমি ও আমার অনুসারীগণ। আল্লাহ মহিমান্বিত। যারা আল্লাহর শরিক করে আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নই।"

[সূরা ইউসুফ : ১০৬-১০৮]

আল্লাহ তায়ালার দাবি সব সময় এটাই ছিল এবং কিয়ামত পর্যন্ত এটাই থাকবে অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার প্রতি ঈমান যেন খাঁটি তাওহিদের সাথে হয় এবং সব ধরনের শিরকের মিশ্রণ থেকে পবিত্র হয়। যেমন– বিভিন্ন আয়াতে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন :

قُلْ إِنِّيْ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّيْنَ ❁

وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُوْنَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِيْنَ ❁

"বলুন, আমি আদিষ্ট হয়েছি আল্লাহর আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে তাঁর ইবাদত করার এবং আদিষ্ট হয়েছি আমি যেন আত্মসমর্পণকারীদের অগ্রণী হই।"

[সূরা যুমার : ১১-১২]

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে,

أَمِ اتَّخَذُوْا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُوْنَ ❁ لَوْ كَانَ فِيْهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ❁ لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُوْنَ ❁ أَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهِ آلِهَةً قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ هٰذَا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِيْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُوْنَ ❁ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُوْلٍ إِلَّا نُوْحِيْ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُوْنِ ❁

"তারা মৃত্তিকা হতে তৈরি যেসব দেবতা গ্রহণ করেছে, সেগুলো কি মৃতকে জীবিত করতে সক্ষম? যদি আল্লাহ ছাড়া বহু ইলাহ থাকত আকাশম-লী ও পৃথিবীতে, তবে উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেত। অতএব তারা যা বলে, তা থেকে আরশের অধিপতি আল্লাহ পবিত্র, মহান। তিনি যা করেন সে বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা যাবে না বরং তাদেরকেই প্রশ্ন করা হবে। তারা কি তাঁকে ছাড়া বহু ইলাহ গ্রহণ করেছে? বলুন, তোমরা তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত করো। এটাই আমার সাথে যারা আছে, তাদের জন্য উপদেশ এবং এটাই উপদেশ ছিল আমার পূর্ববর্তীদের জন্য। কিন্তু তাদের অধিকাংশই প্রকৃত সত্য জানে না। ফলে তারা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। আমি তোমার পূর্বে এমন কোনো রাসূল প্রেরণ করি নি তার প্রতি এ ওহী ছাড়া যে, আমি ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ্ নেই। সুতরাং আমারই ইবাদত কর।" [সূরা আল আম্বিয়া : ২১-২৫]

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে,

وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ ۞ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ۞ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَٰئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ۞

"যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল, তারা তো বিভক্ত হল তাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পর। তারা তো আদিষ্ট হয়েছিল আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদত করতে এবং নামায কায়েম করতে ও যাকাত দিতে—এটাই সঠিক দীন। কিতাবিদের মধ্যে যারা কুফরি করে তারা এবং মুশরিকরা জাহান্নামের আগুনে স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে। তারাই সৃষ্টির অধম।" [সূরা বায়্যিনাহ : ৪-৬]

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে,

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ۞ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ۞ [التوبة : ٣٢-٣٣]

"তারা আল্লাহ ছাড়া তাদের পি-তগণকে ও সংসার-বিরাগীগণকে তাদের প্রভুরূপে গ্রহণ করেছে এবং মারইয়াম-তনয় মসীহকেও। কিন্তু তারা এক ইলাহের ইবাদত করার জন্যই আদিষ্ট হয়েছিল। তিনি ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ নেই। তারা যাকে শরিক করে তা হতে তিনি কত পবিত্র! তারা তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহর জ্যোতি নিভিয়ে দিতে চায়। কাফিরগণ অপ্রীতিকর মনে করলেও আল্লাহ তাঁর জ্যোতির পূর্ণ উদ্ভাসন ছাড়া অন্য কিছু চান না। মুশরিকরা অপ্রীতিকর মনে করলেও অন্য সকল দীনের উপর জয়যুক্ত করার জন্য তিনিই পথনির্দেশ ও সত্য দীনসহ তাঁর রাসূল পাঠিয়েছেন।"

[সূরা তওবা : ৩১-৩৩]

আল্লাহ তায়ালার সাথে কাউকে শরিক করা হারাম। এর দ্বারা ঈমান নষ্ট হয়ে যায় এবং মানুষ কাফির ও মুশরিক হয়ে যায়। তা সে পাথর বা মূর্তিকে শরিক করুক বা জিন ও শয়তানকে করুক অথবা ফিরিশতাদেরকে করুক বা কোনো নবী ও রাসূলকে শরিক করুক, যাঁদেরকে আল্লাহ তায়ালা পাঠিয়েছেন তাওহিদ গ্রহণ ও শিরক বর্জনের পয়গাম দিয়ে। বা এমন কোনো আলেম ও

বুযুর্গকে শরিক করুক, যিনি আজীবন মানুষকে তাওহিদের দাওয়াত দিয়েছেন কিংবা এমন কোনো নেতা ও গুরুকে শরিক করুক, যে কথা ও কাজের দ্বারা মানুষকে তাওহিদ থেকে নিবৃত্ত রেখেছে। সর্বাবস্থায় শিরক শিরকই বটে আর এতে লিপ্ত ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার দুশমন; খোদাদ্রোহী কাফির ও মুশরিক।

কুরআন মাজিদে সর্বপ্রকার শিরক প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে এবং সর্বশ্রেণির মুশরিককে জাহান্নামের হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে,

أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِيْ آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِيْنٌ ۞

وَأَنِ اعْبُدُوْنِيْ هٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيْمٌ ۞

"হে বনী আদম! আমি কি তোমাদের নির্দেশ দিইনি যে, তোমরা শয়তানের দাসত্ব করবে না। সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু? আর আমারই ইবাদত করো! এটাই সরল পথ।" [সূরা ইয়াসীন : ৬০-৬১]

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে,

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِيْ شَكٍّ مِنْ دِيْنِيْ فَلَا أَعْبُدُ الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ وَلٰكِنْ أَعْبُدُ اللهَ الَّذِيْ يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۞ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۞ وَلَا تَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِيْنَ ۞ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيْبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ۞

"বলুন, হে মানুষ! তোমরা যদি আমার দীনের প্রতি সংশয়যুক্ত হও, তবে জেনে রাখো! তোমরা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া যাদের ইবাদত কর আমি তাদের ইবাদত করি না। উপরন্তু আমি ইবাদত করি আল্লাহ তায়ালার, যিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটান আর আমি মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য আদিষ্ট হয়েছি। [আমি আরো আদিষ্ট হয়েছি,] তুমি একনিষ্ঠভাবে দীনে প্রতিষ্ঠিত হও এবং কখনো মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ডাকবে না, যা তোমার উপকারও করে না, অপকারও করে না। কারণ, তা করলে তখন তুমি অবশ্যই যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবে। এবং আল্লাহ তোমাকে ক্লেশ দিলে তিনি ছাড়া তা মোচনকারী আর কেউ নেই এবং আল্লাহ যদি তোমার মঙ্গল চান, তবে তাঁর অনুগ্রহ রদ করবার কেউ নেই। তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তিনি মঙ্গল দান করেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"
[সূরা ইউনুস : ১০৪-১০৭]

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে,

إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ
وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدِ افْتَرٰى إِثْمًا عَظِيْمًا ۞

"নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে শরিক করা ক্ষমা করেন না। তা ছাড়া অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছে ক্ষমা করেন এবং যে কেউ আল্লাহর শরিক করে সে এক মহাপাপ করে।" [সূরা নিসা-৪৮]

স্মরণে রাখুন! তাওহিদই হল ওই বিষয়, যার দাওয়াত নিয়ে সকল নবী-রাসূলকে আল্লাহ তায়ালা পাঠিয়েছেন। সর্বশেষ নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা ﷺ-কেও এ তাওহিদ প্রতিষ্ঠার জন্যই পাঠিয়েছেন। তাঁর উম্মতেরও এটাই দায়িত্ব। হযরত রিবয়ি ইবনে আমের রাযি. প্রমুখ সাহাবির ভাষায়—

اَللهُ اِبْتَعَثَنَا لِنُخْرِجَ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلٰى عِبَادَةِ اللهِ وَمِنْ ضَيْقِ الدُّنْيَا
إِلٰى سِعَتِهَا، وَمِنْ جُوْرِ الْأَدْيَانِ إِلٰى عَدْلِ الْإِسْلَامِ.

'আল্লাহ তায়ালা আমাদের প্রেরণ করেছেন আল্লাহর বান্দাদেরকে বান্দার গোলামি থেকে মুক্ত করে আল্লাহ তায়ালার ইবাদতে দাখিল করতে। দুনিয়ার সঙ্কীর্ণতা থেকে বের করে তার প্রশস্ততার দিকে নিয়ে যেতে এবং সকল ধর্মের জুলুম থেকে মুক্ত করে ইসলামের ইনসাফের ছায়াতলে নিয়ে আসতে।'

### ১৪. মুমিনের বন্ধুত্ব-শত্রুতা হবে ঈমানের ভিত্তিতে

ঈমানের দাবি হল—বন্ধুত্ব, শত্রুতা বা সম্পর্কোচ্ছেদ ঈমানের ভিত্তিতেই হবে। কিন্তু ঈমানের নেয়ামত ও ইসলামের আলো থেকে বঞ্চিতদের কাছে বর্ণ, বংশ, ভাষা, ভূখণ্ড, সংস্কৃতি, মতবাদ, রাজনৈতিক দল ও দর্শন ইত্যাদি বিভিন্ন মানদণ্ডের ভিত্তিতে জাতীয়তা স্বীকৃত হয়। আর এ জাতীয়তাই তাদের কাছে বন্ধুত্ব, শত্রুতা, সম্পর্কোচ্ছেদ ও পারস্পরিক সাহায্য-সহায়তার মানদণ্ড হয়ে থাকে। ইসলামের দৃষ্টিতে এটা সরাসরি মূর্খতা। ইসলামের দৃষ্টিতে বর্ণ, বংশ, ভাষা ও ভূখণ্ড নির্বিশেষে সকল মুমিন একই জাতি। পক্ষান্তরে অন্যান্য অমুসলিম বিভিন্ন জাতি হলেও ইসলামের বিপরীতে তারা অভিন্ন জাতি। اَلْكُفْرُ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ অর্থাৎ 'সকল কুফর এক জাতি'। এটা যেমন শরিয়তের দলিল দ্বারা প্রমাণিত, তেমনি তা বাস্তব সত্যও বটে।

ইসলামের শিক্ষায় বন্ধুত্ব ও সম্পর্কোচ্ছেদের মানদণ্ড ঈমান। আর পরস্পর সহযোগিতার মানদণ্ড ভালো কাজ ও আল্লাহভীরুতা।

আমি যদি মুমিন হই, তা হলে আল্লাহ তায়ালার সব মুমিন বান্দার সাথে আমার বন্ধুত্ব ও ভালবাসা হবে। সে যে বর্ণের, যে ভাষার, যে বংশের বা যে দেশেরই হোক না কেন। তার রাজনৈতিক পরিচয়ও যা-ই হোক না কেন। তার সাথে আমার ঈমানি বন্ধুত্ব সর্বাবস্থায় অটুট থাকবে।

মুমিনের সাথে আমার এ বন্ধুত্ব ঈমানের কারণে ও আল্লাহ তায়ালার জন্য; সাম্প্রদায়িক চেতনা থেকে নয়। কাজেই আল্লাহ তায়ালার অবাধ্যতার ক্ষেত্রে তার সঙ্গ-সমর্থন দেব না; তার সাহায্য করব না। সে কোনো অমুসলিমের উপর জুলুম করলেও আমি তার সহযোগিতা করব না বরং সাধ্যমতো তাকে জুলুম থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করব।

আর যে অমুসলিম (দীন ও পরকাল অস্বীকারকারী কিংবা ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্মাবলম্বী কোনো কাফির, মুশরিক, মুনাফিক) তার সাথে আমার আল্লাহ তায়ালার জন্যই বিদ্বেষ হবে। কেননা সে আমার, তার ও বিশ্বজগতের পালনকর্তা আল্লাহ তায়ালার বিদ্রোহী। আর যেহেতু এ শত্রুতা কেবল আল্লাহ তায়ালার জন্য, কোনো সাম্প্রদায়িক চেতনা থেকে নয়, তাই আমি তার সাথে কখনো বেইনসাফী করব না বরং যদি দেখি—সে নির্যাতিত হচ্ছে আর তাকে জুলুম-নির্যাতন থেকে মুক্ত করার সামর্থ্য আমার আছে, তা হলে জুলুম থেকে মুক্ত করতেও আমি পিছপা হব না।

দুজন লোকের মাঝে হয়তো ভাষা, ভূখণ্ড, বর্ণ, গোত্র, আত্মীয়তা কিংবা রাজনৈতিক পরিচয় ইত্যাদিতে অভিন্নতা আছে, কিন্তু এদের একজন মুসলিম অন্যজন অমুসলিম, তবে এসব অভিন্নতা সত্ত্বেও মুসলিমের উপর অমুসলিমের যেসব অধিকার সাব্যস্ত হয়, তা তো ওই মুসলিম নিশ্চয় আদায় করবেন কিন্তু এদের মাঝে বন্ধুত্বের সম্পর্ক হতে পারে না; মুসলিম তাকে আল্লাহ তায়ালার জন্য দুশমনই মনে করবে, যাবৎ না সে ঈমান আনে ও ইসলাম গ্রহণ করে।

কুরআন মাজিদে ইরশাদ হয়েছে,

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيْ إِبْرَاهِيْمَ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ إِذْ قَالُوْا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتّٰى تُؤْمِنُوْا بِاللهِ وَحْدَهٗ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيْمَ لِأَبِيْهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ۞

"তোমার জন্য ইবরাহিম ও তার অনুসারীদের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ। যখন তারা তাদের জাতিকে বলেছিল, তোমাদের সঙ্গে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার ইবাদত কর, তার সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই।

আমরা তোমাদেরকে মানি না। তোমাদের এবং আমাদের মধ্যে সৃষ্টি হল শত্রুতা ও বিদ্বেষ চিরকালের জন্য; যদি না তোমরা এক আল্লাহতে ঈমান আনয়ন কর।" [সূরা মুম্‌তাহিনা-৪]

আল্লাহ তায়ালার হুকুম করেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ ❖

"হে মুমিনগণ! তোমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের মধ্যে কেউ কেউ তোমাদের শত্রু। তাই তাদের সম্পর্কে তোমরা সতর্ক থেকো।" [সূরা তাগাবুন-১৪]

এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনের শিক্ষা অতি স্পষ্ট। কুরআন মাজিদ আমাদের মনোযোগের সাথে পাঠ করা উচিত। হযরত ইবরাহিম আ. তার মুশরিক পিতা আযরের সাথে কী আচরণ করেছিলেন? হযরত নূহ আ.-এর কাফির পুত্র সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা কী বলেছেন? হযরত লূত আ.-এর স্ত্রী সম্পর্কে কী বলেছেন? পক্ষান্তরে ফিরাউনের মুমিন স্ত্রী সম্পর্কে কী বলেছেন? প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ তাঁর চাচা আবু তালিবকে কী বলেছেন—যিনি তাঁকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছিলেন, কিন্তু কুফর ও শিরক থেকে তওবা করে ইসলাম কবুল করেননি। কুরআন কারীম, সীরাতে নববী ও হায়াতুস সাহাবা বিষয়ক গ্রন্থাদিতে এ ধরনের ঘটনা আমাদের বারবার পাঠ করা উচিত। যাতে বিষয়টি আমাদের সামনে ভালভাবে স্পষ্ট হয়ে যায়।

**মোটকথা :** পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও শত্রুতার মাপকাঠি ইসলাম ধর্মের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি নীতি। ইসলামে বন্ধুত্বের মানদণ্ড হচ্ছে, ঈমান ও ইসলাম। আর শত্রুতার ভিত্তি শিরক ও কুফর। যে ব্যক্তি মুসলিম উম্মাহর অন্তর্ভুক্ত, সে শুধু ঈমান ও ইসলামের কারণে অন্য কোনো বৈশিষ্ট্য ছাড়াই বন্ধুত্বের যোগ্য। ইসলাম নির্দেশিত সকল বাস্তব মানবাধিকার তার প্রাপ্য (আজকালের অসার, অবাস্তব বা প্রতারণামূলক তথাকথিত মানবাধিকার নয়)। পক্ষান্তরে যে শিরক বা কোনো ধরনের কুফর-শিরক অবলম্বন করেছে, তার সাথে বন্ধুত্ব হারাম বরং এটা কুফরের পরিচয়।

আরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল—বন্ধুত্ব, শত্রুতা ও সম্পর্কচ্ছেদের এ নীতিতে অন্যদের কথা তো বলাই বাহুল্য; খোদ পিতা-মাতাও ব্যতিক্রম নন।

আল্লাহ তায়ালার ইরশাদ করেন,

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ، حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ❖ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا

وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ❖

"আমি তো মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি। মা সন্তানকে কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে গর্ভে ধারণ করে এবং তাকে দুই বছর দুধ পান করান। সুতরাং আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। প্রত্যাবর্তন তো আমারই নিকট। তোমার পিতা-মাতা যদি তোমাকে পীড়াপীড়ি করে আমার সমকক্ষ দাঁড় করাতে যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তুমি তাদের কথা মানবে না, তবে পৃথিবীতে তাদের সাথে বসবাস করবে সদভাবে ও যে বিশুদ্ধচিত্তে আমার অভিমুখী হয়েছে তার পথ অবলম্বন করো। এরপর তোমাদের প্রত্যাবর্তন আমারই কাছে এবং তোমরা যা করতে সে বিষয়ে আমি তোমাদেরকে অবহিত করব।" [সূরা লুকমান :১৪-১৫]

অন্যত্র আরো ইরশাদ হয়েছে,

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ❖ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ ❖

"আত্মীয় হলেও মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা নবী এবং মুমিনদের জন্য সঙ্গত নয়, যখন এটা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, নিশ্চিত তারা জাহান্নামি। ইবরাহিম তাঁর পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছিল তাকে এর ওয়াদা দিয়েছিল বলে। এরপর যখন তাঁর কাছে এটা সুস্পষ্ট হল যে, সে আল্লাহর শত্রু, তখন ইবরাহিম তার সঙ্গে সম্পর্কোচ্ছেদ করল। ইবরাহিম তো নরমদিল, সহনশীল।"
[সূরা তওবা : ১১৩-১১৪]

সূরা মুজাদালায় বন্ধুত্ব, শত্রুতা ও সম্পর্কচ্ছেদের উপরিউক্ত নীতিটা নেহাৎ সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে,

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ❖ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ❖ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ❖ لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ❖ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ، أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ ❖ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ، أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ، أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ

الْخَاسِرُوْنَ ۞ إِنَّ الَّذِيْنَ يُحَادُّوْنَ اللهَ وَرَسُوْلَهٗ أُولٰئِكَ فِي الْأَذَلِّيْنَ ۞ كَتَبَ اللهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِيْ إِنَّ اللهَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ ۞ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّوْنَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَوْ كَانُوْا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيْرَتَهُمْ أُولٰئِكَ كَتَبَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْإِيْمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوْحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ، أُولٰئِكَ حِزْبُ اللهِ، أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۞

"তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য কর নি, যারা আল্লাহ যে জাতির প্রতি রুষ্ট, তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে? তারা তোমাদের দলভুক্তও নয়; তাদের দলভুক্তও নয়। আর তারা জেনে শুনে মিথ্যা শপথ করে। আল্লাহ তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন কঠিন শাস্তি। তারা যা করে, তা কত মন্দ! তারা তাদের শপথগুলো ঢালস্বরূপ ব্যবহার করে আর তারা আল্লাহর পথ হতে নিবৃত্ত করে। কাজেই তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাকর শাস্তি। আল্লাহর শাস্তির বিপরীতে তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তাদের কোনো কাজে আসবে না। তারাই জাহান্নামের অধিবাসী। সেখানে তারা স্থায়ী হবে।

যে-দিন আল্লাহ পুনরুত্থিত করবেন তাদের সকলকে, তখন তারা আল্লাহর নিকট তেমনি শপথ করবে, যেরূপ শপথ তোমাদের কাছে করে আর তারা মনে করে যে, এতে তারা ভালো কিছুর উপর রয়েছে। সাবধান! তারাই তো প্রকৃত মিথ্যাবাদী। শয়তান তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। ফলে তাদের ভুলিয়ে দিয়েছে আল্লাহর স্মরণ। তারা শয়তানেরই দল। সাবধান! শয়তানের দল অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত। যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা হবে চরম লাঞ্ছিতদের অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহ সিদ্ধান্ত করেছেন, আমি নিশ্চয় বিজয়ী হবো; আমার রাসূলগণও। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশক্তিমান, পরাক্রমশালী। তুমি পাবে না আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী এমন কোনো সম্প্রদায়, যারা ভালবাসে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচারীদেরকে—হোক সে বিরুদ্ধাচারীরা তাদের পিতা, পুত্র, ভাই অথবা তাদের জ্ঞাতি-গোত্র; তাদের অন্তরে আল্লাহ সুদৃঢ় করেছেন ঈমান আর তাদের শক্তিশালী করেছেন তাঁর পক্ষ থেকে রূহ দ্বারা। তিনি তাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে; যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট আর তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। তারাই আল্লাহ দল। শোনো! আল্লাহর দলই সফলকাম হবে।"

[সূরা মুজাদালা : ১৪-২২]

অন্যত্র আরো ইরশাদ হয়েছে,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ۞ هَا أَنْتُمْ أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۞ إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ۞

"হে মুমিনগণ! তোমাদের আপনজন ছাড়া অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা তোমাদের ক্ষতি করতে ত্রুটি করবে না; তারা তা-ই কামনা করে, যা তোমাদেরকে বিপন্ন করে। তাদের মুখে বিদ্বেষ প্রকাশ পায় এবং তাদের হৃদয় যা গোপন রাখে তা আরো গুরুত্বর। তোমাদের জন্য নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বিবৃত করেছি, যদি তোমরা অনুধাবন কর।

শোনো! তোমরাই তাদেরকে ভালবাস কিন্তু তারা তোমাদেরকে ভালবাসে না অথচ তোমরা সব কিতাবে ঈমান রাখা আর তারা যখন তোমাদের সংশ্রবে আসে তখন বলে, আমরা বিশ্বাস করি; কিন্তু তারা যখন একান্তে মিলিত হয় তখন তোমাদের প্রতি আক্রোশে তারা নিজেদের আঙুলির অগ্রভাগ দাঁতে কেটে থাকে। বলুন, তোমাদের আক্রোশেই তোমরা মরো। অন্তরে যা রয়েছে সে সম্বন্ধে আল্লাহ সম্যক অবগত।

তোমাদের মঙ্গল হলে তা তাদেরকে কষ্ট দেয়। আর তোমাদের অমঙ্গল হলে তারা তাতে আনন্দিত হয়। তোমরা যদি ধৈর্যশীল হও এবং মুত্তাকি হও, তবে তাদের ষড়যন্ত্র তোমাদের কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না। তারা যা করে নিশ্চয় আল্লাহ তা পরিবেষ্টন করে আছেন।" [সূরা আলে ইমরান : ১১৮-১২০]

এখানে কিছু অবুঝ মুসলমানের ভুল ধারণারও সংশোধন করা হয়েছে, যারা সামাজিক সৌজন্যের নামে ধর্মীয় ক্ষেত্রে চরম শিথিলতার শিকার হয় এবং বলে, 'তারা অমুসলিম হলেও তো আমাদের ভাই/বন্ধু!' নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক। নিঃসন্দেহে এটা চরম নির্বুদ্ধিতা। কেউ যদি বুঝে শুনে একথা বলে, তা হলে এটাই তার 'মুনাফিক' হওয়ার স্পষ্ট নিদর্শন। আমাদের তরফ থেকে কী নির্বুদ্ধিতা হয় যে, আমরা এদের প্রতি প্রীতি-ভালবাসা পোষণ করি অথচ তারা তাদের ভ্রান্ত ধর্ম/ মতবাদে নেহাৎ কট্টর। আমাদের প্রতি তাদের

ভালবাসা তো দূরের কথা, আমাদেরকে তারা হীনতম শত্রু মনে করে এবং আমাদেরকে যন্ত্রণা দেওয়ার ক্ষেত্রে, দেশে দেশে আমাদের ভাই-বোনদের ব্যাপক হত্যা-নির্যাতনের ক্ষেত্রে কোনো অপচেষ্টা বাদ রাখে না।

এ বিষয়ে আরো জানতে সূরা বাকারা-২৫৭; সূরা আলে ইমরান-২৮; সূরা নিসা-১৩৯ ; সূরা মায়িদা-৫১, ৫৭ ও ৮১; সূরা আন্‌ফাল-৭২ ও ৭৩; সূরা তওবা-২৩, ২৪, ৬৭ ও ৭১ এবং সূরা জাছিয়া-১৯ আয়াতগুলো মনোযোগের সাথে পাঠ করুন!

**সহযোগিতা করা না করার মানদণ্ড**

ইসলামি আদর্শে সহযোগিতা করা বা নাকরার যে মানদণ্ড উপরে বলা হয়েছে তার সাথে সংশ্লিষ্ট কুরআন মাজিদের কয়েকটি আয়াত দেখুন :

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ❖

"তোমাদেরকে মসজিদুল হারামে প্রবেশে বাধা দেওয়ার কারণে কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেন কখনো সীমালঙ্ঘনে প্ররোচিত না করে। সৎকর্ম ও তাকওয়ার কাজে তোমরা পরস্পর সাহায্য করো এবং পাপ ও সীমালঙ্ঘনে একে অন্যের সাহায্য করো না। আল্লাহকে ভয় করো! নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তিদানে কঠোর।" [সূরা মায়িদাহ-২]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ❖

"হে মুমিনগণ! আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্যদানে তোমরা অটল থাকো। কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেন কখনো সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে, সুবিচার করবে; এটা তাকওয়ার নিকটতর আর আল্লাহকে ভয় করবে, তোমরা যা কর নিশ্চয় আল্লাহ তার সম্যক খবর রাখেন।"
[সূরা মায়িদাহ-৮]

হাদিস শরিফে বর্ণিত আছে,

لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا إِلَى عَصَبِيَّةٍ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ قَاتَلَ عَلَى عَصَبِيَّةٍ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ مَاتَ عَلَى عَصَبِيَّةٍ

অর্থাৎ যে আসাবিয়্যার দিকে ডাকে সে আমাদের দলভুক্ত নয় এবং সে-ও আমাদের দলভুক্ত নয় যে আসাবিয়্যার ভিত্তিতে লড়াই করে। আর সে-ও না যে আসাবিয়্যার উপর মৃত্যুবরণ করে। [আবু দাউদ, হাদিস নং ৫১২১]

আরেক হাদিসে আছে : يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا الْعَصَبِيَّةُ؟ قَالَ : أَنْ تَعِيْنَ قَوْمَكَ عَلَى الظُّلْمِ অর্থাৎ ইয়া রাসূলাল্লাহ! সাম্প্রদায়িকতা কী? ইরশাদ করলেন, আপন গোত্রের জুলুমে সহযোগী হওয়া। [আবু দাউদ, হাদিস নং ৫১১৯]

এ হাদিসে আসাবিয়্যাহ (সাম্প্রদায়িকতা)-এর অর্থও সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি, দল, মতবাদ বা সম্প্রদায়কে শুধু এজন্যই সহযোগিতা করা যে, সে আমাদের লোক। সে ন্যায়ের উপর থাকুক কি অন্যায়ের ওপর! সঠিক হোক বা ভুল। অথচ ইসলামে সহযোগিতার ভিত্তি নেক আমল ও খোদাভীরুতা। কাউকে গুনাহ ও জুলুমে কারো সহযোগিতা করা হারাম। সে যতই নিকটবর্তী হোক না কেন বরং জালেমকে জুলুম থেকে নিবৃত্ত রাখাই হচ্ছে তার সহযোগিতা। হাদিস শরিফে রাসূলুল্লাহ ﷺ তা-ই বলেছেন–

انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا . أَوْ مَظْلُوْمًا فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُوْمًا أَفَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ ظَالِمًا كَيْفَ أَنْصُرُهُ قَالَ تَحْجُزُهُ . أَوْ تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ فَإِنَّ ذٰلِكَ نَصْرُهُ

"তুমি তোমার ভাইকে সাহায্য করো সে জালেম হোক বা মাজলুম। এক সাহাবি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! মাজলুমকে সাহায্যের বিষয়টি তো বুঝলাম, কিন্তু জালেমকে কিভাবে সাহায্য করব? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাকে জুলুম থেকে বিরত রাখবে। এটাই তাকে সাহায্য করা।"

[মুসলিম শরিফ, হাদিস নং ৬৭৪৭; বুখারি শরিফ, হাদিস নং ৬৯৫২]

### ১৫. ঈমান অতি সংবেদনশীল : মুমিন বিজাতির মধ্যে লীন হতে পারে না

ইসলাম পূর্ণাঙ্গ একটি দীন। ঈমানের বিষয়টি অতি সংবেদনশীল। ইসলাম এটা বরদাশত করে না যে, মুসলিম উম্মাহ অন্য কোনো জাতির মাঝে বিলীন হয়ে যাবে কিংবা অন্যদের সাথে মিশে একাকার হয়ে যাবে। ইসলাম তার অনুসারীদের যে পূর্ণাঙ্গ শরিয়ত দান করেছে, তাতে এমন অনেক বিধি-বিধান আছে, যার তাৎপর্যই হচ্ছে মুসলিমের আলাদা পরিচয় প্রতিষ্ঠিত হওয়া এবং অন্যদের থেকে স্বাতন্ত্র হওয়া। যেমনটা সে স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্রের অধিকারী চিন্তা-বিশ্বাস, ইবাদত-বন্দেগি, ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনের বিধি-বিধান ইত্যাদি ক্ষেত্রে। বেশভূষা, আনন্দ-বেদনা, পর্ব-উৎসব, সংস্কৃতি ও জীবনাচার বিষয়ে শরিয়তের আলাদা অধ্যায় ও আলাদা বিধি-বিধান আছে, যার দ্বারা জাতি হিসেবে মুসলমানদের স্বাতন্ত্র-স্বকীয়তা সৃষ্টি হয়। বাস্তব জীবনে এসব বিধানের অনুসরণ প্রত্যেক মুমিনের জন্য জরুরি। আর এগুলোকে সত্য বলে মানা এবং অন্তর থেকে পছন্দ করা তো ঈমানের অংশ।

তন্মধ্যে অমুসলিমের সাথে সম্পর্কের ধরণ বিষয়ক যেসব বিধান রয়েছে, তা সবিশেষ মনোযোগের দাবিদার। তন্মধ্যে একটি হুকুম হল, অমুসলিমদের পর্ব-উৎসব থেকে দূরে থাকা এবং তাদের ধর্মীয় নিদর্শনের প্রতি কোনোরূপ সম্মান প্রদর্শন থেকে পরিপূর্ণভাবে বেঁচে থাকা। বাকি বন্ধুত্ব ও সম্পর্কোচ্ছেদের মৌলিক বিধান তো উপরে বলা হয়েছে। এখানে সে সংক্রান্ত শুধু দুটি বিধান উল্লেখ করব– (১) জানাযার নামায। (২) গুনাহের ক্ষমা প্রার্থনা করা।

এ দুটি বিষয়ে ইসলামের শিক্ষা হল, কোনো অমুসলিমের জানাযার নামায পড়া যাবে না এবং কোনো অমুসলিমের জন্য গুনাহ মাফের দুয়া করা যাবে না। সে অমুসলিম পিতা হোক বা ভাই, উস্তাদ হোক বা মুরব্বি, নেতা হোক বা লিডার। সীরাতে নববীর দিকে তাকান! রাসূলুল্লাহ ﷺ আপন চাচা আবু তালিবের জানাযার নামায পড়াননি অথচ তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কতইনা পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। সীরাত-তারিখ সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান রাখেন, এমন যে কারো তা জানা আছে। এত সহায়তা, পৃষ্ঠপোষকতা এবং নিকটাত্মীয়তা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ ﷺ তার জানাযা পড়েননি। তার জন্য গুনাহ মাফের দুয়াও করেননি। আল্লাহর বিধানই কার্যকর হয়েছে।

এ বিষয়ে নবী-রাসূল ও সাহাবিদের ঘটনাবলি প্রচুর। তজ্জন্য পৃথক গ্রন্থ রচনা প্রয়োজন। এখানে শুধু আলোচনা-সংশ্লিষ্ট দুটি আয়াত দেখুন!

وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِۦٓ ۖ إِنَّهُمْ كَفَرُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَمَاتُوا۟ وَهُمْ فَٰسِقُونَ ۞

"তাদের মধ্যে কারো মৃত্যু হলে তুমি কখনো তার জানাযার নামায পড়বে না এবং তার কবরের পাশে দাঁড়াবে না; তারা তো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অস্বীকার করেছিল এবং পাপাচারী অবস্থায় তাদের মৃত্যু হয়েছে।"

[সূরা তওবা-৮৪]

مَا كَانَ لِلنَّبِىِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَن يَسْتَغْفِرُوا۟ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوٓا۟ أُو۟لِى قُرْبَىٰ مِنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَٰبُ ٱلْجَحِيمِ ۞ وَمَا كَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَٰهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَآ إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُۥٓ أَنَّهُۥ عَدُوٌّ لِّلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ ۚ إِنَّ إِبْرَٰهِيمَ لَأَوَّٰهٌ حَلِيمٌ ۞

"আত্মীয় হলেও মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা নবী এবং মুমিনদের জন্য সঙ্গত নয়, যখন সুস্পষ্ট হয়ে গেছে, নিশ্চিত তারা জাহান্নামি। ইবরাহিম তাঁর পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছিল তাকে এর ওয়াদা দিয়েছিল বলে।

এরপর যখন তাঁর কাছে এটা স্পষ্ট হল যে, সে আল্লাহর শত্রু, তখন ইবরাহিম তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করল। ইবরাহিম তো কোমলহৃদয়, সহনশীল।" [সূরা তওবা : ১১৩-১১৪]

এখানে এ কথা উল্লেখ করে দেওয়া দরকার মনে করছি। তা হল, সাধারণ অবস্থায় অমুসলিম আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী ও অন্য যে কোনো বিধর্মীর সাথে সদাচরণ শরিয়তে বৈধ।

নিজের ঈমান-আকিদা আর ইসলামি স্বাতন্ত্র-স্বকীয়তা রক্ষা করে তাদের সাথে সদাচরণ শুধু বৈধই নয় বরং শরিয়ত নির্দেশিতও বটে। এমনকি নফল দান-সদকা দ্বারা তাদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করাও জায়েয।

এ ছাড়া কুরআন মাজিদের এ হুকুম তো সকলের জন্যই প্রযোজ্য।

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ۞ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ۞

"ভালো ও মন্দ সমান হতে পারে না। মন্দ প্রতিহত করুন উৎকৃষ্টের দ্বারা; ফলে আপনার সাথে যার শত্রুতা আছে সে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত হয়ে যাবে। এ গুণের অধিকারী করা হয় শুধু তাদেরকেই, যারা ধৈর্যশীল, এ গুণের অধিকারী করা হয় কেবল তাদেরকেই যারা মহাভাগ্যবান।" [সূরা হামীম সাজদা : ৩৪-৩৫]

অবশ্য আমাদের কিছু অবুঝ শ্রেণির মুসলমান ভাইয়ের কর্মপন্থা ভিন্ন। তাদেরকে নিজের এবং নিজের গুরুজন ও মুরব্বি সম্পর্কে অতি সংবেদনশীল দেখা যায়। তাদের ব্যাপারে কেউ সামান্য উচ্চ-বাচ্য করলে তার আর রক্ষা নেই। পক্ষান্তরে কোনো বেদীন-মুলহিদ ইসলাম ও ইসলামের সুমহান গ্রন্থ কুরআন মাজিদ, নবী মুহাম্মদ ﷺ ও ইসলাম নিদর্শন সম্পর্কে যত অশ্রাব্য গালি-গালাজ, ঠাট্টা-বিদ্রূপ করুক না কেন, এ নিয়ে তাদের কোনো মাথাব্যথা নেই। অথচ সামাজিক সৌজন্য তো আলাদা বিষয়। আর ক্ষমা-মার্জনা তো হতে পারে ব্যক্তিগত হক সম্পর্কে এবং তা উচিতও বটে। কিন্তু যেখানে দীন-ঈমানের প্রশ্ন এসে দাঁড়াবে, আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসূল এবং ইসলাম ও শিআরে ইসলামের প্রশ্ন এসে দাঁড়াবে, সেখানে তো প্রত্যেক মুসলমানকে শরিয়তের গণ্ডিতে থেকে সাধ্যানুযায়ী ঈমানি চেতনা ও মর্যাদাবোধের পরিচয় দেওয়া কর্তব্য।

অবশ্য এর পন্থা ও উপায় কী হবে এবং শ্রেণিভেদে কার উপর কী ধরনের দায়িত্ব বর্তাবে, তা বিজ্ঞ আলেম থেকে জেনে নেওয়া জরুরি।

## ১৬. ঈমান পরীক্ষার উপায়

মানুষের জন্য ঈমানের চেয়ে বড় কোনো নেয়ামত নেই। এ নেয়ামতের কারণে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করবে, আল্লাহ তায়ালার শোকর গোযারী করবে এবং এর সংস্কার ও সংরক্ষণের জন্য ইসলামি শিক্ষা অনুযায়ী মেহনত করবে। সকাল-সন্ধ্যায় মনে-প্রাণে দুয়া করবে–

رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا، وَبِالإِسْلاَمِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا

আমি রব হিসেবে আল্লাহ তায়ালার প্রতি সন্তুষ্ট, দীন হিসেবে ইসলামের প্রতি সন্তুষ্ট আর নবী হিসেবে মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রতি সন্তুষ্ট।

أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ؛
لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

এ সকালে (ও أَمْسَيْنَا এ সন্ধ্যায়) আমরা আল্লাহ তায়ালার, গোটা রাজত্ব আল্লাহ তায়ালার এবং সকল প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার। কোনো মাবূদ নেই আল্লাহ তায়ালা ছাড়া, তিনি এক, তার কোনো শরিক নেই। তাঁরই রাজত্ব এবং তাঁরই প্রশংসা। আর তিনি সর্বশক্তিমান।

অনুরূপ—

اللّٰهُمَّ مَا أَصْبَحَ بِي مِنْ نِعْمَةٍ أَوْ بِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ فَمِنْكَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ.
فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ.

ইয়া আল্লাহ, এ সকালে (এবং مَا أَمْسَى بِي এ সন্ধ্যায়) যা কিছু নেয়ামতের আমি অধিকারী হয়েছি বা তোমার কোনো সৃষ্টি অধিকারী হয়েছে, তা একমাত্র তোমারই পক্ষ হতে। তোমার কোনো শরিক নেই। সুতরাং তোমারই প্রশংসা এবং তোমারই জন্য শোকর-কৃতজ্ঞতা।

ঈমানের লালন ও বর্ধন এবং সংস্কার ও সুরক্ষার জন্য জ্ঞান-গবেষণা এবং কর্ম ও দাওয়াতের অঙ্গনে কী কী পদক্ষেপ ব্যক্তিগতভাবে ও সম্মিলিতভাবে নিতে হবে—এখানে তার আলোচনা উদ্দেশ্য নয়। এখন শুধু একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজের বিষয়ে নিবেদন করছি। সেটা হল—আমরা প্রত্যেকে যেন মাঝেমধ্যে নিজের ঈমান পরীক্ষা করি! (আল্লাহ না করুন) আমাদের ঈমান শুধু মৌখিক জমাখরচ নয় তো? আমাদের ঈমান শুধু নামমাত্র নয় তো, যা 'গ্রহণযোগ্য ঈমান'-এর মানদণ্ডে উত্তীর্ণই হয় না! আল্লাহ না করুন! বাস্তবেই অবস্থা এমন হলে এক্ষনি নিজের ইসলাহ ও সংশোধন আরম্ভ করা উচিত।

সহজতার জন্য কুরআন, হাদিস ও পূর্বসূরি বুযুর্গদের জীবনচরিতের আলোকে 'ঈমান পরীক্ষার কিছু উপায়' সংক্ষেপে উল্লেখ করে দিচ্ছে। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে ঈমান মজবুত করার তাওফিক দিন!

মনে রাখবেন! মৌলিকভাবে ঈমান যাচাইয়ের দুটি স্তর আছে–

(১) আমার ঈমান ঠিক আছে কি-না?

(২) সবলতা ও দুর্বলতার বিচারে আমার ঈমানের অবস্থান কোথায়?

এখানে শুধু প্রথম পর্যায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু কথা নিবেদন করছি। এর জন্য নিম্নোক্ত পাঁচটি উপায় ব্যবহার করা অধিক সহজ।

**ক. আমার মাঝে কোনো কুফরি আকিদা নেই তো?**

প্রথম কাজ হচ্ছে, আমাদেরকে ইসলামি আকাইদ সঠিকভাবে জানতে হবে এবং চিন্তা করতে হবে, আমার মধ্যে ওইসব আকিদার পরিপন্থি কোনো কিছু আছে কি-না? যদি থাকে তা হলে আমাকে তৎক্ষণাৎ তওবা করতে হবে এবং ইসলামি আকিদার পরিপন্থি বিষয়কে বাতিল ও কুফরি বিশ্বাস করে এর সাথে সম্পর্কোচ্ছেদ করতে হবে।

কুরআন মাজিদে মুশরিক, পরকালে অবিশ্বাসী, ইহুদি, খ্রিষ্টান, মুনাফিক, বস্তুবাদী, বেদীন, নাস্তিক চক্রসহ সকল ভ্রান্ত মতবাদের খণ্ডন উল্লেখ রয়েছে। চিন্তা-ভাবনার সাথে কুরআন তিলাওয়াত করে বা কোনো নির্ভরযোগ্য তরজমা ও সংক্ষিপ্ত তাফ্সিরের সাহায্যে কুরআন পাঠ করে এবং প্রয়োজনে কোনো আলেমের কাছে সবক পড়ে প্রত্যেক শ্রেণির কাফিরদের ভ্রান্ত আকিদা-বিশ্বাস সম্পর্কে জেনে নিজেদের আকিদা-বিশ্বাসের পরীক্ষা নিতে হবে, আমার মধ্যে এসবের কোনো কিছু নেই তো?

**খ. আমার মধ্যে নিফাক নেই তো?**

নিফাকের বিভিন্ন প্রকার আছে– **(এক)** বিশ্বাসগত নিফাক। এ প্রবন্ধে এ নিয়েই আলোচনা করা উদ্দেশ্য। বিশ্বাসগত নিফাকের অর্থ, অন্তরে কুফরি মতবাদ বা ইসলাম বিদ্বেষ লালন করেও কথা বা কাজে মুসলিম দাবি করা। বিশ্বাসগত নিফাক হল, কুফরির এক কঠিনতম প্রকার। এটা যার মধ্যে আছে, সে সরাসরি কাফির। তবে উপযুক্ত দলিল-প্রমাণ ছাড়া কারো প্রতি নিফাকের সন্দেহ করা বা কাউকে নিফাকের অভিযোগে অভিযুক্ত করা জায়েয নয়। হাঁ! যখন কারো কথা বা কাজের দ্বারা নিফাক প্রকাশিত হয়ে পড়ে, অন্তরে লালিত কুফরি আকিদা ও ইসলাম-বিদ্বেষ মুখেও চলে আসে, তখন তো তার সম্পর্কে মুসলমানদের সাবধান হতে হবে আর সরকারকেও এ লোক সম্পর্কে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে হবে।

বিশ্বাসগত নিফাকের রূপগুলো কী কী কুরআন মাজিদে তা ঘোষণা করা হয়েছে। সেগুলো জেনে নিজেকে যাচাই করা উচিত, আমার মধ্যে এসবের কোনো কিছু আছে কি-না? এখানে বিশ্বাসগত নিফাকের কয়েকটি রূপ :

ইসলামি শরিয়ত বা শরিয়তের কোনো বিধানকে অপছন্দ করা।

ইসলামের, ইসলামের নবীর, ইসলামের কিতাবের, ইসলামি নিদর্শনের কিংবা ইসলামের কোনো বিধানের বিদ্রূপ বা অবজ্ঞা করা।

ইসলামের কিছু বিশ্বাস ও বিধানকে মানা, আর কিছু না মানা।

শরিয়তের কোনো বিধানের উপর আপত্তি করা বা তাকে সংস্কারযোগ্য মনে করা।

ইসলামের কোনো অকাট্য ও দ্ব্যর্থহীন আকিদা/বিধানের অপব্যাখ্যা করা।

**গ. শিআরে ইসলামের বিষয়ে আমার অবস্থান কী?**

শিআরে ইসলামকে 'শিআর' বলার কারণ হল, তা ইসলামের নির্দশন। আর ইসলামের প্রধান নিদর্শন নিম্নরূপ :

(১) ইসলামের কালিমা।

(২) আল্লাহ তায়ালার ইবাদত (বিশেষত নামায, যাকাত, রোযা, হজ)।

(৩) আল্লাহ তায়ালার রাসূল।

(৪) আল্লাহ তায়ালার কিতাব।

(৫) আল্লাহ তায়ালার ঘর কাবা, অন্যান্য মসজিদ ও ইসলামের অন্যান্য পবিত্র স্থান—বিশেষত মসজিদে হারাম, মিনা, আরাফা, মুযদালিফা, মসজিদে আকসা ও মসজিদে নববি।

(৬) হজে কুরবানির জন্য নির্ধারিত ওই পশু, যাকে 'হাদি' বলে।

কুরআন মাজিদে (সূরা হজ : ৩২-৩০) আল্লাহ তায়ালা ইসলামের নিদর্শনাবলিকে 'শাআইরুল্লাহ' ও 'হুরুমাতুল্লাহ' বলেছেন এবং এ নিদর্শনগুলোর মর্যাদা রক্ষার আদেশ করেছেন। আরো ইরশাদ করেছেন, এগুলোর মর্যাদা রক্ষা প্রমাণ করে অন্তরে তাকওয়া আছে, আল্লাহ তায়ালার ভয় আছে।

নিজের ঈমান যাচাইয়ের এক গুরুত্বপূর্ণ উপায় হল, আমি আমার অন্তরে খুঁজে দেখব, নিজের কথা-কাজ পরখ করে দেখব—আমার মাঝে শায়াইরে ইসলামের ভক্তি-শ্রদ্ধা আছে কি-না? তদ্রূপ কেউ শায়াইরুল্লাহর অবমাননা করলে আমার কি কষ্ট হয়? না শায়াইরের অবমাননা করছে আর আমি একে তার ব্যক্তিগত বিষয় মনে করে নীরব ও নির্লিপ্ত থাকছি, আমার কষ্ট হচ্ছে না অথবা এ গর্হিত কাজ সম্পর্কে আমার মনে ঘৃণা জাগছে না, ওই বেয়াদবের

প্রতি আমার অন্তরে কোনো রাগ হয় না, তার সঙ্গে ও তার কুফরি কার্যকলাপ থেকে সম্পর্কোচ্ছেদের কোনো প্রেরণা জাগে না!?

আল্লাহ না করুন! শায়াইরে ইসলামের বিষয়ে এ যদি হয় আমার আচরণ-অনুভূতি, তা হলে তখনই নিশ্চিত বুঝতে হবে—এ অন্তর একদম ঈমানশূন্য। সাথে সাথে সাজ্‌দায় পড়ে যাওয়া এবং তওবা করে সর্বপ্রকার কুফর-নিফাক পরিত্যাগের ঘোষণা দিয়ে ঈমানের নবায়ন করা কর্তব্য।

**ঘ. আমার অন্তরে অন্যদের ধর্মপরিচয়ের প্রতি ভালবাসা নেই তো?**

ইসলাম ছাড়া অন্য সব ধর্ম এবং পরকাল-অস্বীকার সংক্রান্ত সকল ইজম সম্পূর্ণ বাতিল ও ভ্রান্ত। এদেরও 'শায়াইর' ও নিদর্শন আছে, মিথ্যা উপাস্য ও আদর্শ আছে, যেগুলোর কোনো সারবত্তা নেই। কিন্তু ইসলাম এসবের উপহাস ও কটূক্তিরও অনুমতি নিজ অনুসারীদের দেয় না। একে তো এজন্য যে, তা ভদ্রতা-শিষ্টতার পরিপন্থি। দ্বিতীয়ত এজন্যও যে, একে বাহানা বানিয়ে এরা ইসলামের সত্য নিদর্শনের অবমাননা করবে। সুতরাং কুরআন মাজিদে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন :

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۞

"আল্লাহকে ছেড়ে তারা যাদেরকে ডাকে, তোমরা তাদেরকে গালি দিও না। কেননা তারা সীমালঙ্ঘন করে অজ্ঞতাবশত আল্লাহকেও গালি দিবে। এভাবে আমি প্রত্যেক জাতির দৃষ্টিতে তাদের কার্যকলাপ সুশোভন করেছি। এরপর তাদের প্রতিপালকের কাছে তাদের প্রত্যাবর্তন হবে। অনন্তর তিনি তাদেরকে তাদের কৃতকার্য সম্বন্ধে অবহিত করবেন।" [সূরা আনয়াম-১০৮]

অন্যান্য কওমের রব, ইলাহ ও শিআরের উপহাস ও কটূক্তি থেকে বিরত থাকা ইসলামের শিক্ষা, যা স্বস্থানে ইসলামি আদর্শের এক অনুপম সৌন্দর্য। কিন্তু এর অর্থ কখনো এটা নয় যে, তাদের রব ও মাবুদের (যা নিঃসন্দেহে অসার ও অসত্য) এবং এদের শায়াইর ও নিদর্শনের (যা পুরোপুরি কল্পনা ও কুসংস্কার প্রসূত) সমর্থন ও সত্যায়ন করা হবে বা এগুলোর প্রশংসা-মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হবে কিংবা অন্তরে আবেগ-ভক্তি পোষণ করা হবে। কারণ, এ তো সরাসরি কুফর। যদি তা বৈধ ও অনুমোদিত হয়, তা হলে তো এরপর ঈমান ও ইসলামের কোনো প্রয়োজনই অবশিষ্ট থাকে না। আর না উপরিউক্ত বিশ্বাস ও কর্মের পরও ঈমানের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায়।

ভালোভাবে বোঝা উচিত, কোনো কিছুর কটূক্তি-অবজ্ঞা থেকে বিরত থাকার অর্থ এটা নয় যে, ওই বিষয়কে সম্মান করতে হবে বা সত্য মনে করতে হবে। তো কুফরের শায়াইরের সম্মান বা ভালবাসা হচ্ছে পরিষ্কার কুফর। আজকাল কিছু মানুষ দেখা যায়, যাদের দৃষ্টিতে নিজেদের তথা ইসলামি শায়াইরের তো বিশেষ মর্যাদা নেই, এগুলোর অবমাননাও তাদের মাঝে কোনো প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে না। অথচ এরাই একাত্মতা প্রকাশ করে অন্যদের শায়াইরের বিষয়ে। এরা অন্যদের ধর্মীয় উৎসবেও যোগদান করে এবং একে গৌরবের বিষয় মনে করে। একে তারা 'সৌজন্য' আখ্যা দেয় ও 'উদারতা'র পরিচয় বলে। তাদের জানা নেই, এটা সৌজন্য ও উদারতা নয়, এ হচ্ছে সত্য দীনের বিষয়ে শিথিলতা ও হীনম্মন্যতা; আপন জাতির সাথে বড় জঘণ্য ও চেতনা বিরোধী আচরণ। হায়! তারা যদি বুঝত যে, কুফর ও শায়াইরে কুফরের প্রতি আকর্ষণ, এসবের সাথে একাত্মতা প্রকাশ ও এসবের ভক্তি-উপাসনায় সন্তোষ বা আনন্দ প্রকাশও সরাসরি কুফর।

এ শ্রেণির মানুষের মনে রাখা উচিত কুরআন মাজিদে ইরশাদ হয়েছে,

إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ

"তা হলে তো তোমরাও তাদের মতো হবে।" [সূরা নিসা-১৪০]

এভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইরশাদ করেছেন,

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

'যে কোনো জাতির সাদৃশ্য গ্রহণ করবে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত।'
[আবু দাউদ শরিফ, হাদিস নং ৪০৩৩]

**মোটকথা :** নিজের ঈমানের শুদ্ধতা-অশুদ্ধতা যাচাইয়ের অন্যতম উপায় এ চিন্তা করা যে, অন্তরে বেদ গোষ্ঠী ও ইসলামের বিদ্রোহীদের নিদর্শনের সমর্থন এবং প্রীতি-আকর্ষণ নেই তো? যদি থাকে, তা হলে তওবা করে নিজেকে সংশোধন করবে। আল্লাহ তায়ালার কাছে শায়াইরুল্লাহর ভক্তি-ভালবাসা এবং সংরক্ষণ-সমর্থনের তাওফিক প্রার্থনা করবে। কুফরের শায়াইরের প্রতি ঘৃণা ও সেগুলোর অসারতার বিষয়ে প্রত্যয় ও প্রশান্তি প্রার্থনা করবে।

### ঙ. পছন্দ-অপছন্দের ক্ষেত্রে আমার নীতি উল্টো নয় তো?

জগতে পছন্দ-অপছন্দের অনেক মানদণ্ড আছে। মানুষের স্বভাব-প্রকৃতির মধ্যে সৃষ্টিগতভাবেই কিছু বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ রয়েছে আর কিছু বিষয়ে অনাগ্রহ ও বিমুখতা বরং ঘৃণা ও বিদ্বেষ। কিন্তু কেউ যখন ইসলাম কবুল করে

এবং ঈমানের সম্পদ লাভ করে, তখন তার হাতে পছন্দ-অপছন্দের প্রকৃত মানদণ্ড চলে আসে। সে মানদণ্ড হচ্ছে আল্লাহ তায়ালা, তাঁর রাসূল ও তাঁর প্রদত্ত শরিয়ত। সুতরাং যা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসূলের কাছে পছন্দনীয় এবং শরিয়তে কাম্য, তা মুমিনের কাছে অবশ্যই পছন্দনীয় হবে, যদিও অন্য কোনো বিচারে লোকেরা তা পছন্দ না করুক কিংবা খোদ তার কাছেই তা স্বভাবগতভাবে পছন্দের না হোক। আর যা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসূলের কাছে অপছন্দের এবং শরিয়তে নিষিদ্ধ, তা তার কাছে অবশ্যই অপছন্দনীয় হবে, যদিও অন্য কোনো বিচারে লোকেরা তা পছন্দনীয় মনে করে কিংবা স্বভাবগতভাবে তার নিজেরও ওই বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ থাকে। মুমিন সর্বদা নিজের পছন্দ-অপছন্দকে দীন-ঈমানের দাবির অধীন রাখে। নিজের স্বভাবগত আকর্ষণকে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির উপর কুরবান করে।

তাই ঈমান পরখের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায় হল—নিজের অন্তরকে পরখ করা। তাতে পছন্দ-অপছন্দের মানদণ্ড কী? আল্লাহ তায়ালা, তাঁর রাসূল ﷺ ও শরিয়তের পছন্দ-অপছন্দ না-কি নিজের প্রবৃত্তির চাহিদা, নিজ গোত্র, দল, দলনেতা, পার্থিব বিচারে মর্যাদাবান শ্রেণি, শুধু শক্তিমত্তায় প্রবল জাতিসমূহের সংস্কৃতি, সাধারণের মতামত, পার্থিব জীবনের চাকচিক্য বা এ ধরনের কিছু?

যদি তার কাছে পছন্দ-অপছন্দের মানদণ্ড প্রথম বিষয়টি হয়, তবে আল্লাহ তায়ালার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। আর যদি তার পছন্দ-অপছন্দের মানদণ্ড দ্বিতীয় বিষয়গুলো হয়, তা হলে সে খাঁটি মনে তওবা করে নিজের পছন্দকে আল্লাহ ও তাঁর বিধানের অধীন করবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং তাঁর উসওয়ায়ে হাসানার (শরীয়ত ও সুন্নতের) অনুগামী করবে এবং ঈমান নবায়ন করবে।

আল্লাহ তায়ালার পছন্দকে অপছন্দ করা বা আল্লাহ তায়ালার অপছন্দকে পছন্দ করা কিংবা আল্লাহর বিধান অপছন্দকারীদের আংশিক আনুগত্য করা ইত্যাদিকে কুরআন মাজিদে 'মুরতাদ হওয়ার কারণ' সাব্যস্ত করা হয়েছে। বলা হয়েছে, এগুলোর কারণে বান্দার সকল আমল নষ্ট হয়ে যায়। যেমন—

إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ ۞ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ۞ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ۞ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ۞

"যারা নিজের কাছে সৎপথ ব্যক্ত হওয়ার পর তা পরিত্যাগ করে, শয়তান তাদের কাজকে শোভন করে দেখায় এবং তাদেরকে মিথ্যা আশা দেয়। এটা এজন্য যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা যারা অপছন্দ করে তাদেরকে তারা বলে, আমরা কতক বিষয়ে তোমাদের আনুগত্য করব। আল্লাহ তাদের গোপন অভিসন্ধি অবগত আছেন। ফিরিশতারা যখন তাদের মুখমণ্ডলে এবং পৃষ্ঠদেশে আঘাত করতে করতে প্রাণ হরণ করবে, তখন তাদের দশা কেমন হবে! এটা এজন্য যে, তারা তা অনুসরণ করে, যা আল্লাহর অসন্তোষ জন্মায় এবং তার সন্তুষ্টিকে অপ্রিয় গণ্য করে। তিনি এদের কর্ম নিষ্ফল করে দেন।"
[সূরা মুহাম্মদ : ২৫-২৮]

সেইসাথে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে, আল্লাহ তায়ালার পছন্দ হল ঈমান আর অপছন্দ হল কুফর ও শিরক। আর আল্লাহ তায়ালার কাছে ঈমান ও ঈমান সংশ্লিষ্ট সবই পছন্দনীয়। পক্ষান্তরে কুফর, শিরক-কুফর ও শিরকের সাথে সংশ্লিষ্ট সবকিছু অপছন্দনীয়। ইরশাদ হচ্ছে,

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ❖

"মুশরিক নারীকে ঈমান না আনা পর্যন্ত তোমরা বিবাহ করো না। মুশরিক নারী তোমাদেরকে মুগ্ধ করলেও, নিশ্চয় মুমিন দাসী তাদের অপেক্ষা উত্তম। ঈমান না আনা পর্যন্ত মুশরিক পুরুষের সাথে তোমরা বিবাহ দিও না, মুশরিক পুরুষ তোমাদেরকে মুগ্ধ করলেও, মুমিন দাস তাদের অপেক্ষা উত্তম। তারা জাহান্নামের দিকে আহবান করে আর আল্লাহ তোমাদেরকে নিজ অনুগ্রহে নিজ জান্নাত ও ক্ষমার দিকে আহবান করেন। তিনি মানুষের জন্য নিজের বিধান সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন। যাতে তারা তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।"
[সূরা বাকারা-২২১]

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ ❖ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ❖ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ ❖

"আর মানুষের মধ্যে কিছু এমন ব্যক্তি আছে, পার্থিব জীবন সম্পর্কে যার কথাবার্তা তোমাকে চমৎকৃত করে এবং তার অন্তরে যা আছে, সে সম্বন্ধে সে আল্লাহকে সাক্ষী রাখে। বস্তুত সে ভীষণ কলহপ্রিয়। যখন সে প্রস্থান করে,

তখন সে পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টির এবং শস্যক্ষেত্র ও জীব-জন্তু ধ্বংসের চেষ্টা করে। আর আল্লাহ অশান্তি পছন্দ করেন না। যখন তাকে বলা হয়—তুমি আল্লাহকে ভয় কর, তখন তার আত্মাভিমান তাকে পাপে লিপ্ত করে। সুতরাং জাহান্নামই তার জন্য যথেষ্ট। নিশ্চয় তা নিকৃষ্ট বিশ্রামস্থল।"

(সূরা বাকারা : ২০৪-২০৬)

وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ ۖ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ ۞ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ۞

"তাদের মধ্যে কারো মৃত্যু হলে তুমি কখনো তার জন্য জানাযার নামায আদায় করবে না এবং তার কবরের পাশে দাঁড়াবে না। তারা তো আল্লাহ ও তার রাসূলকে অস্বীকার করেছিল ও পাপাচারী অবস্থায় তাদের মৃত্যু হয়েছে। আর তাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাকে যেন বিমুগ্ধ না করে। আল্লাহ তো এর দ্বারাই পার্থিব জীবনে শাস্তি দিতে চান; তারা কাফির থাকা অবস্থায় তাদের আত্মা দেহ ত্যাগ করবে।" [সূরা তওবা : ৮৪-৮৫]

**চ. নিজের ইচ্ছা বা পছন্দের কারণে ঈমান ছাড়ছি না তো?**

নিজের ইচ্ছা ও চাহিদা, স্বভাব ও রুচি-অভিরুচি, আত্মীয়তা ও সম্পর্কের আকর্ষণ ইত্যাদির সাথে যে পর্যন্ত ঈমানের দাবিসমূহের সংঘর্ষ না হয়, ওই পর্যন্ত ঈমানের পরীক্ষা হয় না। ওইসব বিষয়ের দাবি আর ঈমান-আকিদার দাবির মধ্যে একটিকে গ্রহণ করার পরিস্থিতি তৈরি হলেই ঈমানের পরখ হয়ে যায়। সে মুহূর্তটাই হচ্ছে মুমিনের ঈমানি পরীক্ষার মুহূর্ত। আল্লাহ তায়ালা বান্দার ঈমান পরীক্ষার জন্য, মুমিন ও মুনাফিকের মাঝে পার্থক্য করার জন্য এমন সব পরিস্থিতি সৃষ্টি করেন এবং দেখেন পরীক্ষায় কে সত্য প্রমাণিত হয় আর কে মিথ্যা? কার ঈমান খাঁটি সাব্যস্ত হয় আর কার ঈমান নামমাত্র?

মুমিনের কর্তব্য হল, এ পরীক্ষার মুহূর্তে পূর্ণ সতর্ক থাকা। এসব ক্ষেত্রে দুটোকে গ্রহণের সুযোগ নেই বিধায় অবশ্যই তাকে কোনো একটিকে প্রাধান্য দিতে হবে। এ প্রাধান্য দানের ক্ষেত্রে তাকে ঈমানের প্রমাণ দিতে হবে। যদি সে আল্লাহ তায়ালা, রাসূল ﷺ, হিদায়েতের কিতাব এবং দীন ও শরিয়তকে প্রাধান্যের মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করে এবং ঈমান ও ঈমানের দাবিসমূহের বিপরীতে নিজের ইচ্ছা-চাহিদা, স্বভাবগত পছন্দ-অপছন্দ এবং আত্মীয়তা ও সম্পর্কের আকর্ষণ ও দুর্বলতাকে জয় করতে পারে, তবে সে আল্লাহ তায়ালার কাছে সফল এবং ঈমানি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

পক্ষান্তরে যদি সে নিজের স্বভাব, কামনা-বাসনা ও পার্থিব সম্পর্ককে প্রাধান্যের মাপকাঠি সাব্যস্ত করে আর এসবের খাতিরে ঈমান ও ঈমানের দাবিসমূহ কুরবান করে দেয়, তা হলে সে ব্যর্থ ও ঈমানি পরীক্ষায় পরাজিত। তার নিশ্চিত জানা উচিত, তার ঈমান শুধু নামমাত্র আর অন্তরটা নিফাক-কপটতায় পরিপূর্ণ।

কুরআন-সুন্নাহর বক্তব্যে এ নীতি বারবার ব্যক্ত হয়েছে। মুসলমানের জন্য প্রাধান্য দানের মানদণ্ড হল—আল্লাহ তায়ালা, তাঁর রাসূল ﷺ এবং ঈমান ও ঈমানের দাবিসমূহ। এটি আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ। সুতরাং এটাকে যে ব্যক্তি প্রাধান্যের মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করল না, সে কুফরের পথ অবলম্বন করল।

উদাহরণত নিম্নে কয়েকটি আয়াত লক্ষ্য করুন!

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ❖ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللهُ بِأَمْرِهِ وَاللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ❖

"হে মুমিনগণ! তোমাদের পিতা ও ভাই যদি ঈমানের বিপরীতে কুফুরিকে পছন্দ করে, তবে তাদেরকে অন্তরঙ্গ রূপে গ্রহণ করো না। তোমাদের মধ্যে যারা তাদেরকে অন্তরঙ্গ রূপে গ্রহণ করে তারাই জালেম। বলুন! তোমাদের নিকট যদি আল্লাহ তাঁর রাসূল এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করা অপেক্ষা বেশি প্রিয় হয় তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভ্রাতা, তোমাদের পত্নী, তোমাদের স্বগোষ্ঠী, তোমাদের অর্জিত সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য যার মন্দা পড়ার আশঙ্কা কর এবং তোমাদের বাসস্থান যা তোমরা ভালবাস, তবে অপেক্ষা করো আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত। আল্লাহ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না।" [সূরা তওবা : ২৩-২৪]

এর চেয়ে আরো স্পষ্ট 'নস' ও বাণীর কি প্রয়োজন আছে যে, আল্লাহ তায়ালার কাছে মুক্তি শুধু তখনই পাওয়া যাবে, যখন আমাদের গ্রহণ-বর্জনের মানদণ্ড হবে আল্লাহ তায়ালা, তাঁর রাসূল ও তাঁর দীন। আর পার্থিব সকল সম্পর্ক হবে এর অধীন। যাতে সংঘর্ষকালে আমরা আল্লাহ তায়ালার মর্জিকে প্রাধান্য দিতে পারি। আমাদের কেউ যদি প্রাধান্য দানের এ আসমানি মানদণ্ড

ত্যাগ করে কোনো পার্থিব সম্পর্ককে, নিজের গোত্র (বংশীয় বা রাজনৈতিক) বা গোত্রপতিদের চিন্তা বা পছন্দকে প্রাধান্যের মানদণ্ড বানায়, তা হলে সে নিঃসন্দেহে ঈমানের পরীক্ষায় নিজেকে অকৃতকার্য করল।

বস্তুত প্রাধান্যের মানদণ্ড প্রসঙ্গ একটি স্পষ্ট বাস্তবতা। চিন্তা করলেই বুঝা যাবে, ঈমানের গোটা বিষয়টা নির্ভরশীল প্রাধান্যের উপরই। ঈমানের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করলে সব জায়গায় দেখা যাবে—ঈমান বিল্লাহর প্রথম কথা, গায়রুল্লাহ থেকে বিমুখ হয়ে আল্লাহ তায়ালার দিকে রুজু করা, কেবল তাঁরই ইবাদত করা, সকল তাগুতের (খোদাদ্রোহী শক্তির) আনুগত্য অস্বীকার করা এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করা।

তদ্রুপ রাসূলের প্রতি ঈমান গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল—রাসূলুল্লাহ সা.-এর উপর নাযিলকৃত কিতাব ও শরিয়ত এবং তাঁর উত্তম আদর্শকে দুনিয়ার সকল ইজম, মতবাদ ও সংস্কৃতির চেয়ে অগ্রগণ্য মনে করা এবং ওইসব থেকে বিমুখ হয়ে একেই গ্রহণ করা। আর আল্লাহ তায়ালার মনোনীত দীন ইসলামে পরিপূর্ণভাবে দাখিল হওয়া।

তদ্রুপ পরকালে বিশ্বাসের অনিবার্য অর্থ হল, পরকালীন জীবনকে সফল ও সজ্জিত করার দাবিসমূহ ইহজীবনের কামনা-বাসনার উপর প্রাধান্য দান।

এভাবে ঈমানের এক একটি বিষয় নিয়ে চিন্তা করতে থাকুন। দেখবেন, ঈমান ও ইসলামের অর্থই হচ্ছে—হেদায়েতকে পথভ্রষ্টতার ওপর, আলোকে অন্ধকারের ওপর, কল্যাণকে অকল্যাণের ওপর, তাওহিদকে শিরকের ওপর, সুন্নতকে বিদআতের ওপর, পুণ্যকে পাপাচারের ওপর, আনুগত্যকে বিদ্রোহের ওপর, পরকালকে দুনিয়ার ওপর, ইসলামকে অনিসলামের ওপর এবং আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসূলকে অন্য সবার উপর প্রাধান্য দেওয়া। ইরশাদ হচ্ছে,

مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَعْدِ إِيْمَانِهٖ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهٗ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيْمَانِ وَلٰكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللّٰهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۞ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ وَأَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَافِرِيْنَ ۞ أُولٰئِكَ الَّذِيْنَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُوْنَ ۞ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُوْنَ ۞

"যে ঈমান আনার পর আল্লাহকে অস্বীকার করল এবং কুফরির জন্য হৃদয় উন্মুক্ত রাখল তার উপর আপতিত হবে আল্লাহর গজব ও তার জন্য মহাশাস্তি; তবে তার জন্য নহে, যাকে কুফরির জন্য বাধ্য করা হয় কিন্তু তার হৃদয় ঈমানে অবিচলিত। তা এজন্য যে, তারা দুনিয়ার জীবনকে পরকালের উপর

প্রাধান্য ও আল্লাহ কাফির সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না। তারাই ওইসব লোক আল্লাহ যাদের অন্তর, কর্ণ ও চক্ষু মোহর করে দিয়েছেন এবং তারাই গাফেল। নিশ্চয় তারা পরকালে হবে ক্ষতিগ্রস্ত।" [সূরা নাহল : ১০৬-১০৯]

জাদু ও কুফর থেকে তওবা করে যারা আল্লাহ তায়ালা ও তার রাসূল হযরত মূসা আ.-এর উপর ঈমান এনেছিলেন, ফিরাউন তাদেরকে হাত পা কেটে শূলিতে চড়ানোর হুমকি দিয়েছিল, কিন্তু তাদের জবাব ছিল—

قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۞ إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ۞ إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ۞ وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ ۞ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَٰلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّىٰ ۞

"তারা বলল, আমাদের কাছে যে স্পষ্ট নিদর্শন এসেছে তার উপর এবং যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন তাঁর উপর তোমাকে আমরা কিছুতেই প্রাধান্য দেব না। সুতরাং তুমি কর যা তুমি করতে চাও। তুমি তো কেবল এ পার্থিব জীবনের উপর কর্তৃত্ব করতে পার।

আমরা নিশ্চয় আমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান এনেছি যাতে তিনি আমাদের অপরাধ ক্ষমা করেন এবং তুমি আমাদেরকে যে জাদু করতে বাধ্য করেছ তাও ক্ষমা করেন। আর আল্লাহ শ্রেষ্ঠ ও স্থায়ী।

যে তার প্রতিপালকের কাছে অপরাধী হয়ে উপস্থিত হবে, তার জন্য তো আছে জাহান্নাম, সেখানে সে মরবেও না বাঁচবেও না।

এবং যারা তার নিকট উপস্থিত হবে মুমিন অবস্থায়, সৎকর্ম করে তাদের জন্য আছে সর্বোচ্চ মর্যাদা।

স্থায়ী জান্নাত, যার পাদদেশে নহর প্রবাহিত, সেখানে তারা স্থায়ী হবে এবং এ পুরস্কার তাদেরই, যারা পবিত্র।" [সূরা ত্বহা : ৭২-৭৬]

فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ ۞ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ ۞ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا ۞ قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ ۞

"পরে আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে সৎপথের নির্দেশ আসলে যে আমার পথ অনুসরণ করবে, সে বিপথগামী হবে না ও দুঃখ-কষ্ট পাবে না। যে

আমার স্মরণে বিমুখ থাকবে, অবশ্যই তার জীবন হবে সঙ্কুচিত এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন উত্থিত করব অন্ধ অবস্থায়। সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! কেন আমাকে অন্ধাবস্থায় উত্থিত করলে? তিনি বলবেন, এমনই আমার নিদর্শনাবলি তোমার কাছে এসেছিল; কিন্তু তুমি তা ভুলে গিয়েছিলে এবং সেভাবে আজ তুমিও বিস্মৃত হলে।" [সূরা ত্বহা : ১২৩-১২৬]

فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ ۞ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَىٰ ۞ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ ۞ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ ۞ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۞ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ۞ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۞ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ۞

"এরপর যখন মহাসংকট উপস্থিত হবে। মানুষ যা করেছে, তা সেই দিন স্মরণ করবে। এবং প্রকাশ করা হবে জাহান্নাম দর্শকদের জন্য। অনন্তর যে সীমালঙ্ঘন করে। এবং পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দেয়। জাহান্নামই হবে তার আবাস। পক্ষান্তরে যে নিজ প্রতিপালকের সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে এবং প্রবৃত্তি থেকে নিজেকে বিরত রাখে। জান্নাতই হবে তার আবাস।" [সূরা নাযিয়াত : ৩৪-৪১]

অপরাধীর উপর দয়াবশত কোনো বিচারক হয়তো দণ্ড প্রয়োগ করা থেকে বিরত থাকবে। আল্লাহ তায়ালা সতর্ক করে দিয়েছেন, কক্ষণো নয়। আল্লাহর বিধান ও দণ্ডবিধিকে সবকিছুর উপরে রাখবে, যদি তোমরা মুমিন হও।

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ۞

"ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী—তাদের প্রত্যেককে একশত কষাঘাত করবে, আল্লাহর বিধান কার্যকরিকরণে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে প্রভাবিত না করে, যদি তোমরা আল্লাহ এবং পরকালে বিশ্বাসী হও; মুমিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।" [সূরা নূর-২]

অবশ্য বর্তমানে হদ কায়েম (শরিয়তের দণ্ড প্রয়োগ) করার ক্ষেত্রে দেশের সরকারগুলোর যে অনীহা তার প্রধান কারণ সম্ভবত অপরাধীর প্রতি (অন্যায়) দয়া নয় বরং মূল কারণ সাধারণত অপরাধ-অশ্লীলতার সাথে মানসিক সখ্য এবং সেসব মুরব্বির ভয়, যারা আপাদমস্তক বর্বরতায় ডুবে গিয়ে ইসলামের ইনসাফের আইনকে বর্বর বলে আখ্যায়িত করে। বলা বাহুল্য, এসব কারণে ইসলামি দণ্ডবিধির বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া আরো বেশি ঈমানহীনতা।

আবার হতে পারে কিছু শাসক ঈমানদার হওয়া সত্ত্বেও ইসলামের বিধান ও দণ্ডকে ইনসাফপূর্ণ মনে করেও ভীরুতার কারণে তা কার্যকর করার সাহস করেন না। এদের উপর অবশ্য নিফাক ও ইলহাদের হুকুম জারি হবে না।

যা হোক! বলা হচ্ছিল, নিজের ঈমান যাচাই করার একটি গুরুত্বপূর্ণ পন্থা হল—নিজের আত্মিক অবস্থা বিচার করা অর্থাৎ আমার কাছে প্রাধান্য দানের মানদণ্ড ঈমান ও ইসলাম না-কি নিজের রুচি-অভিরুচি, প্রবৃত্তির চাহিদা বা নিজের দল, গোত্র ও সম্প্রদায়ের পক্ষপাতিত্ব? যদি ঈমান ও ইসলামের স্থলে নিজের প্রবৃত্তি ইত্যাদি হয়, তা হলে তাৎক্ষণিক তওবা করে কেবলই ইসলামি প্রাধান্যের মাপকাঠি অবলম্বন করতে হবে এবং ঈমানের নবায়ন করতে হবে।

আমলের সংশোধনের হিম্মত যদি এ মুহূর্তে না হয়, তা হলে ঈমান তো দিলের বিষয়। ঈমানের সংশোধন তো তৎক্ষণাৎ হতে পারে। আর এর দ্বারা অন্তত আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর দীনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অপরাধ থেকে তো নিষ্কৃতি পাওয়া যেতে পারে।

### ছ. আল্লাহকে হাকিম ও বিধাতা মানতে কোনো দ্বিধা নেই তো?

এক তো হচ্ছে বর্তমান যুগের বাস্তবতা। এটা আমাদেরই কর্মফল। আজ বিশ্বের কোনো ভূ-খণ্ড এমন নেই, যেখানে রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামি বিধান চালু আছে; কিন্তু মুমিন মাত্রই জানেন, মুসলিম উম্মাহর প্রকৃত অবস্থা এটা নয়। মুসলিম উম্মাহ তো পূর্ণাঙ্গ দীন ও শরিয়তের অধিকারী। যাতে বড় একটি অংশ রয়েছে রাজত্ব ও শাসন বিষয়ক। উম্মাহর নেতৃত্ব ও পরিচালনা যাদের উপর ন্যস্ত, তাদের ফরয দায়িত্ব ওই নীতি ও বিধান অনুযায়ী দেশ পরিচালনা করা, নামায কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, সৎকাজের আদেশ আর অসৎ কাজের নিষেধ, প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করা; ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা ও নববি আদর্শে খেলাফত পরিচালনার দায়িত্ব পালন করা, ইসলামি হদ, কিসাস ও তাযীর (দণ্ডবিধি) কার্যকর করা, সাধ্যানুযায়ী ইসলামি জিহাদের দায়িত্ব পালন করা, রাষ্ট্র পরিচালনা (আইন-বিচার, নির্বাহী ব্যবস্থা)-এর ক্ষেত্রে নতুন-পুরাতন জাহিলি যুগের বিধি-বিধান এবং নতুন-পুরনো সকল তাগুতি ব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণরূপে বিমুখ হয়ে ইসলামি বিধানের আনুগত্য করা। এটাই হচ্ছে ইসলামের শিক্ষা; এটাই হচ্ছে মুসলিম উম্মাহর প্রকৃত অবস্থা। ইরশাদ হচ্ছে,

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا

يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ❖ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ❖

"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, তিনি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করবেন, যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীগণকে এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত করবেন তাদের দীনকে, যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে তাদেরকে অবশ্য দান করবেন নিরাপত্তা। তারা আমার ইবাদত করবে, আমার কোনো শরিক করবে না, এরপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে তারা তো সত্যত্যাগী। তোমরা নামায কায়েম করো, যাকাত দাও ও রাসূলের আনুগত্য করো। যাতে তোমরা অনুগ্রহভাজন হতে পার।" [সূরা নূর : ৫৫-৫৬]

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ❖

"আমি এদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করলে এরা নামায কায়েম করবে, যাকাত দিবে এবং সৎকাজের নির্দেশ দিবে ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবে; আর সকল কর্মের পরিণাম আল্লাহর ইখতিয়ারে।" [সূরা হজ-৪১]

يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ❖

"হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি। অতএব তুমি লোকদের মধ্যে সুবিচার করো এবং খেয়াল-খুশির অনুসরণ করো না। কেননা তা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে। যারা আল্লাহর পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়, তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। কেননা তারা বিচার দিবসকে বিস্মৃত হয়ে আছে।" [সূরা ছোয়াদ-২৬]

وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ❖ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ❖ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارٰى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ❖

"কিতাব অবতীর্ণ করেছি, যাতে তুমি আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, সে অনুযায়ী তাদের বিচার নিষ্পত্তি কর, তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ না কর এবং তাদের সম্বন্ধে সতর্ক হও। যাতে আল্লাহ যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছেন, তারা তার কিছু থেকে তোমাকে বিচ্যুত না করে। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে জেনে রাখো! অনেক পাপের কারণে আল্লাহ তাদেরকে বিপদাপন্ন করতে চান এবং মানুষের মধ্যে অনেকেই তো সত্যত্যাগী। তবে কি তারা জাহিলিযুগের বিধি-বিধান কামনা করে? নিশ্চিত বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য বিধান দানে আল্লাহর চেয়ে কে শ্রেষ্ঠতর? হে মুমিনগণ! তোমরা ইহুদি ও খ্রিষ্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে কেউ তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে সে তাদেরই একজন হবে। নিশ্চয় আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।"

[সূরা মায়িদা : ৪৯-৫১]

এসব আয়াতে মুসলিম শাসকদের কর্তব্য ও তাদের রাষ্ট্রপরিচালনার নীতি দুটিই রয়েছে। এ নিগূঢ়তা স্মরণে রাখলে জানা যাবে, একটি মুসলিম ভূখণ্ডে শাসকদের জন্য সেখানেই আইন প্রণয়নের অবকাশ আছে, যেখানে কুরআন-সুন্নাহ নিশ্চুপ এবং ইজমায়ে উম্মত ও খুলাফায়ে রাশিদিনের সর্বসম্মসত রায়ে যার নজির নেই। অন্য কথায় আধুনিক ইজতিহাদি বিষয়, বৈধ বিষয়াবলি এবং বৈধ বিষয়াবলির এক বিরাট অংশ ব্যবস্থাপনাগত বিষয়াদি—এ তিন ক্ষেত্রেই মুসলিম শাসকদের আইন প্রণয়নের প্রয়োজন হয়; এর অবকাশও আছে।

তন্মধ্যে আধুনিক ইজতিহাদি বিষয়াবলির সমাধান সমকলীন ফকিহদের উপর ন্যস্ত করা অপরিহার্য। আর যেসব বিষয়ে কুরআন-সুন্নাহর সুনির্ধারিত ও সুস্পষ্ট নির্দেশনা আছে, সেখানে হুবহু ওই শিক্ষা ও নির্দেশনার অনুসরণ করা ও তা কার্যকর করা জরুরি। এসব বিষয়ে নতুন আঙ্গিকে বিন্যাস ও সংকলনের কাজ হতে পারে, কিন্তু তা পরিবর্তন-পরিবর্ধনের কোনো সুযোগ নেই।

এমনিভাবে সেসব থেকে বিমুখ হয়ে আলাদা আইন প্রণয়ন বা তদস্থলে মানবরচিত কোনো আইন গ্রহণের কোনো অবকাশ নেই। কেউ এরূপ করলে যদি নিজেকে অপরাধী মনে করে, অন্তরে আল্লাহ তায়ালার প্রতি, আখিরাতের প্রতি, তাঁর রাসূল, তাঁর কিতাব, তাঁর বিধান ও শরিয়তের প্রতি ঈমান থাকে এবং তার এতটুকু উপলব্ধি থাকে যে, আল্লাহ তায়ালার বিধান অনুসারেই রাষ্ট্র পরিচালনা করা ফরয, এতেই আছে কল্যাণ ও সফলতা; কিন্তু ঈমানি দুর্বলতা ও হীনমন্যতার কারণে আমি তা করতে পারছি না। তা হলে অন্তরে ঈমান থাকা এবং ওই হারাম কাজে নিজেকে অপরাধী মনে করার কারণে তার উপর কাফির-মুনাফিকের হুকুম আরোপিত হবে না।

পক্ষান্তরে যদি আল্লাহ পাকের বিধান তার পছন্দ নয়, ইসলামকে সে ঘর ও মসজিদে আবদ্ধ রাখতে চায়, জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলামের নেতৃত্বে তার ঈমান না থাকে এবং আসমানি বিধিবিধানের উপর মানবরচিত আইন-কানুনের শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাসী হয়, তা হলে নিঃসন্দেহে তার এ কর্ম ও অবস্থান সরাসরি কুফর। আর এ কুফরের সাথে কথায় বা আচরণে ঈমানের দাবি সরাসরি নিফাক ও মুনাফিকি।

সুতরাং মহান আল্লাহ কুরআন মাজিদে ইরশাদ করেছেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۞ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا ۞

"হে মুমিনগণ! তোমরা আনুগত্য করো আল্লাহর, আনুগত্য করো রাসূলের ও তোমাদের মধ্যে ক্ষমতাবানদের। সুতরাং কোনো বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিলে তা সমর্পণ করো আল্লাহ ও রাসূলের কাছে; যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস কর। এটাই উত্তম এবং পরিণামে প্রকৃষ্টতর। তুমি কি তাদেরকে দেখনি যারা দাবি করে যে, তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে, তাতে তারা বিশ্বাস করে, অথচ তারা তাগুতের কাছে বিচারপ্রার্থী হতে চায়, অথচ তা প্রত্যাখ্যান করার জন্য তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আর শয়তান তাদেরকে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট করতে চায়। তাদেরকে যখন বলা হয়—আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তার দিকে এবং রাসূলের দিকে এসো! তখন মুনাফিকদেরকে তুমি তোমার থেকে মুখ একেবারে ফিরিয়ে নিতে দেখবে।" [সূরা নিসা : ৫৯-৬১]

'তাগুত' অর্থ ওই আল্লাহদ্রোহী বান্দা, যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের বিপরীতে নিজেকে বিধানদাতা মনে করে এবং মানুষের উপর তা কার্যকর করতে চায়।

প্রকৃতপক্ষে কোনো তাগুত ব্যক্তি বা দলের রচিত আইন-কানুন হচ্ছে সত্য দীন ইসলামের পরিপন্থি বিভিন্ন 'ধর্ম', যা থেকে সম্পর্কোচ্ছেদ করা ছাড়া ঈমান সাব্যস্ত হয় না। আল্লাহ তায়ালার বিরুদ্ধে কিংবা আল্লাহ তায়ালার সাথে তাগুতের উপাসনা বা আনুগত্য করা কিংবা তা বৈধ মনে করা,

অদ্রুপ আল্লাহ তায়ালার দীনের বিপরীতে বা তার সাথে তাগুতের আইন-কানুন গ্রহণ করা বা গ্রহণ করাকে বৈধ মনে করা সরাসরি কুফর ও শিরক। তাগুত ও তার বিধি-বিধান থেকে সম্পর্কোচ্ছেদ ছাড়া ঈমানের দাবি নিফাক ও মুনাফিকি।

এ নিফাক হতে বাঁচার ন্যূনতম উপায় হল, শাসক-জনগণ সকলের অন্তরে বাসনা থাকতে হবে—হায়! আমাদের দেশে যদি ইসলামি আইন চালু হত! আমাদের রাষ্ট্র যদি ইসলামের আইনে পরিচালিত হত! কমপক্ষে যদি অন্তরেও পূর্ণাঙ্গ ইসলামের ঈমান থাকে এবং ইসলামি রাষ্ট্রনীতি ও আইনের প্রতি শ্রদ্ধা-ভালবাসা বিদ্যমান থাকে, তা হলে এটাও অনেক বড় ব্যাপার। এর জন্যও আল্লাহ তায়ালার শোকর করা কর্তব্য।

পক্ষান্তরে অন্তরে অবস্থা যদি (নাউযুবিল্লাহ) তার উল্টো হয় অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালাকে হাকিম ও শাসক মেনে নিতেই দ্বিধা ও সঙ্কোচ বা অস্বীকৃতি থাকে এবং রাজনীতি ও রাষ্ট্র পরিচালনায় আসমানি বিধান অনুসরণে আপত্তি করে, তা হলে নিশ্চিত বুঝতে হবে—সে অন্তর ঈমান শূন্য এবং লোকটি ইসলাম থেকে খারিজ। সুতরাং তাকে কুফর ও নিফাক থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে খাঁটি মনে তওবা করতে হবে। ইসলামের স্বয়ংপূর্ণতা, পূর্ণাঙ্গতা এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে তার অবশ্য পালনীয় হওয়ায় বিশ্বাস স্থাপন করত পরিপূর্ণ ইসলামে প্রবেশ ও ঈমানের নবায়ন করতে হবে। যাতে অন্তত ঈমানের বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর দীনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অপরাধ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। এরপর সদিচ্ছা থাকলে হয়তো কখনো কার্যত বিদ্রোহ থেকেও মুক্তি পাবে।

স্মরণে রাখবেন! হেদায়েত ও সত্য ধর্মের বিজয়-সাফল্য কাফির-মুশরিক ও মুনাফিকদের কাছে সহনীয় নয়। এটা তাদের কাছে বড় অসহনীয় যে, শুধু আল্লাহ তায়ালার ইবাদত ও আল্লাহ তায়ালার কালিমা সমুন্নত হবে। মুসলিম জাতির ঈমানি উন্নতি ও জাতি হিসেবে তাদের প্রতিষ্ঠা ওদের চরম গাত্রদাহের কারণ। এখন যদি ইসলামের কালেমা পাঠ করেও আমার অবস্থা তেমনি হয় এবং আমার বন্ধুত্বও হয় তাদের সাথে, তা হলে আমি কিভাবে ঈমানের দাবি করি? আমার আদর্শ তো হবে রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং তাঁর সাহাবিগণ। কুরআন মাজিদে এমন লোক প্রসঙ্গে ইরশাদ হয়েছে :

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ، وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ

وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ❖

"মুহম্মাদ আল্লাহ তায়ালার রাসূল; তার সহচরগণ কাফিরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মাঝে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল; আল্লাহর অনুগ্রহ এবং সন্তুষ্টি কামনায় তুমি তাদেরকে দেখবে—রুকু ও সাজ্‌দায় অবনত। তাদের লক্ষণ তাদের মুখম-লে সাজ্‌দার প্রভাবে পরিস্ফুট থাকবে; তাওরাতে তাদের বর্ণনা এমন এবং ইনজিলেও তাদের বর্ণনা এমনই। তাদের দৃষ্টান্ত একটি চারাগাছ, যা থেকে বের হয় কিশলয়। এরপর তা শক্ত ও পুষ্ট হয় এবং পরে কা-ের উপর দাঁড়ায় দৃঢ়ভাবে, যা চাষীর জন্য আনন্দদায়ক। এভাবে আল্লাহ মুমিনদের সমৃদ্ধির দ্বারা কাফিরদের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করেন। যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের।"

[সূরা ফাতহ-২৯]

কাফির-মুশরিকদের এ ক্রোধ-ঘৃণা অতীতেও ছিল, বর্তমানেও আছে আর ভবিষ্যতেও থাকবে যাবৎ না তারা কুফর-শিরক থেকে তওবা করে সত্য দীন গ্রহণ করে। মুসলিম জাতির জন্য আপন ঈমান রক্ষা করতে চাইলে ওদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করা অবশ্য কর্তব্য। তথাপি কেউ যদি ওদের বন্ধুত্ব ছাড়িয়ে প্রভুত্বের আসনে সমাসীন করে এবং নিজের আদর্শ বানিয়ে নেয়, তা হলে তো তাদের অবস্থা তা-ই, যেমনটি কুরআন মাজিদে বারবার বিবৃত হয়েছে :

يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ❖ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ❖

"তারা মুখের ফুৎকারে আল্লাহর আলো নিভিয়ে দিতে চায়। আল্লাহ তাঁর আলোকে পূর্ণরূপে বিকশিত করবেন যদিও কাফিররা তা অপছন্দ করে। তিনি তাঁর রসূলকে পথ নির্দেশ ও সত্যধর্ম নিয়ে প্রেরণ করেছেন, যাতে একে সকল ধর্মের উপর প্রবল করে দেন—যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।"

[সূরা ছফ্ : ৮-৯]

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ❖ يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ❖ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ❖

"এরা তাদের পণ্ডিত ও সন্ন্যাসীদেরকে তাদের পালনকর্তারূপে গ্রহণ করেছে আল্লাহ ছাড়া এবং মরিয়মের পুত্রকেও। অথচ তারা আদিষ্ট ছিল এক মাবুদের ইবাদতের জন্য। তিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। তারা তাঁর শরিক সাব্যস্ত করে; তার থেকে তিনি পবিত্র। তারা তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহর নূরকে নির্বাপিত করতে চায়। কিন্তু আল্লাহ নিশ্চয় তাঁর নূরের পূর্ণতা বিধান করবেন, যদিও কাফিররা তা অপছন্দ করে। তিনিই প্রেরণ করেছেন আপন রসূলকে হেদায়েত ও সত্যধর্ম সহকারে, যাতে এ ধর্মকে অন্যান্য ধর্মের উপর জয়যুক্ত করেন, যদিও মুশরিকরা তা অপ্রীতিকর মনে করে।" [সূরা তওবা : ৩১-৩৩]

হাদিস শরিফে বর্ণিত আছে, ইহুদি-খ্রিষ্টানরা তাদের ধর্মযাজক ও পণ্ডিত-সন্ন্যাসীদের উপাসনা করত না। এখনো করে না। অবশ্য তারা হালাল-হারাম নির্ণয়ের ক্ষমতা তাদেরকে দিয়ে রেখেছিল। আর তাই আল্লাহ তায়ালা বলেন, ওরা নিজেদের আহবার-রোহবানকে রব/পালনকর্তা হিসেবে গ্রহণ করেছে।

[তিরমিযি শরিফ, হাদিস নং ৩০৯৫]

অথচ 'রব' বা পালনকর্তা শুধু আল্লাহ তায়ালা। তাঁর রব-গুণে কেউ শরিক হতে পারে না; তাঁর উপাস্য হওয়ার গুণেও নয়। তাই কেউ আল্লাহ তায়ালার বিধি-বিধান ও তার দেওয়া শরিয়তের বিপরীতে কারো জন্য আইন প্রণয়নের অধিকার স্বীকার করলে সে সরাসরি শিরকে লিপ্ত হয়ে গেল। ওই ব্যক্তিকে সে নিজের 'রব' বা পালনকর্তা হিসেবে গ্রহণ করে নিল। আল্লাহ আমাদেরকে সর্বপ্রকার কুফর-শিরক থেকে বেঁচে থাকার তাওফিক দান করুন। আমিন!

### জ. আমি 'মুমিনদের পথ' থেকে বিচ্যুত হচ্ছি না তো?

সর্বশেষ কথা হল, কুরআন-হাদিসে সিরাতে মুস্তাকিম ও হেদায়েতের উপর প্রতিষ্ঠিত মুক্তিপ্রাপ্ত লোকদের পথকে 'সাবিলুল মুমিনিন' [মুমিনদের পথ] বলা হয়েছে এবং এ পথ থেকে বিচ্যুত হওয়াকে জাহান্নামে যাওয়ার কারণ সাব্যস্ত করা হয়েছে। যেমন, ইরশাদ হয়েছে :

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ
نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيْرًا ۞

"কারো কাছে সৎপথ প্রকাশিত হওয়ার পর সে যদি রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং মুমিনদের পথ ছাড়া অন্য পথ অনুসরণ করে, তা হলে যেদিকে সে ফিরে যায় সেদিকেই তাকে ফিরিয়ে দিব ও জাহান্নামে তাকে দগ্ধ করব। আর তা কত মন্দ আবাস!" [সূরা নিসা-১১৫]

এজন্য নিজের ঈমান যাচাইয়ের সহজ পথ হল—নিজের আকিদা-বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা ও জীবন-কর্ম পর্যালোচনা করা। যদি এতে সাবিলুল মুমিনিন বা জান্নাতের সহজ-সরল পথ পরিপন্থি কোনো কিছু চোখে পড়ে, তবে অবিলম্বে খাঁটি মনে তওবা করে বিচ্ছিন্নতা থেকে ফিরে আসবে এবং 'সাবিলুল মুমিনিন' তথা ঈমানের পথে চলতে থাকবে। এর অপর নাম مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي (আমি ও আমার সাহারিগণ যে পথে আছি অর্থাৎ সিরাতে মুস্তাকিম। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে সে পথে অটল-অবিচল রাখুন। আমিন!

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ❖

"আমাদের পালনকর্তা! সরল পথ প্রদর্শনের পর তুমি আমাদের অন্তরকে সত্যলঙ্ঘনে প্রবৃত্ত করো না এবং তোমার নিকট থেকে আমাদেরকে অনুগ্রহ দান করো। তুমিই সবকিছুর দাতা।" [সূরা আলে ইমরান-৮]

**ঝ. দল ও দলনেতা পরকালে কোনো কাজে আসবে না**

যে কেউ দুনিয়াতে 'সাবিলুল মুমিনিন' তথা ঈমানের পথ থেকে আলাদা থাকবে, সে পরকালে আফসোস করে বলবে :

وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ❖ يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا ❖ لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا

"জালেম সেদিন নিজ হস্তদ্বয় কামড়াতে কামড়াতে বলবে—হায়! আমি যদি রাসূলের সাথে সৎপথ অবলম্বন করতাম! হায়, দুর্ভোগ আমার! আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম। আমাকে তো সে আমার কাছে উপদেশ আসার পর বিভ্রান্ত করেছিল। শয়তান তো মানুষের জন্য মহাপ্রতারক।" [সূরা ফুরকান : ২৭-২৯]

إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ❖ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ❖ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا ❖ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا ❖ رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا ❖

"আল্লাহ তায়ালা কাফিরদেরকে অভিশপ্ত করেছেন ও তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন জ্বলন্ত অগ্নি। সেখানে তারা স্থায়ী হবে; তারা কোনো অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না। যেদিন তাদের মুখমণ্ডল আগুনে উলট-পালট করা হবে সেদিন তারা বলবে—হায়, আমরা যদি আল্লাহকে মানতাম এবং রাসূলকে মানতাম! তারা আরো বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক!

আমরা আমাদের নেতা ও বড় লোকদের আনুগত্য করেছিলাম এবং তারা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল; হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের দ্বিগুণ শাস্তি দাও এবং তাদেরকে দাও মহাঅভিসম্পাত।" [সূরা আহযাব : ৬৪-৬৮]

কিন্তু জবাব আসবে—

قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَٰكِن لَّا تَعْلَمُونَ ❖

"আল্লাহ বলবেন, প্রত্যেকের জন্য দ্বিগুণ রয়েছে, কিন্তু তোমরা জান না।" [সূরা আ'রাফ-৩৮]

নেতারা বলবে—

فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ❖

"আমাদের উপর তোমাদের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। সুতরাং তোমরা নিজের কৃতকর্মের শাস্তি আস্বাদন করো।" [সূরা আ'রাফ-৩৯]

**তওবার দরজা খোলা**

মৃত্যু হাজির হলে তওবার দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। এখনই সংশোধনের সময়। খাঁটি তওবা করলে আল্লাহ তায়ালা কুফর-শিরক ও নিফাকসহ বড় বড় গুনাহও মাফ করে দেন। তবে তওবায়ে নাসূহা তথা খাঁটি তওবা করা শর্ত। এ তওবায় সর্বপ্রকার কুফর-শিরক ও মুনাফিকি বর্জনের পাশাপাশি সর্বপ্রকার গুনাহ থেকে বেঁচে থেকে আত্মশুদ্ধি ও কর্মসংশোধন এবং সাধ্যমতো অতীত জীবনের ক্ষতিপূরণও শামিল থাকবে। ইরশাদ হচ্ছে,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا ❖ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ❖ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ❖ مَّا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ❖

"হে মুমিনগণ! মুমিনগণের পরিবর্তে কাফিরগণকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তোমরা কি আল্লাহকে তোমাদের বিরুদ্ধে স্পষ্ট প্রমাণ দিতে চাও? নিশ্চয় মুনাফিকরা জাহান্নামের নিম্নতম স্তরে থাকবে আর তাদের জন্য কখনো কোনো সহায় পাবে না। কিন্তু যারা তওবা করে, নিজেকে সংশোধন করে, আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করে এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে তাদের দীনে একনিষ্ঠ থাকে, তারা মুমিনদের সঙ্গে থাকবে এবং মুমিনগণকে আল্লাহ অবশ্যই মহাপুরস্কার

দিবেন। তোমরা যদি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর এবং ঈমান আন, তবে তোমাদের শাস্তিতে আল্লাহর কি কাজ? আল্লাহ পুরস্কারদাতা সর্বজ্ঞ।" (সূরা নিসা : ১৪৪-১৪৭)

হে আল্লাহ! আমরা অন্তর থেকে ঈমান আনছি ও আপনার শোকর আদায় করছি। আপনি কবুল করুন। আমিন! [মাসিক আল কাউসার; জুমাদাল উলা ১৪৩৪ হি. মার্চ-এপ্রিল-মে ২০১৩]

## ইসলাম ও কুফরের মানদণ্ড

—মুফতি মুহাম্মদ শফি' রহ.

**ভূমিকা :** কোনো মুসলমানকে কাফির বা কাফিরকে মুসলমান বলা দুটোই গুরুত্বর কাজ। কুরআন শরিফে এতদুভয় বিষয়ে কঠোর নিষেধাজ্ঞা এসেছে। মুসলমানকে কাফির বলা সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا ضَرَبْتُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَتَبَيَّنُوْا وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ اَلْقٰٓى اِلَيْكُمُ السَّلٰمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا ۚ تَبْتَغُوْنَ عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۖ فَعِنْدَ اللّٰهِ مَغَانِمُ كَثِيْرَةٌ ۭ كَذٰلِكَ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوْا ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ۝

"হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা আল্লাহর পথে সফর কর, তখন প্রতিটি কাজ সূক্ষ্মরূপে বিচার করে করবে এবং যে ব্যক্তি তোমাদেরকে সালাম দেয়, পার্থিব সম্পদ (গনিমত) লাভের জন্য তোমরা তাদেরকে অবিশ্বাসী বলে আখ্যা দিয়ো না। কেননা আল্লাহর কাছে অঢেল গনিমত রয়েছে। তোমরাও প্রথম এরূপই ছিলে। তারপর আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়া করেন। সুতরাং ভেবে দেখো! তোমরা যা কিছু করছ, নিঃসন্দেহে আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক অবগত রয়েছেন।" [সূরা নিসা-৯৪]

এ আয়াত থেকে জানা গেল—যে ব্যক্তি নিজেকে মুসলমান বলে জাহির করে, তার কাফির হওয়ার সুনিশ্চিত প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত তাকে 'কাফির' বলা অবৈধ এবং গুরুত্বর ব্যাপার।

এভাবে কাফিরকে মুসলমান বলে অভিহিত করাও নিষিদ্ধ। ইরশাদ হচ্ছে,

اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَهْدُوْا مَنْ اَضَلَّ اللّٰهُ ۭ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ سَبِيْلًا .

"তোমরা কি সেসব লোককে হেদায়াত করতে চাও, যাদেরকে আল্লাহ নিজেই পথভ্রষ্টতায় ফেলে রেখেছেন? আর যাদেরকে আল্লাহ নিজে পথভ্রষ্টতায় ফেলে রাখেন, তাদেরকে উদ্ধারের কোনোই পথ তুমি পাবে না।" [সূরা নিসা-৮৮]

সাহাবা, তাবিয়ি এবং পরবর্তী যুগের মুজতাহিদ ইমামগণ এ ব্যাপারে পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বনের জন্য বারবার তাগিদ করেছেন। দার্শনিক ও ফকিহগণ

এ ব্যাপারটিকে অত্যন্ত জটিল মনে করতেন। এ বিষয়ে যাঁরা আলোচনা করতে চান, তাঁদের প্রতি কঠোর সাবধানতা অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছেন। হযরত মোল্লা আলী কারী রহ. 'শরহে শিফা'য় লিখেছেন :

اِدْخَالُ كَافِرٍ فِي الْمِلَّةِ الْاِسْلَامِيَّةِ اَوْ اِخْرَاجُ مُسْلِمٍ عَنْهَا عَظِيْمٌ فِي الدِّيْنِ

কাফিরকে মুসলিম সমাজের অন্তর্ভুক্ত মনে করা বা মুসলমানকে ইসলাম থেকে খারিজ বলে অভিহিত করা দুটিই শরিয়তের দৃষ্টিতে গুরুত্বর ব্যাপার।

[শরহে শিফা-২/৫০০]

কিন্তু আজকাল এ দুটি বিষয় অতি সাধারণ মনে করা হয়। যেন কুফর ও ইসলাম এবং ঈমান ও ইরতিদার (ধর্মান্তর) সাব্যস্ত করার ব্যাপারে কোনো মাপকাঠি ও মূলনীতি বলে আদৌ কিছু নেই!

একদল তো কেবল কুফরির ফতওয়া দেওয়াকে নিজের একমাত্র কাজ ও পেশা বানিয়ে নিয়েছে। কেউ সামান্য একটু শরিয়তবিরোধী অথবা তাদের মর্জিবিরোধী কিছু করলেই তারা তাকে কাফির বলে ফতওয়া দিয়ে বসে। সামান্য কথার জন্য তারা এক মুসলমানকে ইসলাম থেকে খারিজ করে দেয়।

অপরদিকে আরেক দল আছে, যাদের কাছে ঈমান ইসলামের জন্য তেমন কিছুর প্রয়োজন হয় না; বরং যে কেউ নিজেকে মুসলমান বলে জাহির করে, তাকেই তারা নির্বিচারে ও নির্দ্বিধায় মুসলমান বলে অভিহিত করে—ওই ব্যক্তি কুরআন-হাদিস ও ইসলামের আহকাম-আরকান যতই অস্বীকার বা অবজ্ঞা করুক না কেন! তাদের মতে সমস্ত কুফরি কথাবার্তা ও কার্যকলাপ ইসলামের অন্তর্ভুক্ত। হিন্দুধর্ম ও অন্যান্য বাতিল ধর্মের মতো এরা ইসলামকেও একটা জাতীয় পরিচয় বলে ধরে নিয়েছে—ব্যক্তির আকিদা-বিশ্বাস যা-ই থাকুক না কেন, আমল-আচরণ যেমনই হোক না কেন, সর্বাবস্থায় সে ব্যক্তি মুসলমান থাকবে! তারা একে উদারতা ও হৃদ্যতা বলে। তাদের সমস্ত রাজনৈতিক স্বার্থ ও সুবিধা এর উপরই নির্ভর করে।

কিন্তু স্মরণে রাখবেন! ইসলাম ও ইসলামের নবী ﷺ এ বক্রতা, ভ্রষ্টতা, বাড়াবাড়ি ও অতি উদারতার আদৌ সমর্থক নন। ইসলাম তার অনুসারীদের জন্য একটি আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক প্রদত্ত বিধান পেশ করেছে। যে ব্যক্তি ঠাণ্ডা মাথায় এবং সর্বপ্রকার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব পরিহার করে তাকেই শিরোধার্য করে নেয়, সে মুসলমান। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার এ বিধানের সামান্য কোনো ব্যাপারকেও অস্বীকার বা অগ্রাহ্য করে, নিঃসন্দেহে ও নির্দ্বিধায় বলা চলে, সে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যায়। এমন ব্যক্তিকে ইসলাম তার গণ্ডিতে রাখতে

চায় না। এমন ব্যক্তির দ্বারা ইসলামের পরিসর ও মুসলমান সমাজের লোক সংখ্যা বৃদ্ধি করতে ইসলাম ও মুসলিম জাতি রীতিমতো অপমানবোধ করে। এ ধরনের স্বল্পসংখ্যক লোককে ইসলামের মধ্যে দাখিল বলে মেনে নিলে হাজারো মুসলমানের ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাওয়ার সমূহ আশঙ্কা দেখা দেয়। অতীতে বহুবার এরূপ দেখা গেছে। আর এটা এমনি একটি ক্ষতি যে, যদি বাহ্যত এর বিনিময়ে হাজার রকমের কল্যাণও সাধিত হয়, তবু কোনো ধর্মপ্রাণ মুসলমান তা গ্রাহ্য করতে পারে না, বিশেষ করে যখন সেই হাজার রকমের উপকার নিছক কাল্পনিক ও অনুমানভিত্তিক হয়।

আমি বর্তমান যুগের লোকদের এ বাড়াবাড়ি, অতি উদারতা এবং ইসলাম ও কুফরের ব্যাপারে অসতর্কতা লক্ষ্য করে দীর্ঘদিন যাবৎ এ সম্পর্কে একখানি পুস্তিকা রচনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে আসছিলাম। যাতে ইসলাম ও কুফরির মানদণ্ড বর্ণিত হবে। বর্ণিত হবে কোন্ কোন্ আকিদা, কথাবার্তা ও কার্যকলাপ দ্বারা কোন্ ব্যক্তি ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যায়।

এমনি সময়ে নিম্নে বর্ণিত প্রশ্নের জবাব লিখার প্রয়োজন দেখা দিল। তাই তা একটু বিস্তারিত লিখে দিয়েছি, যদ্বারা কী কী কারণে একটি লোক কাফির হয়ে যায়, তা জানার সাথে সাথে কিছু কিছু গোমরাহ দল সম্পর্কে ইসলামের বিধান কী, তাও স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। মুরতাদ বা ধর্মত্যাগীদের সম্পর্কে ইসলামের কিছু বিধানও এ বইয়ে বর্ণিত হয়েছে। অধিকন্তু হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভি রহ. এ পুস্তিকাটি আগাগোড়া পড়ে যথেষ্ট পরিবর্ধন-পরিমার্জন করে দিয়েছেন। আমার এ উর্দু পুস্তিকাটির নাম 'উসূলুল আফ্কার ইলা উসূলিল ইক্ফার' ঠিক করে দিয়েছেন।

**ইসলাম ও কুফর**

**প্রশ্ন :** কুফর ও ইসলামের মাপকাঠি কী? কি কি কারণে একজন মুসলমানকে মুরতাদ বা ইসলাম ত্যাগী কাফির বলা হয়?

**উত্তর :** ইরতিদাদ শব্দের আভিধানিক অর্থ হল, ফিরে যাওয়া ও বিমুখ হওয়া। শরিয়তের পরিভাষায়, ঈমান ও ইসলাম থেকে বিমুখ হওয়াকে ইরতিদাদ বলে আর যে বিমুখ হয় তাকে মুরতাদ বলা হয়।

**ইরতিদাদ (ধর্মান্তর)-এর শ্রেণিভেদ**

ইরতিদাদ (ধর্মান্তর) দুই প্রকারে হতে পারে। যথা—

১. কোনো হতভাগ্য ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে খ্রিষ্টান, ইহুদি, আর্যসমাজী বা এরূপ অন্য কোনো ধর্মে দীক্ষিত হয়ে পড়ল কিংবা আল্লাহ তায়ালার

অস্তিত্ব বা তাঁর একত্ববাদে (তাওহিদে) বিশ্বাস হারিয়ে ফেলল অথবা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রিসালাতকেই অস্বীকার করে বসল। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে রক্ষা করুন!

২. প্রকাশ্যে হয়তো সে ধর্ম পরিবর্তন বা তাওহিদ ও রিসালাতকে অস্বীকার করল না ঠিক; কিন্তু এমন কিছু কর্মকা--আচরণ, কথাবার্তা বা আকিদা-বিশ্বাসে লিপ্ত হয়ে পড়ল, যাতে প্রকারান্তরে কুরআন শরিফ বা রিসালাত অস্বীকার করা হয়। যেমন, সে ব্যক্তি ইসলামের এমন কোনো ব্যাপারকেই অস্বীকার করে বসল, যা কুরআন শরিফের স্পষ্ট আয়াত দ্বারা সুপ্রমাণিত বা যা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদিস থেকে বর্ণনা-পরম্পরায় (তাওয়াতুরের সাথে) এমনভাবে সুপ্রমাণিত, যা অস্বীকার করা চলে না।

সমস্ত উম্মতের আলেমদের ইজমা তথা সর্বসম্মত মত হল, এমন ব্যক্তি ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে 'মুরতাদ' গণ্য হবে। যদিও সে ওই একটি বিষয় ছাড়া অন্য সমস্ত বিষয়েই ইসলামের পূর্ণ আনুগত্য ও অনুসরণ করে।

এ দ্বিতীয় প্রকার মুরতাদদের ইসলামি বেশভূষা ও আচার-আচরণে কোনো পার্থক্য হয় না বিধায় এদের ব্যাপারে মুসলমানরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভুল বোঝাবুঝিতে লিপ্ত হয়ে পড়ে। মুসলমানগণ সাধারণত এদেরকে মুসলমান বলে ধারণা করে। বাহ্যত এটা একটা মামুলি ভুল মনে হলেও পরিণতির দিক থেকে চিন্তা করলে এর চেয়ে মারাত্মক বিষয় ইসলাম ও মুসলিম সমাজের জন্য আর কিছুই হতে পারে না। কেননা এতে কুফর ও ইসলামের কোনো মাপকাঠি বা সীমারেখাই বর্তমান থাকে না; পার্থক্য থাকে না একজন মুমিন ও একজন কাফিরের মধ্যে। ফলে ইসলামের ধূর্ত শত্রুরা চালাকি করে মুসলিম সমাজের একজন সেজে আস্তিনের সাপ ও ঘরের শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। বন্ধু বেশে শত্রুতার সকল পরিকল্পনা নির্বিঘ্নে বাস্তবায়ন করে।

তাই ইরতিদাদ (মুরতাদ হওয়া) সংক্রান্ত ব্যাপারটি একটু বিস্তারিতভাবেই আলোচনা করা প্রয়োজন। আর মুরতাদ হওয়া যেহেতু ঈমানেরই বিপরীত কাজ, তাই প্রথমে ঈমানের সাধারণ পরিচয় বর্ণনার পর ইরতিদাদ বা মুরতাদ হওয়ার স্বরূপ ব্যাখ্যা করব।

**ঈমান ও ইরতিদাদের সংজ্ঞা**

ঈমানের সংজ্ঞা সুবিদিত। এর দুটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ রয়েছেথ

১. আল্লাহ তায়ালার প্রতি ঈমান আনয়ন বা বিশ্বাস স্থাপন।

২. তাঁর রাসূল ﷺ-এর প্রতি ঈমান আনয়ন। কিন্তু আল্লাহ তায়ালার প্রতি ঈমান আনার অর্থ কেবল তাঁর অস্তিত্বের কথা স্বীকার করে নেওয়াই নয় বরং সমুদয় গুণ যে তাঁর মধ্যে পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান রয়েছে, তিনি যে সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে শ্রবণশীল, দর্শনশীল, ক্ষমতাশীল—যেভাবে কুরআন শরিফে বিবৃত হয়েছে, তা বিনা বাক্যে মেনে নিতে হবে। নতুবা ইহুদি, খ্রিষ্টান, হিন্দু ধর্মাবলম্বীরাও স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাসী।

অনুরূপ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি ঈমান আনয়নের অর্থ এটা নয় যে, কেউ তাঁর অস্তিত্ব ছিল বলে বিশ্বাস করল। আরো বিশ্বাস করল, তিনি মক্কা শরিফে জন্মগ্রহণ করেছেন, মদিনায় হিজরত করেছেন, ৬৩ বছরের জীবনায়ু লাভ করেছেন ও অমুক অমুক কাজ করেছেন বরং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি ঈমান আনয়নের তাৎপর্য কুরআনের ভাষায় শুনুন!

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتّٰى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِيٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ۞

"কসম আপনার প্রভুর, তারা ওই পর্যন্ত মুসলমান হতে পারবে না, যাবৎ না তাদের মধ্যকার বিবাদ-বিসংবাদে আপনাকে মধ্যস্থ ও বিচারক বলে মেনে নেবে এবং আপনার ফায়সালা কোনোরূপ দ্বিধাদ্বন্দ্ব ব্যতিরেকে শিরোধার্য করে নেবে এবং পূর্ণরূপে আপনার সম্মুখে নতি স্বীকার করবে।" [সূরা নিসা-৬৫]

তাফ্সিরে রুহুল মায়ানি প্রণেতা এ আয়াতের তাফ্সিরে প্রাথমিক যুগের আলেমদের সূত্রে বর্ণনা করেছেন :

فَقَدْ رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ ﷺ قَالَ : لَوْ أَنَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللهَ تَعَالٰى وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَصَامُوا رَمَضَانَ وَحَجُّوا الْبَيْتَ ثُمَّ قَالُوا لِشَيْءٍ صَنَعَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَلَّا صَنَعَ خِلَافَ مَا صَنَعَ أَوْ وَجَدُوا فِيٓ أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا لَكَانُوا مُشْرِكِيْنَ.

হযরত জাফর সাদিক রহ. থেকে বর্ণিত আছে, যদি কোনো সম্প্রদায় আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করে, নামায কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে, রমাযানের রোযা রাখে, বায়তুল্লাহর হজও করে, কিন্তু এমন কোনো কাজ যা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ করেছেন বলে সুপ্রমাণিত—সে সম্পর্কে বলে যে, এমন একটি কাজ তিনি কেমন করে করলেন কিংবা এমনটি করা থেকে তিনি কেন বিরত থাকলেন না অথবা তা মেনে নিতে তার অন্তরে দ্বিধা সৃষ্টি হয়, তবে এ সম্প্রদায় মুশরিক বা বিধর্মী সম্প্রদায় বলে গণ্য হবে।

[তাফ্সিরে রুহুল মায়ানি-৫/৬৫]

উপরোল্লিখিত আয়াত ও তার তাফ্সিরের দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেল, রাসূল বা রিসালাতের প্রতি ঈমান আনয়ন করার অর্থ হচ্ছে, তাঁর সমস্ত বিধি-বিধানকে সজ্ঞানে ঠাণ্ডা মাথায় শিরোধার্য করে নেওয়া এবং তাতে কোনোরূপ সঙ্কোচ বা ইতস্তত না করা।

ঈমানের তাৎপর্য স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে কুফর ও ইরতিদাদ যে কী বস্তু, তাও সুস্পষ্ট হয়ে গেল। কেননা যা মেনে নেওয়া বা স্বীকার করে নেওয়াকে ঈমান বলে, সেটাকে না মানা বা অস্বীকার করার নাম কুফর বা ইরতিদাদ। শরহুল মাকাসিদ কিতাবে এরূপই বর্ণিত আছে।

ঈমান ও কুফরের উক্ত সংজ্ঞা দ্বারা আরো প্রমাণিত হয়ে গেল, আল্লাহ ও রাসূলকে আদৌ না মানলেই কেবল কোনো ব্যক্তি কাফির হয় না বরং যা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশ বলে নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত বা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হুকুম জেনেও যদি তা মানতে অস্বীকার করে, তবে শরিয়তের অন্য দশটি বিধান কঠোরভাবে পালন করলেও তা কুফর বলেই গণ্য হবে। কারণ, কুফর ও ইরতিদাদ হচ্ছে 'মালিকুল মুলূক ওয়াল মালাকুত' আল্লাহ তায়ালার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। আর সবাই জানেন, বাদশাহর সমস্ত আইন-কানুনকে অস্বীকার ও অগ্রাহ্য করা যেমন বিদ্রোহ, তেমনি তাঁর কোনো একটি আইনকে অমান্য করা এবং আইন ভঙ্গ করা তেমনি বিদ্রোহ; যদিও অন্য দশটা আইন কোনো ব্যক্তি মেনেও চলে।

দুনিয়ার জঘন্যতম কাফির ও কাফির সৃষ্টিকারী ইবলিস শয়তানের কুফরও এ দ্বিতীয় প্রকারেরই। কেননা সে ধর্ম পরিবর্তন করেনি। আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্ব, কুদরত ও পালনকর্তা হওয়াকে অস্বীকার বা অগ্রাহ্য করে ছিল বরং আল্লাহ তায়ালার একটি মাত্র হুকুম অগ্রাহ্য করে সে চিরতরে বিতাড়িত ও অভিশপ্ত হয়েছিল। হাফেয ইবনে তাইমিয়া রহ. তাঁর সুবিখ্যাত আস-সারিমুল মাসলূল কিতাবের ৩৬৭ পৃষ্ঠায় লিখেছেন :

আল্লাহ ও রাসূলকে গালি না দিয়েও যেমন একজন লোক মুরতাদ হতে পারে, তেমনি অন্য ধর্ম গ্রহণ বা রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার ইচ্ছা পোষণ না করেও কোনো ব্যক্তি মুরতাদ হয়ে যেতে পারে। যেমন ইবলিসের কুফর ও ইরতিদাদে আল্লাহর পালনকর্তা হওয়ার অস্বীকৃতির ইচ্ছা ছিল না।

মোটকথা, ইরতিদাদ শুধু ধর্মান্তরিত হওয়া বা প্রকাশ্যে আল্লাহ তায়ালা ও রাসূলের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করার নামাই নয়; দীনের মৌলিক বিষয়ের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন এবং قَطْعِيُّ الثُّبُوْتِ وَقَطْعِيُّ الدَّلَالَةِ বা সুনিশ্চিতভাবে সাব্যস্ত ও সুস্পষ্ট দ্ব্যর্থহীন হুকুমসমূহের কোনো একটির প্রতি জেনে-শুনে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনও সমানভাবেই কুফর ও ইরতিদাদ।

জ্ঞাতব্য : এখানে দুটি ব্যাপার লক্ষণীয়। প্রথমত কুফর ও ইরতিদাদ কেবল তখনই হয়, যখন শরিয়তের কোনো বা নিশ্চিত বিধানের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা হয় বা তা অবশ্যকরণীয় বলে বিশ্বাস না থাকে। কিন্তু কেউ যদি তা অবশ্য পালনীয় বলে বিশ্বাস ও স্বীকার করে, কিন্তু আলস্য বা গাফলতির কারণে তার উপর আমল না করে, তবে তাকে কুফর ও ইরতিদাদ বলা যাবে না। যদি সে ব্যক্তি সারা জীবনের মধ্যে একবারও তার উপর আমল না করে, তবু তাকে মুসলমানই বলা হবে, কাফির বা মুরাতাদ বলা চলবে না।

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তা অবশ্য পালনীয় বলে অন্তরে বিশ্বাস পোষণ করে না, সে ব্যক্তি সারা জীবনও যদি তার আমল করে, তবু সে মুরতাদ বলেই গণ্য হবে। উদাহরণত এক ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত নামায যত্নসহ আদায় করে; কিন্তু ফরয বলে স্বীকার করে না, তা হলে সে ব্যক্তি কাফির বলে গণ্য হবে। আরেক ব্যক্তি একে ফরয বলে স্বীকার করে, কিন্তু কখনো নামায আদায় করে না, সে ফাসেক ফাজের ও মারাত্মক গুনাহগার বটে; কিন্তু সে মুসলমানই, কাফির বা মুরতাদ নয়।

দ্বিতীয়ত লক্ষণীয় হল, প্রামাণ্যের পার্থক্যে শরিয়তের বিধি-বিধানও বিভিন্ন প্রকারে বিভক্ত হয়ে যায়। এ বিষয়ে সব বিধানের হুকুম এক নয়। কুফর ও ইরতিদাদ শুধু সেই ধরনের হুকুমকে অগ্রাহ্য করলেই হয়ে থাকে, যা قَطْعِيُّ الثُّبُوْت নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত এবং যা قَطْعِيُّ الدَّلَالَة তথা সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন।

قَطْعِيُّ الثُّبُوْت নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত বলতে কেবল সেসব বিধান বা হুকুমই উদ্দেশ্য, যা কুরআন শরিফ এবং এমন হাদিস দ্বারা প্রমাণিত, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগ থেকে আজ পর্যন্ত প্রত্যেক যুগে প্রত্যেক স্তরে এত বেশিসংখ্যক লোক মারফত প্রচারিত হয়ে আসছে, যাঁদের সকলে একটি মিথ্যার ব্যাপারে একমত হতে পারেন বলে বিশ্বাস করা সুকঠিন। হাদিসের পরিভাষায় এরূপ হাদিসকে মুতাওয়াতির হাদিস বলা হয়ে থাকে।

قَطْعِيُّ الدَّلَالَة সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন বলতে বুঝানো হয়েছে, কুরআন শরিফের যে আয়াত বা মুতাওয়াতির হাদিসের যে ভাষ্য দ্বারা সেই বিধানটি প্রমাণিত, তার অর্থ এতই সুস্পষ্ট যে, তার অন্যরূপ ব্যাখ্যা করা বা অর্থ বিকৃত করার কোনো অবকাশ নেই।

তারপর আবার এ ধরনের আহকাম বা বিধি-বিধান যদি মুসলমান জাতির প্রত্যেক স্তরের লোকের মধ্যে এ পরিমাণ সুবিদিত ও সুপরিচিত থাকে যে, তা

জানার জন্য তেমন কোনো বিশেষ বিদ্যাশিক্ষা বা আয়াস স্বীকারের প্রয়োজন হয় না বরং মুসলমানগণের বংশপরম্পরায়ই তা জানা থাকে। যেমন– নামায, রোযা, হজ, যাকাত ফরজ হওয়া বা চুরি ও মদ্যপান ইত্যাদি হারাম হওয়া, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শেষ নবী হওয়া প্রভৃতি। শরিয়তের এ জাতীয় احكام قطعية বা নিশ্চিত বিধানসমূহকে বলা হয় দীনের অপরিহার্য বিষয়াবলি। যেসব ব্যাপার সেরূপ মশহুর বা সুবিদিত নয়, সেগুলোকে অপরিহার্য বিষয় বলা যায় না। শুধু احكام قطعية বা নিশ্চিত বিধান বলা হয়।

উক্ত দুই প্রকার বিধানের মধ্যে পার্থক্য হল– প্রথম প্রকার অর্থাৎ দীনের অপরিহার্য বিষয়াবলিকে কোনো ব্যক্তি অবজ্ঞা বা অগ্রাহ্য করলে সে ব্যক্তি সর্বসম্মতভাবে কাফির হবে, অজ্ঞতার আপত্তি এখানে চলবে না বা অন্যরূপ ব্যাখ্যাও চলবে না।

পক্ষান্তরে যেসব বিধান সুপ্রমাণিত, কিন্তু ততটা মশহুর বা সুবিদিত নয় (قَطْعِيَّاتٍ مَحْضَةٌ), সে ব্যাপারে হানাফি মাযহাবের মত হল—কোনো সাধারণ মানুষ অজ্ঞতাবশত যদি তা অস্বীকার করে বসে, তা হলে সাথে সাথে তাকে কাফির বলা হবে না। প্রথমে তাকে তাবলিগ করে বুঝাবে, বিষয়টি দলিল-প্রমাণাদির দ্বারা সুপ্রমাণিত। এর অর্থও সুস্পষ্ট দ্ব্যর্থহীন। সুতরাং এমন একটি বিষয়কে অস্বীকার করা যায় না। তদুপরি যদি সে ব্যক্তি তা অস্বীকার করে এবং তাতে অটল থাকে তবেই তাকে কাফির বলে ফতওয়া দেওয়া হবে।

ইমাম ইবনে হুমাম রহ. তাঁর বিখ্যাত আল-মুসামারায় লিখেন : শরিয়তের যে হুকুম সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত; কিন্তু দীনের অপরিহার্য বিষয়াবলির পর্যায়ে পড়ে না, যেমন উত্তরাধিকারের ব্যাপারে যদি কেউ নিজ কন্যা ও পৌত্রী রেখে যায়, তবে গোটা মুসলিম জাতির সর্বসম্মত মতে পৌত্রীর প্রাপ্য পরিত্যক্ত সম্পদের এক-ষষ্ঠাংশ। বাহ্যিক অর্থে হানাফিদের মতে এ বিধান যে অস্বীকার করবে, তাকে কাফির বলা হবে। কেননা এ বিধানটি قَطْعِيُّ الثُّبُوْت তথা অকাট্য দলিল দ্বারা সুপ্রমাণিত। আর হানাফিগণ قَطْعِيُّ الثُّبُوْت তথা অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত হওয়া ছাড়া আর কোনো শর্ত প্রয়োগ করেন না। কিন্তু হানাফিদের এ মত কেবল সেক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, যেখানে অস্বীকারকারী ব্যক্তি তা قَطْعِيُّ الثُّبُوْت বা অকাট্য দলিল দ্বারা সুপ্রমাণিত বলে জানে। [আল্ মুসামারা-১৪৯]

**মোদ্দাকথা :** যেভাবে ধর্মান্তরিত হওয়াকে কুফর ও ইরতিদাদ (মুরতাদ হওয়া) বলে, তেমনি ধর্মের অপরিহার্য বিষয়াবলি ও সুনিশ্চিতভাবে ইসলাম বলে বিদিত যে কোনো বিষয় অস্বীকার বা অগ্রাহ্য করলে অথবা تأويل তথা

সুবিদিত অর্থ গ্রহণের পরিবর্তে মনগড়া ভিন্ন অর্থ করলে—যদ্বারা তার আসল উদ্দেশ্যই প- হয়ে যায়, তাও কুফর ও ইরতিদাদ বলে গণ্য। এ দ্বিতীয় প্রকার ইরতিদাদকে পবিত্র কুরআনের ভাষায় বলা হয়েছে 'ইলহাদ'। ইরশাদ হচ্ছে,

إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا

"যারা আমার আয়াতসমূহকে ইলহাদ করে, তারা আমার নিকট থেকে গোপনীয়তা অবলম্বন করতে পারবে না।" [সূরা হা-মিম সাজদা-৪০]

হাদিসে এ জাতীয় ইরতিদাদকে বলা হয়েছে 'যান্দাকা'। যেমন মাজমাউল বিহার এর সংকলক হযরত আলী রাযি.-এর বর্ণনা বলে উদ্ধৃত করেন, হযরত আলী রাযি.-এর সমীপে কিছুসংখ্যক যিন্দিককে গ্রেফতার করে আনা হল।

যানাদিকা হচ্ছে যিন্দিক শব্দের বহুবচন। আর যিন্দিক সেসব লোককে বলা হয়, যারা দীনের ইলহাদ বা বিকৃত অর্থ করে। এখানে যানাদিকা বলতে ইসলামত্যাগী একদল মুরতাদের কথা বোঝানো হয়েছে।

[মাজমাউল বিহার-৬৯৫]

দার্শনিক ও ফকিহগণ এ বিশেষ ধরনের ইরতিদাদকে বাতিনিয়াত বলেন। আবার কখনো কখনো তাঁরাও এটাকে যান্দাকা বলে অভিহিত করেন।

শরহে মাকাসিদে আল্লামা তাফতাজানি রহ. কুফরের প্রকরণ প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন : সুস্পষ্ট হয়ে গেল, যে ব্যক্তি মুমিন নয়, সেই কাফির পদবাচ্য। এখন যদি সে নিজেকে মুসলমান বলে বাহ্যত দাবি করে, তা হলে এমন ব্যক্তিকে মুনাফিক বলা হবে। আর যদি মুসলমান হওয়ার পর কুফরিতে লিপ্ত হয়, তবে তাকে বলা হবে মুরতাদ। কেননা সে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে গেছে। আর যদি সে ইহুদি ধর্ম, খ্রিষ্টধর্ম প্রভৃতি রহিত ধর্ম অবলম্বন করে, তবে তাকে বলা হবে কিতাবি। যদি সে ব্যক্তি মনে করে যে, এ বিশ্ব চরাচর অনাদিকাল থেকে (কোনো স্রষ্টা ও নিয়ন্তা ছাড়াই) এমনিতেই চলে আসছে এবং যুগচক্রেই সব এমনিতে ঘটে চলেছে, তবে তাকে বলা হবে দাহ্‌রিয়া। আর যদি সে স্রষ্টার অস্তিত্বই আদৌ স্বীকার না করে, তবে তাকে বলা হবে মুয়াত্তিল। যদি নবী ﷺ-এর নবুওয়ত এবং ইসলামের প্রতীকরূপী রোযা-নামাযের স্বীকারোক্তির সাথে সাথে এমন কিছু বিশ্বাসও পোষণ করে, যা সর্বসম্মতভাবে কুফর বলে স্বীকৃত, তবে এমন ব্যক্তিকে বলা হবে যিন্দিক। [শরহে মাকাসিদ : ২/২৬৮]

যিন্দিকের সংজ্ঞা বর্ণনাকালে বলা হয়েছে : সে তার বাতিল বিশ্বাস অন্তরে পোষণ করে, তার অর্থ এটা নয় যে, মুনাফিকদের মতো তার অন্তরের বিশ্বাস সে গোপন রাখে বরং তার অর্থ হল, সে তার কুফরি আকিদা-বিশ্বাসগুলোকে ইসলামের ছদ্মাবরণে চাকচিক্যময় করে পেশ করে।

আল্লামা শামী রহ. বলেন, যিন্দিক তার ধর্মদ্রোহী মতকে নিখুঁত রূপ দিতে ও প্রতিষ্ঠিত করতে আগ্রহী থাকে এবং সে তাকে নিখুঁতরূপে পেশ করে। যিন্দিকের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয়, সে তার কুফর গোপন করে। তার অর্থ হল– সে তার কুফরকে এমনভাবে পেশ করে যে, মানুষ তার ব্যাপারে বিভ্রান্ত হয়। এজন্য তার কুফর গোপন করা প্রকাশ করার নামান্তর। [শামী-৩/৪৫৮]

কুফরের উপর্যুক্ত প্রকারসমূহের মধ্যে শেষোক্ত কুফর আমাদের আলোচ্য ও প্রতিপাদ্য। এ সম্পর্কে শরহে মাকাসিদ-এর বর্ণনায় সুস্পষ্ট হয়ে গেছে, যেমনি প্রাগুক্ত কুফরের অন্যান্য প্রকারসমূহ কুফর, ঠিক শেষ প্রকারের কুফরও এ পর্যায়ের কুফর যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রিসালাত এবং কুরআন শরিফের বিধি-বিধান মেনে নেওয়া এবং মুখে মুসলমানির দাবি ও কার্যত কড়াকড়িভাবে ইসলামের সমুদয় আহকাম-আরকান মেনে চলা সত্ত্বেও কিছু কিছু আহকাম-আকাইদের বিরোধিতার দরুন কাফির ও মুরতাদ হয়ে যাবে।

**একটি সন্দেহ নিরসন**

একটি কথা সর্বসাধারণ্যে প্রসিদ্ধ আছে, আহলে কিবলা কোনো ব্যক্তিকে কাফির সাব্যস্ত করা জায়েয নয়। ফিক্‌হ ও আকাইদের কিতাবসমূহেও এরূপ কথা রয়েছে। কোনো কোনো হাদিস দ্বারাও এ মাসআলাটি প্রমাণিত আছে। যেমন, আবু দাউদ শরিফে জিহাদ প্রসঙ্গে আছে। হযরত আনাস রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, ঈমানের আসল কথা হচ্ছে তিনটি। (যথা—)

১. যে ব্যক্তি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর স্বীকারোক্তি করে, তাকে হত্যা করো না।

২. কোনো গুনাহের দরুন তাকে কাফির বলো না।

৩. কোনো মন্দ আমলের জন্য তাকে ইসলামের গণ্ডির বাইরে ঠেলে দিও না।

তাই প্রতিপাদ্য বিষয়ে অনেকের মনে সন্দেহ জাগে, যে ব্যক্তি রোযা-নামাযে যত্নশীল, সে তো আহলে কিবলাভুক্ত; তা হলে কোনো কোনো আকিদায় বিরোধিতা করলে বা দু-চারটি আহকাম অগ্রাহ্য করলে তাকে কিভাবে কাফির বলা হবে? এ সন্দেহের বশবর্তী হয়ে অনেক মুসলমানই আজকাল এ দ্বিতীয় পর্যায়ের কাফির তথা মুলহিদ ও যিন্দিকদেরকে মুরতাদ-কাফির মনে করেন না। এটা এমন একটি মারাত্মক ভুল যে, এর প্রতিক্রিয়া সরাসরি ইসলামের উপর এসে পড়ে। কেননা আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করে এসেছি, যদি এ দ্বিতীয় পর্যায়ের কুফরকে কুফর বলে স্বীকার না করা হয়, তবে স্বয়ং ইবলিসও আর কাফির থাকে না।

এজন্য বিস্তারিত আলোচনা করে সন্দেহ নিরসন করা প্রয়োজন। শরহে ফিক্‌হ আকবর প্রভৃতি গ্রন্থে ইমাম আযম হযরত আবু হানিফা রহ.-এর সূত্রে এবং শরহে আকাইদের হাশিয়ায় শায়খ আবুল হাসান আশয়ারি রহ.-এর সূত্র ধরে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের নীতি উদ্ধৃত করা হয়েছে, 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মূলনীতি হচ্ছে, কোনো আহলে কিবলা ব্যক্তিকে কাফির বলা যাবে না। শরহে আকাইদে নাসাফি ও শরহে তাহ্‌রির-৩/৩১৮ পৃষ্ঠায় রয়েছে, এ অভিমতটি ইমাম আবু হানিফা থেকে বর্ণিত হয়েছে, কোনো গুনাহের দরুন আমরা কোনো আহলে কিবলা ব্যক্তিকে কাফির বলব না। এ বাক্যে 'গুনাহের দরুন' শর্তটি আছে। মনে হয়, একটু আগে বর্ণিত আবু দাউদ শরিফের উক্ত হাদিসটির ভিত্তিতেই তিনি এ কথাটি বলেছেন। এর বিশুদ্ধ অর্থ হল, কোনো গুনাহের কাজে লিপ্ত হওয়ার দরুন কোনো মুসলমানকে কাফির বলে অভিহিত করো না। চাই তার গুনাহ যতই মারাত্মক হোক না কেন। তবে শর্ত হল, সেই গুনাহ যেন কুফর ও শিরক না হয়। কেননা গুনাহ বলতে এখানে সেসব গুনাহ উদ্দেশ্য, যা কুফরের আওতায় পড়ে না।

যেমন, হাফেয ইবন তাইমিয়া রহ.-এর কিতাবুল ঈমানে আছে– আমরা যখন বলি—আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত এ ব্যাপারে একমত যে, কোনো ব্যক্তিকে কোনো বিশেষ গুনাহের দরুন কাফির বলা যাবে না, তখন আমরা যা বুঝিয়ে থাকি, তা হল—কাউকেও যিনা বা মদ্যপান প্রভৃতি গুনাহের জন্য কাফির বলা যাবে না। আল্লামা কুনাভী তার শরহে আকিদায়ে তহাবি কিতাবে এটা বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। নাহয় (ফিকহে আকবর ও শরহে তাহ্‌রিরের উদ্ধৃতিসহ উপরে বর্ণিত) বাক্য অর্থহীন হয়ে পড়ে এবং 'গুনাহের দরুন' বলার কোনো অর্থই হয় না।

আসলে সন্দেহের সূত্রপাত হয়েছে যে কারণে, তা হল—কেনো কোনো আলেম বিষয়টি সর্বজনবিদিত থাকায় 'গুনাহের দরুন' অংশটি তাঁদের রচনায় বাক্যসংক্ষেপ করার উদ্দেশ্যে ছেড়ে দিয়েছেন। ফলে শেষ পর্যন্ত তা হয়ে দাঁড়িয়েছে আহলে কিবলাকে কাফির বলা চলে না। হাদিস ও ফিকহ সম্পর্কে অজ্ঞ ও শরিয়তের স্পিরিট সম্পর্কে বেখবর লোকেরা এতে ধরে নিয়েছে, যে কেউ কিবলার দিকে মুখ করে নামায আদায় করবে তাকে আর কাফির বলা চলবে না—সে যত কুফরি আকিদা-বিশ্বাসই পোষণ করুক এবং যত কুফরি কথাই উচ্চারণ করুক না কেন। এ অর্থকে সুঠিক বলে ধরে নিলে দুনিয়ায় আর কাফির বলে কেউ থাকতে পারে না। কেননা কখনো কখনো প্রত্যেকেই কিবলামুখী হয়ে থাকে—চাই নামায আদায় করুক বা না করুক।

আর একথা বলাই বাহুল্য যে, আহলে কিবলা বলতে সর্বক্ষণ কিবলামুখী হয়ে থাকা লোককে বুঝানো হতে পারে না। সুতরাং মাঝে মধ্যে কিবলামুখী হলেই সাধারণভাবে আহলে কিবলা বলা যেতে পারে।

এখানে ভালোমতো বুঝে নিন যে, আহলে কিবলা একটি শরয়ি পরিভাষা। এর অর্থ আহলে ইসলাম বা ইসলামপন্থি। আর আহলে ইসলাম ও আহলে কিবলা সেই লোকই হতে পারে, যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আনীত বলে প্রমাণিত সকল ব্যাপারেই ঈমান রাখে। এর অর্থ কখনো কিবলার দিকে মুখ করে থাকা ব্যক্তি হতে পারে না। যেমনি দুনিয়ার কোর্ট-কাচারীতে কর্মচারী বলতে সেসব লোকই বুঝায়, যারা যথারীতি চাকরিজীবী এবং যারা চাকরির নিয়ম-কানুন মেনে চলেন। তার আভিধানিক অর্থানুসারে যে কোনো কাজ করলেই কর্মচারী বলা যাবে না। এ বক্তব্য ফিক্‌হ ও আকাইদের প্রায় সমস্ত কিতাবেই লিপিবদ্ধ আছে। নিম্নে কয়েকটি উদ্ধৃতি লক্ষ্য করুন!

হযরত মোল্লা আলী কারী রহ. শরহে ফিকহে আকবরে লিখেন– জেনে রেখো! আহলে কিবলা বলতে সেসব লোককেই বুঝানো হয়, যারা পৃথিবীর নশ্বরতা, পরকালে সশরীরে পুনরুত্থান এবং সর্ববিষয়ে (কুল্লিয়াত ও জুযিয়াত) আল্লাহ পাকের সম্যক জ্ঞান ও দীনের ইত্যকার মৌলিক বিষয়াবলি একবাক্যে বিশ্বাস করে। তাই যে ব্যক্তি ইবাদত-বন্দেগি ও শরিয়তের আনুগত্যের মধ্য দিয়ে দীর্ঘজীবন অতিবাহিত করেছে অথচ বিশ্বাস পোষণ করেছে, এ পৃথিবী অবিনশ্বর, পরকালে সশরীরে পুনরুত্থান হবে না এবং সর্বব্যাপারে আল্লাহ তায়ালার সম্যক জ্ঞান নেই—এমন ব্যক্তি আহলে কিবলা পদবাচ্য নয়। তাই আহলে কিবলা কোনো ব্যক্তিকে কাফির বলা যাবে না বলতে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত যা বুঝিয়ে থাকেন, তা হলো যতক্ষণ পর্যন্ত তার মধ্যে কুফরের কোনো আলামত পাওয়া না যাবে বা তার দ্বারা কোনো কুফরি কার্যকলাপ সংঘটিত না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এমন ব্যক্তিকে কাফির বলা যাবে না।

শরহে মাকাসিদে উক্ত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার পর লিখেন– আহলে কিবলার মধ্যে কোনো ব্যক্তি দীনের মৌলিক জরুরি বিষয়াবলির যে কোনো বিষয়কে অগ্রাহ্য বা অস্বীকার করলে সারা জীবন ইবাদত-বন্দেগি ও শরিয়তের আনুগত্যের মধ্য দিয়ে কাটালেও যে সে ব্যক্তি কাফির—এ বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই। [শরহে তাহ্‌রির-১/৩৭৭]

শরহে আকাইদে নাসাফির শরহে নিবরাস এর ৫৭২ পৃষ্ঠায় আছে : দার্শনিকদের পরিভাষায় আহলে কিবলা বলতে সে ব্যক্তিকেই বোঝানো হয়ে থাকে, যে দীনের জরুরি ও মৌলিক বিষয়াবলিকে সত্য বলে জানে। কোনো

ব্যক্তি যদি ইবাদত-বন্দেগিতে নিমগ্নও থাকে আর জরুরি মৌলিক বিষয়াবলির কোনো একটি বিষয়কেও অগ্রাহ্য করে, তবে সে আহলে কিবলা বলে গণ্য হবে না। অনুরূপ যার মধ্যে কুফরের কোনো আলামত বা লক্ষণ পাওয়া যায় কিংবা কুফরি কোনো কার্য তার দ্বারা সংঘটিত হয়—যেমন : সে মূর্তিপূজা করল বা শরিয়তের কোনো বিধানের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করল বা তা নিয়ে উপহাস করল, এমন ব্যক্তি আহলে কিবলার অন্তর্ভুক্ত নয়। আহলে কিবলাকে কাফির বলা যাবে না বলতে যা বোঝানো হয়েছে তা হল, কোনো গুনাহের জন্য বা শরিয়তের এমন সব ক্ষুদ্র ব্যাপার, যা সর্বজনবিদিত নয়, অজ্ঞতাবশত তা অগ্রাহ্য করলে কোনো ব্যক্তি কাফির হবে না।

**সতর্কবাণী**

কোনো মুসলমানকে কাফির বলা না-বলার ব্যাপারে আজকাল অত্যাধিক বাড়াবাড়ি পরিলক্ষিত হয়। একশ্রেণির লোক সামান্য কারণেই মুসলমানদের কাফির বলে আখ্যায়িত করে। যেন কাফির ফতওয়া দেওয়াই তাদের পেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এরা শরিয়তের খেলাফ একটু কিছু দেখলেই যে কাউকে ইসলাম থেকে খারিজ করে দেয়!

অপরদিকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত একদল বল্গাহীন লোক আছে, যাদের মতে ইসলামি আকিদা ও বিশ্বাসের ঘোর বিরোধিতা করলেও কোনো ব্যক্তি কাফির হয় না। তারা এমন ব্যক্তিকেও মুসলমান বলে মেনে নেওয়া ফরজ জ্ঞান করে, যারা নিজেকে মুসলমান বলে দাবি করে; চাই লোকটির আকিদা-বিশ্বাস ও আচার-আচরণ ইসলামের ঘোর বিরোধীই হোক বা সে ইসলামের মৌলিক বিষয়বালিকেই অগ্রাহ্য করেই বসুক না কেন!

বস্তুত একজন মুসলমানকে কাফির বলা যেমন বিপজ্জনক, তেমনি একজন কাফিরকে মুসলামান বলাও কম বিপজ্জনক নয়। কেননা এতদুভয় অবস্থায়ই ইসলাম ও কুফরের গণ্ডি লঙ্ঘন হয়। এজন্যই ধর্মবেত্তা আলেমগণ এ বিষয়ে সর্বদা কঠোর সতর্কতা অবলম্বন করে এসেছেন। কাজেই কোনো মুসলমানকে কাফির বলার ব্যাপারে তাঁরা লিখেছেন—কোনো ব্যক্তি যদি শরিয়ত বিরোধী কোনো উক্তি করে আর ওই উক্তিটির বিভিন্ন অর্থ হয় এবং সকল অর্থেই তার উক্তিটি কুফরি হয়; কিন্তু কোনো দূরতম অর্থে একটি ইসলামসম্মত ব্যাখ্যা দেওয়া যায় আর সে লোকটি নিজে এ ব্যাখ্যার বিরোধিতা না করে, তা হলে মুফতির জন্য ওই দূরতম অর্থটিই গ্রহণ করে তাকে মুসলমান বলে ফতওয়া দেওয়া ওয়াজিব। অনুরূপ কোনো মুসলমান যদি এমন কোনো বিশ্বাস পোষণ

করে বলে প্রকাশ পায়, অধিকাংশ আলেম যাকে 'কুফরি' ফতওয়া দিয়েছেন, কিন্তু কোনো কোনো ইমাম তা কুফরি নয় বলেও মত প্রকাশ করেছেন, তবে এ বিতর্কিত বিশ্বাসের জন্যও কোনো মুসলমানকে কাফির বলা জায়েয নয়।

[রদ্দুল মুহতার; জামেউল ফুসুলাইন-কালিমাতুল কুফর অধ্যায়; আল বাহরুর রায়েক, ৫ম খণ্ড, মুরতাদ অধ্যায়]

অপরদিকে যে ব্যক্তি প্রকৃতই ইসলামচ্যুত মুরতাদ বা কাফির হয়ে গেছে, তাকে স্পষ্টভাবে কাফির বলে অভিহিত করতে দ্বিধাবোধ করা বা এ ব্যাপারে শিথিলতা প্রদর্শন করাও যে ইসলামের মূলনীতিকেই পঙ্গু করে দেওয়া বৈ নয়, তাও সাহাবায়ে কিরামের কর্মপদ্ধতি দ্বারা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওফাতের পর যারা মুরতাদ হয়েছিল, তাদের ধর্মচ্যুতিও ছিল এ দ্বিতীয় প্রকারের ইরতিদাদ; প্রকাশ্যে ধর্মান্তর ছিল না; কিন্তু এতদসত্ত্বেও হযরত আবু বকর রাযি. তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ পরিচালনা অতি জরুরি জ্ঞান করেছিলেন। সময়টা জিহাদের উপযুক্ত কি-না এবং মুসলমানরা এখন কত দুর্বল, সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করলেন না।

অনুরূপ নবুওয়তের দাবিদার মুসায়লামা কাযযাব এবং তার অনুসারীদের বিরুদ্ধে তিনি জিহাদ পরিচালনা করেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ সাহাবায়ে কেরাম তাতে অংশগ্রহণও করেন। ফলে তাঁদের ইজমা ও ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল— যে ব্যক্তি খতমে নবুওয়ত বা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শেষ নবী হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করে বা নিজেই নবুওয়াতের দাবি করে বসে, সে কাফির; যদিও সে রোযা-নামায প্রভৃতি আরকানে ইসলামের পূর্ণ অনুসারী এবং আবেদ-যাহেদ তথা সুফী-দরবেশও হয়ে থাকে।

সুতরাং কাউকে 'কাফির' আখ্যা দিতে হলে শরিয়তের নির্ধারিত মূলনীতি হল, যতক্ষণ পর্যন্ত কারো উক্তিকে ইসলামসম্মত সাব্যস্ত করার অবকাশ থাকে এবং সে নিজে এর বিপরীত অর্থ প্রকাশ না করে অথবা তার আকিদা কুফরি আকিদা হওয়া সম্পর্কে মুজতাহিদ আলেমদের মধ্যে সামান্যতম দ্বিমতও থাকে, তবে সে ব্যক্তিকে কাফির বলা যাবে না। কিন্তু কোনো ব্যক্তি যদি দীনের অপরিহার্য বিষয়াবলির কোনো একটি বিষয়ও অগ্রাহ্য করে কিংবা তার সর্বসম্মত অর্থের বিপরীত কোনো বিকৃত অর্থ প্রকাশ করে, তাকে কাফির বলে আখ্যায়িত করতে একটুও দ্বিধাবোধ করা উচিত নয়।

**খুব সাবধান!**

আলোচ্য বিষয়ে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে, এ মাসআলাটি অত্যন্ত জটিল। এ ব্যাপারে ভ্রূক্ষেপহীনতা বা তড়িঘড়ি করে মন্তব্য করে বসা অত্যন্ত

বিপজ্জনক। মাসআলার দু' দিকই অত্যন্ত সতর্কতার দাবিদার। কেননা যেমনি কোনো মুসলমানকে কাফির বলা একটি মারাত্মক বিষয় এবং হাদিসের বর্ণনা অনুযায়ী এরূপ উক্তিকারীর নিজেই কাফির হয়ে যাওয়ার সমূহ আশঙ্কা আছে, তেমনিভাবে কোনো কাফিরকে মুসলমান বলা বা মনে করাও তদপেক্ষা কম বিপজ্জনক নয়। যেমনটি শিফার উদ্ধৃতিতে উক্ত হয়েছে।

এ মাসআলার জটিলতা প্রসঙ্গে কাজি ইয়ায রহ. 'শিফা'য় বলেন– আব্দুল হকের প্রশ্নের জবাবে আবুল মায়ালি এ অভিমতই ব্যক্ত করেছেন। আব্দুল হক তাঁকে এ প্রশ্ন করলে তিনি জবাবদানে নিজের অপারগতা প্রকাশ করে বলেন, এ বিষয়ে ভুল-ভ্রান্তি অত্যন্ত বিপজ্জনক। কেননা কোনো কাফিরকে মুসলমান শ্রেণিভুক্ত আখ্যায়িত করা কিংবা কোনো মুসলমানকে কাফির বলে আখ্যায়িত করে মুসলিম সমাজ বহির্ভূত করা ধর্মের দৃষ্টিতে অত্যন্ত গুরুত্বর ব্যাপার।'

[শরহে শিফা]

এজন্যই এতটুকু সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে যে, যখন কোনো ব্যক্তির একটি বিভিন্ন অর্থবোধক উক্তি সম্মুখে আসে, যার সব ক'টিতে তার কুফরি আকিদা-বিশ্বাস প্রকাশ পায়; কিন্তু কেবল একটি অর্থ তার এমনও আছে, যা শরিয়তসম্মত, শরিয়তের বিরোধী নয়, তবে সেই অর্থটি দুর্বল হলেও মুফতি ও কাজি সাহেবের অবশ্য কর্তব্য হল—তার সেই উক্তিটিকে শুদ্ধ অর্থে গ্রহণ করে তাকে মুসলমান বলে ফতওয়া দেওয়া। (যেমনটি রয়েছে শিফা, বাহর ও জামিউল ফুসুলাইন কিতাবে।) অপরদিকে যার কাফির হওয়া সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়ে যায়, তাকে কাফির আখ্যা দিতে বিলম্ব বা তার অনুসারীদেরকে কাফির বলতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করাও উচিত নয়। ধর্মবিদ আলেমগণের উপরিউক্ত উক্তিসমূহের দ্বারা সুস্পষ্টভাবে এটাই প্রমাণিত হয়েছে।

**উপসংহার**

উপরিউক্ত বর্ণনা ও ফতওয়া কেবল সেই ব্যক্তি ও দলের উপরই প্রযোজ্য যারা বা যাদের উক্তরূপ উক্তি বা বিশ্বাসের কথা সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়। কিন্তু যদি এ ব্যাপারে সন্দেহ উপস্থিত হয় যে, প্রকৃতপক্ষে সেই ব্যক্তি এরূপ কথা বলেছে কি-না বা এরূপ আকিদা-বিশ্বাস সত্যি সত্যই পোষণ করে কি-না, তখন তার ব্যাপারে ইমদাদুল ফতওয়ায় নির্দেশিত পন্থা গ্রহণই নিরাপদ। মাসআলাটির উপসংহারে নিম্নে তা হুবহু উদ্ধৃত করা হল :

যদি কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা বিশেষ দলের কাফির হওয়া সম্পর্কে সন্দেহ উপস্থিত হয়, চাই সে সন্দেহের কারণ আলেমদের মতানৈক্যই হোক, চাই তা যেসব কারণের দায়ে তাকে কাফির বলা হবে, সেই কারণসমূহের বৈপরিত্যই

হোক, চাই নীতিগত জটিলতাই হোক—সর্ববস্থায় নিরাপদ ব্যবস্থা হল, এমন ব্যক্তিকে কাফির বা মুসলমান কোনোটাই বলা হবে না। কেননা এমতাবস্থায় যদি সে লোকটিকে কাফির বলা হয়, তবে তার ব্যাপারে এটা অসতর্কতা বা বাড়াবাড়ি হয়ে যেতে পারে। আবার যদি মুসলমান বলা হয়, তবে তা অপর দশজন মুসলমানের জন্য ক্ষতিকর বিধায় অন্যরূপ বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে।

সুতরাং উভয়দিক হতেই সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। অর্থাৎ তার সঙ্গে বিবাহ-শাদীর অনুমতি দেওয়া হবে না, তার পিছনে নামায আদায় করা হবে না, তার জবাই করা পশুর গোশত খাবে না এবং তাকে কাফির সাব্যস্ত করে তার সাথে কাফিরসুলভ আচরণও করবে না। সম্ভব হলে তার প্রকৃত অবস্থা যাচাই করবে। যাচাইয়ের পর সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। নচেৎ তার ব্যাপারে পূর্ণ নীরবতা অবলম্বন করে তার ব্যাপারটি আল্লাহ তায়ালার উপর ছেড়ে দিবে। তার হুকুম হবে আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের সন্দেহজনক বর্ণনার হুকুমের অনুরূপ। তাদের সম্পর্কে হাদিস শরিফে বর্ণিত আছে :

لَا تُصَدِّقُوا أَهْلَ الْكِتَابِ، وَلَا تُكَذِّبُوهُمْ، وَلَكِنْ قُولُوا: آمَنَّا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ.

কিতাবীদেরকে তোমরা সত্যবাদী জ্ঞান করো না; আবার মিথ্যাবাদীও প্রতিপন্ন করো না বরং এক্ষেত্রে তোমরা বলবে, আমরা ঈমান আনয়ন করেছি আল্লাহর প্রতি এবং আমাদের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তার প্রতি।

[বুখারি, মাসিক নেয়ামত, মে-২০১৬ খ্রি.]

## মুসলমানের বৈশিষ্ট্যময় গুণাবলি

মুসলমানের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন,

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ.

'মুসলিম তো সে, যার হাত ও মুখ থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে।'

[বুখারি শরিফ হাদিস নং ১০, মুসলিম শরিফ হাদিস নং ১৭১]

মুসলমানি শব্দটি লিখতে আরবিতে সাতটি হরফের দরকার হয়। এ সাত হরফে একজন মুসলমানের সাতটি গুণ বুঝায়। সেগুলো কবির ভাষায় শুনুন!

مسلمانی حروف ہفت دانی ❖ یکے میم است موت خود بدانی

دوم سین سجدہ کردن عفیف است ❖ سوم لام غذا خوردن لفیف است

چہارم میم دیگر آں نواشد ❖ محبت با خدا و مصطفی شد

پنجم شد الف از وے امانت ❁ ششم نون نفی نفس از حرمت

بہفتم یائے یاد حق نور است ❁ کہ یاد حق تسکین قلوب است

সাত হরফের সাতটি গুণে হবে মুসলমান
প্রথম হরফ মীমে বুঝায় মউতের স্মরণ।
সীনে বুঝায় সাজ্‌দা করো আল্লাহর কদমে
হালাল খাবার খেতে হবে বুঝায় হরফ লামে।
মীম হরফটি মুহাব্বতের জেনে রেখো ভাই
আল্লাহ-রাসূল থেকে অধিক প্রিয় কেহ নাই।
পঞ্চম হরফ আলিফ মানে আমানতদার হওয়া
নূন হরফে নিষেধ বুঝায় হারাম পথে যাওয়া।
সপ্তম হরফ ইয়া দিয়ে ইয়াদ লিখতে হয়
ইয়াদ মানে খোদার যিকির অন্য কারো নয়।
আল্লাহ তায়ালার যিকিরে শান্তি আসে মনে
কথাগুলো স্মরণ রাখিও সকল মুসলমানে।

**মোটকথা :** উক্ত সাতটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ :

১. মুসলমান সে তো সর্বদা মৃত্যুকে স্মরণে রাখবে। কোনো ব্যক্তি যদি মনে করে, কিছুক্ষণ পরেই আমার মৃত্যু হয়ে যাবে, সে কখনো অন্যের হক নষ্ট করতে বা অন্য ভাইকে কষ্ট দিতে পারে না। সে কখনো আল্লাহ তায়ালার নাফরমানী করতে পারে না। হাদিসের ভাষ্যমতে তো সেই মুসলমান।

২. মুসলমান তো সেই ব্যক্তি, যে একমাত্র আল্লাহ তায়ালাকে সাজ্‌দা করবে। কেউ আছে মাজারে সাজ্‌দা করে, কবরে সাজ্‌দা করে, পীর সাহেবকে সাজ্‌দা করে, আবার মুসলিম হওয়ার দাবিও করে, কেউ তো আল্লাহকেই মানে না; কিন্তু মুসলিম বলেও চিৎকার করতে থাকে। বিবেকের দুয়ারে এদেরকে মুসলিম তো বলা যাবেই না; বরং মুসলিম না হয়েও মুসলিম দাবি করার জন্য ডাবল শাস্তির উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে।

৩. মুসলমান তো সেই ব্যক্তি, যে সর্বদা হালাল রিযিক ভক্ষণ করবে। উপবাস থাকবে, তবু হারাম খাবে না। এখন তো বিলাসিতার জন্য হারাম উপার্জন করে, হারাম ভক্ষণ করে; অথচ নিজেকে পাক্কা মুসলমান বলে দাবি করে। বিবেকের দুয়ারে তাকে মিথ্যাবাদী বলে সাব্যস্ত করা হয়।

৪. মুসলমান তো সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসূলকে নিজের প্রাণের চেয়ে অধিক ভালবাসে। হযরত উমর রাযি. রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলেছিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনাকে আমার প্রাণ ছাড়া অন্যসব কিছু থেকে অধিক ভালবাসি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, উমর! তুমি মুমিন হওনি। সাথে সাথে হযরত উমর রাযি. বললেন, আমি আমার প্রাণের চেয়ে আল্লাহ তায়ালার রাসূলকে অধিক ভালবাসি। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন বললেন, এখন তুমি মুমিন হলে।

আর আজকাল অনেককে দেখা যায়, তার সম্মুখে আল্লাহর রাসূলকে গালি দেওয়া হচ্ছে; তার শরীরের মধ্যে একটু স্পন্দনও হচ্ছে না; অথচ নিজেকে পাক্কা মুসলিম বলে দাবি করতে থাকে। নিজের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ তায়ালা ও রাসূলের দুশমনদের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছে না। আবার নিজেকে পাক্কা মুসলমান মনে করছে। এমন ব্যক্তিও বিবেকের দুয়ারে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হবে।

৫. মুসলমান তো ওই ব্যক্তি, যে পরিপূর্ণ আমানতদার হয়। নিজের সন্তানের আমানত, সম্পদের আমানত, পরিবারের আমানত, ক্ষমতার আমানত, শরীরের আমানত, এসব আমানত যে ব্যক্তি যথাযথ তার হকদারের কাছে পৌঁছাতে পারবে সে নিজেকে প্রকৃত মুসলমান বলে দাবি করতে পারবে, অন্যথা তার দাবি মিথ্যা বলে বিবেচিত হবে।

৬. মুসলমান তো সেই ব্যক্তি, যে নিজেকে সকল হারাম কাজ থেকে বাঁচিয়ে রাখবে। এখন তো দেখা যায়, সকালে ঘুম থেকে ওঠে হারাম কাজ দিয়ে দিনের শুরু করে। এমনকি অনেকে তো ঘুম থেকেও হারাম ভাবে ওঠে, ঘুমাতে গিয়ে হারাম কাজ করে; অথচ নিজেকে মুসলমান বলে দাবি করে থাকে। এমন দাবিও বিবেকের দুয়ারে মিথ্যা বিবেচিত হয়।

৭. মুসলমান তো ওই ব্যক্তি, যে সর্বদা আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণে রাখে। যদি কেউ সব সময় আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ করে, আল্লাহ তায়ালার যিকিরে লিপ্ত থাকে, সে কখনো পাপ কাজ করতে পারবে না।

মোটকথা, উপর্যুক্ত সাতটি গুণের সমাবেশ ঘটলে তবেই একজন মুসলমান প্রকৃত মুসলমান বলে গণ্য হতে পারে। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে উক্ত গুণগুলো অর্জন করার তাওফিক দান করুন। আমিন!

## ঈমানের পূর্ণতার জন্য চাই পূর্ণ সমর্পণ

কুরআন মাজিদে আল্লাহ তায়ালা গুণবাচক কত নামেই তো নিজ পরিচয় দিয়েছেন। কোথাও রাহমান, কোথাও রাহীম, কোথাও গাফফার, কোথাও কাহহার, কোথাও আযীযুন হাকীম, কোথাওবা গাফূরুন হালীম। অধিক পরিমাণে যে নামগুলো উল্লেখ করা হয়েছে সেসবের মাঝে 'আযীযুন হাকীম' অন্যতম। অর্থাৎ তিনি পরাক্রমশালী। তাঁকে পরাস্ত করার মতো কেউ নেই। তিনি হেকমতওয়ালা, প্রজ্ঞাবান। তাঁর কোনো কাজ কোনো সিদ্ধান্তই হেকমত থেকে খালি নয়।

বিচিত্র এ পৃথিবীতে আমরা বিচিত্র কত কিছু দেখি! প্রতিদিন কত বিচিত্র বিষয়ের মুখোমুখি হই! এর সবই আল্লাহ তায়ালার হেকমত ও প্রজ্ঞার অধীন। আমাদের স্থূল জ্ঞানে আমরা এসবের খুব সামান্যই তৎক্ষণাৎ বুঝে উঠতে পারি। হেকমত কখনো বুঝে আসে কোনো কিছু ঘটে যাওয়ার সামান্য পরে, কখনো দীর্ঘ সময় পরে। কাঙ্ক্ষিত কোনো বিষয় যখন ঘটে, তখন আমাদের খুশির সীমা থাকে না। এর রহস্য ও যৌক্তিকতা বুঝতেও কোনো সমস্যা হয় না। বিপত্তি ঘটে তখনই, যখন অনাকাঙ্ক্ষিত কোনো কিছু ঘটে। কিন্তু অনেক সময় পরে হলেও যখন সেই অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয়টির কোনো কল্যাণময় দিক প্রকাশ পায়, তখন মুমিন বান্দা নিজের অজান্তে বলে উঠে— আল্লাহ তায়ালার পরম করুণা! আল্লাহ তায়ালা যা করেন ভালোই করেন!

এমনটি আমাদের সবার জীবনেই হয়তো কমবেশি ঘটে থাকে। কুরআন মাজিদের বাণী কত স্বচ্ছ ও আলোকময় দেখুন! ইরশাদ হচ্ছে,

عَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسٰٓى اَنْ تُحِبُّوْا شَيْـًٔا وَّهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۞

"তোমরা যা অপছন্দ কর হয়তো তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং যা তোমরা ভালবাস, হয়তো তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আল্লাহ জানেন আর তোমরা জান না।" [সূরা বাকারা-২১৬]

আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে কত বিধান আসে। কত ফয়সালায় তো হয়। তিনি যা চান তা-ই হয়। তাঁর সিদ্ধান্ত প্রতিহত করার মতোও কেউ নেই। আবার তিনি না চাইলে কোনো কিছু করার সাধ্য কারো নেই।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চাচাত ভাই বিশিষ্ট সাহাবি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি.। স্নেহের ভাইকে স্নেহের সুরে তিনি একদিন বললেন–

إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهَ ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ لَكَ، وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ.

কিছু চাইতে হলে আল্লাহ তায়ালার কাছেই চাও! সাহায্য চাইলে আল্লাহ তায়ালার কাছেই সাহায্য চাও। শোনো! পুরো উম্মত যদি তোমাকে কোনো উপকার করতে সংঘবদ্ধ হয়, তবু তারা শুধু ততটুকুই করতে পারবে, যতটুকু আল্লাহ তায়ালা তোমার জন্য লিখে রেখেছেন। আর তারা যদি তোমার কোনো ক্ষতি করতে একজোট হয়, তবু তারা ততটুকুই ক্ষতি করতে পারবে, তোমার যতটুকু ক্ষতি তিনি ফয়সালা করে রেখেছেন।

[তিরমিযি শরিফ, হাদীস নং-২৫১৬]

আল্লাহ তায়ালা নিজেই তো বলেছেন :

وَإِنْ يَّمْسَسْكَ اللهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗٓ إِلَّا هُوَ، وَإِنْ يُّرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِهٖ...الخ

"আর আল্লাহ তোমাকে ক্লেশ দিলে তিনি ছাড়া তা মোচনকারী আর কেউ নেই। আর তিনি যদি তোমার মঙ্গল চান, তা হলে তাঁর অনুগ্রহ রদ করারও কেউ নেই। আপন বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তিনি মঙ্গল দান করেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" [সূরা ইউনুস-১০৭]

পানির মতো সরল বক্তব্য। আল্লাহ তায়ালা চাইলেই হয়, না চাইলে হয় না। যা কিছু হয় তাঁর সিদ্ধান্তেই হয়। যা কিছু হয় না তাঁর সিদ্ধান্তেই হয় না। কিন্তু ওই যে বলে এসেছি—তিনি হাকীম, তিনি প্রজ্ঞাবান, বিধায় আপাত দৃষ্টিতে তাঁর কোনো ফয়সালার রহস্য আমাদের বুঝে না এলেও আমাদের প্রকৃত কল্যাণ তাতেই নিহিত—মনে-প্রাণে এ বিশ্বাস ধারণ করতে হবে এবং এ বিশ্বাসই লালন করে যেতে হবে। আল্লাহ পাকের ফয়সালার সামনে নিজের সবটুকু সমর্পণ করে দিতে হবে।

ইতিহাসের পাতা থেকে একটি উদ্ধৃতি দিই। ষষ্ঠ হিজরিতে মক্কা থেকে হিজরত করে যাওয়ার ছয় বছর পর রাসূলুল্লাহ ﷺ ওমরা পালনের উদ্দেশ্যে সাহাবিদের সঙ্গে নিয়ে মক্কার দিকে রওয়ানা হলেন। কিন্তু মক্কার কাছাকাছি হুদায়বিয়া নামক স্থানে কাফিররা এসে তাদেরকে আটকে দেয়। তখন অল্প সময়ের ব্যবধানে কত কিছু ঘটে গেল!

রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত উসমান রাযি.-কে দূত হিসেবে মক্কায় পাঠালেন। মক্কার কুরাইশ কাফিররা নবী মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর সঙ্গীগণকে ওমরা পালনের

সুযোগ দিতে নারাজ। এদিকে কিভাবে যেন খবর ছড়িয়ে পড়ল—হযরত উসমান রাযি.-কে হত্যা করা হয়েছে। এ খবর শুনে দূত হত্যার বদলা নিতে পূর্ণ উজ্জীবিত মুসলিম শিবির। হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাতে হাত দিয়ে সকলে বাইয়াত গ্রহণ করলেন। দুদিকেই চরম উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল।

এমন পরিস্থিতিতে মক্কার কুরাইশদের পাঠানো প্রতিনিধির সঙ্গে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে একপেশে সন্ধি করতে হয়। বাহ্যত এটাকে দ্বিপাক্ষিক সন্ধিচুক্তি বলা যায় না বরং একে বলতে হয়, কাফিররা মুসলমানদের উপর একটি সন্ধিনামা চাপিয়ে দিয়েছে! বাহ্যত অনেকটা নিচু হয়েই সন্ধির সব শর্ত মেনে নিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ। বিষয়টি সাহাবিদের অনেকেই মেনে নিতে পারছিলেন না।

হযরত উমর রাযি. তো বলেই বসলেন, আপনি কি সত্য নবী নন? আমরা কি সত্যের অনুসারী নই? আমাদের শত্রুরা কি ভুলের অনুসারী নয়? তাই যদি হয়, তবে কেন আমরা আমাদের দীনের বিষয়ে এতটা নীচুতাকে মেনে নিব?

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হাঁ! আমি নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালার রাসূল। আমি তাঁর অবাধ্য হতে পারি না। তিনি আমাকে অবশ্যই সাহায্য করবেন।

হযরত উমর রাযি. বললেন, আপনি কি আমাদের বলেন নি, আমরা কাবা ঘরে যাব। আল্লাহ তায়ালার ঘর তাওয়াফ করব?

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হাঁ! আমি তো তা বলেছি। তবে আমি কি একথা বলেছি যে, তুমি এ বছরই সেখানে যাবে?

হযরত উমর রাযি. বললেন, না!

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তা হলে তুমি অবশ্যই সেখানে যাবে এবং সে ঘর তাওয়াফ করবে। ...

ঘটনার বিবরণ সুদীর্ঘ। যা হোক! সন্ধি করে ফিরে যাওয়ার সময় আল্লাহ তায়ালা ওয়াহি নাযিল করলেন–

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا

"নিশ্চয় আমি তোমাকে দিয়েছি সুস্পষ্ট বিজয়।" [সূরা ফাত্হ-১]

কোনো কোনো সাহাবি তখন অবাক হয়েছিলেন– নিচু হয়ে এভাবে সন্ধি করে ফেরাকেও কি বিজয় বলা যায়! বাহ্যত এটা পরাজয় ছাড়া আর কী! গিয়েছিলেন ওমরা পালনের পবিত্র উদ্দেশ্যে। অথচ শত্রুদের বাধায় ওমরা না করে সন্ধি করে ফিরে আসলেন। সন্ধিতেও ছিল বাহ্যত কিছু অবমাননাকর শর্ত। আর এটাকেই বলা হচ্ছে বিজয়!

কিন্তু এ সন্ধির সুযোগেই রাসূলুল্লাহ ﷺ নির্বিঘ্নে দাওয়াত পৌঁছে দেওয়ার সুযোগ পান বিভিন্ন রাজা-বাদশাহের দরবারে। অবশেষে মাত্র দুই বছরের ব্যবধানে সেই মক্কা বিজয় হয়! জ্ঞানঘনিষ্ঠ বিখ্যাত সাহাবি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. তাই বলেছেন, 'তোমরা তো মক্কা বিজয়কে বিজয় মনে করে থাক। আর আমরা হুদায়বিয়ার সন্ধিকেই বিজয় মনে করি'।

[তাফ্‌সিরে ইবনে কাছির, সূরা ফাতহ]

সোজা কথা, এ জীবনে আমরা যত কিছুর মুখোমুখি হই না কেন, তা আমাদের কাঙ্ক্ষিত ও প্রত্যাশিত হোক আর অনাকাঙ্ক্ষিত হোক, মেনে নিতে হবে—আমার জন্য এটাই আমার দয়াময় প্রভুর ফয়সালা।

দুনিয়াতে চলতে গিয়ে আমরা নানা ধরনের বিপদের শিকার হতে পারি। ধনসম্পদ, বাড়িঘর, সন্তান-সন্ততি, পরিবার-পরিজন এমনকি নিজের শরীরও দুর্ঘটনার শিকার হতে পারে। বিপদে পড়লে সবর করতেই হবে। আল্লাহর ফয়সালার সামনে নিজেকে পূর্ণরূপে সঁপে দিতে হবে। তা হলে সবরের পথটি সুগম হয়। আবার হয়তো দেখা যাবে, অর্থকড়ির জন্য কিংবা পার্থিব অন্য যে কোনো বিষয়ের জন্য অনেক চেষ্টা করেও সফল হতে পারছি না বা কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য স্পর্শ করতে পারছি না, তখনো এ সান্ত্বনা নিবে—আমার জন্য এটাই আল্লাহ তায়ালার ফয়সালা। আর এটা শুধু সান্ত্বনা নয়, এ সংকটের সমাধানও এতেই নিহিত রয়েছে।

পক্ষান্তরে কেউ যদি নিজেকে আল্লাহ তায়ালার ফয়সালার সামনে সঁপে দিতে না পারে, তা হলে হয়তো সে আক্ষেপ করে মনঃকষ্টে ভুগতে থাকবে। এমনকি একপর্যায়ে (নাউযুবিল্লাহ) সে পরম দয়াময় প্রভুর নামে অভিযোগও করে বসতে পারে—'আল্লাহ কি শুধু আমাকেই দেখেন!' সে এ ধরনের নানা কথাবার্তা বলে বসবে। এভাবে সে নেমে যেতে থাকে অন্ধকার থেকে গভীর অন্ধকারে। সঙ্গে ঈমান হারানোর শঙ্কা তো রয়েছেই। এ শঙ্কা যদি সত্য হয়, তা হলে তো দুনিয়া-আখিরাত সবই গেল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ স্পষ্ট বলেছেন,

مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ رِضَاهُ بِمَا قَضَى اللهُ لَهُ، وَمِنْ شَقَاوَةِ ابْنِ آدَمَ تَرْكُهُ اسْتِخَارَةَ اللهِ، وَمِنْ شَقَاوَةِ ابْنِ آدَمَ سَخَطُهُ بِمَا قَضَى اللهُ لَهُ

আদম সন্তানের একটি সৌভাগ্যের দিক হল, আল্লাহ তায়ালা তার জন্য যে ফয়সালা করেন সে তাতেই সন্তুষ্ট থাকবে। আর আদম সন্তানের দুর্ভাগ্যের বিষয় হল, সে আল্লাহ তায়ালার কাছে কল্যাণ প্রার্থনা করা ছেড়ে

দিবে। তার দুর্ভাগ্যের আরেকটি দিক, আল্লাহ তায়ালা তার জন্য যে ফয়সালা করেন, সে তাতে অসন্তুষ্ট হয়। [তিরমিযি শরিফ, হাদিস নং-২১৫১]

ওয়াহির ফয়সালা—আল্লাহ পাকের ফয়সালা মেনে নেওয়ার মধ্যে আদম সন্তানের সৌভাগ্য নিহিত। আর সে ফয়সালায় অসন্তুষ্ট হওয়ার মাঝে রয়েছে তার দুর্ভাগ্য। কিন্তু তাই বলে কি চেষ্টা-তদবির বা পরম করুণাময়ে দরবারে নিজের কল্যাণ প্রার্থনাও ছেড়ে দিতে হবে? না! বরং মনে রাখতে হবে, চেষ্টা-তদবির ছেড়ে দেওয়ার নাম আল্লাহ তায়ালার সামনে নিজেকে সমর্পণ করা নয়। দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের জন্য সাধ্যমতো যতটুকু চেষ্টা করা যায়, সবই করতে হবে। চেষ্টা যাতে সফল হয়, সেজন্য আল্লাহ তায়ালার দরবারে দুয়া-মুনাজাতেও মগ্ন হতে হবে। নিজের সাধ্যটুকু বিলিয়ে এবং নিজেকে সঁপে দিতে হবে আল্লাহ তায়ালার ফয়সালার সামনে। এরপর মনে করতে হবে— আমার যেটুকু করার আমি করেছি, এবার আল্লাহ তায়ালা যে ফয়সালা করেন আমি তাতেই খুশি। মুমিনের বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে—

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗٓ أَمْرًا
أَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ.

"আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিলে কোনো মুমিন পুরুষ কিংবা কোনো মুমিন নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের অবকাশ থাকে না।"
[সূরা আহযাব-৩৬]

সবশেষে একটি প্রশ্ন—অনাকাঙ্ক্ষিত কিছু যখন ঘটে যায়, তখন তো মন ব্যথিত হয়। অস্থিরতা সৃষ্টি হয়। এগুলো কি সমর্পণের পরিপন্থি? না, কোথাও কোনো কষ্ট পেলে, শরীর-মন-অর্থসম্পদ-পরিবার-পরিজন বিপদে আক্রান্ত হলে মনে অস্থিরতা সৃষ্টি হওয়াটাই স্বাভাবিক। প্রিয়জনের বিরহে মন ব্যথিত হবে এটাই স্বাভাবিক। এ স্বাভাবিকতাকে ইসলাম অস্বীকার করে না। কিন্তু মানবিক এ স্বাভাবিক অস্থিরতার মধ্য দিয়েও কল্যাণের বিশ্বাসের সঙ্গে আল্লাহ পাকের ফয়সালাকে মেনে নিতে হবে। সবরের সঙ্গে এ কল্যাণের বিশ্বাস আর পূর্ণরূপে নিজেকে সমর্পণ ছাড়া যে ঈমানই পূর্ণতা পায় না!
[মাসিক আল-কাউসার]

**নিজেই নিজের ঈমান পরখ করুন!**

এখানে আমরা এমন কিছু কৌশল আপনাকে শিখিয়ে দিব, যার মাধ্যমে আপনি নিজেই ঠিক করে নিতে পারবেন, আপনি আসলেই মুসলমান কি-না? যদি মুসলমান গণ্য হন, তা হলে আল্লাহ তায়ালার দরবারে শোকর আদায়

করবেন। মুসলমান হওয়াতে সন্দেহ থাকলে যে কারণে সন্দেহ তৈরি হয়েছে, সে কারণটির অপনোদন করে আল্লাহর দরবারে খাঁটি মনে তওবা করবেন। ঘটনাক্রমে যদি আপনি সরাসরি অমুসলিমের কাতারে পড়েও যান, তাতেও ভয় নেই। কারণ, আল্লাহ তায়ালা বান্দার তওবা কবুল করার জন্য সদা প্রস্তুত রয়েছেন। সুতরাং তাৎক্ষণিক তওবা করে নিবেন।

আপনি মুসলমান কি-না? এ বিষয়টি ঠিক করার জন্য নিম্নে আমরা প্রকৃত মুসলমানের মৌলিক আকিদা-বিশ্বাস উল্লেখ করছি। এগুলো ভালোভাবে পাঠ করুন। তারপর ভালোভাবে চিন্তা করে দেখুন, কোনো আকিদা আপনার মধ্যে অনুপস্থিত কি-না? কোনো আকিদায় আপনি মুসলমান হিসেবে দুর্বল কি-না? এরপর সে ক্ষতিপূরণ করে প্রকৃত মুসলমান ও মজবুত ঈমানদার হয়ে যান।

## প্রকৃত মুসলমানের মৌলিক আকিদাসমূহ

আপনাকে একজন প্রকৃত মুসলমান হতে হলে নিচের বিষয়গুলো অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে–

১. আল্লাহ তায়ালা এক।
২. তাঁর কোনো শরিক (অংশীদার) নেই।
৩. কোনো কিছুই তাঁর সদৃশ নয়।
৪. তাঁকে অক্ষমকারী কোনো জিনিস নেই।
৫. তিনি ব্যতীত কোনো মাবুদ ও উপাস্য নেই।
৬. তিনি অনাদি, তাঁর কোনো শুরু নেই।
৭. তিনি অবিনশ্বর, তাঁর কোনো শেষ নেই।
৮. তাঁর কোনো ধ্বংসও নেই এবং ক্ষয়ও নেই।
৯. তিনি যা ইচ্ছা করেন, তাই হয়।
১০. মানুষের ধারণা আল্লাহ তায়ালা পর্যন্ত পৌঁছুতে পারে না।
১১. বোধশক্তি তাঁকে উপলব্ধি করতে পারে না।
১২. সৃষ্টিজীব তাঁর সাদৃশ্য অবলম্বন করতে পারে না।
১৩. তিনি চিরস্থায়ী, কখনো মৃত্যুবরণ করবেন না।
১৪. তিনি চিরঞ্জীব; কখনো ঘুমান না।
১৫. তিনি কোনো মাখলুক অযথা সৃষ্টি করেননি।
১৬. তিনি কষ্ট ব্যতীত রিযিকদাতা।
১৭. কোনোরূপ পরোয়া ব্যতীত মৃত্যুদানকারী।
১৮. কোনো কষ্ট ছাড়াই পুনরুত্থানকারী।
১৯. তিনি মাখলুক সৃষ্টির পূর্বে নিজ গুণাবলির সাথে অনাদি।

২০. মাখলুককে সৃষ্টির দ্বারা তাঁর এমন কোনো গুণ বৃদ্ধি পায় নি, যা তাদের সৃষ্টির পূর্বে ছিল না।

২১. যেমনি তিনি নিজ গুণাবলি নিয়ে অনাদি, তেমনি তিনি নিজ গুণাবলিসহ চিরন্তন ও চিরঞ্জীব।

২২. সৃষ্টিজীবকে সৃষ্টি করার পূর্বেও তিনি খালেক; সৃষ্টিকর্তা।

২৩. প্রতিপালিতদের অবর্তমানেও তিনি প্রতিপালনের গুণে গুণান্বিত।

২৪. যেমনি তিনি মৃতদেরকে জীবিত করার পর তাদেরকে জীবনদানকারী, ঠিক তেমনিভাবে তিনি মৃতদের জীবিত করার পূর্বেও এ গুণবাচক নামের (তথা মৃতকে জীবনদানকরা) অধিকারী। এভাবে তিনি সৃষ্টিজীবকে সৃষ্টি করার পূর্বেও খালেক (স্রষ্টা) নামটির অধিকারী ছিলেন।

২৫. তিনি নিজ ইলম দ্বারা সৃষ্টিজীবকে সৃষ্টি করেছেন।

২৬. তিনি মাখলুকের জন্য পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন।

২৭. তিনি তাদের জন্য জীবন-মৃত্যুর সময় ধার্য করেছেন এবং মাখলুককে সৃষ্টি করার পূর্ব থেকেই তাঁর নিকট কোনো বিষয় গোপন ও অস্পষ্ট নেই।

২৮. মাখলুককে সৃষ্টি করার পূর্বেই তারা যা করবে, তা তিনি জানেন।

২৯. তিনি মাখলুককে নিজ আনুগত্যের নির্দেশ দিয়েছেন এবং তাঁর অবাধ্যতা করতে নিষেধ করেছেন।

৩০. সবকিছু তাঁর ক্ষমতায় পরিচালিত হয়।

৩১. তাঁর ইচ্ছায় সবকিছু কার্যকর হয়।

৩২. আল্লাহ তায়ালার চাওয়ার বাইরে বান্দার কোনের চাওয়া নেই। সুতরাং তিনি তাদের জন্য যা চান, তাই হয়। আর যা চান না, তা হয় না।

৩৩. তিনি নিজ অনুগ্রহে যাকে ইচ্ছা হেদায়েত দান করেন এবং রক্ষা করেন ও বিপদমুক্ত করেন।

৩৪. তিনি ইনসাফস্বরূপ যাকে ইচ্ছা তাকে পথভ্রষ্ট করেন এবং তার থেকে সাহায্য তুলে নেন এবং তাকে বিপদাপদে লিপ্ত করেন।

৩৫. সকলেই তাঁর ইচ্ছা, অনুগ্রহ ও ইনসাফের মাঝে আবর্তিত।

৩৬. তাঁর ফায়সালাকে প্রত্যাখ্যান করার কেউ নেই।

৩৭. তাঁর হুকুমকে পশ্চাতে নিক্ষেপকারী কেউ নেই।

৩৮. তাঁর নির্দেশের উপর প্রভাব বিস্তারকারী কেউ নেই।

৩৯. তিনি প্রতিপক্ষ ও সমকক্ষ থেকে অনেক উর্ধ্বে।

৪০. নিশ্চয় মুহাম্মদ ﷺ তাঁর মনোনীত বান্দা।

৪১. তাঁর মনোনীত নবী।

৪২. তাঁর সন্তোষভাজন নবী।

৪৩. তিনি সর্বশেষ নবী।

৪৪. তিনি (মুহাম্মদ ﷺ) মুত্তাকিদের ইমাম।

৪৫. তিনি রাসূলকুল শিরোমণি।

৪৬. তিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ তায়ালার প্রিয়ভাজন।

৪৭. হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর নবুওয়তের পর প্রত্যেক নবুওয়তের দাবিই ভ্রষ্টতা ও প্রবৃত্তিপ্রসূত।

৪৮. মুহাম্মদ ﷺ সত্য ও হেদায়েত নিয়ে প্রেরিত হয়েছেন সকল জীন এবং সমস্ত মাখলুকের নিকট।

৪৯. কুরআন শরিফ আল্লাহ তায়ালার কালাম তথা কথা।

৫০. কুরআন আল্লাহ তায়ালার থেকে প্রকাশ পেয়েছে বলার কোনো পদ্ধতি ব্যতিরেকে।

৫১. কুরআন আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীর উপর অবতীর্ণ করেছেন ওয়াহিরূপে।

৫২. কুরআনকে সকল মুমিন সত্য বলে সত্যায়ন করে।

৫৩. সকল মুমিন বিশ্বাস করে যে, 'কুরআন' বাস্তবে আল্লাহ তায়ালার কালাম, সৃষ্টিকুলের কথার মতো তা মাখলুক (সৃষ্ট) নয়।

৫৪. যে ব্যক্তি কুরআন শরিফ শ্রবণ করে 'এটা মাখলুকের কথা' মনে করল, সে কুফ্‌রি করল।

৫৫. কুরআন শরিফ মানুষের কথার সদৃশ নয়।

৫৬. যে ব্যক্তি মানবীয় কোনো গুণের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার গুণ বর্ণনা করবে, সে কুফরি করেছে বলে সাব্যস্ত হবে।

৫৭. জান্নাতবাসী আল্লাহ তায়ালার দর্শন লাভ করবে—এটা সত্য। তবে সে দর্শনের কোনো ধরণ-পদ্ধতি আমাদের জানা নেই এবং সেই দর্শন হবে পরিবেষ্টন ব্যতিরেকে।

৫৮. আমরা আরো বিশ্বাস করি, 'দর্শন' প্রসঙ্গে যেসব বিশুদ্ধ হাদিস রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত আছে, সেসব হাদিস তেমনই, যেমনটি রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন এবং সেসব বিশুদ্ধ হাদিসের ব্যাখ্যা তাই, রাসূলুল্লাহ ﷺ তার দ্বারা যা উদ্দেশ্য নিয়েছেন।

৫৯. 'দর্শন' সম্পর্কিত আয়াত ও হাদিসের মধ্যে আমরা নিজের মতামত বা ধারণাপ্রসূত কোনো ব্যাখ্যা প্রদান করি না।

৬০. উক্ত আয়াত ও হাদিসের ব্যাপারে আমরা নিজেদের প্রবৃত্তিপ্রসূত কোনো কিছু ধারণাও করি না।

৬১. ইসলামের চরণ প্রতিষ্ঠিত থাকে কেবল আত্মসমর্পণ ও বশ্যতা স্বীকারে।

৬২. যে ব্যক্তি নিষিদ্ধ বিষয়ে অবগতি লাভ করতে চায় এবং আত্মসমর্পণের দ্বারা তার বুঝ-শক্তি পরিতৃপ্ত হয় না, সে নিষ্কলুষ একত্ববাদের বিশ্বাস, নিরঙ্কুশ মারেফাত ও বিশুদ্ধ ঈমান থেকে বঞ্চিত হয়।

৬৩. এরূপ ব্যক্তি কুফর ও ঈমান, তাসদিক ও তাকযিব, ইকরার ও ইনকারের মাঝে দোদুল্যমান থাকে। তদুপরি সর্বদা সে সন্দেহ, অস্থিরতা, অভিযোগ ও বক্রতায় লিপ্ত থাকে। ফলে সে مُؤْمِنٌ مُصَدِّقٌ (সত্যনিষ্ঠ মুমিন) হয় না; আবার كَافِرٌ جَاحِدٌ (অস্বীকারকারী কাট্টা কাফির)-ও হয় না।

৬৪. জান্নাতবাসীদের আল্লাহ তায়ালার দর্শন লাভের ওপর ওই ব্যক্তির ঈমান আনয়ন শুদ্ধ হবে না, যে এটাকে কল্পনা দ্বারা অপব্যাখ্যা করে আমরা নিজ বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী এটার (দর্শনের) ব্যাখ্যা করে।

৬৫. যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার গুণাবলিকে অস্বীকার এবং মাখলুকের গুণের সাথে তুলনা করা থেকে বিরত থাকতে পারেনি, তার পদস্খলন ঘটেছে। সে আল্লাহ তায়ালার পবিত্রতা প্রমাণ করতে পারেনি। কেননা আমাদের সুমহান প্রতিপালক একক গুণে গুণান্বিত, অদ্বিতীয় বিশেষণে বিশেষিত।

৬৬. ভূ-পৃষ্ঠে কেউ তাঁর গুণে গুণান্বিত নয়।

৬৭. আল্লাহ তায়ালা পরিধি, সীমা-পরিসীমা, অঙ্গ-প্রতঙ্গ ও উপাদান-উপকরণ থেকে বহু উর্ধ্বে; পূত-পবিত্র।

৬৮. সৃষ্ট বস্তুনিচয়ের মতো তাকে কোনো কিছু পরিবেষ্টন করতে পারে না।

৬৯. মেরাজ সত্য। রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে রাতের বেলায় ভ্রমণ করানো হয়েছে। তাকে জাগ্রতবস্থায় স্বশরীরে নভোম-লে উঠানো হয়েছে। এরপর আল্লাহ তায়ালা তার উর্ধ্ব জগতের যেখানে চেয়েছেন, সেখানেই তাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা তাকে যে জিনিস দ্বারা সম্মানিত করতে চেয়েছেন, তা দ্বারা তাকে সম্মানিত করেছেন। তিনি যা প্রত্যাদেশ করার ইচ্ছা করেছেন, তা তার বান্দার নিকট প্রত্যাদেশ (ওয়াহি) করেছেন।

৭০. 'হাউজে কাওসার' চিরসত্য। যা দ্বারা আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীকে আপন উম্মতের (পরকালে) পিপাসা নিবারণার্থে দানস্বরূপ সম্মানিত করেছেন।

৭১. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুপারিশ সত্য। যে সুপারিশ আল্লাহ তায়ালা তাঁর উম্মতের জন্য সংরক্ষিত রেখেছেন। হাদিস শরিফে তাই বর্ণিত আছে।

৭২. আল্লাহ তায়ালা হযরত আদম আ. ও তাঁর সন্তানদের থেকে রূহজগতে যে অঙ্গীকার নিয়েছেন, তা চিরসত্য।

৭৩. আল্লাহ তায়ালা অনাদিকাল হতে পূর্ণরূপেই জানেন, কতসংখ্যক লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে আর কতসংখ্যক লোক জাহান্নামে প্রবেশ করবে। এ সংখ্যায় বৃদ্ধি পাবে না এবং হ্রাস হবে না।

৭৪. তদ্রুপ আল্লাহ পাক নিজ বান্দাদের কর্ম সম্পর্কে পূর্ব থেকেই অবগত।

৭৫. যাকে যে কর্মের জন্য তিনি সৃষ্টি করেছেন, তাঁর জন্য সে কর্ম সহজসাধ্য করা হয়েছে।

৭৬. সকল কর্মের প্রতিদান শেষ অবস্থার উপর নির্ভরশীল।

৭৭. আল্লাহ তায়ালার ফায়সালা দ্বারা যে সৌভাগ্যবান হয়েছে, সেই প্রকৃত সৌভাগ্যবান আর যে দুর্ভাগা হয়েছে, সেই মূলত হতভাগা।

৭৮. তাকদির হল মাখলুক সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালার একটি গোপন রহস্য। যা নৈকট্যশীল কোনো ফিরিশতা এবং নবী-রাসূলও জানেন না।

৭৯. তাকদির সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করা ব্যর্থতা ও আল্লাহ তায়ালার রহমত থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণ এবং এটা সীমালঙ্ঘনের মাধ্যম।

৮০. তাকদিরের উদ্দেশ্য খুঁজতে আল্লাহ তায়ালা নিষেধ করেছেন। সুতরাং যদি কেউ বলে তিনি এটা কেন করলেন তা হলে সে কাফির হয়ে যাবে।

৮১. عِلْمِ مَوْجُوْد (ইলমে মওজূদ বা অস্তিত্ব জ্ঞান) অস্বীকার করা কুফরি। তদ্রুপ عِلْمِ مَفْقُوْد (ইলমে মাফকূদ অপ্রাপ্ত জ্ঞান)-এর দাবি করাও কুফরি। বস্তুত علم موجود গ্রহণ ও عِلْمِ مَفْقُوْد অন্বেষণ বর্জন ছাড়া ঈমান শুদ্ধ হবে না।

৮২. আমরা লাওহে মাহফুজ (সংরক্ষিত ফলক)-এর প্রতি বিশ্বাস রাখি।

৮৩. আমরা কলম এবং কলম যা লিখেছে তার প্রতি বিশ্বাস রাখি।

৮৪. যদি সকল সৃষ্টিজীব সংঘবদ্ধ হয়ে চেষ্টা করে ওইসব বিষয় না হওয়ার জন্য, যা সংঘটিত হওয়ার কথা আল্লাহ তায়ালা লওহে মাহফুজে লিখে রেখেছেন, তবে তারা এতে সক্ষম হবে না। তদ্রুপ যদি সকল মাখলুক একজোট হয়ে ওইসব বিষয় সংঘটনের জন্য চেষ্টা চালায়, যা সংঘটিত হওয়ার কথা আল্লাহ তায়ালা লওহে মাহফুজে লিখেননি, তা হলে এতেও তারা সক্ষম হবে না।

৮৫. কিয়ামত অবধি যা কিছু হবে, কলম তা লিখে শুকিয়ে গেছে।

৮৬. বান্দার কাছে যা পৌঁছে নি, তা পৌঁছার ছিল না। আর যা পৌঁছেছে, তা পৌঁছারই ছিল।

৮৭. বান্দার উপর এ কথা বিশ্বাস করা আবশ্যক যে, মাখলুক থেকে যা হবে আল্লাহ তায়ালা তা পূর্ব হতেই জানেন।

৮৮. আল্লাহ যা কিছু ধার্য করেছেন, তা নিজ ইচ্ছা থেকে ধার্য করেছেন।

৮৯. আসমান-জমিনের কেউ তাঁর ইচ্ছার খণ্ডনকারী নেই।

৯০. তাঁর ইচ্ছা পশ্চাতে নিক্ষেপকারী ও দূরিভূতকারী কেউ নেই।
৯১. তাঁর ইচ্ছার পরিবর্তন ও পরিবর্ধনকারী কেউ নেই।
৯২. তাতে কেউ কিছু বৃদ্ধি করতে বা কমাতেও পারে না।
৯৩. আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি ব্যতীত কোনো কিছু সৃষ্ট হয় না।
৯৪. আল্লাহ তায়ালার সকল সৃষ্টি সুন্দর হয়।
৯৫. আরশ-কুর্‌সি সত্য।
৯৬. তিনি আরশ ও অন্যান্য সকল কিছু থেকে অমুখাপেক্ষী।
৯৭. তিনি সকল বিষয়কে পরিবেষ্টনকারী।
৯৮. তিনি সবকিছুর উর্ধ্বে।
৯৯. সৃষ্টিকুল তাঁকে পরিবেষ্টন করতে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে।
১০০. আমরা দৃঢ় বিশ্বাস, সত্যায়ন এবং আনুগত্যসহ স্বীকার করি যে, আল্লাহ তায়ালা ইবরাহিম আ.-কে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন এবং হযরত মূসা আ.-এর সঙ্গে কথা বলেছেন।
১০১. আমরা সকল ফিরিশতা ও নবী-রাসূলের প্রতি অবতীর্ণ সকল আসমানি কিতাবের প্রতি ঈমান রাখি।
১০২. আমরা সাক্ষ্য দিই, সকল নবী সুস্পষ্ট সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।
১০৩. আমরা কিবলার অনুসারীদের মুমিন ও মুসলমান নামে ভূষিত করি, যতক্ষণ তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আনীত বিষয়ের উপর বিশ্বাসী থাকবে এবং তিনি যা কিছু বলেছেন তা সত্যায়ন করবে।
১০৪. আমরা আল্লাহ তায়ালার সত্তা নিয়ে অহেতুক গবেষণা করি না।
১০৫. আমরা আল্লাহ তায়ালার দীন সম্পর্কে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করি না।
১০৬. আমরা কুরআনের ব্যাপারে কোনো বিবাদে লিপ্ত হই না।
১০৭. আমরা সাক্ষ্য দিই যে, কুরআন বিশ্বজগতের পালনকর্তার কালাম। এটা নিয়ে হযরত জিবরাঈল আ. অবতরণ করেছেন এবং নবীকুলের সর্দার হযরত মুহাম্মদ ﷺ-কে শিক্ষা দিয়েছেন।
১০৮. মাখলুকের কোনো কথা আল্লাহর কালামের সমকক্ষ হতে পারে না।
১০৯. আমরা কুরআনকে মাখলুক (সৃষ্ট) বলি না।
১১০. আমরা কখনো আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের বিরোধিতা করি না।
১১১. আমরা আহলে কিবলা বা কোনো মুসলমানকে কোনো গুনাহের কারণে কাফির বলি না।
১১২. আমরা একথাও বলি না যে, ঈমান থাকা অবস্থায় কোনো পাপীর পাপ ক্ষতিসাধন করে না।

১১৩. সৎকর্মশীলদের ব্যাপারে আমরা আশা করি যে, আল্লাহ তায়ালা তাদের ক্ষমা করে দিবেন। তবে আমরা তাদের ক্ষমার ব্যাপারে নিশ্চিত নই।

১১৪. আমরা তাদের পাপের জন্য ইস্তিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করি।

১১৫. আমরা তাদের জন্য জান্নাতের সাক্ষ্য দিই না।

১১৬. আমরা তাদের ব্যাপারে আশঙ্কা বোধ করি; তবে নিরাশ হই না।

১১৭. আল্লাহ তায়ালার শাস্তি থেকে নিশ্চিন্ত হওয়া কিংবা তাঁর রহমত হতে নিরাশ হওয়া—দুটিই ইসলাম বহির্ভূত কাজ ও কুফরি। কিবলাপন্থি তথা মুসলমানদের জন্য এ দুয়ের মাঝে হচ্ছে হকের পথ।

১১৮. যে সকল বিষয় বিশ্বাস করার দ্বারা বান্দা ঈমানদার বলে সাব্যস্ত হয়, তার কোনো একটি অস্বীকার করলে সে ঈমান থেকে খারিজ হয়ে যাবে এবং কাফির হয়ে যাবে।

১১৯. আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে নাযিলকৃত কুরআন এবং রাসূল ﷺ থেকে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হাদিসসমূহ সত্য।

১২০. মৌলিক ঈমান এক। ঈমানের মৌলিক বিষয়ে মুমিনগণ সবাই সমান। তবে তাকওয়া, কুপ্রবৃত্তির বিরোধিতা ও উত্তম বিষয় আঁকড়ে ধরার কারণে তাদের মাঝে মর্যাদাগত প্রকৃত পার্থক্য হয়।

১২১. সকল মুমিন আল্লাহ তায়ালার বন্ধু। তবে তাদের মধ্যে যিনি তাকওয়া, মারিফাত ও কুরআনের সর্বাধিক অনুগত, সে সর্বাধিক সম্মানিত ব্যক্তি।

১২২. ঈমান মানে আল্লাহ তায়ালা, তাঁর ফিরিশতা, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর নবী রাসূলগণের প্রতি, পরকাল দিবস, মৃত্যুর পর পুনরুত্থান এবং এর ভালো-মন্দ ও তিক্ত-মিষ্টতার প্রতি বিশ্বাস রাখা।

১২৩. আমরা নবী-রাসূলদের ব্যাপারে ঈমান আনার ক্ষেত্রে কোনো পার্থক্য করি না।

১২৪. মুহাম্মদ ﷺ-এর উম্মতের মধ্যে যারা ঈমান অবস্থায় কবিরা গুনাহ করবে, তাঁরা জাহান্নামে যাবে; তবে চিরকাল থাকবে না। যদিও তওবা না করে মারা যায়। হাঁ! আল্লাহ তায়ালা চাইলে তাদেরকে ক্ষমা করতে পারেন, আবার নাও করতে পারেন। আর যদি এদের শাস্তি দেন, তবে প্রত্যেকের অপরাধ অনুযায়ী দিবেন। এরপর নিজ কৃপায় তাদের জান্নাত দান করবেন। কারণ, আল্লাহ তায়ালা সকল মুমিন বান্দার অভিভাবক। তিনি মুমিনদের সাথে কাফিরদের মতো আচরণ করবেন না।

১২৫. আমরা কিবলাপন্থি প্রত্যেক সৎ ও অসৎ ব্যক্তির পিছনে নামায আদায় করাকে বৈধ মনে করি। তাদের জানাযা পড়াকেও বৈধ মনে করি।

১২৬. আমরা কাউকে জান্নাতি বা জাহান্নামি বলি না।

১২৭. আমরা তাদের কারো প্রতি কুফর, শিরক বা নিফাকের সাক্ষ্য দিই না; যাবৎ না তাদের থেকে তা প্রকাশ পায়।

১২৮. আমরা তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়াদি আল্লাহ তায়ালার নিকট ন্যস্ত করি।

১২৯. আমরা উম্মতে মুহাম্মদি ﷺ-এর কারো প্রতি তরবারি চালানো বৈধ মনে করি না। তবে যার উপর কোনো কারণে শরিয়তের দৃষ্টিতে তরবারি চালানো ওয়াজিব হয়েছে সে ব্যতীত।

১৩০. আমরা আমাদের ইমাম ও শাসকবর্গের আনুগত্য থেকে বের হওয়াকে বৈধ মনে করি না; যদিও তারা জালেম হয়ে থাকে।

১৩১. আমরা তাদের জন্য বদ-দোয়া বা তাদের আনুগত্য ত্যাগ করি না।

১৩২. আমরা তাদের আনুগত্যকে আল্লাহর আনুগত্যের মতো ফরয মনে করি যতক্ষণ পর্যন্ত তারা আল্লাহ তায়ালার সাথে অবাধ্যতার নির্দেশ না দেন।

১৩৩. আমরা শাসকদের কল্যাণ ও সুস্থতার দোয়া করি।

১৩৪. আমরা সুন্নাত ও জামাতের অনুসরণ করি। (জামাত হলো রাসূল ﷺ)-এর আনুগত্য ও নিজ ধর্মের বিষয়ে সুবোধের অধিকারী সাহাবায়ে কিরাম এবং ওইসব ব্যক্তিত্ব, যারা তাঁদের যথাযথ অনুসরণ করবে।

১৩৫. আমরা বিচ্ছিন্নতা, বিরোধিতা ও বিভেদকে পরিত্যাগ করি।

১৩৬. আমরা ন্যায়পরায়ণ ও বিশ্বস্ত লোকদেরকে ভালবাসি।

১৩৭. আমরা জালেম ও অসাধুদের সাথে বিদ্বেষ পোষণ করি।

১৩৮. যেসব বিষয়ের জ্ঞান আমাদের নিকট অস্পষ্ট, সে ক্ষেত্রে আমরা বলি– আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন।

১৩৯. আমরা মুসাফির ও মুকিম অবস্থায় মোজার উপর মাসাহ করাকে বৈধ জ্ঞান করি।

১৪০. হজ ও জিহাদ দুটি পৃথক পৃথক ফরয। দুটিই কিয়ামত পর্যন্ত মুসলিম শাসকগণের মাধ্যমে অব্যাহত থাকবে, চাই তারা সৎ হোক বা অসৎ।

১৪১. কোনো কিছুই এ দুটিকে বাতিল বা রহিত করতে পারবে না।

১৪২. আমরা কিরামান কাতিবিন ফিরিশতাদের প্রতি ঈমান আনয়ন করি যে, আল্লাহ তাদেরকে আমাদের উপর পর্যবেক্ষক হিসাবে নিযুক্ত করেছেন।

১৪৩. আমরা বিশ্ববাসীর রূহ কবজের কাজে নিয়োজিত ফিরিশতার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করি।

১৪৪. আমরা বিশ্বাস করি—কবরের শাস্তি ও নেয়ামতসমূহ সত্য এবং তার উপযুক্ত ব্যক্তি তা ভোগ করবে।

১৪৫. আমরা বিশ্বাস করি যে, কবরে মুনকার-নাকীর ফিরিশতা মৃতব্যক্তিকে তার রব (প্রতিপালক) রাসূল ও ধর্ম সম্পর্কে প্রশ্ন করবেন। যেমনটি হুজুর ﷺ ও সাহাবায়ে কিরাম রাযি. থেকে বর্ণিত আছে।

১৪৬. কবর হয়তো জান্নাতের বাগিচাসমূহের মধ্য হতে একটি বাগিচা অথবা জাহান্নামের গর্তসমূহের মধ্য হতে একটি গর্ত হবে।

১৪৭. আমরা বিশ্বাস করি পুনরুত্থানকে।

১৪৮. কিয়ামত দিবসে আমলসমূহের প্রতিদানকে।

১৪৯. আমলনামা পেশ করাকে।

১৫০. আমলসমূহের হিসাব-নিকাশকে।

১৫১. আমলনামা পাঠ করাকে।

১৫২. উত্তম প্রতিদানকে।

১৫৩. শাস্তিকে।

১৫৪. পুলসিরাতকে।

১৫৫. মিযানকে।

১৫৬. পুনরুত্থান মানে কিয়ামত দিবসে দেহসমূহ একত্র করে জীবিত করা।

১৫৭. জান্নাত-জাহান্নাম এমন দুটি সৃষ্টি, যা কখনো ধ্বংস হবে না।

১৫৮. আল্লাহ তায়ালা মানুষ সৃষ্টির পূর্বেই জান্নাত জাহান্নাম সৃজন করেছেন এবং জান্নাত ও জাহান্নামের অধিবাসীদেরকেও সৃষ্টি করেছেন।

১৫৯. মানুষের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তিনি নিজ অনুগ্রহে জান্নাতি বানিয়েছেন।

১৬০. প্রত্যেকেই সেই কাজই করে, যার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং প্রত্যেকে সে-দিকেরই অনুগামী হয়, যার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

১৬১. কল্যাণ ও অকল্যাণ উভয়টি বান্দার উপর নির্ধারিত।

১৬২. সক্ষমতা দুই প্রকার। ক. যেসব সক্ষমতার সাথে মাখলুক গুণান্বিত হতে পারে না। যেমন, কোনো কাজের তাওফিক দেওয়া। খ. যেসব সক্ষমতার সাথে মাখলুক গুণান্বিত হতে পারে। যেমন, সুস্থ হওয়া।

১৬৩. বান্দার সকল কাজের স্রষ্টা আল্লাহ তায়ালা। আর বান্দা উপার্জনকারী।

১৬৪. আল্লাহ তায়ালা বান্দাদের উপর তাদের সাধ্যের বাইরে কোনো কিছু চাপিয়ে দেন নি। বান্দা শুধু ততটুকুই করতে পারে, যার সক্ষমতা তাকে

দেওয়া হয়েছে। আর এটাই لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ-এর তাফ্সির। অতএব আমরা বলি– আল্লাহ তায়ালার সাহায্য ছাড়া গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার কোনো সাধ্য নেই এবং আল্লাহ তায়ালার তাওফিক ছাড়া তার আনুগত্য করা ও আনুগত্যের উপর অটল থাকা সম্ভব নয়।

১৬৫. প্রত্যেক বস্তু আল্লাহ পাকের ইচ্ছা, ইলম ও সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সংঘটিত হয়। তাই আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা মাখলুকের সকল ইচ্ছার উপর বিজয়ী থাকবে এবং তার সিদ্ধান্ত সমস্ত কৌশলের উপর প্রধান থাকবে।

১৬৬. আল্লাহ তায়ালা যা চান তাই করেন।

১৬৭. তিনি যা করেন তা সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেন না।

১৬৮. সকল সৃষ্টিজীবকে তার কৃতকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।

১৬৯. জীবিতদের দুয়া ও তাদের দানে মৃতব্যক্তিদের জন্য উপকার রয়েছে।

১৭০. আল্লাহ তায়ালা বান্দাদের দোয়াসমূহ কবুল করেন।

১৭১. তিনি প্রয়োজনসমূহ পূর্ণ করেন।

১৭২. তিনি সবকিছুর অধিপতি।

১৭৩. তাঁর উপর কারো আধিপত্য নেই।

১৭৪. তিনি কারো উপর জুলুম করেন না।

১৭৫. কেউ একপলক সময়ও আল্লাহ তায়ালা থেকে অমুখাপেক্ষী নয়।

১৭৬. যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা থেকে একমুহূর্ত অমুখাপেক্ষী হবে, সে কুফরি করেছে বলে সাব্যস্ত হবে এবং ধ্বংসশীলদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

১৭৭. আল্লাহ তায়ালা ক্রোধান্বিত হন; আবার সন্তুষ্টও হন। তবে সৃষ্টিজীবের কারো মতো নয়।

১৭৮. আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবাদেরকে ভালবাসি।

১৭৯. আমরা তাঁদের কাউকে ভালবাসার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করি না।

১৮০. আমরা তাঁদের কারো সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করি না।

১৮১. তাঁদের সাথে যারা বিদ্বেষ পোষণ করে, আমরাও তাদের সাথে বিদ্বেষ পোষণ করি।

১৮২. সাহাবিদের সমালোচকদের প্রতিও আমরা বিদ্বেষ পোষণ করি।

১৮৩. আমরা কেবল তাঁদের সুআলোচনা করব।

১৮৪. তাঁদেরকে ভালবাসা দীন, ঈমান ও ইহসানের বহিঃপ্রকাশ।

১৮৫. তাঁদের সাথে বিদ্বেষ পোষণ কুফর, নিফাক ও অবাধ্যতার নামান্তর।

১৮৬. আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরে সর্বপ্রথম হযরত আবু বকর রাযি.-এর খেলাফতকে স্বীকার করি। তারপর হযরত উমর রাযি.-এর

খেলাফতকে, তারপর হযরত উসমান রাযি.-এর খেলাফতকে, তারপর হযরত আলী রাযি.-এর খেলাফতকে।

১৮৭. রাসূলুল্লাহ ﷺ যে দশজন সাহাবীর নাম উল্লেখ করে তাদের জান্নাতি হওয়ার সুসংবাদ দিয়েছেন আমরা তাদের জন্য জান্নাতের সাক্ষ্য দিই।

১৮৮. যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবি, পূতঃপবিত্র স্ত্রীগণ এবং তাঁর সন্তান-সন্ততি সম্পর্কে সুআলোচনা করবে, তারা নিফাক থেকে মুক্ত থাকবে।

১৮৯. পূর্ববর্তী বুযুর্গ আলেমগণ তথা সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন ও তাঁদের উত্তরসূরিদের মধ্য হতে যারা কুরআন, হাদিস ও ফিকহে পারদর্শী এবং গবেষক, তাদেরকে সম্মানের সাথে স্মরণ করা কর্তব্য। যারা অসম্মানের সাথে তাদেরকে স্মরণ করবে, তারা পথভ্রষ্ট।

১৯০. আমরা কোনো পীর-বুযুর্গকে নবীদের উপর প্রাধান্য দিই না; আমরা বলি—'একজন নবী সকল ওয়ালি-বুযুর্গ থেকে শ্রেষ্ঠ'।

১৯১. আমরা ওইসব কারামাত (অলৌকিক ঘটনাকে) বিশ্বস করি, যা ওয়ালি-বুযুর্গদের থেকে প্রকাশ পায় ও নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর সূত্রে প্রমাণিত।

১৯২. আমরা কিয়ামতের আলামতসমূহের উপর বিশ্বাস রাখি।

১৯৩. কোনো জ্যোতিষী, গণক বা এমন কোনো ব্যক্তি, যে কুরআন-হাদিস ও ইজমায়ে উম্মতের বিরুদ্ধে কথা বলে, তাদের আমরা বিশ্বাস করি না।

১৯৪. আমরা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতকে সত্য ও সঠিক মনে করি।

১৯৫. আমরা বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টিকারীকে পথভ্রষ্ট ও শাস্তিযোগ্য মনে করি।

১৯৬. আসমান-জমিনে আল্লাহ তায়ালার ধর্ম একটাই—ইসলাম ধর্ম।

১৯৭. ইসলাম ধর্ম বাড়াবাড়ি, ছাড়াছাড়ি, তাশবিহ-তা'লীল, জবর-কদর ও আশা-নিরাশা ইত্যাদি সবকিছুর মাঝামাঝি একটি ভারসাম্যপূর্ণ ধর্ম।

## ইসলামই শাশ্বত ধর্ম

মানব জাতির জন্য ইসলামই একমাত্র শ্বাশত ধর্ম। হযরত মুহাম্মদ ﷺ এর আবির্ভাবের পর থেকে অন্য কোনো নবীর অন্য কোনো ধর্ম গ্রহণযোগ্য নয়। এ কথা কুরআন পাকেও আছে। বিবেকও তা-ই দাবি করে। এ পর্যায়ে আমরা ইসলামের শ্বাশত ও পালনীয় ধর্ম হওয়া কিছু প্রমাণ ও উদাহরণ দিব।

**প্রমাণ-১**

ইসলামের ধর্মগ্রন্থ কুরআন ছাড়া আর কোনো ধর্মের ধর্মগ্রন্থ ঘোষণা করে নি—এ ধর্ম সর্বকালের জন্য, সকল জাতির জন্য। কেবল কুরআন এ ঘোষণা

করেছে। সুতরাং আগেকার আসমানি ধর্মগুলো সেকালের জন্য এবং ওই রাসূলের সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষ ছিল।

কুরআন এসে ঘোষণা দিয়েছে, আজ হতে সকল জাতির জন্য একমাত্র দীন ইসলাম। হাদিসে পাকে ঘোষণা হয়েছে, এ বিধানের পর আর কোনো আসমানি বিধান আসার নেই। সুতরাং কুরআন নাযিলের পর থেকে কিয়ামত অবধি ইসলামই একমাত্র পালনীয় ধর্ম বলে প্রমাণিত হল।

ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থ তাওরাত। তাওরাতের ৫টি অংশ। যথা– পয়দায়েশ, হিজরত, লেবীয়, শুমারি ও দ্বিতীয় বিবরণ। কিন্তু এর কোথাও মূসা আ. ও ইহুদি ধর্ম সমগ্র মানব জাতির জন্য প্রেরিত হওয়ার কথা নেই বরং বারবার শুধু বনী ইসরাঈলীদের কথাই বর্ণিত হয়েছে।

এতে পরিষ্কার হয়, ইহুদি ধর্ম সমগ্র মানব জাতির জন্য নয় বরং শুধু বনী ইসরাঈলিদের জন্য প্রেরিত হয়েছে।

তদ্রুপ খ্রিষ্টানদের ইঞ্জিল খুলে দেখলেও দেখতে পাবেন, ইঞ্জিলের মোট চারটি পার্ট রয়েছে—মথি, মার্ক, লুক ও ইউহান্না। কিন্তু এর কোথাও বর্ণিত হয়নি যে, খ্রিষ্টধর্ম সমগ্র মানব জাতির জন্য প্রেরিত হয়েছে বরং পরিষ্কার শব্দে সেখানে আছে, তা শুধু বনী ইসরাইলীদের জন্য এসেছে। যেমন—

"ঈসা ওই বারজনকে এসব আদেশ দিয়ে পাঠালেন, 'তোমরা অইহুদিদের নিকট বা মিশরীয়দের কোনো গ্রামে যাবে না বরং ইসরাইল জাতির হারানো মেষদের নিকটে যাবে।" [ইঞ্জিল মথি-১০ : ৫-৭]

আরেক স্থানে উল্লেখ আছে,

"একজন কেনানীয় স্ত্রীলোক এসে চিৎকার করে বলতে লাগল, হে প্রভু! দাউদের বংশধর! আমার উপর দয়া করুন। ভূত আমার মেয়েকে ভীষণভাবে ধরেছে। কিন্তু ঈসা তাকে একটা কথাও বললেন না। তখন তার সাহাবিরা এসে অনুরোধ করে বললেন, তাকে বিদায় করে দিন। কারণ, সে আমাদের পিছনে চিৎকার করছে। উত্তরে ঈসা বললেন, আমাকে শুধু ইসরাইল বংশের হারানো মেষদের নিকটেই পাঠানো হয়েছে।" [ইঞ্জিল মথি-১৫ : ২২-২৪]

এভাবে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের কোথাও তাদের ধর্মকে সমগ্র মানব জাতির জন্য প্রেরিত হওয়ার কথা বলা হয়নি। কিন্তু কুরআন মাজিদের অনেক স্থানে ইসলাম ধর্মকে সমগ্র মানবজাতির জন্য প্রেরণের কথা রয়েছে। যেমন,

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ❁

"আমি আপনাকে সমগ্র সৃষ্টিজগতের জন্য রহমত স্বরূপই প্রেরণ করেছি।" [সূরা আম্বিয়া-১০৭]

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ❁

"আমি আপনাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য সুসংবাদাতা ও সতর্ককারীরূপে পাঠিয়েছি; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।" [সূরা সাবা-২৮]

উপরিউক্ত আয়াত ছাড়াও আরো অনেক আয়াতই প্রমাণ করে, ইসলামের নবী মুহাম্মদ ﷺ সমগ্র মানবজাতির জন্য প্রেরিত হয়েছেন। আর কোনো নবী বা ধর্ম সমগ্র মানবজাতির জন্য প্রেরিত হয়েছে মর্মে ধর্মগ্রন্থগুলোতে উদ্ধৃত হয়নি। যা প্রমাণ করে ইসলামই সবার জন্য বর্তমানে পালনীয় ধর্ম।

**প্রমাণ-২**

ইসলামের ধর্মগ্রন্থ কুরআন ছাড়া পৃথিবীতে দ্বিতীয় কোনো ধর্মগ্রন্থ নেই, যে গ্রন্থটি যেভাবে নাযিল হয়েছে, তা তার আপন ভাষায় অবিকৃত অবস্থায় সর্বত্র পাওয়া যায়। কিন্তু পৃথিবীর যে কোনো প্রান্ত হতে কুরআন হাতে নিন। আরব, অনারব, স্পে, ডেনমার্ক, ইরাক, ইরান, বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, চিন, জাপান, উগান্ডা, আফ্রিকা, আমেরিকা, ফ্রান্স যে কোনো দেশেই যাবেন, সারা বিশ্বের সর্বত্র কুরআন যে ভাষায় নাযিল হয়েছে, সেখানেই হুবহু অবিকৃত ভাষায় কুরআন মাজিদ সংরক্ষিত পাবেন।

পক্ষান্তরে ইহুদিদের তাওরাত, খ্রিষ্টানদের বাইবেল, হিন্দুদের বেদ কিংবা বৌদ্ধদের ত্রিপিটক এমন সংরক্ষিত পাবেন না বরং একেক ভাষায় একেক বাইবেল পাবেন, একেক ভাষায় একেক বেদ পাবেন।

এতদূর যেতে হবে না। আপনি তাওরাত, যাবুর এবং ইঞ্জিলের একাধিক প্রকাশনীর বাংলাদেশি সংস্করণই খুলে দেখুন! আপনি দেখবেন, একটির ভাষা অন্যটির সাথে মিল নেই। প্রচুর গড়মিল রয়েছে। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ! ছুম্মা আলহামদুলিল্লাহ! পবিত্র কুরআনে এমনটি পাবেন না। সারা বিশ্বের কুরআনের আরবি পাঠ একই। গুহার ভিতরে যদি কোনো কুরআন পাওয়া যায় সেই কুরআন আর রাজ প্রাসাদে থাকা কুরআন একই ভাষায়, একই শব্দে ও একই সূরা-আয়াতে লিপিবদ্ধ পাবেন। কোনো পরিবর্তন-পরিবর্ধন পাবেন না। এটাই সুস্পষ্ট প্রমাণ করে, ইসলামই একমাত্র অবিকৃত ও সত্য ধর্ম।

**প্রমাণ-৩**

সারা পৃথিবীতে কোনো ধর্মের ধর্মগ্রন্থের হাফেজ বা পুরো গ্রন্থ মুখস্থকারী কোনো ব্যক্তি খুঁজে পাবেন না। অথচ পবিত্র কুরআনের কোটি কোটি হাফেজ বিদ্যমান। পৃথিবীর যে কোনো প্রান্ত থেকে হাফেজকে একত্র করুন। সকল হাফেজ একই শব্দে, একই পদ্ধতিতে পুরো কুরআন পড়ে শুনাবে। পক্ষান্তরে বাইবেল, বেদ বা ত্রিপিটকের এমন কোনো হাফেজ পৃথিবীর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

এটা প্রমাণ করে, কুরআন ও ইসলাম সত্য ধর্ম। তাই এ ধর্মগ্রন্থ অবিকৃত রাখা হয়েছে। এটা মুখস্থের দ্বারা সংরক্ষণ করা হয়েছে কোটি মানুষের বুকে।

**প্রমাণ-৪**

পৃথিবীর কোনো ধর্মের অবতার কিভাবে জীবনাচার চালিয়েছেন? কিভাবে সংসার চালিয়েছেন? কিভাবে ইবাদত করতেন? কিভাবে ব্যবসা করতেন? কিভাবে সমাজ চালাতেন? কিভাবে বিচার করতেন? এককথায় তার জীবনের পূর্ণাঙ্গ দিকনির্ভর অবস্থা বিশুদ্ধ সূত্রসহ বর্ণিত হয়নি।

পক্ষান্তরে ইসলামই একমাত্র ধর্ম, যাতে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সঠিক ও বিশুদ্ধ সূত্রসহ সংরক্ষিত আছে রাসূলুল্লাহ ﷺ কিভাবে বাথরুমে যেতেন? কিভাবে গোসল করতেন? কিভাবে বিয়ে করেছেন? কিভাবে সংসার করতেন? কিভাবে যুদ্ধ করেছেন? কিভাবে ব্যবসা করেছেন? তাঁর চরিত্র কেমন ছিল? কিভাবে ইবাদত করতেন? মোটকথা, তাঁর পূর্ণাঙ্গ জীবনের প্রতিটি অবস্থা সংরক্ষিত। আর কোনো ধর্মের অবতারের ক্ষেত্রে এমন নজির নেই।

যদি বলা হয়—ঈসা আ. ও মূসা আ. নামায কিভাবে পড়তেন? রুকুতে গিয়ে কী পড়তেন? এর কোনো জবাব ইহুদি ও খ্রিষ্টানরা দিতে পারবে না। একই অবস্থা হিন্দু ও বৌদ্ধদের। তারাও তাদের অবতারের পূর্ণ জীবনচরিত বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণনা করতে পারবে না। কিন্তু মুসলমানদের নবীর সকল অবস্থা বিশুদ্ধ সূত্রে সংরক্ষিত আছে। যা প্রমাণ করে ইসলামই একমাত্র বিশুদ্ধ ধর্ম।

**প্রমাণ-৫**

ইসলাম ধর্ম ছাড়া আর কোনো ধর্ম গ্রন্থে মানুষের জীবন চলার পূর্ণাঙ্গ কোনো বিবরণ নেই। সমাজ, পরিবার, রাষ্ট্র, বিয়ে, তালাক, মিরাছ, ব্যবসা, বাণিজ্য এককথায় একটি মানুষ কিভাবে চলবে? কিভাবে জীবন যাপন করবে? কিভাবে খাবে? কিভাবে কামাই করবে? কিভাবে ঘর-সংসার করবে? কিভাবে ব্যবসা করবে? কিভাবে যুদ্ধ করবে? কিভাবে ইবাদত করবে?

এসব কিছু বিশদভাবে কোনো ধর্ম গ্রন্থে বর্ণিত হয়নি বরং ইহুদি, খ্রিষ্টান, হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম তো শুধু কিছু আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। মানুষের জীবন ঘনিষ্ঠ যুগ-জিজ্ঞাসার কোনো জবাব তাতে বিদ্যমান নেই। বিশ্বাস না হলে তাওরাত, ইঞ্জিল, বেদ, গীতা ও ত্রিপিটক খুলেই দেখুন!

পক্ষান্তরে ইসলাম এমন ধর্ম নয়। ইসলাম ধর্মের ধর্মীয় গ্রন্থ এবং এ ধর্মের নবী থেকে মানুষের পূর্ণ জীবনের বিধানাবলি, জীবন ঘনিষ্ঠ সকল সমস্যার সমাধান বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত আছে। এটাই প্রমাণ করে যে, ইসলামই একমাত্র মানবতার ধর্ম। সকল মানুষের জন্য নাযিলকৃত ধর্ম। ইসলামই একমাত্র নির্বাচিত ধর্ম।

**প্রমাণ-৬**

ইসলাম ধর্মেরই অবিকৃত আসমানি গ্রন্থ অবিকৃত অবস্থায় বিদ্যমান। আর কোনো ধর্মের আসমানি গ্রন্থ অবিকৃত অবস্থায় বিদ্যমান নেই।

সহজ লজিক হল—স্রষ্টার নাযিলকৃত কিতাব যার উপর নাযিল হল, সে কিতাবে তাঁর মৃত্যুর সময়, মৃত্যুর ঘটনা, তার কবরের বিবরণ ইত্যাদি থাকবে না। যদি এসব থাকে, তা হলে বুঝতে হবে—এটি স্রষ্টার নাযিলকৃত কিতাব নয় বরং পরবর্তীসময়ে লিখিত জীবনীগ্রন্থ।

উদাহরণত আমরা জানি, তাওরাত কিতাবটি হযরত মূসা আ.-এর উপর নাযিল হয়েছে। যেটি তার উপর নাযিল হয়েছে, উক্ত কিতাবে তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন বলে সংবাদ কিছুতেই থাকতে পারে না। যদি তা বিদ্যমান থাকে, তা হলে বুঝা যাবে, তা তার উপর নাযিলকৃতি আসমানি বাণীময় কিতাব নয় বরং পরবর্তীসময়ে লিখিত মূসা আ.-এর জীবনীগ্রন্থ।

অথচ তাওরাতে দেখুন! মাবুদ যা বলেছিলেন সে অনুসারে মাবুদের গোলাম মূসা ওই মোয়াব দেশেই ইন্তেকাল করলেন। মোয়াব দেশের বৈৎ পিয়োরের কাছে যে উপত্যাকা ছিল, সেখানে মাবুদই তাকে দাফন করলেন; কিন্তু তার কবরটা যে কোথায় তা আজ পর্যন্ত কেউ জানে না। ইন্তেকাল করার সময়ে মূসার বয়স ছিল একশত বিশ বছর। তখনও তার দেখার শক্তি দুর্বল কিংবা তার গায়ের জোরও কমে যায়নি। বনি ইসরাইলরা মোয়াবের সমভূমিতে ত্রিশ দিন পর্যন্ত মূসার জন্য কান্নাকাটি করেছিল।

[তাওরাত দ্বিতীয় বিবরণ ৩৪:৫-৮]

তাওরাতের এসব বিবরণ স্পষ্ট প্রমাণ করে, বর্তমানে বিদ্যমান তাওরাত মূসা আ.-এর উপর নাযিলকৃত আসমানি গ্রন্থ নয় বরং পরবর্তীকালে কারো লিখিত মূসা আ.-এর জীবনীগ্রন্থ। আর জীবনীগ্রন্থেই কেবল মৃত্যুর সময়,

কোথায় দাফন করা হয়েছে ও মৃত্যুর পর তার উম্মত কী করেছেন, তা বিবৃত হয়। মৃতব্যক্তির জীবদ্দশায় নাযিলকৃত কিতাবে এসব আসতেই পারে না। বোঝা গেল, বর্তমানের তাওরাত মূলত হযরত মূসা আ.-এর জীবনীগ্রন্থ। তাঁর উপর নাযিলকৃত আসমানি গ্রন্থ নয়।

একই অবস্থা ঈসা আ.-এর উপর নাযিলকৃত ইঞ্জিলের বর্তমান ভার্সনের। বাংলাদেশসহ বিশ্বের যে কোনো ভাষায় প্রচারিত ইঞ্জিল বইটি খুলুন! দেখবেন এটা মূলত আসামনি কিতাব নয় বরং তা ঈসা আ.-এর জীবনীগ্রন্থ মাত্র।

কারণ ওই একটাই অর্থাৎ আসমানি গ্রন্থ যার উপর নাযিল হয়েছে, তাঁর মৃত্যুসংবাদ, তাঁর কবরের অবকাঠামো ইত্যাদি আসতে পারে না। বর্তমানের ইঞ্জিলে তা আছে। যেমন– বর্ণিত আছে,

'সন্ধ্যার পর অরিমাথিয়া গ্রামের ইউসুফ নামে জনৈক ধনী লোক সেখানে আসলেন। ওনি ঈসার উম্মত হয়েছিলেন। পীলাতের কাছে গিয়ে তিনি ঈসার লাশটা চাইলেন। তখন পীলাত তাকে এ লাশটা দিতে হুকুম দিলেন। ইউসুফ ঈসার লাশটা নিয়ে গিয়ে পরিষ্কার কাপড়ে জড়ালেন। আর যে নতুন কবর তিনি নিজের জন্য পাহাড়ের মধ্যে কেটে রেখেছিলেন, সেখানে সেই লাশটা দাফন করলেন। পরে সেই কবরের মুখে বড় একটা পাথর গাড়িয়ে দিয়ে তিনি চলে গেলেন।' [ইঞ্জিল মথি-২৭:৫৭-৬০; মার্ক-১৫: ৪২-৪৭; লূক-২৩:৫০-৫৩; ইউহান্না-১৯:৩৮-৪২]

একই অবস্থা হিন্দু ও বৌদ্ধদের ধর্মীয় গ্রন্থগুলোর। কিন্তু ইসলামের ধর্মগ্রন্থ এমন নয়। এখানে উক্ত ধর্মের নবী মারা যাবেন, একথা বিদ্যমান আছে? কিন্তু কোথায় মারা গেছেন? কিভাবে মারা গেছেন? কবর কোথায়? সেসব ধর্মগ্রন্থ কুরআনে বিদ্যমান নেই।

অন্যান্য ধর্মের ধর্মগ্রন্থ ও মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ খুললেই যে কোনো জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান মানুষের বিবেক বলে দিবে—কোন্‌টি অবিকৃত আসমানি গ্রন্থের মর্যাদা রাখে আর কোন্‌টি রাখে না?

**প্রমাণ-৭**

ইসলামের ধর্মগ্রন্থ পবিত্র কুরআনে কোনো অবৈজ্ঞানিক কথা নেই। এতে এমন অসংখ্য বিষয় আছে, যা হাজার বছর পূর্বে উদ্ধৃত হয়েছে। কিন্তু কুরআন নাযিলের অনেক পর বৈজ্ঞানিকরা তা আবিষ্কার করেছেন। এটাই কুরআনকে সর্বজ্ঞ স্রষ্টার নাযিলকৃত বাণী হওয়ার পরিষ্কার স্বীকৃতি প্রদান করে। যেমন–

**বিগব্যাং থিওরি :** সমগ্র বিশ্ব ছিল একটি বস্তুপূঞ্জ, পাইমারি নেবুলা। এরপর বিগ ব্যাং অর্থাৎ একটা বড় বিস্ফোরণ হল। পুনরায় সেফারেট হল। যাতে গ্যালাক্সি বা নক্ষত্রপূঞ্জের সৃষ্টি হল।

এ বিগ ব্যাং থিওরি আবিষ্কারের ফলে ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে দুজন বিজ্ঞানীকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। অথচ সাড়ে চৌদ্দশত বছর পূর্বেই ইসলামের ধর্মগ্রন্থ পবিত্র কুরআনে এ বিগ ব্যাংগের কথা উদ্ধৃত হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে,

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا ❖

'কাফেররা কি ভেবে দেখে না, নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল একসঙ্গে যুক্ত ছিল। এরপর আমি উভয়কে খুলে দিলাম।" [সূরা আম্বিয়া-৩০]

মাত্র পঞ্চাশ বা একশত বছর আগে যে থিওরি মাত্র আবিষ্কৃত হল, সেই থিওরি হাজার বছর পূর্বে কোনো গ্রন্থে থাকাই প্রমাণ করে, উক্ত গ্রন্থটি স্রষ্টার কিতাব ছাড়া আদৌ মানবরচিত গ্রন্থ হতে পারে না।

**চাঁদের নিজের কোনো আলো নেই :** চাঁদের নিজস্ব আলো আছে কি-না? তা বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে এইতো সেদিন। কিন্তু পবিত্র কুরআন তা সাড়ে চৌদ্দশত বছর আগেই জানিয়ে দিয়েছে, চাঁদের নিজের আলো নেই। বরং তা অন্যের থেকে সংগ্রহিত প্রতিফলিত আলো।

تَبَارَكَ الَّذِىْ جَعَلَ فِى السَّمَاءِ بُرُوْجًا وَجَعَلَ فِيْهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُّنِيْرًا.

"কল্যাণময় তিনি, যিনি সৃষ্টি করেছেন নক্ষত্রপুঞ্জ আর তাতে একটি প্রদীপ স্থাপন করেছেন ও একটি চাঁদ যার প্রতিফলিত আলো আছে।" [সূরা ফুরকান-৬১]

**চাঁদ ও সূর্য স্থির নয় :** বিজ্ঞানের আবিষ্কার হল, চাঁদ ও সূর্য একেকটি গ্রহ। যা স্থীর নয়। অথচ এ কথা হাজার বছর পূর্বে পবিত্র কুরআনে বিবৃত হয়েছে। এটি স্রষ্টার বাণী না হলে বিজ্ঞানীদের আবিষ্কারের পূর্বে তা কিভাবে বলল?

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۖ كُلٌّ فِىْ فَلَكٍ يَسْبَحُوْنَ ❖

'তিনিই সৃষ্টি করেছেন রাত্রি ও দিন এবং সূর্য ও চন্দ্র। সবাই আপন আপন কক্ষপথে বিচরণ করে।' [সূরা আম্বিয়া-৩৩]

**প্রতিটি জীবন্ত প্রাণী পানি থেকে সৃষ্ট :** আজ তা বৈজ্ঞানিক গবেষণায় সত্য প্রমাণিত। কিন্তু একথা সাড়ে চৌদ্দশত বছর পূর্বেই পবিত্র কুরআন বলেছে :

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ۖ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ۞

'আর প্রাণবন্ত সবকিছু আমি পানি থেকে সৃষ্টি করলাম। এরপরও কি তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না?' [সূরা আম্বিয়া-৩০]

বিজ্ঞানের অনেক থিওরি উল্টে গেছে। ভুল প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু পবিত্র কুরআনের সাথে বিজ্ঞান যেখানে একমত হয়েছে, সেখানে প্রদত্ত কোনো থিওরি আজ পর্যন্ত পরিবর্তন হয়নি, উল্টানো যায় নি। যা প্রমাণ করে, পবিত্র কুরআন কোনো মানবরচিত গ্রন্থ নয় বরং স্রষ্টার নাযিলকৃত কিতাব।

এরকম আরো অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে, যা যে কোনো বিবেকবান ব্যক্তিকে ইসলাম ধর্মই একমাত্র পালনীয় ধর্ম বলে প্রমাণ করবে। এতদসত্ত্বেও যদি কারো ইসলাম ধর্মকে সত্য ধর্ম হিসেবে মানতে সমস্যা হয়, তা হলে তাকে কপালপোড়া এবং হতভাগা ছাড়া আর কী বা বলতে পারি?

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ

"আমাদের পালনকর্তা! সরল পথ প্রদর্শনের পর তুমি আমাদের অন্তরকে সত্যলঙ্ঘনে প্রবৃত্ত করো না এবং তোমার নিকট থেকে আমাদেরকে অনুগ্রহ দান কর। তুমিই সবকিছুর দাতা।" [সূরা আলে ইমরান-৮]

[আহলে হক বাংলা মিডিয়া সার্ভিস]

## একটি জামার উপমা

—মুফতি দিলাওয়ার হুসাইন দা. বা.

আমি যখন একেবারে ছোট্ট, তখন আমার জামা তৈরি করতে সর্বোচ্চ আধা গজ কাপড় হলে চলত। কিন্তু বয়স যখন তিন বছর, তখন আর আধা গজে হয় না। এক গজ লাগে। বয়স যখন ছয় বছর, এখন আর এক গজেও হয় না; দেড় গজ লাগে। বয়স যখন দশ বছর, তখন জামা বানাতে কমপক্ষে দু'গজ কাপড় লাগে। বয়স যখন বিশ বছর, তখনকার কাপড় বানাতে আড়াই গজ কাপড় লাগে। বয়স যখন ত্রিশ বছর, তখনকার জামা বানাতে তিন গজ কাপড় লাগে। কিন্তু ত্রিশ বছর হয়ে গেলে পরে আর কোনো পরিবর্তন করতে হয় না। ষাট বছর/ সত্তর বছর/ আশি বছর কিংবা মরণের আগের দিনও যদি ত্রিশ বছর বয়সের জামাটা নিয়ে আসে, অনায়াসে গায়ে পরতে পারবে, কাজ চলবে, কোনো সমস্যা হবে না। কিন্তু কেউ যদি ত্রিশ বছর বয়সে এসে পাঁচ বছর বয়সের জামা পরতে চায়, সে ব্যর্থ হবে। জোরপূর্বক ব্যবহার করতে গেলে জামাটাই ছিড়ে নষ্ট হয়ে যাবে।

ঠিক তেমনিভাবে মানব জাতির বয়স যখন ছিল একেবারে শূন্য পর্যায়ের, তখন তাদের জন্য রূহানি জামা বানাতে বিধি-বিধান তেমন বেশি লাগেনি। হযরত আদম আ. হতে নিয়ে হযরত নূহ আ. পর্যন্ত শরিয়তের তেমন কোনো বিধান দেওয়া হয়নি। কিন্তু ক্রমশ যেই বয়স বাড়তে লাগল, রূহানি জামা বানাতে বিধি-বিধানেরও প্রবৃদ্ধি ঘটতে থাকল। দেখতে দেখতে একপর্যায়ে এসে মানবজাতি যখন ত্রিশ বছরের যুবকের পর্যায়ে পৌঁছল। তখন আল্লাহ তায়ালা মানবজাতির রূহানি জামা হিসেবে ইসলামকে মনোনীত করলেন। কেয়ামতের আগের দিনও দীন হিসেবে ইসলামই মানুষের কাজে আসবে। অন্য কোনো দীনকে যদি কেউ নিজের রূহের মধ্যে লাগাতে যায়, তা হলে সে নাকাম ও ব্যর্থ হবে। তার পরও জোরপূর্বক লাগাতে গেলে তার দীন নামক জামাটি ছিড়ে ব্যবহার অযোগ্য হয়ে যাবে। নাস্তিকতার মতো নগ্নতার শিকার হতে হবে তাকে। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে হেফাজত করুন।

তাই আবারো বলছি, হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর আগমনের পর থেকে মানব জাতির জন্য ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম গ্রহণযোগ্য নয়। কেবল ইসলামই তাদের রূহানি জামা হিসেবে কিয়ামত অবধি চলতে থাকবে। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আমরণ টিকে থাকার তাওফিক দান করুন। আমিন!

اَللّٰهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا اِتِّبَاعَهٗ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اِجْتِنَابَهٗ.

وَوَفِّقْنَا لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى.

সমাপ্ত

# গ্রন্থপঞ্জি


| | | | |
|---|---|---|---|
| ১ | কুরআন মাজিদ | ২ | তাফ্‌সিরে কুরতুবি |
| ৩ | বুখারি শরিফ | ৪ | মুসলিম শরিফ |
| ৫ | তিরমিযি শরিফ | ৬ | আবু দাউদ শরিফ |
| ৭ | নাসায়ি শরিফ | ৮ | আল মু'জামুল আওসাত |
| ৯ | বাইহাকি শরিফ | ১০ | ফাতহুল বারী |
| ১১ | মিরকাতুল মাফাতিহ | ১২ | তুহফাতুল আহওয়াযি |
| ১৩ | শরহুল আকাইদ | ১৪ | নাস্তিকের যুক্তি খণ্ডন |
| ১৫ | সীরাতে ইবনে হিশাম | ১৬ | সীরাতে মুস্তাফা - ইদ্রিস কান্ধলবী |
| ১৭ | ফাতাওয়া শামী | ১৮ | নাস্তিক-মুরতাদের শরয়ী বিধান |
| ১৯ | প্রতি খোলা চিঠি | ২০ | আলফাউযুল কাবীর |
| ২১ | আল-যুহদ/ইবনে আব্দিদ দুনিয়া | ২২ | সেক্যুলারিজম/আমির খসরু |
| ২৩ | ইসলামি আকিদা ও ভ্রান্ত মতবাদ | ২৪ | কমিউনিস্ট শাসনে ইসলাম/ড. হাসান জামান |
| ২৫ | ইসলাম ও কমিউনিজম / কবি গোলাম মোস্তফা | ২৬ | বামপন্থি রাজনীতি ও বাংলাদেশের অভ্যুদয় |
| ২৭ | ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা | ২৮ | আহলে হক বাংলা মিডিয়া সার্ভিস |
| ২৯ | হক ও বাতিলের চিরন্তন দ্বন্দ্ব/আহমাদ শফী | ৩০ | যুক্তির কষ্টিপাথরে আল্লাহর অস্তিত্ব |
| ৩১ | ওস্তাদ শাগরেদকে হুকূক | ৩২ | মাসিক নেয়ামত |
| ৩৩ | স্টিফেন হকিং, নাস্তিকতা ও ইসলাম | ৩৪ | ছুরাউন মায়াল মালাহিদাতি হাত্তাল আজম |
| ৩৫ | প্যারাডক্সিক্যাল সাজিদ | ৩৬ | ডাবল স্টান্ডার্ড |
| ৩৭ | মাসিক আল-কাউসার | ৩৮ | মাসিক রাহমানী পয়গাম |
| ৩৯ | মাসিক মদিনা | | |

# আমি নাস্তিক নই

মাওলানা আলী মুর্তাজা সিরাজি

আল-কাউসার প্রকাশনী
ইসলামী টাওয়ারা, বাংলাবাজার, ঢাকা

design
HashemAli | 01855 876470